যখন নাবিক ছিলাম

রিচার্ড হেনরী ডানা

অনুবাদ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

এশিয়া
পাবলিশিং
কোম্পানি
কলিকাতা—বারো

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর

প্রদীপকুমার হাজরা

শ্রীমুদ্রণ

৩৮ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ

চৈত্র ১৩৬৭

॥ উপক্রমণিকা ॥ জেমস. ডি. হার্ট ॥

রিচার্ড হেনরী ডানার নাম তাঁর "যখন নাবিক ছিলাম" বইটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে আছে। লেখকের মতে এই কাহিনীর ঘটনাকাল তাঁর জীবনের এক প্রক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। কিন্তু এই অবান্তর অধ্যায়ই তাঁর সুদীর্ঘ সাতষট্টি বছরের অন্য সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব ম্লান করে দিয়েছে। খ্যাতি তাঁর জীবনের অকিঞ্চিৎকর কাজগুলিকেই বড় করে তুলেছিল, শেষ বয়সে একথা বুঝতে পেরে ডানা খেদোক্তি করে বলেন, "আমার জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি—আমার বইটি নেহাৎই বালকসুলভ রচনা—আমার আসল কর্মজীবন আরম্ভ হওয়ার বহু আগে লেখা।"

ম্যাসাচুসেট্সের ইতিহাসে ডানাদের পরিবার দুই শতাব্দী ধরে এক গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। রাজনীতি ও আইন চর্চ্চায় বংশের পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখাই ছিল ডানার মনোগত অভিপ্রায়। এই সাধনায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে তাঁর যশের জন্য সেই বিখ্যাত দুই বছরের অভিজ্ঞতাই বহুলাংশে দায়ী। উদার সমুদ্রের বুকে যে মূল্যবান শিক্ষা অর্জন করেন বস্টনে ফিরে পরিবারের প্রভাবে তার অনেকটাই ডানার মন থেকে মুছে যায়। তাঁর অসাফল্যের এটাও একটা কারণ। নির্জীব সামাজিক পরিস্থিতি ও গতানুগতিকতার স্রোত ক্রমেই তাঁর সত্তাকে গ্রাস করতে থাকে, নাবিক জীবনের খোলা হাওয়ার শেষ চিহ্নটুকু এই করে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ডানার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে উদার, উন্মুক্ত জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তা পূর্ণতা লাভ করেছিল সমুদ্রের বুকে কাটানো সেই দুই বছরে, কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতাকে অঙ্কুরে বিনাশ করলেন তিনি নিজেই। মাল্লার কাজ করবার সময়েই তাঁর মনে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়:

"অন্যেরা মনে করতে পারেন, এক বছরে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম। বস্টন ছাড়ার পর এক বছর কেটে গেল। ফিরতি পথে অন্তত আরো আট নয় মাস। সুতরাং সব মিলিয়ে বস্টনে আমার অনুপস্থিতি দাঁড়াচ্ছে দু বছর। এই দীর্ঘ সময়টা অপচয়

হল বটে তবে আমার ভবিষ্যত কর্মজীবনের পক্ষে তেমন কিছু হানিকর নয়। কিন্তু আরো এক বছর এই ভাবে কাটাতে হলে হয়ত ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের মত। সারা জীবন এই নাবিকবৃত্তিতেই কাটবে…”

কেম্‌ব্রিজের ডানার চিত্ত ফেরার জন্য উন্মুখ, নাবিক ডানা তাঁকে বাধা দেয়। মৃত্যু পর্যন্ত এই মানসিক সংঘাতে জর্জরিত হয়েছেন তিনি। তাঁর অস্থির চিত্ত একবার উদ্বিগ্ন অঙ্গুলী নির্দেশ করে, ‘ঐ দেখো দলে দলে লোক জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একটিই বাঁধা পথ বেয়ে চলেছে—’। ডানা তাদের মত হতে চান নি, আবার পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় টম হ্যারিস নামে বুদ্ধিদীপ্ত সেই মাল্লাটির কথা, ডানার পরিচিত ছাত্রদের সকলের চেয়েও যার মেধা ছিল উজ্জ্বলতর, অথচ চল্লিশ বছর বয়স অবধি মাসিক বারো ডলার মাহিনায় সে এখনো ঘানি টেনে চলেছে। হোগার্থের নীতিমূলক ছবির মত দুটি ভিন্নমুখী পথের নিশানা তাঁর মনে আঁকা হয়েছিল। একটি কেম্‌ব্রিজবাসী ভদ্রসন্তান ডানা, অন্যটি ছোটলোক মাল্লা ডিক। তবে হোগার্থের মত দুটির অর্থই তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না। ডানার মনে দুটি চিত্রের সঙ্গেই মেশানো ছিল অসাফল্যজনিত নৈরাশ্য। যে কেম্‌ব্রিজে দুই শতাব্দী ধরে তাঁরা বংশপরম্পরায় বাস করে এসেছেন ডানা অবশেষে সেই নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরাই মনস্থ করলেন। ফিরলেন অতি সশঙ্ক চিত্তে, পাছে দুই বছরের বেশী দেরী হয়ে গেলে তাঁর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়।

ডানার পূর্বপুরুষ রিচার্ড ডানা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম নিউ ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। তারপর থেকে কেম্‌ব্রিজের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন, যেমন কুইন্সীর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অ্যাডামস পরিবারের নাম। অ্যাডামসদের মত ডানাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি মনোগত মিল ছিল, যাজক, শাসক বা রাজনীতিবিদ্ যে যাই হোননা কেন। লেখকের পিতা রিচার্ড ডানা (সিনিয়র) ওয়াশিংটনের কার্যভার গ্রহণের দুবছর আগে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি নির্বিচারে পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি গ্রহণ করেন, এই আদর্শে তাঁর ছেলেও অনুপ্রাণিত হল। যতই দিন যেতে লাগল প্রথম রিচার্ড ডানা যুবকগোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও সেই সঙ্গে সমাজের টলমলায়মান অবস্থা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। কোন রকম নূতনত্বের অবতারণা ছিল তাঁর সহ্যাতীত। ছেলেকেও অনুরূপ শিক্ষা দেন তিনি। নিউ ইংলণ্ডের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে অহেতুক বেদনা দিয়েছিল, তবু তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে তাঁর টোরী মতবাদ এই বিবর্তনশীল জগতে একমাত্র নির্ভরশীল বস্তু। তাঁর

পুত্র রিচার্ড হেনরী ডানা (জুনিয়র) যেযুগে বাস করেন সেটা আমেরিকার আত্মবিশ্বাস ও স্বীকৃতির চরম অভিব্যক্তির কাল। এই নতুন যুগের মূলমন্ত্র ছিল মানুষের জয়গান। একমাত্র পুরুষকার দিয়ে যাচাই হবে সফলতার পরিমাণ, অথচ পিতার কাছে যে কালভিনীয় মতবাদে ডানা দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই অনুসারে প্রবৃত্তির দমনই হল মুক্তির একমাত্র উপায়। পিতা লিখেছিলেন "যখন কোন কর্মের যোগ্যতা বিবেচনা করিবে প্রথমে বিচার করিও তোমার মনের প্রবণতা কোন দিকে, পরে সেইগুলির বিরুদ্ধে কাজ করিও।" মনের মধ্যে এই বীজমন্ত্র নিয়ে পুত্র ডানা তৎকালীন যুগের সম্মুখীন হলেন। সে যুগ ছিল উগ্র স্বাধীনতা বাদের যুগ। প্রত্যেক মানুষ তার ভাগ্যনিয়ন্তা—এই মতবাদ বিক্ষুব্ধ পশ্চিম সীমান্তের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদেও অনেকটা পুষ্ট হয়েছিল।

লেখকের জন্মের বছর, ১৮১৫ সনে তাঁর পিতার আমলের সনাতন সভ্যতা বর্তমানের সঙ্গে কঠিন সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হতে থাকে। পুরাতনের মৃত্যুবাণ হাতে নিয়ে আবির্ভূত হলেন আণ্ড্রু জ্যাকসন ও এমার্সন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বস্টনে এক বলিষ্ঠ নবযুগের সূচনা হয়। যেসব প্রাচীন শিকড়ে তাঁদের বংশের ঐতিহ্য এতদিন সুরক্ষিত ছিল সেগুলি প্রায় ডানার জন্মের সময় থেকেই জীর্ণ হতে আরম্ভ করে। অথচ ডানা তার আভাসমাত্র পাননি। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা চলেছিল সেই সাবেকী ছাঁদে। এক যুগ পরে হেনরী অ্যাডামসের সামনেও এই এক সমস্যার উদ্ভব হয়—পারিবারিক সংস্কার ও নতুন আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। যুগের ছাঁচে নিজেকে নতুন করে ঢেলে তৈরী করার আপ্রাণ চেষ্টার যে বিবরণ অ্যাডামস দিয়েছেন সেটি ডানার প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। যে ঐতিহ্যের ধ্বজা বহন করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অ্যাডামস ওয়াশিংটনে যান সেখানে গিয়ে দেখেন সেই ঐতিহ্যই লুপ্তপ্রায়। অনুরূপভাবে ডানা কংগ্রেস প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে দেখেন তাঁর বস্টনের আভিজাত্য এমনই অবজ্ঞার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শুধু ঐজন্যেই ওঁ-কে পরাজয় বরণ করতে হল। ডানা ও অ্যাডামসদের তখন সেকেলে বলে গণ্য করা হত—যেসব কারণে তাঁদের পরিবারের প্রসিদ্ধি এখন সেইগুলিই হয়ে দাঁড়াল নূতন গণতান্ত্রিক সমাজের পরিপন্থী।

হঠাৎ হাম হবার ফলে ডানার বাঁ দিকের চোখটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন হারভার্ড থেকে তাঁকে বাধ্য হয়ে ছুটি নিতে হয়। পরিণাম অবশ্য তাঁর পক্ষে ভালোই হয়েছিল। দৃষ্টি শক্তির পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি কঠোর কায়িক পরিশ্রমের কাজ বেছে নেন। এইভাবে সাময়িকভাবে তাঁর পিতা ও কেমব্রিজের প্রভাব থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এক ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে—যে জগতে স্বাভাবিক বুদ্ধিধর টম হ্যারিস, জন নামে মেজাজী সুইডেনবাসী মাল্লা, ডানার প্রতি ভক্তিমান হোপ নামে কানাকা ও প্রবলপ্রতাপ ক্যাপ্টেন টমসনের বাস। জন্ম থেকে শিক্ষালাভের সময় পর্যন্ত তাঁর জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন লয়ে বেজে চলেছিল এখন সেখান থেকে ভিন্ন পরিবেশে বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হল তার মূল্য বড় কম নয়।

ফিরে এসে ডানা স্নাতক হওয়া অবধি পাঠ গ্রহণ করে পরে হারভার্ডের আইনবিত্থালয়ে প্রবেশ করেন। আইনের প্রতি তাঁর তেমন কোন স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল না কেবল পরিবারের চিরাচরিত ধারা অনুসারে আইনপাঠ করতে আসেন। বহুদিন ধরে তাঁদের বংশে আইনচর্চ্চা হয়ে এসেছে, সুতরাং ডানা ধরে নিলেন তাঁকেও ব্যবহারজীবি হতে হবে। সমুদ্র গমনের স্মৃতি ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছিল। বস্টনের গতানুগতিকতার স্রোতে গা ঢেলে দিলেন ডানা। আইন পড়ার সময় "যখন নাবিক ছিলাম" বইটি রচিত হয়। প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সালে। নাবিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সাহিত্যিক, রাজনৈতিক এবং আইনজ্ঞ হিসাবে ডানা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এই বইটি প্রকাশ করা হল তার প্রথম সোপান। নাবিকদের দুর্দশার কথা জনসাধারণের গোচরে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পরবর্তী বই "নাবিকের বন্ধু" তে তিনি মাল্লাদের তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, অ্যালার্ট থেকে অবতরণ করার বারো বছর পরে ডানা প্রথম সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে ভূমি স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। বস্টনে তখন হুইগ নেতৃত্ব, এবং ম্যাসাচুসেটস্ এর তাঁতশিল্পীদের দক্ষিণের কার্পাস উৎপাদনকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ডানার এই রাজনৈতিক মতবাদে বস্টনের অভিজাত কুল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। হুইগ ব্যবসায়ী ও জাহাজের মালিকদেরও বিরাগভাজন হলেন তিনি। ডানা নিজের মতামত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে বললেন :

"আমার পক্ষে হয়ত একথা বলা অনুচিত কিন্তু উত্তরের পুরোনো বাসিন্দাদের একজন বলেই আমি এই ভূমি আন্দোলনে বিশ্বাসী। যে কোনরকম পরাধীনতা ও দাসত্বকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি—আমার দেশবাসীরা এরূপ কোন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন এটাও আমার ইচ্ছা নয়।...... মালিকরা আজ আমাদের বিপক্ষে কেননা এই স্বাধীনতা

আন্দোলন মহাজনদের খাতার পক্ষ সমর্থন করেনি……আমাদের ভরসা কৃষক, শ্রমিক ও দেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়।"

সারাজীবনই ডানা ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি সর্বদাই তাঁর উদার মতবাদ ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রক্ষণশীলতার মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজতেন। তাঁর সব কাজেই দুটি বিপরীত চিন্তাধারা লক্ষ্যণীয়—পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমুদ্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ডানা বস্টনের দক্ষিণের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন। তিনি শুধু যে পলাতক ক্রীতদাস আইনের বিরোধিতা করেন তা নয়, এই আইন অনুসারে আটক যে কোন নিগ্রোকে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আইন পরামর্শ দিতে এগিয়ে যেতেন। এন্টনী বার্ণস নামে পলাতক ক্রীতদাসকে নিয়ে বস্টনে যে বিখ্যাত মামলা হয় ডানা তাতে আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তবে মামলায় তাঁর পরাজয় হয় এবং নিগ্রোকে সমর্থন করার অপরাধে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা একেবারে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। যাঁর ধমনীতে বহু পুরুষ ধরে অভিজাত নীল রক্ত প্রবাহিত সেই ডানাকে হতে হয় সমাজে অপাংক্তেয়। মণ্টারীতে যেমন মাথায় করে চামড়া তোলার কাজে তিনি নিজেকে ক্রমশঃ অভ্যস্ত করে তোলেন এখনও সেই রকম অবিচলিত চিত্তে তিনি এই অভাবনীয় অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা চাইত সামাজিক প্রতিপত্তি ও সুনাম কিন্তু পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত কঠিন আত্মসংযমের দ্বারা ডানা তাঁর ইচ্ছার কণ্ঠরোধ করলেন।

নিগ্রো ক্রীতদাসটির ব্যাপারে ডানার নাম জনসাধারণের কাছে অজানা ছিলনা, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় সামনার যেমন উচ্চপদ দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন ডানার ভাগ্যে সেসব কিছুই লেখা ছিল না। ডানা ভেবেছিলেন হয়ত তাঁর আইনজ্ঞান তাঁকে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে, কিন্তু কার্যত তার কিছুই হয়নি। সুযোগ অবশ্য এসেছে, কিন্তু ডানা সে সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন। আর কারো সাহায্য না নিয়ে ডানা একা ম্যাসাচুসেটসের নতুন সংবিধান রচনা করেন, কিন্তু সেটি ভোটে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল না। কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েও তিনি শেষে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। রাশিয়া ও জার্মাণীতে তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠানর প্রস্তাব করা হয়, এমনকি নৌবিভাগের প্রাধান সচিব পদের জন্যও ডানাকে যোগ্য বিবেচনা করা হয় কিন্তু কোনটিই শেষ অবধি ফলপ্রসূ হয়নি। কিছুদিনের জন্য তিনি ম্যাসাচুসেট্স্ বিধান-

সভার সদস্য হয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এ্যাটর্নী এবং হ্যালিফ্যাক্স মৎস্যসংক্রান্ত মামলায় বিচারকও ছিলেন—কিন্তু এসবের কোনটিতেই তাঁর যোগ্যতার সম্পূর্ণ প্রয়োগ হয়নি। ডানার উচ্চাশা কোনদিনই পূর্ণ হতে পেল না। এই ক্ষোভ তাঁর লেখার স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। ডানা লিখেছেন ঃ

"দিবারাত্র তুচ্ছ তুচ্ছ সংগ্রামে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলার পরিবর্তে যদি পূর্ণ বিশ্রাম ভোগ করার জন্য অন্তত একটি শীতকালও পেতাম!"

এমনকি ১৮৪৩ সালেই ডানা বস্টনের জীবনধারা সম্বন্ধে ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, তখনও ভবিষ্যৎ জীবনের বহু আশাভঙ্গ দেখতে বাকী আছে।

"সংসারের যত ক্ষুদ্র কাজ করার কি অসীম গ্লানি! কিন্তু উপায় নেই। হায় যদি ইচ্ছামত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারতাম—তাহলে প্রকৃতি ও শিল্পচিন্তার আরো নিকটে থেকে বাঁচার মত বাঁচতাম।"

বস্টনের হতাশা ও গ্লানি থেকে সাময়িকভাবে মুক্তিলাভের আশায় ডানা কয়েকবার তাঁর পূর্বেকার সমুদ্রজীবনে ফিরে যেতে চেয়েছেন। এই পুস্তকের "চব্বিশ বছর পরে" পরিচ্ছেদে এইরূপ একটি ছুটীর বর্ণনা আছে। "কিউবা ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন" নামে বিস্মৃতপ্রায় বইটিতেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। এইভাবে ছুটী কাটাবার পর বস্টনে ফিরে ডানা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে ঃ

"আমার প্রকৃতি ভ্রাম্যমাণের, সমুদ্রে ও স্থলপথে যথেষ্ট পর্যটন করব ও মধ্যে মধ্যে দু একটি কাহিনী লিখব—আমার জীবনের গতি হওয়া উচিত ছিল এইরূপ। এর পরিবর্তে আমি যে পণ্ডিত, আইনবিদ ও লোকসেবক সেগুলি সবই বাহুল্য মাত্র।"

১৮৭২ সালে যখন ডানা সরকারী পদমর্যাদার আশা একেবারে ত্যাগ করেছেন এমন সময় প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুখবর ঘোষণা করেন। ডানার নাম নাকি সেণ্ট জেমস আদালতে মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচনের জন্য সেনেটের কাছে প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু এতেও বাদ সাধলেন ডানার দুজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। গোপনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে তাঁরা পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ডানার মনোনয়ন নাকচ করবার ব্যবস্থা করলেন। সেনেটে ডানার শুভাকাঙ্খী বন্ধুরা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য তাঁকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এমন কাজ করতে ডানার আত্মসম্মানে বাধল। তিনি লিখলেন ঃ

"এই দপ্তরের কাছে গিয়ে নিজের পথ নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে

অত্যন্ত অবমাননাকর। একটি লোভনীয় চাকরী পুরস্কার পাব এই আশায় বাটলারের অভিযোগ খণ্ডন করতে যাবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার পিতা বা পিতামহ কখনো এমন কাজ করতেন না, এমনকি আমার ছেলেও না।"

পররাষ্ট্র দপ্তর ডানার চিঠির ভাষা অত্যন্ত আপত্তিজনক মনে করেন এবং তাঁর অভিযোগের উত্তর দিতে অস্বীকার করাটাও অভদ্রতাসূচক বলে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যাপারটির ঐখানেই ইতি। ডানা শেষবারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদলাভের সুযোগ হারালেন। যশোলাভের আকাঙ্খা থাকলেও ডানার অতি তীক্ষ্ণ সম্মান বোধ থাকায় তাঁর মনোবাঞ্ছা কোনদিনই পূর্ণ হয়নি। সুযোগ যতবারই সামনে এসেছে ডানা বেছে নিয়েছেন কার্যসিদ্ধির কঠিনতম উপায়—ফলে সাফল্যের আশা ক্রমেই হয়েছে সুদূর পরাহত।

বারবার অকৃতকার্য হবার পর ডানা গভীর ক্ষোভে যেকথা বলেন সে কথা যেকোনো লোকের পক্ষেই স্বীকার করা বেশ কঠিন। "জীবনে যা হতে চেয়েছি তার কিছুই হল না"। শেষ কয়েক বছর তিনি আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেন—ভেবেছিলেন সেটিই হবে তাঁর জীবনের মহত্তম সৃষ্টি। কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল বইটির কিছুই লেখা হয়ে ওঠেনি। শেষ জীবনে তাঁর হতাশার আর অন্ত ছিল না। ডানা বহুবার বলেছেন "আমি আসলে জলচর, স্থলে বাস করাই আমার পক্ষে মহান ভুল হয়ে গেছে।" "কেবল মনে পড়ে সমুদ্রের বুকে সেই দিনগুলির কথা।" "বোধহয় আমি নাবিক হবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছি—আঃ, সমুদ্রে কী অপরিসীম শান্তি!" হয়ত ক্যালিফোর্নিয়াতে আর এক বছর থেকে নাবিকবৃত্তিতে আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে সেটাই তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক হত, হয়ত প্রকৃতি ও শিল্পের প্রভাবে সত্ত্বাকে উন্মুক্ত করে দিলে তাঁর সৃজনী শক্তি বিকশিত হয়ে উঠত, কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের সমুদ্রবাসের অভিজ্ঞতার এর থেকে ভালো বর্ণনা ডানা পরে আর কখনো লিখতে পারতেন কি না সন্দেহ। জীবনে মাত্র একবারই সফলতার মুখ দেখেছিলেন ডানা, অবশিষ্ট জীবন অপব্যয় হয়েছে কিন্তু ঐ দুবছরের ঘটনা নিয়ে তিনি যে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা বিরল। খুব কম লোকই এমন সাফল্য গৌরব লাভ করতে পারেন। তাঁর জীবন যতই নৈরাশ্যজনক হোক না কেন ডানার বইটি সমুদ্রের জীবন সম্বন্ধে একটি বলিষ্ঠ লিখন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এই সংস্করণের পাণ্ডুলিপি ডানা শেষ দেখে সংশোধন করেন—এর সঙ্গে তাঁর

স্মৃতিকথা হিসাবে একটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছে, অধ্যায়টির নাম "চব্বিশ বছর পরে।" ভূমিকা ও উপসংহার রূপে প্রথম সংস্করণের প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদ দুটি সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এই দুটি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় বোঝার জন্য এই দুটি অধ্যায়ের তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

লেখকের ভূমিকা

এই বইটি পাঠকসমাজে উপস্থিত করার পূর্বে আমার একটি নিবেদন আছে। বইটি প্রকাশ করার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কি না এ সম্বন্ধে পাঠকদের কিঞ্চিৎ অবগতির জন্যই এই ভূমিকা। মিঃ কুপারের 'পাইলট' ও 'রেড রোভার' হতে শুরু করে সমুদ্রের জীবন নিয়ে আজ অবধি বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে। এই বিষয়ে আরেকটি পুস্তক যোগ করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন না করলে মনে হয় আমার কাজটি সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

কেবলমাত্র মিঃ এমিসের "নাবিকের ঘটনাপঞ্জী" নামক সুখপাঠ্য বইটি ছাড়া (যদিও এটি দ্রুতলিখন দোষ দুষ্ট) জলজীবন সংক্রান্ত অন্য যে সব বই লেখা হয়েছে সেগুলির কোনটিই ঘটনাপ্রধান নয়। অধিকাংশ বইয়ের লেখক হয় নৌবিভাগীয় আধিকারিক অথবা যাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রথমতঃ যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও রীতিনীতির মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ, দ্বিতীয়তঃ এই সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার বিবরণগুলি যতই সুলিখিত হোক না কেন একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নৌকর্মচারী যাঁর কখনো হাত থেকে দস্তানা খুলে কাজ করার প্রয়োজন হয় না এবং সমপদস্থ কর্মী ছাড়া যিনি মাল্লাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন না তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও হবে অতি পরিমিত এবং সাধারণ নাবিকদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক।

জীবনের যেসব বিচিত্র রূপ সর্বসাধারণের কাছে অনাস্বাদিত সেগুলি সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। এছাড়াও আজকাল লোকে মাল্লাদের সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী ও সহানুভূতিশীল। অথচ পূর্বে উল্লিখিত বইটি ছাড়া অন্য কোথাও মাল্লাদের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের একান্ত অভাব। এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাদেরই সঙ্গে সুখে দুঃখে এক হয়ে দিন কাটিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে নাবিক জীবনের সত্যকার কাহিনী এখনো পর্যন্ত শোনা যায় নি।

একটি আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজে নাবিক রূপে কিঞ্চিদধিক দুই বছরে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এই বই তারই বৃত্তান্ত। সে সময়ে লিখিত রোজনামচা

ও দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণ থেকে আমার বইয়ের উপাদান সংগৃহীত। আমি সত্যঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি এবং ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ বোঝাবার জন্য অনেক সময় অমার্জিত ভাষাও ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য যেখানে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছি সেখানে সেসব কথা সযত্নে পরিহার করতে দ্বিধা করিনি। ভালোমন্দয় মেশানো যে জীবন মাল্লারা যাপন করে সেটি দ্বিধাহীন চিত্তে পাঠকদের সামনে তুলে ধরাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কারণেই পুস্তকটি প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

বইটি হয়ত অংশ বিশেষে পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য কিন্তু আমার ধারণা কোন নতুন বিষয়ে পড়বার সময় পাঠকের জাগ্রত কৌতূহল তাকে কাহিনীতে শেষ অবধি নিবিষ্ট করে রাখে, খুঁটিনাটি জ্ঞানের অভাবে তেমন অসুবিধা হয় না। 'পাইলট' বইটিতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে একটি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজের পলায়নের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী শত শত লোক পাঠ করে আনন্দ পেয়েছেন—"রেড রোভার" বইটিতে ইংরাজ বাণিজ্যপোত ধ্বংসের কাহিনীও কিছু কম চিত্তাকর্ষক নয়। যে সব লোকে জাহাজের বিভিন্ন দড়াদড়িব নাম জানেনা, নাবিকবিদ্যার অন্যান্য খুঁটিনাটি-জ্ঞান তো দূরের কথা তাদের পুস্তকপাঠের আনন্দ এই অজ্ঞতার জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যাহত হয়নি।

এই কারণে বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। এই উদ্যমে কয়েকজন বন্ধুও পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। যদি পাঠকেরা এই বই পড়ে আনন্দ পান, মাল্লাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং সর্বোপরি যদি এই পুস্তক পাঠ করে কেউ এই হতভাগ্যদের অবস্থার উন্নতি সাধনে ও তাদের নৈতিক মান উন্নয়নে তৎপর হন তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বিবেচনা করব।

বস্টন, জুলাই, ১৮৪০ আর, এইচ, ডি। (জুনিয়র)

॥ ১ ॥ অবতরণিকা ॥

পিলগ্রিম নামে জাহাজটির ১৭ই আগস্ট বস্টন বন্দর থেকে দক্ষিণের হর্ণ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অভিমুখে যাত্রা করার কথা ছিল। যাত্রার সময় দুপুরের পরে, কাজেই আমি কালবিলম্ব না করে জাহাজের উপযোগী বেশভূষা পরে উপস্থিত হলাম, সঙ্গে দুই তিন বছরের মত পরিধেয় বস্ত্রাদি। আমার নৌজীবন গ্রহণ করার বিশেস কারণ ছিল। রোগাক্রান্ত হয়ে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়, কোন ঔষধেই তা নিরাময় হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমি অগত্যা দীর্ঘকালের জন্য সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়ব মনস্থ করলাম। দুই বছর পড়াশুনা হতে বিরত থেকে, কঠোর কায়িক পরিশ্রম ও খোলা হাওয়ায় যদি চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনা যায় এই আশা ছিল। ঔষধ খেয়ে যখন কিছুই হল না তখন অভ্যস্ত জীবনধারায় পরিবর্তন ঘটলে যদি কিছু ফল লাভ হয়!

ছাত্রাবস্থায় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আঁটো কোর্তা, রেশমী টুপী ও চামড়ার দস্তানা পরে কাটিয়েছি তার বদলে এখন নাবিকদের ঢিলা পাজামা, বিচিত্র রঙের জামা ও ত্রিপলের টুপি পরে মনে বেশ একটা অন্যরকম ভাব উপস্থিত হল। ভাবলাম চেহারাটাও বেশ মাল্লাদের মত হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু অভিজ্ঞ চোখের কাছে এত কৌশল সত্ত্বেও হয়ত ধরা পড়া বিশেষ কঠিন হত না। নিজেকে সাক্ষাৎ বরুণদেবের মানসপুত্র ভেবে ডেকে উঠলাম। আমার অনভ্যস্ত পোশাক নিশ্চয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি। মাল্লাদের পোশাকের ছাঁদ ও হাঁটাচলার ধরনই আলাদা। তাদের মত পোশাক পরিচ্ছদে ইচ্ছাকৃত ঢিলাঢালা ভাব, মাথার পিছন দিকে বাঁকা করে বসানো টুপী থেকে ঝোলানো ফিতা ইত্যাদি নানা মুদ্রাদোষ রপ্ত করা দু-একদিনের কর্ম নয়। বেশভূষায় অসামঞ্জস্য ছাড়াও আমার গায়ের রঙ দেখেই আমি যে নবাগত একথা কারো পক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিল না। হাত দুটিও তখনো কঠিন পরিশ্রমে রুক্ষ হয়ে ওঠেনি। পেশাদার মাল্লাদের রোদে পোড়া তামাটে রঙ, পদক্ষেপ অনায়াস ও দীর্ঘ, কঠিন হাতের বজ্রমুষ্ঠি যেন প্রয়োজন হলে এখনি দড়ি ধরে টান মারতে প্রস্তুত।

যাই হোক, আমার নানা দুর্বলতার কথা ভাবতে ভাবতে নাবিক মহলে প্রবেশ

করলাম। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নদীপথে গিয়ে আবার রাত্রের মত নোঙর ফেলা হল। পরদিন যাত্রার উদ্যোগপর্ব। পাশের হালকা পালের দড়াদড়ি ঠিক করে রাখা, যেখানে যেখানে ঘষা লেগে কাঠ বা দড়ি ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা সেখানে আলাদা করে কাঠের টুকরো বসানো ইত্যাদি নানা আনুসঙ্গিক আয়োজনে আমরা ব্যস্ত রইলাম। পরদিন রাতে আমার প্রথম পাহারা দেবার কথা। পাছে ডাক শুনতে না পাই এই ভয়ে প্রথম রাত্রে আমার ভাল করে ঘুমই এল না। নতুন কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি এতই সচেতন ছিলাম যে অবিরাম পাটাতনের আগা থেকে শেষ পর্যন্ত পায়চারী করে কাটালাম। জাহাজের কর্তৃপক্ষ আমার উপর যে কর্তব্যের ভার দিয়েছেন তার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি যৎপরোনাস্তি সচেতন হয়ে গলুই এর উপর দিয়ে চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি ফেলে সাবধানে পাহারা দিতে লাগলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার পরে যে নাবিকটি এল সে আর কালবিলম্ব না করেই এসেই একটি নৌকার নীচে ঘুমোবার ব্যবস্থায় লেগে গেল। যেন পরিষ্কার রাত্রে নিরাপদ বন্দরে জাহাজ বাঁধা থাকলে পাহারার কোনই প্রয়োজন নেই।

পরদিন শনিবার। দক্ষিণদিক থেকে হাওয়া উঠতেই আমরা পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে উপসাগরে ভেসে পড়লাম। আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে শেষবারের মত পরিচিত দৃশ্যপটের দিকে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু নাবিককে হৃদয়াবেগে অধীর হওয়া সাজে না। বন্দরের উপকণ্ঠে বাতাসের গতি পরিবর্তিত হল, অগত্যা আবার নোঙর ফেলা ছাড়া উপায় রইল না। সমস্ত দিন সেখানে অপেক্ষায় কাটল, রাত্রির খানিকটা সময়ও গেল এইভাবে। রাত এগারোটায় আমার পাহারা আরম্ভ হল, পশ্চিমদিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করলেই যেন ক্যাপ্টেনকে সংবাদ দেওয়া হয়—আমার প্রতি আদেশ হল। মধ্য রাতে বাতাস বইলে ক্যাপ্টেনকে খবর দিলাম এবার আমার উপর কাজ পড়ল অন্য সকলকে ডেকে তোলার। কি করে যে কাজটি সম্পন্ন করলাম মনে পড়ে না তবে মাল্লাদের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে যে ডাক দিতে পারি নি সে কথা না বললেও চলে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে মহা তৎপরতার সঙ্গে পালদণ্ড, দড়াদড়ি ও পাল নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করলে, নোঙর তোলার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির সঙ্গে আমাদের শেষ বন্ধনটুকুও মুছে গেল। এই সব কাজে আমি যোগ দিতে পারলাম না, কেননা জাহাজের চালন-প্রণালী সম্বন্ধে এখনো আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। আমার চারিদিক ঘিরে কত বিচিত্র সুরে চীৎকার। কত রকম আদেশ, কাজের তাড়াহুড়ো—তার মধ্যে আমি

কেমন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। স্থলচর জীবের সমুদ্রে জীবন আরম্ভ করার প্রথম দিকে যে দুরবস্থা ঘটে তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা চলে না। তারপর আরম্ভ হল মাল্লাদের একটানা সুরে হাঁক। অর্থাৎ কপিকল টানা আরম্ভ হয়েছে। রাত্রির ভিজে হাওয়ায় সমুদ্রের আলোড়ন, গলুই থেকে জল আছড়াবার শব্দ, এতক্ষণে সত্যই আমাদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার সূচনা। দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

॥ ২ ॥ প্রথম পরিচয় ॥

সমুদ্রের বুকে একদিন কাটল। মনে পড়ে দিনটা ছিল রবিবার। বন্দর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে কর্মব্যস্ততার ধুম পড়ে গেল—সমস্ত দিন কাজের আর শেষ নেই। প্রথমে আমাদের বিভিন্ন কর্মভার ও দায়িত্বের বিভাগ করে দেওয়ার পর রাত্রে পাহারার পালা ঠিক করা হল। এইবার আমাদের ক্যাপ্টেন দর্শন দিলেন। উচ্চতর ডেকে পায়চারী করতে করতে ক্যাপ্টেন ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের উদ্দেশ্যে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ক্যাপ্টেন সাধারণতঃ বড় একটা কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন না।

ক্যাপ্টেন আমাদের সম্বোধন করে বলতে আরম্ভ করলেন, "বন্ধুগণ, আমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে বেরিয়েছি। যদি মিলে মিশে বন্ধুভাবে থাকা যায় অতি উত্তম কথা। যদি তা না পারা যায় তবেই বিপদ। তোমরা তোমাদের কর্তব্য করে যাবে, এর বেশী আমি আর কিছু চাই না। কিন্তু কর্তব্যপালনে ত্রুটি হলে ব্যাপারটা কারো পক্ষেই মঙ্গলের হবে না একথা আগে থেকে জানিয়ে দিলাম। বন্ধুভাবে থাক, আমার কাছ থেকেও ভদ্র ব্যবহার পাবে, না হলে নিজ মূর্তি ধারণ করতে বাধ্য হব। তোমাদের কাছে আমার এইটুকুই বক্তব্য। বাঁদিকের পাহারায় যারা আছ অবিলম্বে নীচে যাও।"

আমি ডান দিকের পাহারায় ছিলাম। সমুদ্রে পাহারা দেবার প্রথম পালা পড়েছিল আমারই। আমার সঙ্গে ছিল স্টিমসন নামে আরেকজন নবাগত যুবক। সে বস্টনে এক সওদাগরী অফিসে কাজ করত। আমরা দুজনে বসে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে আলোচনা করতাম—বস্টনে তারা এখন কি করছে আর আমরা এখন কোথায়! আমাদের সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধেও কথা হল। কিছুক্ষণ পরে স্টিমসন নিজের জায়গায় ফিরে গেল, আমি দিগন্ত প্রসারী নীরবতার মধ্যে একা

বসে চিন্তা করতে লাগলাম। উপরের ডেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পায়চারী করছিলেন, সেখানে যাবার আমার অধিকার নেই; পাটাতনের নীচে মাল্লাদের থাকবার জায়গা থেকে দু-একজনের কথাবার্তার আভাষ পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাদের আলোচনায় যোগ দিতে ইচ্ছা হল না। উপরে তারা ভরা আকাশ, তার উপর দিয়ে মেঘের রাশ ভেসে চলেছে, নীচে মহাসমুদ্রের শুব্ধ সৌন্দর্য। আমি অভিভূত হয়ে এই অনির্বচনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি বসে রইলাম। তবুও মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উদয় হচ্ছিল যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পিছনে ফেলে এলাম তার কথা। সে কথা মনে পড়তেই এক বিচিত্র সুখানুভূতিতে মন ভরে উঠছিল। পরেও কখনো এজন্য খেদ করি নি। যা ছেড়ে এলাম তার মূল্য যেন ভুলে না যাই এজন্য আরো বেশী করে স্মৃতিচিন্তায় আনন্দ পেতাম।

ইতিমধ্যে বাতাসের বেগ প্রবলতর হওয়াতে পালদণ্ড খাটাবার হুকুম এল—চমক ভেঙ্গে উঠে পড়লাম। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মাল্লাদের ঘন ঘন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত দেখে বোঝা গেল ঝড় আসন্ন। ক্যাপ্টেন বললেন মাঝরাত নাগাদ উপসাগরীয় স্রোতে পৌছতে পারা যাবে। এমন সময় পর পর আটটি ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল, অর্থাৎ আমাদের পাহারার পালা শেষ। মাল্লাদের থাকবার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা জাহাজের খোলের মধ্যে ঢোকা গেল। এতক্ষণে বুঝলাম নাবিকজীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য কাকে বলে। বিছানার জন্য তক্তাপোষ জাতীয় কিছু তো ছিলই না, চারিদিকে মাস্তল, পালের দড়ি, পাল ও পুরানো কাছির টুকরোয় ক্রমাগত দোলনিতে সব জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে সে এক মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। জামা কাপড় টাঙাবার জন্য আমাদের কোথাও পেরেক লাগাবার হুকুমও ছিল না! আমার তোরঙ্গের ওপর একটি বিরাট কাছি কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা, ইতিমধ্যে আমার জামা জুতো কম্বল ইত্যাদি বাঁদিকে চলে গিয়ে বাক্সপত্র ও দড়াদড়ির মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। অসুবিধার উপর অসুবিধা। আমরা আলোও জ্বালাতে পারব না। সুতরাং ঐ অন্ধকারে আমার জিনিসপত্র খুঁজে বার করার বৃথা চেষ্টা না করে আমি একটা পালের উপর শুয়ে পড়লাম। অবসন্ন, নির্জীব দেহমন, তার উপর আবার সমুদ্রপীড়ার সমস্ত উপসর্গ একটু একটু করে আরম্ভ হতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এই বুঝি উপর থেকে ডাক এল। কেননা ঝড় এসে পড়তে আর দেরী নেই। পাটাতনের উপর বৃষ্টির শব্দ, চিৎকার, পালের আওয়াজ, কাঠের উপর দিয়ে ছুটাছুটি সবই আমার কানে এসে পৌছচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাটাতনের দরজা খুলে গেল, খোলা দরজা দিয়ে উপরের

কোলাহল যেন বহুগুণ হয়ে বাজতে লাগল। "ওঠ, ওঠ, শীঘ্র কর পাল নামাতে হবে" আদেশ ভেসে এল। উপরে উঠে দেখি এক অভাবনীয় দৃশ্য।

বাতাসের প্রতিকূলে চালিত আমাদের জাহাজটি একপাশে কাত হয়ে প্রায় উল্টে যাবার অবস্থা—ঝড়ের সে কি প্রচণ্ড তাণ্ডব! সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ এক একবার বিকট শব্দ করে গলুই-এর উপর আছড়ে পড়ছে, পরক্ষণেই পাটাতন ভাসিয়ে আমাদের সর্বশরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাস্তুলের উপরের অংশের পাল নামাবার দড়িটি টেনে নামানো হয়েছে, বিরাটাকৃতি পালগুলি দণ্ডের উপর বজ্রগর্জনে আছড়ে পড়ছে, রাশীকৃত রশারশির মধ্য দিয়ে বাতাসের তীক্ষ্ম আর্তনাদ। খোলা দড়ির টুকরোগুলির প্রবল আলোড়ন এবং সেই বিক্ষুব্ধ দৃশ্যপটের মধ্যে কিসব আদেশ দেওয়া হচ্ছিল, মাল্লারা দড়ি টানাটানি করতে করতে কি বলে চীৎকার করছিল সবই আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে লাগল।

একে এই কাজে একেবারে অনভিজ্ঞ, তার উপর সমুদ্র-পীড়ার কষ্ট, দুইয়ে মিলে আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা অবধি লোপ পেয়েছিল। এই অবস্থায় সেই অন্ধকারের ভিতর আমাকে উপরের বড় পালের এক অংশ গুটিয়ে ফেলতে হুকুম দেওয়া হল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কি করে উপরে উঠলাম মনে পড়েনা, তবে পালদণ্ডটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বাতাসের দিকে মুখ করে বার কয়েক বমি করেছিলাম এটুকু জ্ঞান আছে। কতটা কাজে লাগতে পেরেছিলাম জানিনা। উপরের ব্যবস্থা শেষ হলে মাল্লারা আবার নীচে যাবার অনুমতি পেল। তবে তাতে সে এমন কিছু আনন্দিত হওয়ার কারণ ছিল সেকথা মনে করা ঠিক হবেনা। একে তো জিনিসপত্রের বিশৃঙ্খল অবস্থা, তার উপর জাহাজের খোলে জমা দূষিত জলের দুর্গন্ধে নীচে যা অবস্থা হয়েছিল তার চেয়ে ডেকের ঝড়বৃষ্টিও মনে হল বহুগুণে শ্রেয়। সমুদ্রযাত্রার কষ্টের কথা আগেও শুনেছি কিন্তু এখন বাস্তবের সামনে এসে বোধ হল এর থেকে অসহ্য অভিজ্ঞতা বোধ হয় আর কিছু নয়। দীর্ঘ দুই বছর এই অবস্থায় কাটাতে হবে ভাবতেও হৃদকম্প হল। ডেকে গিয়ে যে একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াব তার উপায় নেই। মাল্লাদের অলস দেখলেই উর্দ্ধতন কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু নীচের নরককুণ্ডের থেকে বোধ করি তাও ভাল। অস্বস্তি বোধ করলেই পাটাতনের দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বমি করে সাময়িকভাবে শরীর সুস্থ হচ্ছিল। দুই দিন এইভাবে কাটল।

বুধবার, ২০শে আগস্ট। ভোর থেকে বেলা আটটা পর্যন্ত ডেকে পাহারায় ছিলাম। ভোর চারটেয় এসে দেখলাম আবহাওয়ার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। বাতাসের বেগ কম, সমুদ্রও অপেক্ষাকৃত শান্ত, নক্ষত্রের নির্মেঘ আকাশে তারার দ্যুতি। আমার শরীর তখনো বেশ দুর্বল, তবু এই দেখে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম অন্ধকারের বুক চিরে প্রথম আলোর উন্মেষ। সমুদ্রে সূর্যোদয় নিয়ে নানারকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু আমার চোখে স্থলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে এর কোন তুলনাই চলে না। সমুদ্রের মধ্যে কোথায় ভোরের পাখীর কূজন, জনকোলাহল, গাছের সারি বা জনবসতির চিহ্ন? প্রথম সকালের রোদ বাড়ীঘর ও গাছের মাথায় এসে না পড়লে যেন প্রভাতের শোভা সম্পূর্ণ হয় না। এই ধু-ধু জলরাশির বুকে দৃশ্যপট বলতে কিছুই নেই। সমুদ্রের বুকে সূর্য ওঠার দৃশ্য তেমন মনোরম না হলেও অন্তত একটি বিষয়ে সমুদ্র তুলনা-রহিত। বিস্তীর্ণ তরঙ্গরাশির উপর প্রথম রোদের ছটা পড়ে মনে একটা একাকীত্বর বিষাদ ঘনিয়ে আসে - বিশ্বচরাচরের আর কোন বস্তুতেই বোধ হয় এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

পূব দিক থেকে ক্ষীণ আলোক রশ্মি যখন জলের উপর পড়ে ধূসর মায়াজাল সৃষ্টি করে, সমুদ্রের তলহীন বিশালতা যেন বেশী করে প্রকট হয়, কেমন একটা অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় মনের ভিতর কেঁপে ওঠে। ক্রমে রোদ বাড়ে, আরম্ভ হয় জাহাজের দৈনিক কাজের কার্যক্রম—কর্মের স্রোত এসে গ্রাস করে অলস ভাবনার স্রোতকে।

"তাড়াতাড়ি চলে এস, পাম্প ঠিক করতে হবে"—নিমেষের মধ্যে দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। বুঝলাম দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে মাল্লাদের কাজে নামতে হবে, নষ্ট করার মত সময় নেই। পাম্পের কাজ শেষ হবার পর জাহাজের পাচক, ছুতোর, স্টুয়ার্ট প্রভৃতিদের ডাক পড়ল। এবার আরম্ভ হল ডেক ধোয়ার কাজ। নিত্যকার এই কাজটি শেষ করতে লাগে প্রায় ঘণ্টা দুই। আমার দুর্বল শরীরে কোনমতে ধোয়ামোছা শেষ করে দড়িগুলো পাকিয়ে রেখে আমি একটি কাঠের দণ্ডের উপর বসে প্রাতরাশের অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রাতরাশের সময় সাতটা ঘণ্টা পড়ত। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে প্রধান মাস্তুলটি পালিশ করার আদেশ দিলেন। জাহাজ তখন বেশ দুলছে, তিনদিন আমার খাওয়া হয়নি, কাজটি জলখাবারের কিছু করলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে বলার উপায় নেই।

আদেশপালনে এতটুকু শৈথিল্য দেখলেই আমাকে আর আস্ত রাখা হবেনা। অগত্যা তেলের বালতি হাতে নিয়ে প্রধান মাস্তুলদণ্ডে উঠলাম, যত উপরে উঠি দোলানিও তত বাড়ে। হাতের বালতি থেকে তেলের গন্ধে বমি আসছে, কোনমতে কাজ শেষ করে যখন ডেকে নামলাম মনে হল যেন পৃথিবীর মাটিতে পা দিলাম। যদিও এখানে দোলানির বিরাম ছিল না কিন্তু মাস্তুলের উপরের আন্দোলনের তুলনায় সেটা ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই গতিমাপক যন্ত্রে বেগ ধরা পড়ল, ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাজের বিরাম। তারপর প্রাতরাশ। খাওয়ার সময় সরলপ্রকৃতির আফ্রিকাবাসী রাঁধুনীর উপদেশবাণী এখনো মনে পড়ে। "আহা, তোমার চেহারার জৌলুস এই কদিনেই অনেকটা শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে নতুন ব্যবস্থায় খানিকটা রপ্ত হয়েছ! যদি শক্ত সমর্থ থাকতে চাও তবে সুখাদ্যের আশা ছেড়ে জাহাজী মোটা রুটী আর নোনতা মাংস পেট ভরে খাও। দেখবে দক্ষিণের অন্তরীপ অবধি পৌঁছবার আগেই তুমি অন্যদের মত দৌড় ঝাঁপ করে কাজ করছ—কাজেই আগেকার কথা ভুলে যাও।" সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত যাত্রীরা যখন নানারকম মিষ্টান্ন খেতে চান তখন তাঁদের প্রতিও এই কথাই প্রযোজ্য।

রুটী ও মাংস খেয়ে শরীরে বল পেলাম, নিজেকে মনে হল অন্য মানুষ। দুপুর অবধি নীচে ছিলাম, রাঁধুনীর কাছ থেকে এক টুকরো বড় মাংস নিয়ে বহুক্ষণ ধরে সেটাই চিবিয়ে চিবিয়ে খেলাম। যখন ডেকে কাজ করতে উঠলাম তখন মনেও বেশ ফূর্তি। প্রায় দুটোর সময় সকলকে সচকিত করে হাঁক শোনা গেল "ঐ জাহাজ!" দূরে দুটি পাল দেখা গেল। দুটি জাহাজ আমাদের গমনপথের সঙ্গে আড়ভাবে চলে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এত দূরে ছিল যে কথাবার্তা বলা সম্ভব হল না, তবে আমাদের ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে নাম পড়তে পারলেন। একটি নিউ ইয়র্কের "হেলেন মার", অন্যটি বস্টনের "জলপরী"। দুটিই পশ্চিম দিকে চলেছে—দেশের দিকে। জলপথে অন্য জাহাজ দর্শন আমার জীবনে এই প্রথম—তখন এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, মনে হল কোন পার্থিব বস্তুতে এমন রূপ সম্ভব নয়। পরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

বৃহস্পতিবার, ২১শে আগস্ট। নির্মল আকাশে সূর্যোদয় হল, বাতাস মৃদুমন্দ, প্রকৃতি প্রসন্ন। ততদিনে আমি নৌজীবনে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, নিজেকে আর আগের মত খাপছাড়া মনে হয় না। ছবার ঘণ্টা পড়ার সময়, অর্থাৎ বিকেল তিনটেয় বাঁদিকের গলুই থেকে আর একটি জাহাজ আমাদের নজরে

এল। সেই দেখে অন্য সকলের মত আমিও তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অস্থির হলাম। জাহাজটি কাছে এসে পিছনে চলার মত করে পাল সাজাল, তারপর দুটি যুদ্ধোন্মাদ অশ্বের মত আমরা পরস্পরকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। শান্ত সমুদ্রেও জাহাজটি এত জোরে দুলছিল যে আশ্চর্য হতে হল। একবার সামনের অংশটি জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তারপর ধীরে ধীরে পিছনের দিক জলের মধ্যে অদৃশ্য হতে থাকে, বিশালাকার আগা গলুইএর তাম্রফলক ঝিকমিক করে ওঠে। জাহাজের সামনের বাঁকানো কাঠের টুকরা থেকে লোনা জল ঝরতে থাকে যেন বরুণদেব সদ্য সমুদ্রস্নান সেরে মাথা তুলছেন। যাত্রীরা জাহাজ দেখার জন্য ডেকের উপর ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, পোশাক দেখে মনে হল তারা ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের লোক। ওরা আমাদের প্রথমে ফরাসীভাষায় সম্বোধন করল পরে উত্তর না পেয়ে ইংরাজীতে কথা বলল। জাহাজটির নাম ক্যারোলিনা, হাভ বন্দর থেকে চলেছে নিউ ইয়র্কের দিকে। আমরাও তাদের আমাদের নাম জানিয়ে বললাম আমরা ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চলেছি, বস্টন ছাড়ার পর পাঁচদিন কেটেছে। জাহাজটি অতঃপর চলে গেল, আমরাও জল কেটে গন্তব্যস্থলের দিকে এগোতে লাগলাম।

সমুদ্রে দুটি জাহাজের দেখা হলে তাদের মধ্যে কথোপকথনের একটা বাঁধা গত আছে। প্রথমে জাহাজের নাম ও পরে গন্তব্যস্থান জিজ্ঞাসা করা হয়, বন্দর ছাড়ার পর কতদিন কেটেছে সেটাও অবশ্য জ্ঞাতব্য। সাধারণতঃ হাতে সময় বা বিশেষ কিছু বক্তব্য না থাকলে এই রীতি বহির্ভূত কোন কথা বলা হয় না।

দিনটি ভালোভাবে কাটল। আবহাওয়া অতি সুন্দর, আমরা যে যার কাজে ব্যস্ত। নাবিকের জীবন বড়ই একঘেয়ে। মধ্যে মধ্যে ঝড় উঠলে, অন্য জাহাজের দেখা পেলে বা ডাঙ্গার কাছে পৌঁছলে বা একটু নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়।

॥ ৩ ॥ জাহাজের কাজ ॥

এখন কিছুদিন ধরে আবহাওয়ার অবস্থা সন্তোষজনক, আমাদের জীবন চলেছে গতানুগতিক ছন্দে, কোন নতুন ঘটনা দ্বারা বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, কাজেই এই সুযোগে আমি আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজের রীতিনীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে কিছু বলে নিতে চাই। পরে এমন অবকাশ হয়ত নাও হতে পারে।

প্রথমেই ক্যাপ্টেনের প্রসঙ্গ। তিনি হলেন তাঁর জাহাজের সর্বময় কর্তা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। খেয়ালখুশীমত তাঁর গতিবিধি, তাঁর কথার উপর কারো কথা বলার হুকুম নেই, কারো কাছে তিনি জবাবদিহি করেন না, এমনকি তাঁর বিশেষ কর্মচারীর কাছেও না। তিনি ইচ্ছামত কর্মচারীদের কাজে লাগান বা বরখাস্ত করেন, সময় সময় উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সাধারণ মাল্লাদের মত কাজে পাঠাতে পারেন। তবে শেষোক্ত কাজটি করার তাঁর অধিকার আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের মত মাল জাহাজ, যেখানে যাত্রী বলে কেউ নেই, সেসব ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন তাঁর রাজসিক মহিমায় একা বন্ধুহীন ভাবে বিরাজ করেন। সব ক্যাপ্টেনদের প্রকৃতি একই রকম। জাহাজে তাঁদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপায় নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং কখনো কখনো তার প্রয়োগ। এছাড়া আর কিছুতে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না।

ক্যাপ্টেনের ঠিক পরের পদস্থ কর্মচারী প্রধান মেট, তিনি একাধারে সচিব, শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সদাসর্বদা সক্রিয়। প্রধান মেট ক্যাপ্টেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। পাল, নৌকা, দড়াদড়ি প্রভৃতির দেখাশোনা করা এবং জাহাজ চালানোর যাবতীয় ব্যাপারে তিনিই সর্বেসবা। মেট কাজকর্মের নির্দেশ অবশ্য ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে পান, কিন্তু অন্যের কাজ ভাগ করে দেওয়া এবং সেটি ঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না সেটা দেখাও তার কাজ। এছাড়া জাহাজের যে পত্রিকাতে গতিবেগ, বায়ুর বিভিন্ন অবস্থা ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে লেখা হয় তার সংরক্ষণের দায়িত্বও তাঁর। মালের হেফাজত ও ঠিকমত চালানের দায়িত্বও মেটকেই জাহাজের মালিক ও বীমাকারীরা দিয়েছেন। এই সব সরকারী কর্ম ছাড়াও প্রধান মেট আরেকটি দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী—তিনি জাহাজের প্রধান বিদূষক। সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ঠাট্টামস্করা করা অনুচিত মনে করেন, এবং দ্বিতীয় মেটের কথা কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না কাজেই প্রধান মেট যখন স্থূল রসিকতায় সর্বসাধারণকে আনন্দ দানের চেষ্টা করেন তখন সকলেই তা শুনে হাসতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় মেটের অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। সে হতভাগ্য না উচ্চপদস্থ কর্মী না সাধারণ মাল্লা। মাস্তুলে চড়ে উপরে খাটানো পাল গোটানো বা জড়ানোর কাজ থেকে আরম্ভ করে মাল্লাদের মত কাদামাটি ঘাঁটা ইত্যাদি সবই তার কাজের পর্যায়ে পড়ে, আর মাল্লারাও তাকে মোটেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে না দ্বিতীয় মেটকে অনেক সময় মাল্লাদের চাকর আখ্যায় ভূষিত করা হয়ে

থাকে, কেননা রশারশি, কাছিতে জড়াবার সরু দড়ি, দুটি দড়ির প্রান্ত এক সঙ্গে জোড়া দেবার সময় ব্যবহৃত লোহার ফলা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ দ্বিতীয় মেটের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং দরকার মত সেগুলির জোগান দেওয়ার ভারও তারই উপর; ক্যাপ্টেন তার কাছ থেকে উচ্চ কর্মচারীসুলভ গাম্ভীর্য আশা করেন, এদিকে নিম্নতর কর্মচারীদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার কথা, অথচ প্রধান মেটের সঙ্গে তার অবস্থার বৈগুণ্য এবং মাল্লাদের সঙ্গে একত্র কাজ করা এই সব মিলিয়ে দ্বিতীয় মেটের এক শোচনীয় অবস্থা। তার প্রাপ্য এমন কিছু বেশি নয় কিন্তু পরিবর্তে তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়। কেবিনে বাস করলে বা মাল্লাদের দ্বিগুণ মাইনে পেলে কি হয়, তার বেশীর ভাগ সময় কাটে জাহাজের ডেকে; এমনকি ক্যাপ্টেন ও প্রধান মেটের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করার অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত।

রান্না. ভাঁড়ার ঘরের দেখাশোনা করে ষ্টুয়ার্ট, সে একমাত্র ক্যাপ্টেনের কাছে জবাবদিহি করতে পারে। প্রধান মেট পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যে হাত দিতে পারেন না, অন্য কেউ দূরের কথা। এই সব অধিকার আছে বলে মেট তার উপর কিয়ৎপরিমাণে খাপ্পা, কেননা ষ্টুয়ার্ট মাল্লাদের একজন নয়। সে একেবারে খাস ক্যাপ্টেনের বান্দা।

রাঁধুনীকে মাল্লারা বিশেষ খাতির করে চলে। তার পক্ষপাতের উপর নির্ভর করে রান্নাঘরের উনানের আঁচে মোজা দস্তানা প্রভৃতি শুকোনো যায়। তার অনুমতি পেলে রাত্রের পাহারাদারেরা উনুনের আগুনে তামাক ধরিয়ে খেতে পারে। ষ্টুয়ার্ট ও রাঁধুনী ছাড়াও আরো দুজন কর্মী আছে যাদের পাহারায় যেতে হয় না—তারা হল ছুতার ও পাল সারাবার মিস্ত্রী। অবশ্য সেরকম জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে যে তাদেরও ডাক পড়ে না এমন নয়।

পাহারার পালা অনুসারে মাল্লাদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বাঁদিকের অংশে যাদের পাহারা দেবার কথা প্রধান মেট তাদের দলপতি, ডান দিকের দলকে দ্বিতীয় মেট পরিচালনা করেন। প্রতি চারঘণ্টা অন্তর এই দুই দলের কাজের পালা চলে। সমস্ত রাত্রি তিন ভাগে পাহারা দেওয়া হয়। প্রথম ভাগ, মধ্য ভাগ ও শেষ ভাগ। প্রধান মেটের দল যদি রাত আটটা থেকে বারোটা অবধি পাহারায় নিযুক্ত থাকে তবে বারোটা থেকে চারটে অবধি পালা পড়বে অপর দলটির, এবং বাঁদিকের দল আবার চারটের সময় ডেকে ফিরে আসবে। যুদ্ধজাহাজ এবং কোন কোন য়্যাল জাহাজে সারা দিনরাত্রি ধরে এই রকম ক্রমাগত পাহারার

পালা চলতে থাকে। তবে নেহাত দুর্যোগের সময় ছাড়া আমাদের জাহাজে কেবল রাত্রিবেলাই ঐ পদ্ধতিতে পাহারা দেওয়া হত।

যাঁরা কখনো সমুদ্রযাত্রা করেননি তাঁদের অবগতির জন্য পাহারার আরেকটি নিয়মের কথা বলা দরকার। সমুদ্রে পাহারার একটি বিশেষ সময় আছে, যেটি স্বল্পকালস্থায়ী হলেও অত্যন্ত বিরক্তিকর। সাধারণতঃ পাহারার সময় এমন ভাবে বদলে বদলে দেওয়া হয় যাতে একই লোককে প্রতিদিন একই সময়ে পাহারায় না থাকতে হয়। বিকাল চারটে থেকে রাত্রি আটটার পাহারাকে এইজন্য দুইভাগে ভাগ করা হয়, চারটে থেকে ছয়টা এবং ছয়টা থেকে আটটা। ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছয়টি পাহারার পরিবর্তে পাহারার সংখ্যা সাতটিতে দাঁড়ায়, এতেই পালা বদলে যায়। ফলে সন্ধ্যেবেলা যাদের পাহারায় দাঁড়াতে হয় তাদের উপর সকলেরই জাগ্রত দৃষ্টি, উপরের ডেকে পদচারণারত ক্যাপ্টেন, বাঁদিকে প্রধান মেট, সিঁড়ির কাছে দ্বিতীয় মেট, ভাঁড়ার ঘরের কাজ শেষ করে স্টুয়ার্ট উপরে এসে রাঁধুনীর সঙ্গে ধূমপানরত, কপিকলের উপর চড়ে বসে মাল্লারা গল্প করছে বা গান গাইছে। রাত আটটায় পর পর আটটি ঘণ্টা বাজে, পাহারার দল ছুটি পায়, রাত্রের দল উপরে আসে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেক ধোয়া মোছার পালা। ছিদ্রযুক্ত বড় বড় কাঠের পিপের মধ্যে পানীয় জল ভরা, রশারশি টেনে পাকিয়ে রাখা ইত্যাদি—কাজে সাড়ে সাতটা বেজে যায়। তারপর প্রাতরাশের ছুটি, আটটা থেকে আবার অবিরাম কাজের চাপ, কেবল মধ্যে একঘণ্টা খাবার সময় ছাড়া।

যাঁরা স্থলে বাস করেন তাঁদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। প্রায়ই তাঁদের মুখে শোনা যায় নাবিকরা নাকি বড়ই অলস, সমুদ্রে তাদের করার তেমন কিছু নেই, ইত্যাদি, এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হতে পারে না, নাবিকদের অনেক সময়ই এই জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তাই কথাটা সম্যক পরিষ্কার করে দেওয়া আবশ্যক। জাহাজের নিয়ম অনুসারে রবিবার ও রাত্রিবেলা ছাড়া অন্য সময়টা নাবিকদের কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত থাকার কথা। উন্নত ধরনের কোন জাহাজে কখনই কোন মাল্লাকে বসে, দাঁড়িয়ে বা রেলিঙ হেলান দিয়ে গালগল্প করতে দেখা যাবে না। উচ্চ কর্মচারীদের কাজই হল অনুক্ষণ অধস্তন কর্মচারিদের কাজে নিযুক্ত রাখা, কোন কাজ না থাকলে লোহার শিকলের গা থেকে মরচে তোলাও চলতে পারে। জেলের কয়েদীদেরও এমন কড়া শাসনে রাখা হয় কি না সন্দেহ। কাজের সময় মাল্লাদের নিজেদের মধ্যে

কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ। এ নিয়ম যদিও সদাসর্বদা মানা হয় না, কিন্তু ধারে কাছে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দেখলেই তারা আবার মৌনভাব অবলম্বন করে।

মাল্লাদের কাজকর্মের প্রকৃতি অনভিজ্ঞ লোকদের বোঝানো বড়ই কঠিন। বন্দর ছাড়ার সময় ভেবেছিলাম জাহাজের বিলি ব্যবস্থা বোধহয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে আর আমাদেরও জাহাজ চালানো ছাড়া আর অন্য কাজ থাকবে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঐ অবস্থা দু'বছর ধরে চলল, দুবছর কাটবার পরেও অবস্থা যথাপূর্বম। জাহাজকে অনেক সময় বলা হয় মেয়েদের ঘড়ির মত, কলকব্জা সবসময় বিগড়েই আছে। রশারশি ফুটোর মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া, দড়ি প্রভৃত পরীক্ষা করে দেখা, ব্যবহারের অনুপযুক্ত হলে খুলে ফেলে তার যায়গায় নতুন দড়ি লাগানো, যেসব দড়ি লাগানো আছে সেগুলি বিভিন্ন রকমে মেরামত করা, যেখানে যেখানে বিন্দুমাত্র ঘষাঘষি বা ক্ষয় হবার সম্ভাবনা সেখানেই হাত লাগানো অর্থাৎ জাহাজের পাটাতনের সঙ্গে ত্রিপলের ঘর্ষণ বন্ধ করার জন্য কাঠের টুকরো জোড়া দেওয়া, দড়িতে আলকাতরা মাখানো অথবা ক্যাম্বিসের টুকরো জড়িয়ে দেওয়া, কাছিতে সরু দড়ি জড়ানো—এইসব কাজে নানাবিধ দড়াদড়ি ও মোটা-কাছির অহরহ প্রয়োজন। শুধু ক্ষয় বন্ধ করাব উপায় অবলম্বন করতে এবং দড়ির খোলাপরা ও মেরামতি কাজেই দুজন লোক সারাদিন পরিশ্রম করে প্রায় বছর দুই অনায়াসে লেগে যেতে পারে।

এর পরে আর এক ধরনের কাজ আছে। জাহাজ চালানোর কাজে যতরকম দড়ির ব্যবহার, যথা কাছিতে বাঁধবার দড়ি, গোছা বাঁধা পাকানো দড়ি ও অন্য নানাপ্রকার দড়ি—সবই জাহাজে তৈরী করার ব্যবস্থা থাকে। জাহাজের মালিক প্রচুর পরিমাণে পুরানো কাছির টুকরো কিনে জাহাজ ভর্তি করেন, মাল্লাদের কাজ হল তার থেকে দড়ি বার করে সেগুলি গোলা পাকিয়ে রাখা। এইসব দড়িগুলি পরে চরকায় কেটে শক্ত কাছি তৈরী হয়। কাছি তৈরী করার জন্য প্রত্যেক জাহাজেই একটি করে চরকী কল থাকে—যন্ত্রটা খুবই সাধারণ, একটি চাকা আর লম্বা শলাকা, যার চারিদিকে সুতোটা ঘোরে। আমাদের যন্ত্রটিতে একসঙ্গে তিনজন কাজ করতে পারত। আবহাওয়া ভাল থাকলে অষ্টপ্রহরই শোনা যেত ডেক থেকে চরকার ঘর্ঘর।

মাল্লাদের দিয়ে কাজ করাবার আরেকটি প্রশস্ত উপায় মাস্তল ও পালের তদারকি। খাটানো পাল ঢিলা হয়ে এসেছে সন্দেহ হলেই তৎক্ষণাৎ দড়ি নামিয়ে

কপিকল তুলে পাল আঁটা হয়, তারপর আবার দড়ি স্বস্থানে তোলা—এ সবই বেশ শ্রমসাধ্য কাজ। জাহাজের অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে গ্রথিত যে কোন একটি দড়ি খুলতে গেলেই অন্যগুলিতে টান পড়ে। মাস্তুলের দড়ি দিয়ে মাস্তুল আগে পিছনে করতে গেলে কেবল সামনের দড়িতে হাত দিলেই চলবেনা, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দড়ি ঢিলে হয়ে আসবে। এছাড়া আছে রং গোলা, রং দেওয়া, পালিশ করা, তেল দেওয়া, ঘসে মেজে পরিষ্কার করা—দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এইসব কাজের কোনটিরই বিরাম নেই। সঙ্গে সঙ্গে মাল্লাদের নিত্যকার কর্তব্য—রাত্রে পাহারা, টানা দড়ি দিয়ে পাল চালানো, পাল খাটানো, মাস্তুলে চড়া—এসব তো আছেই। সুতরাং এর পরেও নিশ্চয় নাবিকদের কর্মবিমুখতার অভিযোগ করতে আর কেউ ভরসা পাবেন না।

প্রকৃতির সমস্ত দুর্যোগ মাথা পেতে সহ্য করে মাল্লারা যে অমানুষিক শক্তির পরিচয় দেয় তার মর্ম উপরওয়ালারা কেউ বোঝেন কি না সন্দেহ। প্রবল বৃষ্টি, ঝড়ের তাণ্ডব যার দাপট থেকে হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত আশ্রয় খোঁজে, মাল্লাদের কাছে সে সব কিছুই নয়। কিন্তু এত সত্বেও ক্যাপ্টেন ও জাহাজ মালিকদের ধারণা মাসে মাসে বারো ডলার তারা বোধহয় বিনা পরিশ্রমেই অর্জন করছে—তাই কাজের অভাব ঘটলে তাদের ছেঁড়া দড়ির শন কুড়িয়ে বেড়াবার নির্দেশ দেওয়া হয়। রোজকার বরাদ্দ মোটা রুটী ও নোনতা মাংসের জন্য কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীই যে আমাদের দিয়ে করানো হয়! যখন বৃষ্টির জন্য মাস্তুল বা পাল সংক্রান্ত দড়াদড়ি নিয়ে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন জাহাজের সর্বত্র শন ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে মাল্লারা কাজের অভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বা নিজেদের মধ্যে গল্প করার মত গর্হিত কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে। বিষুবরেখা পার হবার সময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেই সময়ই পূর্বোক্ত উপায়ে আমাদের ব্যস্ত রাখা হয়। অনেক ক্যাপ্টেন ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা এমনই হৃদয়হীন যে অন্য কাজ খুঁজে না পেলে মাল্লাদের দিয়ে লোহার শিকল চাঁছান বা নোঙরে হাতুড়ী পিটতে বলেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থে বোধহয় বলে সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করার পর সপ্তম দিবসে তুমি জাহাজের দড়ি চাঁছিবে।

এই জাতীয় কাজ অবশ্য হর্ণ অন্তরীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ এবং অতি উত্তর বা অতি দক্ষিণ অক্ষাংশের কাছে সম্ভব নয়। কিন্তু হাড়জমানো শীতেও আমি হিম শীতল জল দিয়ে ডেক ধোয়ানো হতে দেখেছি—সে জল টাটকা হলে বোধহয় জমে বরফ হয়ে যেত, ঠাণ্ডায় মাল্লাদের আঙ্গুল বেঁকে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

কাহিনীর মূল অংশ থেকে বিচ্যুত হয়ে এইসব বর্ণনার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সাধারণ পাঠকদের যাতে নাবিকদের জীবন সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটা সত্য ধারণা জন্মে, সেই চেষ্টা। এই সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন নূতন ঘটনাও ঘটেনি, কাজেই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ঐ সব একঘেয়ে কাজের বর্ণনাও বেশ সময়োপযোগী হয়েছে বলা যেতে পারে। স্থলচরদের জ্ঞাতার্থ এখানে আরেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা গেল। জাহাজ সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী অবস্থাতে থাকলেও কাঠের মিস্ত্রীকে এক মুহূর্তের জন্য কাজ থেকে অবসর দেওয়া হয় না।

॥ ৪ ॥ সমুদ্রে রবিবার ॥

২১শে আগস্ট ক্যারোলিনা জাহাজটির সঙ্গে বার্তা বিনিময় হবার পর বেশ কিছুদিন আমাদের একঘেঁয়ে জীবনস্রোতে দাগ কাটবার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর। ডানদিকের নোঙর দণ্ডের দিকে একটি পাল আসতে দেখা গেল। কাছে আসার পর জানা গেল সেটি ইংরাজ জাহাজ, তারা বুয়োনস এয়ারেস থেকে ঊনপঞ্চাশ দিন আগে বেরিয়ে লিভারপুলের দিকে চলেছে। জাহাজটি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পরক্ষণেই আমাদের সঙ্গে তির্যকভাবে আরেকটি জাহাজ যেতে দেখা গেল। অনুমানে বোধ হল ব্রাজিলের জাহাজ, সম্ভবত পর্টুগালে চলেছে। জাহাজটির আকৃতি পাঁচমিশালী। তবে বেশী কাছে না আসার জন্য কথা বলা সম্ভব হল না।

রবিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর। উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু পাওয়া গেল। সকালে প্রথম ডলফিন ধরা হল। আমি কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলাম কিন্তু দেখে হতাশ হলাম। মাছটি মারা যাবার সময় যে রঙের বাহার তা যেন বড়ই ফিকে। এদের সম্বন্ধে যেমন বলা হয়ে থাকে সেরকম কিছুই নয়। অবশ্য ডলফিনদের প্রতি সুবিচার করতে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে না। উজ্জ্বল রোদের দিন জলের কয়েক হাত নীচে ডলফিনদের শোভা অতি অপূর্ব। সমুদ্রের সবচেয়ে দ্রুতগামী আর সুগঠিত মাছ এই ডলফিন। রোদের আলো ওদের চঞ্চল পাখায় পড়ে যখন ছিটকে ওঠে মনে হয় বুঝি বা এক টুকরো রামধনু জলের বুকে নেমে এল।

সমুদ্রের উপর রবিবার যেমনভাবে কাটে এদিনটাও তেমন ভাবেই কাটল। ডেক ধোয়া, দড়াদড়ি পাকিয়ে রাখা, যাবতীয় জিনিস সুবিন্যস্ত করে ফেলা ইত্যাদি কাজের পর নাবিকরা যে যার ইচ্ছামত ভাবে জামা সেলাই, বই পড়া বা গল্প

করে সময় কাটাল। সেদিন একজন করে পাহারায় থাকার কথা। রবিবার উপলক্ষে মাল্লাদের ভাল জামাকাপড় পরে ডেকের উপর বা কপিকলের উপর চড়ে যেমন ভাবে খুশী বিশ্রাম করার অধিকার দেওয়া হয়। সোমবার হলেই আবার সেই মোটা পোশাক পরে ছদিনের কর্মচক্রে বাঁধা পড়া।

এছাড়া রবিবারের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেদিন আমরা নিত্যকার কড়া রুটি আর মাংসের সঙ্গে একটু করে পুডিং জাতীয় একরকম মিষ্টান্ন খেতে পেতাম। ময়দা জলে ফুটিয়ে তাতে গুড় দিয়ে সেই চটচটে কালোমত জিনিসটা তৈরী হত। কিন্তু সেটাই ছিল আমাদের কাছে পরম উপাদেয় বস্তু। শোনা গেছে অনেক-দুরাত্মা ক্যাপ্টেন দেশে ফেরার পথে সপ্তাহে দুবার ঐ মিষ্টি দিয়ে অসন্তুষ্ট মাল্লাদের বশে এনেছেন।

কোন কোন জাহাজে রবিবার দিন ধর্মকর্মে কাটাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন থেকে আরম্ভ করে সবচেয়ে কমবয়সী মাল্লাটি পর্যন্ত সকলেই মহা অধার্মিক। কথা বলার সময় কেউ পাপ পুণ্যের বাছবিচার করে চলে না। কাজেই আমাদের কাছে রবিবারের অর্থ ছিল ছুটী, বড়জোর অল্পস্বল্প আমোদ-প্রমোদ, তার বেশী কিছু নয়।

সোমবার অবধি আমরা উত্তরপূর্ব বাণিজ্য বায়ু ধরে এগিয়ে চললাম।

২২শে সেপ্টেম্বর। সকালে সাতটা ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে উপরে এসে দেখা গেল আগের পাহারার দল জল দিয়ে পাল ভেজাচ্ছে। দেখি একটি কালো খোলের ছোট জাহাজ আমাদের দিকে খুব দ্রুতগতি এগিয়ে আসছে। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলাম, যত পাল ছিল সব লাগিয়ে ফেলা হল, বাড়তি পাল দণ্ডের জন্য মাস্তুলের সঙ্গে দাঁড় বেঁধে দেওয়া হল, বালতি বালতি জল মাস্তুলের মাথায় টেনে তুলে পাল ভেজানো চলল। শেষে বেলা নটা আন্দাজ শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কালো রঙের জাহাজটি কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে দেখে ঘোষণা করলেন ওরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, জাহাজটি যে কোন দেশের বা কোন ব্যক্তির তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। আমরা সমস্ত পাল তুলে দ্রুত এগোতে লাগলাম। অন্য জাহাজটির এবিষয়ে একটা অসুবিধা ছিল, ওদের মাস্তুলের সবচেয়ে উপর একটি মাত্রই পাল, কাজেই আমাদের সঙ্গে এঁটে ওঠার কথা নয়। সকালের দিকে ওরা আমাদের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌছেছিল, কিন্তু বৃষ্টির পর বাতাস পেয়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। সমস্তদিন আমরাও ডেকে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, অস্ত্রশস্ত্রও বার করে রাখা হল।

অবশ্য ওদের যদি সত্যিই কোন কুমতলব থাকত তাহলে এই কয়জনে কীই বা করতে পারতাম। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন রাত্রে চাঁদ ওঠেনি, গভীর অন্ধকারে চারদিক ঢাকা, জাহাজের সব বাতি নিভিয়ে আমরা নিঃশব্দে তারার আলোয় চলতে লাগলাম, তাও বার বার দিক পরিবর্তন করে। ভোর হতে দেখা গেল জাহাজটি অদৃশ্য হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দিক বদলে বদলে যেতে লাগলাম।

বুধবার, ১লা অক্টোবর। ২৪° ২৪´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংসে বিষুবরেখা অতিক্রম করা হল। এতদিনে আমি নিজেকে একজন অভিজ্ঞ মাল্লা মনে করার অধিকার পেলাম, তবে জাহাজে এই উপলক্ষে নতুন নাবিকদের যেমন নাকানি চোবানি খাওয়ানো হয় তার কিছুই আমার ভাগ্যে জোটেনি। সমুদ্রের নিয়ম অনুসারে একবার বিষুবরেখা পার হয়ে গেলেই নতুন নাবিক নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে, আর কেউ তার অনভিজ্ঞতা নিয়ে রসিকতা করতে সাহস করবে না, বরং সেই অন্যকে বিরক্ত করার অধিকার অর্জন করল। জাহাজে যাত্রী থাকলে এই উপলক্ষে নানারকম খেলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হয় কিন্তু আমাদের জাহাজে যাত্রী না থাকায় সেসব কিছুই হয়নি।

কিছুদিন থেকে আভাসে ইঙ্গিতে একটা গোলযোগের সূচনা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের ফস্টার নামে দ্বিতীয় মেটটি যে বেজায় অলস প্রকৃতির এবং নাবিক নামের সর্বাংশে অনুপযুক্ত সেকথা আমরা সকলেই জানতাম। ক্যাপ্টেন ওর উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। যেহেতু ক্যাপ্টেনই জাহাজের সর্বময়কর্তা সেজন্য কিছু একটা অঘটনের আশঙ্কায় আমরা একরকম প্রস্তুত ছিলাম। ফস্টারকে ঠিক পুরোদস্তুর নাবিক বলা যায় না কেননা সমুদ্র-যাত্রা করার ফাঁকে ফাঁকে ও বেশ কিছু সময় বাড়ীতে কাটিয়ে আসত, ওর বাবা ছিলেন বিত্তবান ব্যক্তি, ছেলেকে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন কিন্তু ছেলেটি নেহাত অপদার্থ বলেই অবশেষে তাকে সমুদ্রে পাঠান হয়। সেখানেও স্বভাবদোষে সে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি, নাবিকসুলভ স্বভাব তার একেবারেই ছিলনা। মাল্লাদের সঙ্গে বাজে গালগল্প করা, ক্যাপ্টেনের সমালোচনা করা এবং আরো নানা উপায়ে সে নিয়ম বহির্ভূত কাজ করত। মাল্লারা যে ওর এই অভ্যাসগুলি পছন্দ করত তা নয়, কেননা তারা চায় উপরের কর্মচারী যেন দূরত্ব রেখে চলেন। বলাই বাহুল্য এর কোনোটিই ক্যাপ্টেনের মনঃপুত ছিল না। ফস্টারের আরেকটি বদরোগ ছিল। পাহারার সময় ও ঘুমিয়ে পড়ত। সেজন্য ডেকের উপর মুরগীর খাঁচা আনিয়ে রাখা হল। ক্যাপ্টেন নিজে ডেকে থাকার সময় কখনো দাঁড়ান

ছাড়া বসতেন না। ওঁর অধীনস্থ কোন কর্মচারী যে বসে এটাও উনি চাইতেন না।

বিষুবরেখা পার হবার পর দ্বিতীয় রাত্রে আটটা থেকে বারোটার পাহারায় আমি ছিলাম। মিঃ ফস্টার ছিলেন আমাদের পাহারার তদারকে। সেদিন সমস্তদিন বৃষ্টি গেছে। ক্যাপ্টেন আমাদের বেশ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। কিন্তু হালের কাছে এসে আমি দেখি মিঃ ফস্টার জানালার উপর লম্বা হয়ে তোফা ঘুমের আয়োজন করেছেন। কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন পা টিপে টিপে ডেকে উপস্থিত। কম্পাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উনি বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মিঃ ফস্টার একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে শিস্ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি যে মোটেই ঘুমিয়ে পড়েননি সেটা দেখানোই উদ্দেশ্য। পিছনে একবারও না তাকিয়ে মিঃ ফস্টার এগিয়ে এসে আমাকে আদেশ করলেন, মাস্তলের চতুর্থ অংশের উপর খাটানো পালটা নামিয়ে ফেল। তারপর পিছনে ফিরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতেই খুব একটা বিস্ময়ের ভান করলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেনের চোখ খোলাই ছিল, এবার প্রকৃত ক্যাপ্টেন সুলভ চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষিত হতে লাগল। ক্যাপ্টেন বললেন "তুমি একটি কুঁড়ের বাদশা, অকালকুষ্মাণ্ড, অপদার্থ, তুমি একটি অমানুষ, জড়পিণ্ড বলিলেও কিছু বলা হয় না তোমাকে। তোমার পয়সা রোজগার করার মুরোদ কত তা তো দেখা গেল···" ইত্যাদি আরো নানারকম অশ্রাব্য শব্দ যা একমাত্র নাবিকদের অভিধানেই আছে। হতভাগ্য ফস্টারকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করার পর তাকে কেবিনে পাঠিয়ে বাকি সময়টা ক্যাপ্টেন নিজেই পাহারায় রইলেন।

সকালে সাতটার ঘণ্টায় সকলের ডাক পড়ল। সমবেত মাল্লাদের কাছে ঘোষণা করা হল যে ফস্টারকে আর উচ্চ কর্মচারী বলে গণ্য করা হবে না, এখন আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে দ্বিতীয় মেট পদে নির্বাচন করার জন্য এই জনসভা। এমন ঘটনা যে একেবারে বিরল তা নয়, মাল্লাদের যে নির্বাচন করা ক্ষমতা আছে সেকথা বুঝতে দিয়ে ওদের একটু খুশী করারও এটা এক রকম প্রচেষ্টাও বলা চলে। আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই, কাজেই নির্বাচনের ভারটা ক্যাপ্টেনের উপরেই ছেড়ে দেওয়া গেল। ক্যাপ্টেন জিম হাল নামে একটি চটপটে স্বভাবের মাল্লাকে এই পদে বহাল করলেন। জিম ক্যানবেক নদীর তীরের লোক, ইতিমধ্যে বার কয়েক ক্যান্টন সফর করে এসেছে।

ক্যাপ্টেন বললেন আজ থেকে জিমকে মিঃ হাল নামে ডাকা হবে এবং তোমাদের নতুন দ্বিতীয় মেট হিসাবে তোমরা ওর আদেশ মান্য করে চলবে।

ফস্টার বেচারার নামের থেকে পদবী খসে গিয়ে তার মাল্লাদের রাজ্যে নির্বাসন হল, আর তরুণ জিম হাল তার বদলে উন্নীত হল কাঁটা চামচ ও কাপডিশের সম্ভ্রান্ত জগতে।

রবিবার, ৫ই অক্টোবর। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শোনা গেল, ঐ ডাঙ্গা দেখা গেছে। এই অদ্ভুত ধ্বনির সঙ্গে বহুদিন পরিচয় না থাকায় প্রথমটা তার অর্থ বুঝতে কিছুক্ষণ লেগে গেল। পরে সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমরা অবিলম্বে অল্প হাওয়াতে টাঙ্গাবার অপরিসর পাল তুলে সেই অভিমুখে চললাম। ক্যাপ্টেনের ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী আমরা তখন ২৫° দ্রাঘিমাংশে কিন্তু ক্যাপ্টেনের ধারণা আমরা তার আরো কিছু বেশী এগিয়ে এসেছি। ঘড়ি অথবা কৌণিক দূরত্ব মাপার যন্ত্র এর মধ্যে কোন একটি খারাপ হয়েছে এই সম্বন্ধে কিছুদিন থেকেই ক্যাপ্টেনের মনে একটা সন্দেহ জাগছিল। জায়গাটির প্রকৃত দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করার জন্যই আমরা জাহাজ কূলে ভিড়ালাম। দেখা গেল ঘড়িটিই বিকল হয়েছে। সেটিকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করা হল।

আমরা পার্ণাম্বুকো বন্দরের সমীপবর্তী অঞ্চলে এসে পড়েছি জানা গেল, দূরবীন দিয়ে চোখে পড়ল একটি বড় গীর্জা ও অলিণ্ডা সহরের বাড়ীঘরের ছাদ। বন্দরের মুখে আরেকটি পাল তোলা জাহাজ যেতে দেখলাম। বেলা দুটো নাগাদ আমরা আবার সমুদ্রে পড়লাম। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে উপকূলের শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হল। এখানে রেড ইণ্ডিয়ানরা এক রকম আশ্চর্য ভেলা ব্যবহার করে। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে একটিমাত্র পালের সাহায্যে ভেলা চালান হয়, এই ভেলায় ভরসা করে তারা অন্ধকার সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যায়। শুনলাম ঐ ভেলা নাকি নৌকা হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর। অলিণ্ডা ছেড়ে আমরা এবার হর্ণ অন্তরীপের দিকে যাত্রা করলাম।

আবার কিছুদিন গেল। সেই একঘেয়ে জীবন। আমরা যখন লা প্লাটা নদীর অক্ষাংশে তখন আরম্ভ হল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ভীষণ ঝড়। এই ঝড়ের নাম প্যাসপেরো। এর বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রচণ্ড। ঝড় আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ থেকে শুরু হয় প্রবল বিদ্যুৎ চমক। ক্যাপ্টেন আমাদের সাবধান করে বললেন দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিদ্যুৎ দেখলেই পাল গুটিয়ে ফেলতে। আমার তখন পাহারার পালা: জাহাজে ওঠার বাঁদিকের মঞ্চ পথের কাছে পায়চারী করছি

হঠাৎ মনে হল যেন আগা গলুইএর দিকে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় মেটকে খবর দিতেই সেও এসে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মেঘের ঘনঘটা, মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার বিদ্যুৎ, এবার বেশ স্পষ্ট। দক্ষিণ পূর্ব দিকের হাওয়া বন্ধ হয়ে নেমে এল ভীষণ স্তব্ধ নীরবতা। কোথাও একফোঁটা বাতাস নেই। আমরা লাফিয়ে উঠে মাস্তুলের আগার পাল গুটিয়ে ফেললাম, তিনকোণা পালটা খুলে ফেলে, মাস্তুলের দড়ির উপরের পাল টেনে নামিয়ে পালদণ্ডগুলো শুইয়ে রেখে ঝড়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে তারার আলো আড়াল করে এক বিরাট কুয়াশার জাল এসে আমাদের গ্রাস করে ফেলল, সেই সঙ্গে কাল মেঘের পুঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে চলল প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। আমরা যেন হতবুদ্ধির মত হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী জনেরও যেন সব বীরত্ব লোপ পেল। আমরা পাল নামাবার দড়ি ঢিলা করে দিলাম, বাতাসের বেগে জাহাজ যেন উড়তে উড়তে চলল। মাল্লারা সকলে মিলে হাত লাগিয়ে উপরের পাল গুটিয়ে ফেলল, তিনকোণা পালও গোটান হল, মাস্তুলের দড়ির উপরের পাল ঠিক করে জাহাজকে আয়ত্তের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হতে লাগল। সুবিধার জন্য পালের টানা দড়িও এঁটে নিলাম আমরা।

এই প্রথম আমি সমুদ্রে সত্যকার ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। উপসাগরীয় স্রোতে পড়ার সময় অবশ্য একবার উপরের পালের কিছুটা অংশ গোটাবার প্রয়োজন হয়েছিল, আমার কাছে সেটাই তখন মারাত্মক ব্যাপার, কিন্তু অভিজ্ঞ নাবিকের কাছে সে ঝড় কিছুই নয়। ইতিমধ্যে আমি কাজে অনেকটা পোক্ত হয়েছি, সুতরাং এই দুর্যোগের সময় জাহাজের কাজে সত্যকার সাহায্য করতে পারলাম। পাল গোটানোর কাজেও কিছুটা ক্ষমতা অর্জন করেছি, অন্যদের মত এ কাজে আমিও বেশ উৎসাহ পেতাম। একজন যখন উপরের পাল গোটাচ্ছে অন্য একজন তখন নীচের পালে হাত লাগিয়েছে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পাল আগে শেষ করার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। বাঁদিকের পাহারার দলের চেয়ে এ বিষয়ে আমাদের একটা সুবিধা ছিল। প্রধান মেট কখনো ভুলেও উপরে ওঠার চেষ্টা করতেন না অথচ মাল্লারা এসে পৌঁছবার আগেই আমাদের নতুন দ্বিতীয় মেট লাফ দিয়ে দড়িদড়ার মধ্যে পড়ে পালের কোণ বাঁধা দড়ি তুলে নিতেন। সুতরাং আমাদের পাল গোটান বা নামাবার কাজ বাঁদিকের মাল্লাদের বহু আগেই শেষ হয়ে যেত। সে কথা ওদের জানাবার জন্য আমরা দড়াদড়ি নামিয়ে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়তাম। পাল গোটান কাজটি নাবিকদের সমস্ত কর্তব্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে

রোমাঞ্চকর। একবার পালদণ্ড নামিয়ে ফেলে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না, যদি তুমি তত ক্ষিপ্র না হও তবে অন্য কেউ তৎক্ষণাৎ এসে তোমার হাত থেকে কাজ কেড়ে নেবে। মাস্তুল সংলগ্ন পালদণ্ডের দুটি দিকের ভার সাধারণত দ্বিতীয় মেট অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেন না, কেননা এ দুটি কাজ খুবই দায়িত্বপূর্ণ তবে তিনি যদি নৌবিদ্যায় তেমন পারদর্শী না হন তবে অন্য কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে।

শিলাপাত কমলেও বৃষ্টি চলল সমানভাবে। শীতে অস্বস্তিতে ও আমাদের অতি দুরবস্থা। বিশেষতঃ এখন শীতবস্ত্র কারো গায়েই ছিল না। যাইহোক নীচে যাবার অনুমতি পেয়ে পোশাক বদলে আমরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগ একটু কমল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এল। আমরা আবার পাল তুললাম, মধ্যরাত্রে বড় পালটি স্বস্থানে উঠে গেল।

এবার আরম্ভ হল হর্ন অন্তরীপের প্রচণ্ড শীতের জন্য প্রস্তুতি।

মঙ্গলবার ৪ঠা নভেম্বর। ভোরবেলা বাঁদিকে ডাঙ্গা দেখা গেল। দুটি দ্বীপ, ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের অংশ—দুটিরই প্রকৃতি অনেকটা এক, তবে আয়তন ভিন্ন। দ্বীপের মধ্যভাগ উঁচু জলের দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। দূর থেকে দ্বীপ দুটি নীল রঙের বলে ভ্রম হচ্ছিল। আমরা এই দুটি দ্বীপ ও পাটাগোনিয়ার মধ্যে এসে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপ দুটি উত্তর পূর্ব দিকে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। সূর্যাস্তের সময় দ্বিতীয় মেট ডানদিকে আবার ডাঙ্গার দর্শন পেলেন। আমরা হর্ন অন্তরীপের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, সুতরাং যে স্থলভাগ দেখা গেল সেটা খুব সম্ভব স্লেটেন ভূমির। উত্তরে হাওয়ার পাল তুলে এগিয়ে চললাম। মনে হল এযাত্রা ভ্রমণ বোধহয় সুখকর হবে।

॥ ৫ ॥ হর্ন অন্তরীপ ॥

বুধবার, ৫ই নভেম্বর। গত রাত্রিতে আকাশ ছিল সুন্দর ও নির্মেঘ। দক্ষিণ আকাশের যোগতারাটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। তিনটি নীহারিকার সমষ্টি, যার অপর নাম ম্যাগেলান মেঘপুঞ্জ, দক্ষিণ অয়নান্তবৃত্ত অতিক্রম করার পরই দিক চক্রবালে উদিত হল। দুটি নীহারিকা ছায়াপথের মত উজ্জ্বল, অন্যটি নিষ্প্রভ। ১৮° উত্তর অক্ষাংশে যোগতারাটি দেখা যায়, চারটি তারা ঠিক যেন ক্রসের আকারে সাজানো, আকাশে অন্য সব তারাদের মধ্যে জ্বল জ্বল করছে।

দিনের প্রথমদিকটা হাওয়া বেশ মন্দগতি ছিল, কিন্তু দুপুরের পর থেকে বেগ বাড়তে আরম্ভ করল। আমরা উপরের পাল গুটিয়ে ফেললাম। মৃদু হাওয়ায় যে অপরিসর পাল টাঙ্গান হয়, ক্যাপ্টেন বললেন আমরা তাতেই বেশ যেতে পারব। সন্ধ্যে আটটায় সূর্য অস্ত গেল। এমন সময়ে আমরা মাল্লাদের সাবধানবাণীতে সচকিত হয়ে উপরে উঠে দেখি দক্ষিণপশ্চিম দিক থেকে সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে এক বিরাট মেঘের স্তূপ আমাদের উপর এসে পড়েছে। এই আমরা হর্ণ অন্তরীপে পৌছলাম, মন্তব্য করলেন প্রধান মেট। আমরা তাড়াতাড়ি গোটাবার আগে পালের নীচের প্রান্তদুটি মাস্তলের উপর টেনে এনেছি কি আনিনি এর মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল ভীষণ জলের আলোড়ন। সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উদ্দাম হয়ে গর্জে উঠল। সমুদ্রের সে রূপ আমি আগে কখনো দেখিনি। আমাদের জাহাজটি ভেলার মত সোজা গিয়ে সেই তরঙ্গমালার মধ্যে বিদ্ধ হল, সামনের দিকটা জলের নীচে চলে যাওয়াতে গলুইএর ছিদ্র দিয়ে হুড়হুড় করে জলস্রোত এসে পাটাতন ভাসিয়ে দিল। পাটাতনের জল বেরোবার ছিদ্রের কাছে কোমর সমান জল জমা হল। আমরা অবিলম্বে উপরে উঠে পাল গোটাতে লেগে গেলাম, কিন্তু তাতে ঝড়ের রাগ বিন্দুমাত্র কমল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের কুচি এসে তীরের মতো বিঁধতে লাগল। সমস্ত প্রকৃতি যেন ষড়যন্ত্র করে আমাদের বিরুদ্ধে নর্তন কুর্দন আরম্ভ করে দিল। প্রাণপণে এগোবার চেষ্টায় আমাদের জাহাজটি আর্তনাদ করে উঠছিল। আমরা আবার মাস্তলের দড়ি নামাবার কপিকল বার করে দ্বিতীয়াংশের পাল গোটালাম, প্রধান পালটিও নামান হল, পালের কোণে দড়ি বেঁধে রাখা হল। আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের মনে যে আশা দেখা দিয়েছিল তা নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হল। এবার শীতের প্রকোপ সহ্য করার কথা ভেবে আমরা মনকে প্রস্তুত করলাম। মাস্তলের চতুর্থ অংশের উপরের পালদণ্ড ও অন্যসব দড়াদড়ি নেমে গেল, তবে বাকি সব সাজসরঞ্জাম, ছোট পাল ছড়াবার ডাণ্ডা প্রভৃতি উপরেই রেখে দেওয়া হল।

সমস্ত রাত ধরে নীচে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দোলা, উপরে ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাতের তাণ্ডব। আকাশ যেন আমাদের জাহাজটির উপর ভেঙ্গে পড়তে চায়। ভোর তিনটের আলো আঁধারিতে দেখা গেল জাহাজের ডেক বরফে সাদা হয়ে আছে। রাত্রে যারা পাহারায় ছিল তাদের প্রত্যেকের জন্য ক্যাপ্টেন একপাত্র করে জল মেশানো সুরা পাঠালেন। অন্তরীপের কাছাকাছি আমরা যতদিন ছিলাম এই বন্দোবস্ত বহাল ছিল। যারা উপরের পাল গোটাতে যেত তারাও এই পানীয়

থেকে বঞ্চিত হত না। যাই হোক ভোরের দিকে বাতাসের প্রকোপ একটু কমল, মেঘ কেটে আকাশ দেখা দিল, আমরাও আবার পাল তুলে এগিয়ে চললাম।

বৃহস্পতিবার, ৬ই নভেম্বর। দিনের প্রথম ভাগটা একরকম মন্দ কাটল না, কিন্তু রাত্রে আবার সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। আমরা আর গতরাত্রের মত জাহাজ থামাবার চেষ্টা না করে উপরের পাল গুটিয়ে ও ছোট পাল তুলে হাওয়ার দিকে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেরাত্রে আমার হালে থাকার পালা, প্রায় দুঘণ্টা এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম আমি। অভিজ্ঞতা অল্পদিনের হলেও স্টিমসন আর আমি বেশ যোগ্যতার সঙ্গে জাহাজ চালালাম, উপরওয়ালারা দেখে প্রশংসা করলেন। ঝড়ের সমুদ্রে জাহাজের মুখ ঠিক রাখা বেশ কঠিন কাজ। এসব ক্ষেত্রে জাহাজ যত বেশী ওঠানামা করে দড়িতে তত ঢিলে দেওয়ার কথা। একটু অসাবধান হলেই সমুদ্রের জল এসে ডেক ভাসিয়ে নিতে পারে। দু একটি মাস্তুল ভেঙ্গে যাওয়াও কি বিচিত্র নয়।

শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর। আজ সকালে হঠাৎ বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল গভীর কুয়াসা। এই অঞ্চলে সমুদ্র সর্বদাই চঞ্চল, বাতাস যদি বা কখনো থামে কিন্তু তা এত অল্প সময়ের জন্য যে সমুদ্রে নিস্তরঙ্গ হবার আগেই আলোড়ন আরম্ভ হয়। এই অবস্থার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে জাহাজের পাল কিম্বা হাল কোনটিই ভাল করে চলে না, ফলে বাধ্য হয়ে জাহাজকে কাঠের টুকরার মত পড়ে থাকতে হয়। পালের দণ্ডগুলো কোনমতে দড়ি দিয়ে টেনে দাঁড় করিয়ে রাখা গেল। উপর দিকের সাজসরঞ্জাম এই সময় অনেকটা কাজ দেয়। তবে ঐগুলিও হঠাৎ ঝাঁকুনি লেগে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা।

সেদিন সকালের এই স্তব্ধ প্রকৃতি আমার মনে আরেকটি ঘটনার কথা এনে দিল। ঘটনাটি ঘটার সময় তার বিবরণ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ব্যাপারটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেই প্রথম আমি খুব কাছে থেকে তিমি মাছের নিঃশ্বাসের শব্দ পাই। সেরাত্রে আমরা স্টেটেন ভূমি ও ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে চলেছি। রাত বারোটা থেকে চারটে আমাদের পাহারার পালা। সমুদ্র অস্বাভাবিক রূপে শান্ত, যেন জলে কেউ তেল ঢেলে দিয়েছে। আমি ডেকে উঠে দেখি আমাদের জাহাজ স্থির দাঁড়িয়ে, কুয়াশায় কোথাও দৃষ্টি চলে না, কেবল মাঝে মাঝে জলের গভীরতম তল থেকে মৃদু স্পন্দন তাতে ওঠাপড়া ছাড়া আর কোনো রকম আলোড়ন নেই। আমাদের চতুর্দিক ঘিরে তিমি মাছ আর মকরের ঝাঁক, কুয়াশায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু তাদের গভীর দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসছে যেন

বিরাট বলশালী অথচ স্থবির একদল প্রাণীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। পাহারায় যারা ছিলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘুমে অচেতন, কেউ বা চুপ করে বসে। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই আশ্চর্য দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটির প্রকাণ্ড দেহ একবার জলের উপর দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল, একটু দূরেই শোনা গেল আর একজনের নিঃশ্বাসপতন। মনে হল যেন মহাসমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস আর বুকের তোলাপাড়ার সঙ্গে তারা একাকার হয়ে মিশে গেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যের দিকে কুয়াশা খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এল, আশঙ্কা হল আবার ঝড় এলো বুঝি। সূর্যাস্তের পর বোঝা গেল আমাদের আশঙ্কা অমূলক নয়! তুমুল বরফপাত সুদ্ধ সেই ঝঞ্ঝা এসে পড়ল আমাদের উপর। আবার পাল গোটাও রব পড়ে গেল। সবগুলি পাল একে একে নামান হল। গলুই থেকে আছড়ে আছড়ে জল পড়তে লাগল। ক্যাপ্টেন কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও জাহাজ থামাতে রাজী হলেন না।

শনিবার, ৮ই নভেম্বর। সকালে কুয়াশা এবং বাতাস দিয়ে দিন আরম্ভ, শেষ হ'ল মহা দুর্যোগের মধ্যে, বরফের ঝড়, ভীষণ হাওয়া ও অবশেষে পাল গোটান।

রবিবার, ৯ই নভেম্বর। আজ যখন সূর্য উঠল আকাশ পরিষ্কার। দুপুর অবধি দিনটি ভালই গেল। ক্যাপ্টেন আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলেন। হর্ণ অন্তরীপের কাছে এমন আবহাওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, তাছাড়া এমন চমৎকার দিনটি পড়ল রবিবারে সেটাও মহা আশ্চর্য। আমাদের ভাগ্যে এখনো পর্যন্ত সবকটি রবিবারই ভালোয় ভালোয় কেটেছে, এই সুযোগে আমরা আমাদের আবাসস্থানে কিছুটা গোছগাছ ও ভিজে জামাকাপড়গুলির সদগতি করলাম। কিন্তু সে সুখ আর কতক্ষণ! বিকেল পাঁচটা কি ছয়টা, ডানদিকের পাহারার দলের ডাক পড়ল উপরে। হর্ণ অন্তরীপের জলহাওয়ার একটি সরস নমুনা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হল। দেখা গেল এক বিরাট কালো মেঘ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উড়ে আসছে, কিন্তু একেবারে আমাদের উপর এসে পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি পালগুলি গুটিয়ে ফেলা হল, সেগুলি দিনের বেলায় টাঙান হয়েছিল। কোন গতিকে পাটাতনের সবচেয়ে নীচের পাল টেনে বাঁধা হয়েছে, উপরের পাল নামাবার কপিকলও প্রস্তুত, ইতোমধ্যে তুমুল বেগে ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। নিমেষের মধ্যে সব অন্ধকার, সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত। শিলাবৃষ্টির এমন তোড় যে আমরা দড়ি ছেড়ে এক পা নড়ি তার সাধ্য কি। শীতে

হাত পা জমে যাবার উপক্রম, অন্ধকার ও হাওয়ার দাপটে চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পালগুলো ভিজে শক্ত হয়ে গেছে, দড়ির গায়ে এমন বরফ জমেছে যে সেগুলো নাড়াচাড়া করাই মহা পরিশ্রম। যাই হোক মাস্তুল থেকে তো নীচে নামা গেল। তখন দেখি আমাদের ছোট জাহাজটির অতি শোচনীয় অবস্থা, ঢেউএর ধাক্কায় এদিক ওদিক ছুটে চলেছে আর গলুই-এর ফাঁক থেকে অবিরল ধারে এসে পড়ছে জলস্রোত। একটা মাস্তুলের নীচে ভার তোলার যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে প্রধান মেট এমন সময়ে নির্দেশ দিলেন তিনকোণা পালটা গোটাও। এই কাজটি বেশ কঠিন। জন নামে সুইডেনের একটি মাল্লা এই কাজে এগিয়ে গেল, আমাদের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে করিতকর্মা। কিন্তু আরেকজনের সাহায্য চাই। আমি প্রধান মেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেখান থেকে কয়েকজনের পাশ কাটিয়ে গলুই-এর উপরের ডাণ্ডায় উপস্থিত হলাম এক লাফে। কপিকলের পিছনে দাঁড়িয়ে অন্য মাল্লারা পালটি টানতে লাগল। জন ও আমি পালদণ্ডের উপর উঠলাম, আমাদের পা দড়িতে, প্রতি মুহূর্তে বাতাসের ধাক্কায় পালের উলটো দিকে পড়ে যাবার আশঙ্কা। খানিকক্ষণ আমরা কোনমতে ধরে ঝুলে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না। জাহাজটি পর পর দুবার জলের মধ্যে প্রবেশ করে প্রায় আমাদের গলা অবধি ভিজিয়ে দিল। একবার পালদণ্ড সুদ্ধ আমরা আকাশে উঠছি, পরক্ষণেই চলে যাচ্ছি সমুদ্রের গর্ভে। আমরা জাহাজের উপরে আছি কি না সে জ্ঞানও লোপ পেয়েছিল। জন মনে করল পালদণ্ডটি এবার ভাঙল বোধহয়, সে চীৎকার করে মেটকে বলল মাস্তুলের দড়ির উপরের টাঙ্গান পালটা টেনে নামাতে কিন্তু ঝড়ের গর্জনের মধ্যে তার গলার শব্দ কোথায় ডুবে গেল। সৌভাগ্যবশতঃ জাহাজটি আর বেশী নাকানিচোবানি খায়নি। আমরাও কোনমতে কাজ সেরে নীচে এলাম। এসে দেখি সবই ঠিক আছে। দেখে ভারী উৎফুল্ল বোধ হল, যদিও ভিজে আমাদের সর্বাঙ্গ জবজবে, আর শীতের কথা না বলাই ভাল। জন এতক্ষণে স্বীকার করল যে কাজটা মোটের উপর বেশ বিপজ্জনক ছিল। ভাল নাবিকরা কিন্তু পরে কখনো এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না। সমস্ত রাত ঝড় বৃষ্টি সমান ভাবে চলল।

সোমবার, ১০ই নভেম্বর। ঝড়ের সঙ্গে পাল গুটিয়ে যুদ্ধ করতে করতে চললাম।

মঙ্গলবার, ১১ই নভেম্বর। যথাপূর্বম্।

বুধবার। একই রকম।

বৃহস্পতিবার। একই রকম।

এতদিনে আমরা অন্তরীপের জলহাওয়ায় খানিকটা অভ্যস্ত হয়েছি। পালের সংখ্যা কমিয়ে অবস্থাও অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। কখন পাহারা দেওয়া আর হাল চালান ছাড়া বিশেষ কিছুই করার নেই। এদিকে আমাদের আরেক সঙ্কট উপস্থিত। শুকনো বলতে একটি জামাও অবশিষ্ট নেই। আমাদের থাকবার জায়গায় আগুন জ্বালা যাবে না, আবার রান্নাঘরে কাপড় শুকানো বারণ। চারিদিক ভিজে ভিজে, অন্ধকার। কেবল অবিরাম সমুদ্রের দোলানি। পাহারার পালা শেষ হলে আমরা কোনমতে নীচে নেমে জামাকাপড় নিংড়ে টাঙ্গিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে আসত দুচোখে। নাবিকদের যে কোন অবস্থাতেই ঘুমোবার ক্ষমতা আছে। ঝড় বৃষ্টি বা কোনরকম আওয়াজে তাদের ঘুমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। সকাল বেলায় যখন পাটাতনের দরজায় তিনটি ধাক্কা দিয়ে আমাদের ওঠার ডাক পড়ত তখন আমরা যে যার বিছানা ছেড়ে উপরের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ডেকে হাজির হতাম। আমাদের সুখের সময় বলতে ছিল দু বার, সকাল সন্ধ্যে যখন আমাদের দু কাপ করে চা দেওয়া হত। সে চা নামেমাত্রই চা, আসলে গুড় মেশান গরম জল ছাড়া আর কিছুই নয়—মাল্লারা তাকে বলত মন্ত্রপড়া জল। কিন্তু এতে শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠত। চায়ের সঙ্গে মোটা রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস এই ছিল আমাদের আহার। আবার এই খাওয়াও যে রোজ কপালে জুটবে এমন কথা নিশ্চিত ভাবে বলা শক্ত। রান্নাঘরে গিয়ে আমাদের রুটি মাংস ও টিনের পাত্রে চা নিয়ে নীচে আসতে হত। অনেক সময় দেখেছি দোলানি সামলাতে না পেরে কেউ ডেকে আছাড় খেয়েছে আর তার মাংস পাটাতনের জল বেরোবার ফুটোর মধ্যে দিয়ে অন্তর্ধান করেছে। আমাদের মধ্যে খুব ফুর্তিবাজ গোছের এক ইংরাজ মাল্লা ছিল, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল সে—ছেলেটি পরে সমুদ্রে ডুবে মারা যায়—সে একদিন জাহাজের দোলানি কমবে এই আশায় রান্নাঘরে পুরো দশ মিনিট অপেক্ষা করল, তারপর দোলানি একটু কমতেই এক হাতে চায়ের পাত্র অন্যহাতে খাবার নিয়ে কপিকলটার কাছাকাছি পৌছেছে মাত্র এমন সময় গলুইয়ের উপর থেকে জল আছড়ে পড়ে, বেচারা উলটে গিয়ে সেই জলের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে যায় আর কি। ভাগ্যক্রমে গলুই উঁচু হয়ে ওঠাতে সে আটকে গেল, সেই অবস্থাতেও হাতে চায়ের পাত্রটি কিন্তু ঠিকই ধরা আছে।

তাতে অবশ্য লোনা জল ছাড়া আর কিছু নেই। ছেলেটির এমনই হাসিখুশী স্বভাব যে এতেও সে দুঃখিত হবার ভাব দেখাল না। যে নাবিকটি হালে বসেছিল তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘুঁষি পাকিয়ে বলে গেল "এটুকু ঠাট্টাই যদি না সইতে পারলাম তবে মাল্লা হয়েছি কি করতে!" জলের মধ্যে নাকানিচোবানি খাওয়ার দুর্ভোগ ছাড়াও সেদিনের বরাদ্দ চা-টা মাঠে মারা গেল, তাতে কিন্তু তার বিন্দুমাত্র ফূর্তির অভাব দেখা গেল না। অন্য মাল্লারা নিজেদের চা থেকে একটু একটু করে দিয়ে সে বেচারার দুর্ভাগ্যের একটু উপশম করার চেষ্টা করল।

আমার ভাগ্যেও একদিন ঠিক এই ব্যাপার ঘটল। সেদিন মাংসের টুকরো, আলু ও রুটি একসঙ্গে সিদ্ধ করে একটা ঘণ্ট প্রস্তুত হয়েছে। আমাদের কাছে সেটাই পরম সুখাদ্য। রান্নাঘর থেকে সেই খাবারের পাত্রটা নিয়ে নীচে যাবার ভার পড়েছিল আমার উপর। আমি সিঁড়ির দরজা অবধি ঠিক এলাম, তারপরেই ঘটল সেই অঘটন। জাহাজটা হঠাৎ ভীষণ জোরে উঁচু হয়ে নীচে নেমে যেতেই সিঁড়িটা জায়গা থেকে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সবেগে নীচে এসে পড়লাম। সমস্ত খাবার ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার। এতে রাগ দুঃখ যাই হোক না কেন ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নাবিকদের জীবনে পদে পদে বিপদ, এমনকি মৃত্যুর গা ঘেঁষে যেতে হয় কত সময়, তাতে ভয় করলে চলে না।

শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর। আমরা অন্তরীপ পশ্চিমে ছেড়ে এগিয়ে এসেছি। দক্ষিণ-পশ্চিমে হাওয়ায় কেবল পাটাগোনিয়ার দিকে ঠেলছিল, আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করছিলাম উত্তরে যাওয়ার। দুপুর দুটোর সময় বাঁদিকের নোঙর দণ্ডের দিক থেকে একটা পাল আসতে দেখা গেল। বড় পাল খানিকটা করে গুটিয়ে চলেছে জাহাজটা, আকারে নেহাত ছোট নয়। আমরা তখন হাওয়ার গতিক দেখে পালের গোটানো অংশ মেলে দিয়ে মাঝের বড় পালটি তুলেছি। আমাদের দেখে বোধহয় নবাগত জাহাজের অধিকর্তা অপ্রতিভ হয়েই পালটি সম্পূর্ণভাবে খুলে দিলেন। জাহাজটির সঙ্গে কথা হতে জানা গেল ওটি তিমি শিকারে বেরিয়েছে, নিউ ইংলণ্ডের জাহাজ, নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা করেছে একশ কুড়ি দিন আগে। আমরাও প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দিলাম ,আমাদের বস্টন ছাড়ার পর বিরানব্বই দিন কেটেছে। তারপর দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যে দ্রাঘিমাংশ নিয়ে একটু আলোচনা হল কিন্তু ঠিক মতৈক্য হল না। জাহাজটি একটু দূরে দূরে যেতে লাগল। সারা রাত আমরা পরস্পরের দৃষ্টিপথে রইলাম। সকালের হাওয়ায় আমরা মাস্তুলের আগে

পিছনে সমস্ত পাল তুলে মেঘের মত সাজে এগোতে লাগলাম। তিমি শিকারী জাহাজটি আমাদের থামতে সঙ্কেত করল। সাড়ে সাতটার সময় ওদের জেলে নৌকায় চড়ে ক্যাপ্টেন জব টেরী আমাদের জাহাজে পদার্পণ করলেন। জব টেরীর নাম শোনেনি প্রশান্ত মহাসাগরে এমন বন্দর বা জাহাজ বিরল। ডিঙিতে যে মাল্লাটি এসেছিল তাকে ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে সে খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, সে কি তুমি জব টেরীর নাম শোননি? আমার ধারণা ওঁকে সকলেই চেনে। সত্যিই জব টেরী একজন অসাধারণ পুরুষ। দীর্ঘ ছয় ফিট চেহারা, পায়ে উঁচু গরুর চামড়ার জুতো, বাদামী পরিচ্ছদ, কেবল তামাটে গাত্রবর্ণ ছাড়া নাবিক বলে বোঝার উপায় নেই। অথচ চল্লিশ বছর ধরে উনি এই ব্যবসায়ে আছেন। জাহাজ তৈরী করা, চালানো থেকে আরম্ভ করে হেন কাজ নেই যা উনি করেন নি। ওঁর নিজের জাহাজও ছিল। জাহাজে যতক্ষণ সময় ছিলেন, প্রায় চার ঘণ্টা, ক্যাপ্টেন টেরী অবিশ্রাম কথা বলে গেলেন। সবই ওঁর নিজের সম্বন্ধে—পেরুর সরকারের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক, ডাবলিন নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন লর্ড টাউনসেণ্ড, প্রেসিডেন্ট জাকসন, বাল্টিমোরের জাহাজ অ্যান ম্যাককিন ইত্যাদি। ওঁর গল্প হয়ত শেষই হত না, ভাগ্যক্রমে হাওয়া উঠল, সেই দেখে উনি তাড়াতাড়ি নিজের জাহাজে ফিরে গেলেন। ওঁর জাহাজের মাল্লাদের চেহারা দেখে মনে হল সকলেই আনকোরা নতুন। একজনকে দেখে বোধ হল সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। সে আমাদের জাহাজের পশুদের দেখতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে বললে আহা এখন যদি আবার বাবার শুয়োরের খোঁয়াড়ে ফিরে যেতে পারতাম!

পদমর্যাদা নিয়ে সেদিন একটা গণ্ডগোলের উৎপত্তি হয়। তিমি শিকারী জাহাজে যারা হাল চালায় তারা ঠিক সারেঙ শ্রেণীর মাল্লাদের পর্যায়ে পড়ে না। অথচ তারা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের থেকেও আলাদা। তারা আলাদা টেবিলে খায়, থাকেও মাল্লাদের থেকে অন্যত্র। আমরা এই পদমর্যাদার সূক্ষ্ম হিসাব সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। ক্যাপ্টেন টেরীর সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল তাকে আমরা সারেঙ বলে ধরে নিয়েছিলাম। সারেঙ আর মাল্লাদের মধ্যে শ্রেণীগত কোন পার্থক্য নেই। যাই হোক এই লোকটি আমাদের জাহাজে এসে পড়ল মহা বিপদে। দ্বিতীয় মেট তাকে মোটে লক্ষ্যই করলেন না, সেও আমাদের এড়িয়ে চলতে চায়। খাবার সময় হল আসল সমস্যা। লোকটি কোন টেবিলে বসবে। দ্বিতীয় মেট তাকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে সোজা গিয়ে নিজের টেবিলে আসন গ্রহণ

করলেন। অগত্যা আমরা তাকে নীচে আমাদের সঙ্গে খেতে আসতে অনুরোধ জানালাম। সে বেচারা ক্ষীণ প্রতিবাদ করল, এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্রমেই লোপ পেতে বসেছে। তিমি-জাহাজের মাল্লাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা বোঝবার পর আমরা তাকে আর একবার খেতে আসতে অনুরোধ করতেই সে অবশেষে নীচে এল। কিন্তু সমস্তক্ষণ তার বড় অস্বস্তিতে কাটল, ভাল করে কথাই বললে না, যেন আমাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছে এমন ভাব। মানুষে মানুষে সমভাবের পরিবর্তে আমরা যে কি করে অনর্থক ভেদাভেদ বাড়াই ভাবলে অবাক হতে হয়। তবে এটাই মনুষ্য চরিত্র।

আটটার সময় গতি পরিবর্তন করে আমরা উত্তরে জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ অভিমুখে চললাম।

অন্তরীপ পার হবার কিছুক্ষণ পর থেকেই দক্ষিণ সাগরের অতিকায় পাখী আলবাট্রসদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। কোলরিজের কবিতায় বর্ণনা পড়ে পাখীগুলি সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম তার সঙ্গে এদের সত্যিকার রূপ বেশ মিলে গেল। কয়েকটি পাখী ধরেছিলাম। মস্ত বড় ডানা, লম্বা লম্বা পা আর জলজলে চোখ—সব মিলিয়ে ভারী আশ্চর্য চেহারা। ওড়বার সময় ওদের মন্দ দেখায় না কিন্তু একবার জলের মধ্যে একটি ঘুমন্ত আলবাট্রস চোখে পড়েছিল। সে দৃশ্য ছবির মত আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। সেদিন স্তব্ধ হাওয়া, সমুদ্রে অতি ধীরে তরঙ্গের ওঠানামা। পাখীটি ডানায় মাথা গুঁজে একবার ঢেউএর উপরে উঠছে আবার পরক্ষণেই নীচে নেমে যাচ্ছে। আমাদের গলুই-এর শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। মাথা তুলে জাহাজের দিকে চেয়ে দেখেই পাখাটি বিরাট ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে।

॥ ৬ ॥ সলিল সমাধি ॥

সোমবার, ১৯শে নভেম্বর। এই দিন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সকাল সাতটায় আমরা চীৎকার শুনে উঠে পড়লাম। একজন জলে পড়ে গেছে। এই খবরে সকলের বুকের মধ্যে ভয়ের শিহরণ খেলে গেল। উপরে উঠে দেখি জাহাজ পিছনে ফেরান হয়েছে, হাল নামান। ডেক থেকে সন্ধানী নৌকা নামান হচ্ছে দেখে আমি এক লাফে তাতে চড়ে পড়লাম। তখনো পর্যন্ত জানি না সেই

হতভাগ্য ব্যক্তি কে। নৌকায় করে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডুবন্ত লোকটির সন্ধান করে বেড়াচ্ছি, তখন শুনি লোকটি অন্য কেউ নয়, জর্জ বালমার নামে সেই আমুদে ইংরাজ মাল্লা, যার কথা আগে লিখেছি। কর্মচারীরা সকলেই ওকে পছন্দ করতেন। মাল্লাদের মধ্যে ও ছিল খুব জনপ্রিয়। সবচেয়ে উপরের মাস্তুল দণ্ডে একটা দড়ি বাঁধবার জন্য ও উপরে উঠেছিল, গলায় পাল নামাবার দড়ি, কাছিতে আটকাবার সরু ফলক ইত্যাদি জড়ানো। মাস্তুলের ডানদিকের রশারশির উপর থেকে বেচারা পড়ে যায়। একে সাঁতার জানত না, তার উপর গলায় ভারী জিনিস বাঁধা, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যেতে দেরী হয়নি। আমরা বৃথাই সমুদ্রের মধ্যে ওকে খুঁজে বেড়ালাম। সকলেই মনে মনে জানি ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তবু আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত নৌকার মুখ ঘুরিয়ে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম।

মৃত্যু সব সময়েই ভয়ঙ্কর, কিন্তু সমুদ্রে আকস্মিক মৃত্যুর মত ভয়াবহ বোধ হয় আর কিছু নয়। ডাঙায় কেউ মারা গেলে অন্তত তার দেহ পড়ে থাকে, শবানুগমন করেও আত্মীয় বন্ধুজনেরা কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারে, কিন্তু জলমগ্ন হওয়ার মধ্যে এমন একটা নিঃশেষ বিলুপ্তি আছে যে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। ডাঙায় একটা সমাধিফলক মৃত ব্যক্তির দৈহিক অবশিষ্টের চিহ্ন সূচিত করে, অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হবার সময় থাকে, তাছাড়া থাকে স্মৃতির অবলম্বন। যুদ্ধক্ষেত্রে পাশে যদি কেউ গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় তার দেহটা অন্তত প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান থাকে কিন্তু সমুদ্রে যে হারায় সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আগের মুহূর্তে হয়ত সে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, কিন্তু সে আর নেই, কোথাও নেই, তার বদলে কেবল ফাঁকা। সমুদ্রে কারো অভাব যেন আরো বেশী করে বোধ হয়। জন কয়েক লোক একটা ছোট জায়গায় আবদ্ধ হয়ে জনহীন বিশাল সমুদ্রে ভেসে পড়েছে। তারা পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হওয়া যেন নিজের একটা অঙ্গহানির মত। যে গেল তার স্থান পূর্ণ করার জন্য অন্য কাউকে তো পাবার উপায় নেই। তার শূন্য বিছানা, খাবার সময় একজনের অভাব সদাসর্বদা তার কথা মনে করিয়ে দেয়। হাল চালাবার সময় একজন লোক কম, পালের দণ্ড টাঙ্গাবার সময় একজন সহযোগী পাশে এসে দাঁড়ায় না—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই অনুভব অনুক্ষণ বুকে এসে বাজে।

এই দুর্ঘটনার জের বেশ কিছুদিন চলল। সকলেই গম্ভীর, কেউ হাসিঠাট্টা

করে না, উচ্চ কর্মচারীরা নরম সুরে কথাবার্তা বলেন, মাল্লারা মাস্তুলে চড়বার আগে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। মৃত লোকটির প্রসঙ্গ সকলেই এড়িয়ে চলে। কখনো তার কথা এসে পড়লেও মাল্লাদের মাথায় কোন দার্শনিক চিন্তাও আসার কথা নয়। আহা জর্জ বেচারা পটল তুলল। যাকগে বেচারা নিজের কাজ করে গেছে, ভগবান এবার ওর উপর মুখ তুলে চাইবেন। মাল্লারা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যদিও তাদের মন নানা কুসংস্কারে পূর্ণ। ওরা মনে করে যে ব্যক্তি এই জীবনে বহু পরিশ্রম করে শেষ অবধি কষ্টকর মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করেছে তাকে অন্তত মৃত্যুর পর ঈশ্বর দয়া করবেন—সে যাই করে থাকুক না কেন নরকবাসের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। আমাদের আফ্রিকান রাঁধুনীটি ছিল একটু ধর্মভীরু প্রকৃতির। জাহাজে আসার আগে দিনে দু বার গির্জায় যেত সে। এখন প্রতি রবিবার নিয়মিত বাইবেল পাঠ করে ও আমাদের ভয় দেখিয়ে বলে উপাসনার দিন, অর্থাৎ রবিবার যদি বাজে কাজে সময় নষ্ট কর তবে ঐ জর্জের মতই দশা হবে।

নাবিকের জীবনে আরাম কম, পরিশ্রমই বেশী। অসুন্দর ও কুশ্রী নিয়েই তার দৈনন্দিন কাজ, তার মধ্যে ক্বচিৎ কখনো সুন্দরের দেখা মেলে।

আমরা নৌকা নিয়ে জাহাজে ফেরার পর ক্যাপ্টেন সকলকে ডেকে পর পর করে জিজ্ঞাসা করলেন আরো খোঁজা দরকার আছে বলে আমরা মনে করি কি না। লোকটিকে বাঁচানোর চেষ্টায় কোনরকম ত্রুটী হয়নি এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হবার জন্য আমাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমরা সকলেই এক বাক্যে বললাম আর চেষ্টা করা বৃথা, কেন না ছেলেটি একে সাঁতার জানত না, তার উপর গায়ে প্রচুর ভারী জিনিস বাঁধা ছিল। অগত্যা জাহাজের মুখ ফিরিয়ে আবার নিজের পথে চালিত করা হল।

নৌজগতের আইন অনুসারে সমুদ্রে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তির জন্য ক্যাপ্টেন দায়ী। সুবিধার জন্য একটি নিয়ম প্রচলিত আছে সম্ভবতঃ সেটিও আইন এবং তা হল মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র নিলামে চড়ানো। মাল্লারাই সেগুলি কিনে নেয় এবং যাত্রার শেষে ওদের মাইনে থেকে ঐ সব জামাকাপড় প্রভৃতির দাম কেটে নেওয়া হয়। তবে নেহাত প্রয়োজন না পড়লে কেউই এক যাত্রায় ঐ সব পোশাক ব্যবহার করতে চায় না। জর্জের তোরঙ্গটা বার করে এনে তার যাবতীয় জিনিস-পত্র নিলামে চড়ানো হল, তখনো বেচারার অন্তর্ধানের পর বেশীক্ষণ কাটেনি।

জর্জের মৃত্যুর পর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হল। ওর সম্বন্ধে নানা-রকম গুজব ছড়াতে আরম্ভ করল। কেউ বললে জর্জ নাকি প্রায়ই বলত সাঁতার না জানার জন্য একদিন বেঘোরে ওর প্রাণটা যাবে। অনেকে বললে অনিচ্ছায় সমুদ্রে কাজ করতে এলে ফল যে ভাল হয় না তার প্রমাণ জর্জ। ও নাকি আগাম টাকাটা জাহাজে ওঠার আগেই খরচ করে ফেলেছিল, সে টাকা ফেরত দেবার সাধ্য না থাকায় বেচারাকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একটি ছোট ছেলে ছিল জর্জের খুব অনুগত। তার জবানী অনুসারে মারা যাবার আগের দিন রাত্রে জর্জ নাকি ওর কাছে তার বাড়ীর গল্প করেছিল। আর কখনো কারো কাছে ও মা ও অন্য আত্মীয়স্বজনদের কথা বলেছে বলে শোনা যায়নি।

এই দুর্ঘটনার পরদিন রাত্রে আমি যখন চুরুট ধরাতে রান্নাঘরে গেছি রাঁধুনী আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। সাম্প্রতিক ঘটনাতে ওর মনের মধ্যেকার কুসংস্কার-গুলি মাথা চাড়া দিয়েছে দেখলাম। নাবিকদের মধ্যে এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ও বললে মৃত্যু সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই আগে থেকে একটা অনুভূতি হয়। জর্জ নাকি আজকাল প্রায়ই পুরানো বন্ধুবান্ধবদের গল্প করত। এই থেকে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি আরো নানা কুসংস্কারের কথা এসে পড়ল। লোকটির কথাবার্তার ধরন দেখে আমার মনে হচ্ছিল কি একটা কথা ও বলি বলি করেও বলতে পারছে না। অবশেষে এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কেউ নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে সে আমাকে নীচু, রহস্যময় গলায় বললে—

"আচ্ছা বলতে পার জাহাজের ছুতোরটার কি জাত?"

"কেন, জার্মান।" আমি উত্তর দিলাম।

"কি রকম জার্মান?"

"ব্রেমেন-এর লোক।"

"ঠিক বলছ?"

আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে লোকটা জার্মান আর ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষাই জানে না। রাঁধুনী বললে, "যাক বাবা, শুনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি ভাবি ও বুঝি ফিনল্যাণ্ডের লোক। সত্যি কথা বলতে কি ও লোকটিকে খুব সমঝে চলি আমি। সাবধানে কথা কই।"

এমন ব্যবহারের হেতু কি আমি জানতে চাইলাম। রাঁধুনীর উত্তরের মর্মার্থ

হল ফিনরা নাকি যাদু জানে, বিশেষত ঝড়জলের উপর ওদের দৈবী ক্ষমতার কথা নাকি সর্বজনবিদিত। আমি ওকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। সেই কবে একবার ও স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে গিয়েছিল যার পালের মিস্ত্রী ছিল ফিন। তার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, ওর কাছে একটা পুরানো বোতলে মদ ছিল—সে বোতল সব সময়ই আধাভর্তি হয়ে থাকত। অথচ যখনই দেখ সে টেবিলের উপর বোতলটা রেখে নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছে আর বোতল তুলে চুমুক দিচ্ছে। তবু সে বোতল সব সময়ই আধা ভর্তি। লোকটি নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে। সকলেই বলত ও যাদুকর না হয়ে যায় না।

এছাড়া ওর কাছে আরো নানা রহস্যময় খবর পাওয়া গেল। একবার ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে ভীষণ হাওয়ার প্রতিকূলে প্রাণপণ চেষ্টায় ওদের জাহাজ চলেছে এমন সময় দেখা গেল একটি জাহাজ হালকা হাওয়ার ছোট পাল তুলে ফুরফুর করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পরে জানা গেল জাহাজটি ফিনল্যাণ্ডের।

"ওদের সব নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা আছে" বললে রাঁধুনী, "এও আমি বলছি তুমি শুনে রাখ, ওরা যদি জাহাজে থাকে আর ইচ্ছামত কাজে বাধা পায় তবে যা খুশী তাই করতে পারে—শয়তানের চর ওরা।"

আমি তবু সন্দেহ প্রকাশ করছি দেখে রাঁধুনী বললে তবে জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক। জন একেবারেই অশিক্ষিত, কিন্তু মাল্লাদের মধ্যে বয়সে প্রবীণ, তাই আমি ওর মধ্যস্থতায় রাজী হলাম। জন বলাই বাহুল্য রাঁধুনীর কথায় সায় দিল। ও নাকি একবার এক জাহাজে ছিল—ভীষণ হাওয়া উঠল, চোদ্দদিন ধরে হাওয়া কমবার নাম নেই, তখন ক্যাপ্টেন আসল ব্যাপারটা বার করলেন। একজন মাল্লার সঙ্গে কিছুদিন আগে ক্যাপ্টেনের বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেই লোকটি ফিন। ক্যাপ্টেন ওকে বললেন হাওয়া যদি এই মুহূর্তে বন্ধ না হয় তবে তোমাকে আটক করে রাখা হবে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ। লোকটা কি তবু শোনে। শেষে দেড়দিন না খেয়ে যখন আর শরীরে কুলোল না তখন কি সব মন্তর পড়ে হাওয়া থামিয়ে দিল। তখন ওকে ছাড়া হল।

রাঁধুনী শুনে মন্তব্য করলে, "কি? শুনলে তো!" আমি বললাম এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। হাওয়ার গতি দিন পনেরোর মধ্যে তো বদলাবেই, বদলাতে বাধ্য।

রাঁধুনী সেই শুনে চটেমটে বললে "যাও, যাও, ভারা কলেজে পড়ে পণ্ডিত

হয়েছ। থাকো জাহাজে আরো কদিন, নিজের চোখে দেখতে শেখো, তবে না বুঝবে !”

॥ ৭ ॥ জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ ॥

মোটামুটি নির্বিঘ্নে কাটিয়ে আমরা পৌঁছলাম জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ।

মঙ্গলবার, ২৫শে নভেম্বর। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে দেখা গেল জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপটি নীল মেঘের মত সমুদ্রের বুকে জেগে আছে। আমরা তখনও কূল থেকে সত্তর মাইল, সেখান থেকে দ্বীপটি এত উঁচু আর রঙিন দেখাচ্ছিল যে আমার মনে হল ওটা বুঝি মেঘ, ওর নীচের দিকে দ্বীপটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি, ক্রমে আরো কাছে যেতে সবুজ রঙ ফুটে উঠল—জমির উঁচুনীচু ঢালও বোঝা গেল, আস্তে আস্তে গাছ, পাথর সব আলাদা করে দেখা যেতে লাগল। বিকেল নাগাদ দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে আমরা বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। একটিই বন্দর। তখন সূর্য অস্ত গেছে। বন্দরের মুখে একটি চিলির যুদ্ধজাহাজ আমাদের অতিক্রম করে বেরিয়ে এল, ডেকে একজন আমেরিকান কর্মচারী ছিলেন তিনি আমাদের রাত্রি হবার আগেই নোঙর ফেলতে পরামর্শ দিলেন। তারা চলে গেল ভালপারাইসো অভিমুখে। এলোমেলো হাওয়ায় আমাদের নোঙর ফেলতে শেষ অবধি মধ্যরাত্রি হয়ে গেল। একটা ছোট নৌকায় আমরা আগে নেমে গিয়ে কাজ করছিলাম। যারা জাহাজে ছিল তারা হাওয়ার দিক বদলের সঙ্গে সঙ্গে টানাদড়ি দিয়ে পালদণ্ড টানাহেঁচড়া করতে করতে রাত বারোটায় নোঙর ভূমিস্পর্শ করল। সেখানে চল্লিশ ফ্যাদাম* জল। বস্টন ছাড়ার পর এক শ তিন দিন পরে এই আমরা প্রথম মাটি ছুঁলাম। আমরা সমস্ত রাত তিনভাগে ভাগ হয়ে পাহারা দিলাম।

ভোর তিনটের সময় পাহারায় এসে যে আশ্চর্য অনুভূতিতে সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল তা জীবনে ভোলার নয়। কূল থেকে শেষ রাতের হাওয়া বইছে, ভেসে আসছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাক। পাহাড়গুলো যেন সেপাইএর মত আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের মাথা থেকে মধ্যে মধ্যে একটা অদ্ভুত চীৎকার ভেসে আসছিল, মানুষের গলার স্বর বলে বোধ হল না। সেদিকে কোন

* ফ্যাদাম…চার হাত পরিমাণ, সমুদ্রের গভীরতা মাপতে ব্যবহৃত হয়।

আলোর চিহ্ন নেই। পরে প্রধান মেটের কাছে শুনলাম ওখানে চিলির অপরাধীদের পাহাড়ের গুহায় কয়েদ করে রাখা হয়। শান্ত্রীরা চীৎকার করে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে। আমার ছুটি হতে নীচে গেলাম। কতক্ষণে সকাল হবে আর ঐ আশ্চর্য সুন্দর দ্বীপের মাটিতে পা দেব এই চিন্তায় আমি অস্থির।

যখন আবার সব মাল্লাদের ডাক পড়ল তখন সূর্যোদয়ের সময় হয়েছে। প্রাতরাশ পর্যন্ত আমরা জল আনা ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত রইলাম। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে দেখে নিচ্ছিলাম পারিপার্শ্বিকের চেহারা। বন্দরের চারিদিক ঘিরে স্থলভাগ, জাহাজঘাটটি পাথরে বাঁধানো, সেখানে দুটি নৌকা বাঁধা ও পাহারারত এক শান্ত্রী। কাছাকাছি কাঁচা মাটির তৈরী প্রায় শখানেক চালাঘর, কয়েকটি চুনকাম করা, কিন্তু অধিকাংশই বিজন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর তৈরী কুটিরের মত, পাতা দিয়ে ছাওয়া। গভর্ণরের বাড়ীটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একতলা চুনকামকরা বড় বাড়ী, জানলায় গরাদ, ছাদে লাল টালি। তার কাছেই বাদামী রঙের নীচু ক্রসচিহ্নিত গির্জা। বাড়ীটি ঘিরে বেড়া। মাথার উপর বহুকেলে পুরানো বিবর্ণ একটি চিলি দেশের পতাকা উড়ছে। গভর্ণরের বাড়ী, গির্জার প্রবেশ পথ এবং রাস্তায় অন্যত্র বেয়নেটধারী সেপাইদের ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। তাদের পোশাকপরিচ্ছদ অতি অযত্নরক্ষিত, জুতোর মুখ হাঁ করা। তারা অনেকে জেটির কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের কূলে নামার প্রতীক্ষা করছিল।

রাত্রে তারার আলোয় পাহাড়গুলো যত বিশালাকৃতি মনে হয়েছিল দিনের বেলা তেমন লাগল না। বেশ সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়, শুনলাম উপত্যকাগুলিও উর্বর। পাহাড় থেকে খচ্চর নামা পথ দ্বীপের নানা দিকে চলে গেছে।

মাল্লাদের মধ্যে আমি আর স্টিমসন কূলে নামার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। নৌকা নামাবার আদেশ দেওয়া হচ্ছে শুনে আমরা মহানন্দে পকেটে তামাক পুরে প্রস্তুত হলাম—তামাকের পরিবর্তে দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে অন্য কিছু কেনা যাবে এই বাসনা। চারজন লোক নৌকায় যাবে শুনে আমরা পড়ি কি মরি করে নৌকায় চড়েছি—আধঘণ্টা দড়ি টেনে গিয়ে আবার আমরা জাহাজে ফিরে এলাম। আমাদের কাণ্ড দেখে অন্য মাল্লারা হেসেই আকুল।

প্রাতরাশের পর পাঁচজন লোক নিয়ে দ্বিতীয় মেট কূলে চললেন। আমি এই দলে ভিড়ে গেলাম। জলের খালি পিপে ভর্তি করার জন্যে যাওয়া, ভাগ্যদেবীর

অশেষ কৃপায় কূলের কাছে জল এতই ঘোলা যে পানের অযোগ্য। দ্বীপের শাসনকর্তা তাঁর লোকজন দিয়ে নদীর উৎসের কাছ থেকে জল আনতে পাঠালেন। ফলে আমরা প্রায় দু ঘণ্টা সময় হাতে পেলাম। এই সময়টা আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম, অনেকে ফল খেতে দিল। স্ট্রবেরী, আপেল, তরমুজ, আঙুর ওখানে প্রচুর জন্মায়। লর্ড অ্যানসন নাকি এই দ্বীপে প্রথম চেরী গাছ লাগান। সেপাইদের পোশাকের দুরবস্থার কথা আগেই বলেছি। তারা অনেকে আমাদের কাছ থেকে জুতো কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করল। অবশ্য দাম দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমাদের কাছ থেকে তামাক নিয়ে তার বদলে ওরা ফল ঝিনুক ইত্যাদি দিল। ছুরি কিনতে চাইছিল অনেকে, কিন্তু দ্বীপের শাসনকর্তা কোনরকম ধারালো অস্ত্রের লেনদেন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সেপাই শান্ত্রী ও কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া যারা ওখানে আছে সকলেই নাকি ভালপারাইসো থেকে এখানে কোন না কোন অপরাধে নির্বাসিত, তাদের হাতে ছুরি কোনমতেই দেওয়া চলতে পারে না। দ্বীপটি চিলির শাসনাধীন। প্রায় দু বছর যাবৎ নির্বাসনস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শাসনকর্তা জাতে ইংরাজ, আগে চিলির নৌবহরে ছিলেন। একজন পুরোহিত, জনকয়েক কর্মচারী ও কিছু সেপাই শান্ত্রী নিয়ে তিনি এই দ্বীপের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। অবশ্য কাজটি বিশেষ সহজ নয়। আমাদের ওখানে আসার কয়েক মাস আগে নাকি কয়েকজন কয়েদী রাত্রিবেলা একটা নৌকা চুরি করে বন্দরে ভিড়ানো এক জাহাজে উঠে জাহাজের যাবতীয় কর্মচারীদের ঐ নৌকায় ফেরত পাঠিয়ে নিজেরা জাহাজ নিয়ে ভেসে পড়ে। একথা শোনার পর আমরা সাবধান হলাম এবং রাত্রে পাহারা দেবার সময় হাতিয়ারও সঙ্গে রাখতাম। ছুরি সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করল সকলে। জঘন্যতম অপরাধীদের পাহাড়ের গুহায় খুব কড়া নজরে রাখা হত। গুহা থেকে নেমে এসেছে খচ্চর চলা পথ। সেই পথে কয়েদীদের রোজ নীচে নামিয়ে লাগান হত খাল কাটা, জাহাজ ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি নানা পরিশ্রমসাধ্য কাজে। অন্য কয়েদীরা পরিবার নিয়ে বাস করত, নিজেরাই বাসস্থান তৈরী করে। কিন্তু ওদের মত কুঁড়ে প্রকৃতির লোক আমি খুব কম দেখেছি। কথা বলতেও ওদের বেজায় আলস্য। বাড়ীতে, জাহাজঘাটে, জঙ্গলের ভিতর, যেখানে দেখা যায় ওরা কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অনেকে দেখলাম হাতে লম্বা ছড়ি নিয়ে চওড়া টুপি পরে মাথায় বোঝা নিয়ে সার বেঁধে চলেছে। কাজের শ্রেণী বিভাগ যে কি

অনুসারে করা হত জানি না, জানার কোন উপায়ও ছিল না কেন না শাসনকর্তা ছাড়া সেদেশের আর কেউ ইংরাজী জানত না। শাসনকর্তার কাছে যাব আমার এমন সাধ্য ছিল না, জলেই হোক আর স্থলেই হোক যে মাল্লা সে সবসময়েই মাল্লা।

জলের পিপে ভর্তি করে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে আমেরিকান সেনাপতির মত পোশাকে সজ্জিত হয়ে শাসনকর্তা আমাদের জাহাজে পদার্পণ করলেন, সঙ্গে পাদ্রী, তাঁর পরনে সন্ন্যাসীদের মত পোশাক ও টুপি আর বিরাট গুম্ফধারী সেনাপতি। খাওয়ার পর বারদরিয়ায় একটা বিরাট জাহাজ দেখা গেল, খানিক পরে জাহাজ থেকে একটা জেলে ডিঙি এগিয়ে এল বন্দরের দিকে। তাতে তরুণ কোয়েকার ক্যাপ্টেন, সাদাসিধে জামাকাপড় পরে আমাদের জাহাজে এলেন। জাহাজটা নিউ বেডফোর্ডের তিমি শিকারী, নাম কটেস। বন্দরে আসার উদ্দেশ্য অন্তরীপের ওপার থেকে কোন জাহাজ এসেছে কিনা খোঁজ নেওয়া—যাদের কাছ থেকে আমেরিকার সাম্প্রতিক খবরাখবর পাওয়া যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওরা আবার চলে গেল।

দ্বীপের শাসনকর্তা ও তাঁর অনুচরমণ্ডলীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা নৌকা এল। নৌকায় আমাদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রীও ছিল, এক পিপে দুধ, একটা চন্দনকাঠের বিরাট টুকরো, ঝিনুক ইত্যাদি। বস্টন ছাড়ার পর এই আমরা দুধের স্বাদ পেলাম। বলা বাহুল্য দুধের সদগতি হতে দেরী হয়নি। চন্দন কাঠের একটা ছোট টুকরো আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। দ্বীপের মাঝখানে পাহাড়ের মাথায় প্রচুর চন্দনগাছ ছিল। স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আরো নানা জিনিস তখন যে কেন সংগ্রহ করে রাখিনি এখন অনুশোচনা হয়। চন্দনকাঠ ছাড়াও একটি ফুলের পাতা শুকিয়ে আমার কাউপারের পত্রাবলীর মধ্যে রেখেছিলাম। কিন্তু বাড়ী ফেরার পর অন্য একজনের অসাবধানতায় আমার তোরঙ্গটি খোয়া যায়। তার মধ্যে ঐসব জিনিস ছিল।

সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা আগে আমরা জলের পাত্রগুলি যথাস্থানে জমা করে রেখে যাত্রার আয়োজন করলাম। দ্বীপের দিক থেকে দমকা হাওয়া দক্ষিণের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে এলোমেলো ভাবে আসছিল, নোঙরের কাছি তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল আমাদের। ক্রমাগত গতি পরিবর্তন করে, একবার পাল তুলে, একবার নামিয়ে বহুকষ্টে সমুদ্রে পৌছান গেল। তারার আলোয় সেই রহস্যময় দ্বীপটি তার স্তব্ধ সৌন্দর্য নিয়ে পিছনে পড়ে রইল। তাকে নীরবেই বিদায়

জানালাম। এমন সুন্দর স্থান আমি আর কোথাও দেখিনি। এই দ্বীপটি সম্বন্ধে আমার এখনো কেমন একটা দুর্বলতা আছে। বহুদিন মাটি ছাড়ার পর ঐ প্রথম ডাঙ্গার দর্শন পাই, সেটাও ভাল লাগার একটা কারণ হতে পারে। ছোটবেলা থেকে রবিনসন ক্রুসো পড়ে নির্জন দ্বীপ সম্বন্ধে সকলেরই মনে মনে যেসব ধারণা গড়ে ওঠে তার সঙ্গে এই দ্বীপের অনেক মিল ছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে সবুজ সরস উপত্যকা ও পর্বতমালা নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে পরম রমণীয় এই দ্বীপ।

দ্বীপটির পরিস্থিতির কথা এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক। ভালপারাইসো থেকে তিন শ মাইল দূরে চিলির উপকূলে ৩৩° ৩০´ দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত এই দ্বীপ, লম্বায় পনেরো মাইল, প্রস্থে পাঁচ। উপসাগরের নাম কাম্বারল্যাণ্ড উপসাগর, লর্ড অ্যানসন এই নামকরণ করেন। তবে উপসাগর বলা নেহাতই বাহুল্য, আসলে এটা নৌকা ভিড়াবার মত সঙ্কীর্ণ প্রণালী বিশেষ। নোঙর ফেলার সবচেয়ে উপযোগী জায়গা বন্দরের পশ্চিম দিক, যেখানে আমরা ত্রিশ ফ্যাদম জলে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বন্দরটি উত্তর-উত্তর-পূর্ব বাতাসের মুখে পড়ে; উত্তর থেকে পূর্ব সবটাই খোলা তবে দক্ষিণ-পশ্চিমের হাওয়াই বিপজ্জনক। ঐদিকে পাহাড়গুলোর অবস্থান। দ্বীপের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বস্তু হল মাছ। প্রচুর মাছ আছে এখানে। আমাদের দুইজন মাল্লা অল্প সময়ের মধ্যে এত মাছ ধরে ফেলল, বেশ কদিন আমাদের আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এক জনের বাড়ী মার্বলহেড। সে বললে জীবনে কখনো এত মাছ একসঙ্গে দেখেনি। কড, সোনা মাছ, ছোট ছোট হলদে মাছ এবং আরো নানাজাতের মাছ, সবগুলির নামও জানি না।

সুস্বাদু পানীয় জলেরও অভাব নেই। পাহাড় থেকে ছোট ছোট নদী সমতলে নেমে এসেছে। যেদিকে বাড়ীগুলি আছে তার পাশ দিয়ে একটি নদী গেছে কাজেই জল সরবরাহ ব্যবস্থায় কোন অসুবিধা নেই। একটা কাঠের জলবাহক প্রণালী দিয়ে আমাদের জাহাজের কাছেই জলস্রোত নিয়ে আসা হয়েছিল। কয়েদীদের দিয়ে একটা বাঁধ তৈরী করানো হয়েছিল, পরে সেখানে নৌকা ভিড়াবার ঘাট তৈরী হবে শুনলাম, চিলি সরকার নাকি সেখানে মালপত্র লেনদেনের জন্য কিছু মাশুলও ধার্য করবেন।

নভেম্বর মাসে আমরা যখন ঐ দ্বীপে পদার্পণ করি তখন অরণ্যে বসন্তের

ছোঁয়া। গাছপালা সতেজ সুন্দর হয়ে আছে। অধিকাংশ গাছই সুগন্ধী। মেহেদী জাতীয় একরকম গাছ প্রচুর রয়েছে দেখলাম। শস্যক্ষেত্রে শালগম মূলো ইত্যাদি দেখলাম। ছাগল বিশেষ চোখে পড়ল না, তবে মেয়েরা মুরগী প্রতিপালন করে। কুকুরের সংখ্যা অজস্র। দ্বীপবাসী পুরুষেরা কোনই কাজ করে না। এ রকম অলস, অকর্মণ্য বেকার জাত সত্যই একটা দর্শনীয় বস্তু। রঙচঙে রেড ইণ্ডিয়ান সুলভ চাদর অভিজাত ভঙ্গিমায় কাঁধে ফেলা, লোকগুলি মোটের উপর আদব কায়দা দুরস্ত। তাদের ভাবভঙ্গী দেখলে কে বলবে তাদের জুতো শতচ্ছিন্ন পকেট কপর্দকহীন। কখনো কখনো ঝড় উঠলে বেশ মজার দৃশ্য দেখা যেত। দমকা হাওয়ায় পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের চালগুলি যখন নাড়া দেয় ঐ অলস প্রকৃতির লোকগুলিও তখন তৎপর হয়ে ওঠে। দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে যদি কেউ দেখে তার ঘরের পাতাগুলি ঠিক আছে তাহলে সে আর কষ্ট করে গাত্রোত্থান করে না। আর যাদের বাড়ীর চাল উড়ে যায় তারা স্পেনীয় ভাষায় গালমন্দ করতে করতে চাদর প্রভৃতি সামলে ছুটতে আরম্ভ করে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। অবশ্য এই কর্মতৎপরতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পলাতক চাল ধরে এনে আবার তারা চুপ করে বসে পড়ে—এই তাদের একমাত্র কাজ।

দ্বীপের ভিতর দিকে যারা গিয়েছিল তারা বেশ ভালোই বর্ণনা দিল। আমাদের ক্যাপ্টেন শাসনকর্তার সঙ্গে খচ্চরপৃষ্ঠে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ফেরার পর শুনলাম শাসনকর্তা তাঁকে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে কয়েকটি হরিণ নিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন, বেশ চড়া দামে কিনে নেবেন। দ্বীপে হরিণ একেবারেই নেই, তাই তাঁর বাসনা এখানে হরিণ আমদানি হোক।

দক্ষিণ-পশ্চিম হাওয়ায় আমরা ভেসে চললাম। মাঝরাতে পাহারায় ডেকে এসে দাঁড়ালাম। দেখি দক্ষিণের দিক চক্রবালে কয়েকটি তারা ঢাকা পড়ে গেছে। আমার অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতেও বুঝলাম ওটি সেই দ্বীপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাণিজ্য-বায়ুর মেঘ এসে চোখের আড়াল করে দিল।

পরদিন বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর। আমরা আবার কূলহীন প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়েছি। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পৌঁছবার আগে আর ডাঙা চোখে পড়েনি।

॥ ৮ ॥ দৈনন্দিন জীবন ॥

কেবল জল আর জল। জুয়ান ফার্ণাণ্ডিজ থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া অবধি আর কিছু চোখে পড়েনি। দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর অঞ্চলে পৌঁছলাম। সুন্দর বাতাস, তিন সপ্তাহ ধরে একই পালে জাহাজ চলল। কূলে পৌঁছবার আগে হাতে প্রচুর সময়। ক্যাপ্টেন এই সুযোগে জাহাজের সাজসজ্জা সুবিন্যস্ত করে ফেলা মনস্থ করলেন। আমাদের নাকি ডাঙ্গায় নামানো হবেনা, জাহাজেরই একটা ঘরে কেনা বেচা হবে। ছুতোরকে বলা হল জাহাজেরই একটা অংশ ঠিক করে দোকান ঘর তৈরী করতে। সে ঘরে মাল সাজিয়ে রাখা হবে এবং সওদাও চলবে। ইতিমধ্যে আমরা সব রশারশি বেঁধে ছেঁদে প্রস্তুত করে রাখলাম, প্রচুর দড়ি বোনা হল, খাটানো সব দড়িতে দেওয়া হল আলকাতরার প্রলেপ। এই শেষের কাজটির ভার পড়ল আমার আর ষ্টিমসনের উপর। এরকম কাজ করার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি। অন্য মাল্লাদের আরো নানা কাজ। আমার সঙ্গে হেনরী মেলাস নামে আরেকটি ছেলে কাজে ঢুকেছিল, সে বেচারা পায়ে বাত হয়ে শয্যাশায়ী। স্যামের বয়স নেহাত কম, তাছাড়া এখন ওকে বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতে হত হালে। অগত্যা আলকাতরা মাখানোর দায়িত্ব এসে পড়ল আমার আর ষ্টিমসনের স্কন্ধে। ময়লা জামা পরে আলকাতরার বালতি ও শনের গোছা নিয়ে আমরা মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠে গেলাম, একদিকে আমি, অন্যদিকে ষ্টিমসন। সাধারণতঃ জাহাজের সব দড়িতে আলকাতরা মাখানোর কাজটা হয় ছমাসে একবার। আমাদের জাহাজে পরেও এটা বার কয়েক করা হয়েছে—তবে সব মাল্লারা একসঙ্গে হাত লাগালে একদিনের বেশী লাগার কথা নয়। কিন্তু আমরা দুজনেই আনাড়ি, কাজেই আমাদের বেশ কয়েকদিন লেগে গেল। প্রথমে মাস্তুলের আগা থেকে আরম্ভ করে নীচের দিকে দড়াদড়ি, মাস্তুল দণ্ডের পিছনের দিক, পালদণ্ড ইত্যাদি রঙ করতে করতে নেমে আসতে হয়। মাস্তুলের আগা থেকে পাটাতন পর্যন্ত বিস্তৃত দড়িটি রঙ করা সবচেয়ে বিপজ্জনক। পাল নামাবার দড়িটি মাস্তুলের ডগায় তুলে

গলুই থেকে তোলা আরেকটি দড়ির সাহায্যে বালতি ও শনের গোছা সমেত লোকটিকে উপরে উঠানো হয়, দড়ির অপর প্রান্ত ডেকে অন্য একজনের হাতে। লোকটিকে ধীরে ধীরে নামানো হতে থাকে, সে সেই ঝুলন্ত অবস্থায় অতি সাবধানে রঙ করে, কেননা ডেকে এক ফোঁটা রঙ পড়লে মেটের কাছে যৎপরোনাস্তি বকুনি খেতে হবে। দড়িটি ছেড়ে গেলে বা ছিঁড়ে গেলেই মৃত্যু অবধারিত। তবে এসব চিন্তায় নাবিকরা নিজেদের ভারাক্রান্ত করে না, তারা নিজের কাজটি ঠিকভাবে করতে ব্যস্ত। আমি প্রাণ হাতে করে উপরের যাবতীয় পাল ছড়াবার দণ্ডগুলিতে রঙ লাগানো শেষ করলাম।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই নোংরা কাজ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অবশেষে শনিবার এল। তারমধ্যে আমরা ডেক ধুয়ে মুছে রঙের দাগ তুলে ফেলে নিজেরাও পরিষ্কার হয়ে ভদ্রবেশ পরিধান করলাম। শনিবার রাত নির্মল আনন্দে কাটল। পরদিন রবিবার। এক হর্ণ অন্তরীপ পার হবার সময় ছাড়া আমাদের সব রবিবার দিনগুলি ভালই গেছে। পরদিন থেকে জাহাজের আগাপাস্তলা রঙ করা শুরু হল। প্রত্যেক নাবিককেই এতে অংশ গ্রহণ করতে হয়। সেজন্যে যেই জাহাজে চাকরি করেছে সেই রঙ লাগানো সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে। জাহাজের খোলের বাইরের অংশ রঙ করার সময় দড়ি দিয়ে ভারা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, রঙ ও বুরুশ নিয়ে প্রায় জলে পা ডুবিয়ে বসে কাজ করতে হয়। যে দিন বাতাস থাকে না সমুদ্রও শান্ত সেদিনই এই কাজটি করার পক্ষে প্রশস্ত। মনে আছে একদিন বিকেলে জাহাজ মন্থরগতি চলেছে, আমি পাশের দিকে ভারায় বসে রঙ করছি, এমন সময় শার্কের আগে আগে যে মাছ যায় তার একটি এসে পাশে পাশে সাঁতার কাটতে লাগল। ক্যাপ্টেন রেলিঙে ভর দিয়ে মাছটি লক্ষ্য করছিলেন। আমি যেমন নিজের কাজ করছিলাম তেমনি করে গেলাম।

শুক্রবার, ১৯শে ডিসেম্বর। রঙ লাগানো যখন পুরোদমে চলেছে সেই সময় আমরা দ্বিতীয়বার বিষুবরেখা পার হলাম। ডিসেম্বর মাস, অথচ ঘোর গ্রীষ্ম। ঋতুগুলি উল্টো হয়ে যাওয়াটা কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে ডিসেম্বর। বড়দিন। অবশ্য আমাদের সে উপলক্ষে ছুটি নেই। ব্যাতিক্রম হিসাবে খাবার সময় প্লাম দেওয়া মিষ্টি দেওয়া হল, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বরাদ্দ গুড় দেওয়া হয়নি বলে আমরা স্টুয়ার্ডের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করলাম। স্টুয়ার্ড প্লাম দিয়ে মনে করেছিল এতেই

গুড়ের কাজ চলবে, কিন্তু আমরা কেন অত সহজে পাওনা থেকে বঞ্চিত হই ?

বহুদিন হয়ে গেল আমরা সমুদ্রপথে বেরিয়েছি, পরস্পরের মুখ দেখে দেখে সকলেই বিরক্ত, সকলেরই মেজাজ ক্রমশঃ রুক্ষ হয়ে উঠছে। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধছে। খাবার সামগ্রীও ফুরিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। ক্যাপ্টেন আমাদের চাল বন্ধ করে শুধুমাত্র মাংসের ব্যবস্থা করলেন। কেবল প্রতি রবিবারে পায়েস জাতীয় একটা জিনিস, তাও অতি সামান্য পরিমাণে। এতেও অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কে কাকে কখন কি বলেছে সেই নিয়ে মন কষাকষি, নানারকম গুজব ইত্যাদি ছড়াতে লাগল। এত সব তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে আমরা কান দিতে আরম্ভ করলাম যে অন্য কোন অবস্থায় সেটা নেহাতই হাস্যকর মনে হবে। সব কিছুই মন্দ, সবেতেই আমাদের আপত্তি। পালের মুখ ঠিক করতে বলা হলে ধারণা হয় এ কেবল মাল্লাদের অনর্থক উত্যক্ত করার জন্যে।

এই অবস্থায় একদিন ষ্টিমসন আর আমি আমাদের শোবার জায়গা স্থানান্তর করার জন্য ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলাম। আমরা এতদিন গুদামঘরে থাকতাম, এবার অন্য মাল্লাদের সঙ্গে স্থান পেলাম। এতে আমাদের আনন্দ দেখে কে। গুদাম ঘরে স্টুয়ার্ড ও অন্য কর্মচারীদের সামনে আমাদের ইচ্ছামত হাসবার, কথা কইবার, আমোদপ্রমোদ করার স্বাধীনতা ছিল না। পাটাতনের নীচে মাল্লাদের থাকবার অংশে যদি যাওয়া যায় তবে মনে হবে এতদিনে সত্যকার নাবিক হলাম। যথেচ্ছ নাচগান হাসি ঠাট্টা করা ছাড়াও অন্য মাল্লাদের মুখে সমুদ্র ও নৌবিদ্যা সংক্রান্ত গল্প শুনে শুনে অনেক কিছু শিখে ফেলা যায়। আরেকটা প্রয়োজনীয় কাজ ওখান থেকে শিখি—সেটা হল জামাকাপড় রিপু করা। এটা ভবিষ্যতে আমাকে অনেক কাজ দিয়েছিল। সুতরাং মাল্লাদের এলাকার এত সব সুখ ছেড়ে আমার আর কোথাও যাবার ইচ্ছে ছিল না, এমন কি ফেরার পথে হর্ণ অন্তরীপে ভয়ানক দুর্যোগে যখন পাটাতনের ভিতর দিয়ে জল চুইছিল তখনও নয়।

ইতিমধ্যে একটা সমস্যার উদ্ভব হল। আমরা সকলেই এক জায়গায় চলে আসার ফলে রুটির বরাদ্দ এক করে দেওয়া হল—কিন্তু এতে দেখা গেল রুটি পরিমাণে প্রায় আড়াই সের কমে যাচ্ছে। সেই নিয়ে এক মহা হুলস্থূল।

ক্যাপ্টেন তার কারণ জানানো প্রয়োজন মনে করলেন না, তখন আমরাই দল বেঁধে ক্যাপ্টেনের কাছে আর্জি পেশ করতে গেলাম। জন নামে সুইডেনের মাল্লাটি বয়স ও অভিজ্ঞতায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপক্ক বলে তাকেই দলের নেতৃত্ব করতে দেওয়া হল। পরের ঘটনার কথা মনে পড়লে এখন হাসি সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন তাঁর রাজকীয় মর্যাদায় উপরের ডেকে পায়চারি করছেন—আমরা সেখানে সদলবলে উপস্থিত হলাম। আমাদের দেখেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখের ভাবে মনে হল ভস্মীভূত করে দেবেন। "কিসের জন্যে এসেছ এখানে—আস্পর্দ্ধা দেখ একবার" এই বলে সম্ভাষণ আরম্ভ হল। আমরা ভয়ে ভক্তিতে আমাদের বক্তব্য যথাসম্ভব গুছিয়ে জানালাম। শুনে ক্যাপ্টেন রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন, বলতে লাগলেন যত সব কুঁড়ে আর অকর্মার ধাড়ী, খেয়ে খেয়ে মোটাচ্ছ কেবল, আর মাথায় যত কুবুদ্ধি ভর করছে। আমরাও গরম হয়ে মুখে মুখে উত্তর করলাম। ফলে ব্যাপারটা আরো গুরুতর আকার ধারণ করল। দাঁত কিড়মিড় করে, ঘুঁষি পাকিয়ে, মাটিতে পা ঠুকে আমাদের যৎপরোনাস্তি গালাগালি করে ক্যাপ্টেন বললেন "দূর হও সব আমার সামনে থেকে, সব দূর হও। তোমাদের উচিত শিক্ষা দেব এবার। আমার নাম ফ্র্যাঙ্ক টমসন, বুঝলে। আমি সোজা লোক নই, খুবই প্যাঁচালো, চেনোনি এখনো আমাকে—আসল রূপটি এখনো দেখনি—তাই অত তড়বড়ানি—আচ্ছা দেখাচ্ছি এবার!" ক্যাপ্টেনের ভাষণের শেষের দিকটা আমাদের মনে বেশ গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। পরে ওঁর নামই হয়ে গিয়েছিল প্যাঁচালো টমসন। যাই হোক সমস্যার সমাধান হওয়ার ঐখানেই ইতি। পরে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়। ক্যাপ্টেনের রাগ কমলে প্রধান মেট ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলেন। তখন আমাদের উপর আর এক দফা চোটপাট শুরু হল। যত দোষ নাকি আমাদেরই। আমরাই ওঁকে ঠিক করে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। আমাদের যে কথা বলার সুযোগই দেওয়া হয়নি সেকথা আমরা বলতে চাইলাম। কিন্তু বলাই বাহুল্য এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করা হল না। এই নিয়ে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় তার জের কিন্তু বহুদিন ধরে ছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে সুন্দর আবহাওয়ায় এগিয়ে চললাম আমরা। সত্যেই প্রশান্ত এই সমুদ্র। দক্ষিণের অন্তরীপ, চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরের

ছাড়া এখানে ঝড় হয় অল্প, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অয়নান্ত রেখা দুটির মধ্যে সূর্যালোক তত প্রখর নয়। মৃদু কুয়াশাভাব থাকার জন্য রোদের তেজ অনেকটা কম। অনুকূল বায়ু ভরে আমরা এগিয়ে চললাম, উত্তর পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর সঙ্গে। পশ্চিমদিকে এগিয়ে যখন আমরা পয়েন্ট কনাশপশানের অক্ষাংশে পৌঁছলাম তখনো তট থেকে কয়েক শত মাইল পশ্চিমে। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পূবে করা হল, কয়েকদিন সেদিকে চললাম। রাত হলেই জাহাজ থামিয়ে ফেলা হচ্ছিল পাছে কোন অজানা কূলে গিয়ে পৌঁছই যেখানে আলোকস্তম্ভ ইত্যাদি কিছুই নেই।

মঙ্গলবার, ১৩ই জানুয়ারী ১৮৩৫। ৩৪°৩২´ অক্ষাংশ ১২০°৩০´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে আমরা ডাঙা পেলাম। আমাদের গন্তব্য সেন্ট বারবারা বন্দর, সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে। আরো একদিন একরাত কূল ধরে ভেসে চললাম।

১৪ই জানুয়ারী। সকালে বন্দরের উপসাগরে পৌঁছলাম। বস্টন ছাড়ার পর আজ হল একশো পঞ্চাশ দিন।

॥ ৯ ॥ সাণ্টা বারবারা ॥

মেক্সিকোর সমস্ত পশ্চিম উপকূল জুড়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রসার। অবস্থান ২২° থেকে ৩৮° উত্তর অক্ষাংশ। উত্তরে সানফ্রানসিস্কো উপসাগর, দক্ষিণে ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগর। ক্যালিফোর্ণিয়া উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই প্রদেশে বিভক্ত। সান ডিয়াগো বন্দর ও টোডোস সাণ্টোস উপসাগরের মাঝখান দিয়ে এই সীমারেখা প্রসারিত। নীচে পুরানো ক্যালিফোর্ণিয়া—ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগর ও ৩২° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপরে নূতন ক্যালিফোর্ণিয়া, এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশের বন্দর সান ডিয়াগো ৩০°৩৯´ অক্ষাংশে, আর সর্বোত্তরে ৩৭°৫৮´ অক্ষাংশে সানফ্রানসিস্কো, সানফ্রানসিস্কো উপসাগরের কূলে। শুনেছি ফ্রানসিস্কীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের নামানুসারে এই নাম হয়। নূতন ক্যালিফোর্ণিয়ার রাজধানী মণ্টারি, এখানেই সমস্ত মালজাহাজ আগে এসে জিনিসপত্র নামাতে বাধ্য। মুখ্যতঃ এই উপকূলে

ব্যবসা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই আমাদের উচিত ছিল প্রথমে মন্টারিতে যাওয়া কিন্তু যে সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা কাজ করি তাদের দালালের আসার কথা সান্টা বারবারাতে, সেখানে আমাদের মালের ফরমায়েশও দেওয়া হবে। তাই আমরা মন্টারিতে না গিয়ে সান্টা বারবারাতে গিয়ে সেই দালালের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

সান্টা বারবারার উপসাগরকে সচরাচর খাল বলে ডাকা হয়। উপকূলভাগ এখানে অর্ধচন্দ্রের আকারে বেঁকে আছে, অপর পারে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে তিনটি দ্বীপ, ফলে এই উপসাগর স্থানে স্থানে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। মহাসাগরের আলোড়ন ও বাণিজ্য বায়ুর বেগ এখানে সমান ভাবেই অনুভূত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে দমকা হাওয়ায় কূলে এমন স্রোত আছড়ায় যে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে এই সমুদ্রোপকূল বেড়াবার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

বর্ষাকালে, অর্থাৎ নভেম্বর থেকে এপ্রিল এই অঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুর দৌরাত্ম্য বড় বেশী। যে সব বন্দর এই হাওয়ার আওতায় পড়ে সেখানে সমস্ত নোঙর ফেলা জাহাজগুলিকে তট থেকে তিন মাইল দূরে কাছি বেঁধে প্রস্তুত থাকতে হয় যাতে প্রয়োজন হলেই নোঙর তুলে ভেসে পড়া যায়। সানফ্রানসিস্কো, মন্টারি ও সান ডিয়াগো এই বায়ুর প্রভাব মুক্ত, সুতরাং বন্দরগুলিও নিরাপদ।

আমরা জানুয়ারী মাসে যখন পৌছলাম তখন ঝড়ের কাল। উপকূল থেকে তিন মাইল দূরে এগারো ফ্যাদম জলে নোঙর ফেলা হল। কাছিতে বয়া বেঁধে, পাল থেকে কোণ বাঁধা দড়ি খুলে ফেললাম আমরা। ক্যাপ্টেন নৌকা করে কূলে গেলেন, তাঁকে পৌঁছে নৌকা ফিরে এল। সন্ধ্যার সময় আবার তাঁকে আনতে যাবার কথা বলে পাঠালেন। প্রথম বার নৌকায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। রাত্রে আরেকবার নৌকা যাবে শুনে উল্লসিত হলাম। এতদিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে জল দেখে দেখে এমন অবস্থা হয়েছিল যে আর দু-এক ঘণ্টার প্রতীক্ষাও যেন অসহ্য মনে হচ্ছিল। যাই হোক আমরা প্রয়োজনীয় কাজে লেগে গেলাম। এই প্রথম ক্যাপ্টেন অনুপস্থিত, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম আমরা। এই সুযোগে নতুন দেশটির দিকে চেয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম যে কিরকম জায়গায় আমাদের দু-এক বছর কাটাতে হবে।

যদিও তখন ঘোর শীতকাল, তবু দিনের বেলায় এত গরম যে আমাদের খড়ের টুপি ও হাল্কা জামা পরে থাকতে হচ্ছিল। শুনলাম এখানে তাপমান যন্ত্রের পারদ কখনও হিমাঙ্কের নীচে নামে না। শীতে গ্রীষ্মে আবহাওয়ার বিশেষ তারতম্য নেই, অবশ্য বৃষ্টি বাদলের সময় মোটা কাপড়ের দরকার হয়, তাও কালে ভদ্রে।

কোথাও হাওয়া নেই, উপসাগরের জল পুকুরের মত স্থির। কিন্তু যারা নৌকা নিয়ে কূলে গিয়েছিল তারা সমুদ্রের আর এক রূপের বর্ণনা দিল। তারা বললে উপকূল জুড়ে সগর্জনে ঢেউ আছড়াচ্ছে। বন্দরে লম্বা দ্রুতগামী দু মাস্তুল ওয়ালা একটি জাহাজ ছিল, চৌকো পাল দণ্ড, হেলে পড়া পাল। জাহাজটির নাম আয়াকুচো। পেরুর যে রণক্ষেত্রে ওদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয় তার নামানুসারে। জাহাজটিতে কিন্তু ইংরাজ পতাকা উড়তে দেখা গেল। উইলসন নামে একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী জাহাজের অধিকর্তা। তিনি বর্তমানে ক্যালো, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যালিফোর্ণিয়ার মধ্যে বাণিজ্যে রত। মাল্লারা প্রায় সকলেই স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের বাসিন্দা। এই জাহাজটি ছাড়া উপসাগরে দ্রষ্টব্য বস্তু বলতে আর কিছু ছিল না। অর্ধচন্দ্রাকার উপকূলের কোণটি দুইভাগে ভাগ হয়ে সরু হয়ে এসেছে। পশ্চিমে নীচু বালিয়াড়ি, ঝড় উঠলে সেদিকটা জাহাজগুলি এড়িয়ে চলে, অপর দিক উঁচু ও অরণ্যময়। এখানে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের আবাস আছে, তাঁদের নাম থেকেই এই জায়গার নাম হয়েছে সান্টা বুয়েনাভেন্টুরা। নোঙর স্থানের ঠিক উল্টোদিকে সেই সম্প্রদায়ের মঠ। সমতলের উপর সান্টা বারবারা শহর। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা, সমতল সমুদ্রতট থেকে উঁচু, সবুজ ঘাসে ঢাকা। তবে গাছ একটিও চোখে পড়ল না। একটি চূড়াওয়ালা মন্দির ঘিরে মঠের বাড়ীগুলি তৈরী। মন্দিরে ঘন্টাঘর, তাতে পাঁচটি ঘন্টা। বাড়ীগুলির উপর চুনবালির আস্তর, দূর থেকে বেশ চেনা যায়, ঐ চিহ্ন দেখেই জাহাজগুলি নোঙর ফেলে। সমুদ্রতট থেকে আধমাইলের মধ্যে শহরটি, ছোট ছোট একতলা বাড়ীর সমষ্টি, বাড়ীগুলি পোড়ামাটির তৈরী, কোন কোনটি চুনকাম করা, চালে লাল টালি। মনে হয় প্রায় শ'খানেক বাড়ী আছে। দুর্গটি একই উপাদানে তৈরী হলেও বেশ মজবুত। শহরের অবস্থান চমৎকার, সামনে উপসাগর; পিছনে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ে গাছ থাকলে আরো মনোরম হত। একজন শহরবাসীর কাছে শুনলাম প্রায় বারো বছর আগে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত গাছ পুড়ে

ছাই হয়ে যায়—সে নাকি এক অদ্ভুত দৃশ্য। উপত্যকার বাতাস এমন গরম হয়ে গিয়েছিল যে সকলকে ঘরবাড়ী ছেড়ে কয়েক দিনের জন্য সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

সূর্যাস্তের একটু আগে মেট কয়েকজন মাল্লাকে নৌকা নিয়ে তীরে যেতে আদেশ করলেন। আমিও চললাম তাদের সঙ্গে। ইংরাজ জাহাজটির গলুই-এর নীচে দিয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু কূলে পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে সন্ধ্যার আলোআঁধারিতে আমাদের প্রথম অবতরণের অভিজ্ঞতা আমার বহুদিন মনে থাকবে। রাত্রের ভিজে হাওয়া, নীচে প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গমালা শুভ্র ফেনপুঞ্জে সশব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। আমরা বহুক্ষণ ঢেউএর ওপারে অপেক্ষা করলাম। সুবিধামত সময় উপস্থিত হলেই কূলের দিকে ধাওয়া করব। এমন সময় আয়াকুচো থেকে একটি নৌকা এসে আমাদের পাশে উপস্থিত হল। স্ট্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী মাল্লারা বিজাতীয় ভাষায় কি সব বলে কোলাহল করছিল। ওরা আমাদের দেখে স্পষ্টই বুঝল যে এই ধরনের তরঙ্গময় কূলে নৌকা চালাবার বিশেষ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল, আমরা কি করে যাই দেখবে বলে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিলেন দ্বিতীয় মেট, তিনিও চাতুরীতে কিছু কম যান না, তিনিও কিছুতেই আগে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত আমরা আগে না যেতে বদ্ধপরিকর বুঝতে পেরে ওরা একটা বিকট চিৎকার করে নিজেরাই এগিয়ে গেল। একটা বিরাট ঢেউ এসে আমাদের গলুই একেবারে সোজা করে তুলে ধরল, পরক্ষণেই দুই ঢেউএর মাঝখানের গর্তে পড়ে গেল আমাদের নৌকা। ওরা দু-চার বার টান মেরেই ঢেউএর মাথায় চড়ে তীরবেগে এগিয়ে গেল, দাঁড়গুলো যতদূরে সম্ভব ছুঁড়ে ফেলে দিল। নৌকা মাটিতে লাগা মাত্র সকলে লাফিয়ে পড়ে নৌকার পাশটা ধরে বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। আমরা এই দেখে ব্যাপারটা বুঝলাম। নৌকার গলুই সমুদ্রের দিকে সোজা রেখে—কেননা পাশ দিয়ে ঢেউ এলে নৌকা উল্টে যাবার সম্ভাবনা, আমরা ঢেউএর মাথায় উঠে তীরবেগে চললাম। দাঁড় ফেলে দিয়ে আমরাও নৌকার দুপাশ চেপে বসেছিলাম যাতে বালি অবধি পৌঁছলেই সঙ্গে সঙ্গে ধরে দৌড়তে পারি। অবশেষে এই উপায়ে আমরা তটে পৌঁছলাম। দাঁড়গুলো বালি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমরা নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, ক্যাপ্টেন কতক্ষণে ফেরেন সেই আশায়।

ক্যাপ্টেনের খুব শীঘ্র আসার লক্ষণ নেই দেখে আমরা একজনকে নৌকা পাহারায় দাঁড় করিয়ে রেখে একটু বেড়াতে বার হলাম। সমুদ্রোপকূল এখানে মাইল খানেক লম্বা, বালি বেশ মিহি, অবশ্য শেষের দিকে পাথুরে জমিও আছে। আমরা যেখানে নৌকা ভিড়িয়েছিলাম সেই জায়গাটি সবচেয়ে সুন্দর। জোয়ারের দাগ থেকে উঁচু মাটির দূরত্ব প্রায় বিশ গজ। সে জায়গাটা এত কঠিন যে অনায়াসে ঘোড়া ছোটান যায়। অন্ধকার সমুদ্রের বুকে দূরে দুটি জাহাজের অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রের ঢেউগুলি ক্রমে বড় হতে হতে কূলের কাছে এসে কুঁকড়ে ঝুঁকে সাদা ফেনায় ভেঙ্গে পড়ছে। ভাঙ্গবার সময় পড়ছে একের পর এক, যেমন তাসের ঘর একটির উপর একটি পড়ে অনেকটা সেই রকম। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী মাল্লারা ততক্ষণে কাজে নেমে পড়েছে। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে আবার জলে নিয়ে গিয়ে কাঁচা চামড়া আর চর্বি বোঝাই করতে আরম্ভ করেছে ওরা। আমাদেরও শীঘ্রই এই কাজে লাগতে হবে তাই কৌতূহলী হয়ে ওদের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। ওদের মধ্যে দুজন পাতলুন গুটিয়ে নৌকার গলুই ধরে দাঁড়িয়ে রইল, সেখানে ঢেউএর ধাক্কায় দাঁড়ানো বেশ কষ্টকর। বাকীরা কূলে দৌড়াদৌড়ি করে সেখানে জমা করা শুকনো শক্ত মোষের চামড়া একটি দুটি করে মাথায় করে নিয়ে নৌকায় পৌঁছে দিয়ে আসছিল। মাথায় করার উদ্দেশ্য যাতে চামড়ায় জল না লাগে। ওদের মাথায় অবশ্য উলের টুপি ছিল। আমাদের মধ্যে একজন তার বন্ধুকে বললে "দেখো বিল, আমাদের কপালেও এই আছে।" দ্বিতীয় মেট আমাকে পরিহাস করে বললেন "কি হে ডানা, হারভার্ড কলেজের চেয়ে একটু অন্য রকম লাগছে, নয় কি? একেই বলে মাথার কাজ, কি বল?" সত্য কথা বলতে কি গতিক দেখে আমি মোটেই ভরসা পাচ্ছিলাম না।

সব চামড়া তোলা হয়ে গেলে কানাকারা* এবার চর্বিভর্তি থলেগুলি জনে মিলে মাথায় করে নৌকায় নিয়ে আসতে লাগল। তারপর নৌকা আবার চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পালা। এই ব্যাপারে আমরা ওদের কাছে অনেক কিছু শিখলাম। যে হাল চালাবে সে গলুইএর কাছে দাঁড় ধরে দাঁড়াল, অন্য দুটি দাঁড় বাগিয়ে ধরে দুজন মাল্লা বসে গেল, নৌকা ভাসলেই দাঁড় বাইতে আরম্ভ করে দেবে। আগা গলুইএর কাছে দাঁড়িয়ে দুজন

* কানাকা—স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের অধিবাসী।

নৌকার পাশ ধরে দৌড়তে লাগল, গলা জলে পেঁছেই তারা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়, সর্বশরীর দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। অন্যরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ঢেউএর সঙ্গে নৌকা তীরে ফেরত চলে এল। আবার লোক দুটি লাফ দিয়ে নেমে পড়ল, নানারকম অদ্ভুত ধ্বনি সহকারে নৌকা নিয়ে আবার ভেসে পড়ল, এবারে আর ফিরে আসতে হল না। আমরা অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। ঢেউ পার হয়ে ওরা নিজেদের জাহাজের দিকে চলে গেল।

অন্ধকার ততক্ষণে গাঢ় হয়ে এসেছে, পায়ের নীচে ঠাণ্ডা বালি, খালি পায়ে শীত শীত করছে, জলাভূমিতে ব্যাঙের ডাক, বহুদূরে কোথায় একটা পেঁচা বিষণ্ণ গম্ভীর সুরে ডাক দিয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন তখনো আসছেন না দেখে আমরা একটু চিন্তিত হলাম। হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এগিয়ে এল। একটি লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কি যেন বলল, কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে গেল আবার। লোকটির চেহারা রেড ইণ্ডিয়ানদের মত তামাটে, গায়ে উড়ুনি জাতীয় পোশাক, পায়ে চামড়ার পট্টি তাতে একটি ছোরা গোঁজা, মাথায় মস্ত স্পেনীয় টুপি। "এই নিয়ে সাতটি বড় বড় শহর দেখলাম। কিন্তু এটি তো মোটেই ভদ্রলোকের জায়গা বলে মনে হচ্ছে না" মন্তব্য করলে বিল ব্রাউন। জন তাকে বাধা দিয়ে বললে "এখনো তো কিছুই দেখনি।" আমরা এইসব বলাবলি করছি এমন সময় ক্যাপ্টেন উপস্থিত হলেন। নৌকা জলে নামান হল। এই অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ক্যাপ্টেনের যথেষ্টই ছিল, কাজেই উনি হালের দাঁড় হাতে নিলেন। আমি বয়সে ছোট বলে গলুইএর কাছে দাঁড়াবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। যখন নৌকায় উঠলাম তখন একেবারে ভিজে জবজবে। যদিও উঁচু ঢেউএ আমাদের একবার আকাশে তুলে পরক্ষণেই নীচে ফেলছিল, তা সত্ত্বেও আমরা বেশ নির্বিবাদে বাইরের সমুদ্রে পৌঁছলাম, সেখানে কূলের এই জলোচ্ছ্বাস নেই, তবে মৃদু আলোড়ন আছে। আমরা একটা আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। আলোটিই আমাদের জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে লাগানো কাঠের খণ্ডে ঝোলানো ছিল।

জাহাজে নৌকা উঠিয়ে, নীচে নেমে আমরা ভিজে কাপড় ছাড়লাম। তারপর খাওয়া। খাওয়া শেষ হলে নাবিকরা ধূমপান করতে লাগল, আমরা তীরের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলাম। তারপর আরম্ভ হল এই দেশের লোকজন সম্বন্ধে আলোচনা, চামড়া বওয়ার কাজ, আমাদের কতদিন থাকতে

হতে পারে ইত্যাদি। শেষে আটটার ঘণ্টায় নোঙর পাহারার ডাক পড়ল। দুঘণ্টা করে পালা পড়েছিল, একসঙ্গে দুজন থাকবে পাহারায়। আটটা অবধি দ্বিতীয় মেট ডেকে রইলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাতাসের জন্য সতর্ক থাকতে বলা হল সকলকে। সমুদ্রে যেমন প্রতি আধঘণ্টায় ঘণ্টা বাজান হত এখানেও তেমন করার নির্দেশ দেওয়া হল। আমি ডানদিকে ও সুইডেনবাসী জন বাঁদিকে বারোটা থেকে দুটো অবধি পাহারায় রইলাম। ভোর হতেই নিত্যকার ধোয়া-মোছা আরম্ভ হয়ে গেল। আটটায় প্রাতরাশ। বেলা হতে আয়াকুচো থেকে একটি নৌকা এসে আমাদের কিছু মাংস উপহার দিয়ে গেল। বহুদিন পরে আমরা টাটকা মাংসের স্বাদ পেলাম। মেট জানালেন এখানে তাজা মাংস সস্তা, সুতরাং যতদিন এখানে থাকা হচ্ছে আমরা এই মাংসই পাব। খাবার সময় শোনা গেল জাহাজের পাল দেখা গেছে। আমরা উপরে এসে দেখি দুটি জাহাজ। একটি এসেছে জেনোয়া থেকে নানারকম মাল নিয়ে এই উপকূলে সওদা করতে। জাহাজটি আবার চলে গেল সানফ্রানসিস্কোর দিকে। অপর জাহাজটির নাম লরিয়োট। মাল্লারা প্রায় সকলেই স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের, তবে একজন অল্পসল্প ইংরাজী জানত। তার কাছে খবর পাওয়া গেল তাদের ক্যাপ্টেনের নাম 'নাঙ্গ'। ওরা এসেছে ওয়াহু থেকে চামড়া ও চটির ব্যবসা করতে। আয়াকুচো, লরিয়োট এবং পরে আরো যে কয়টি জাহাজ দেখি প্রত্যেকেরই উচ্চ কর্মচারীরা হয় ইংরাজ অথবা আমেরিকান। দু-এক জন নাবিক দড়াদড়ির কাজে থাকে—আর বাকি সকলেই কানাকা। এরা নৌকা বাইবার কাজে খুব তৎপর।

খাওয়ার পর তিন ক্যাপ্টেন আবার কূলে নামলেন। ফিরলেন রাত্রে। বন্দরে থাকার সময় জাহাজের ভার প্রধান মেটের উপর ছেড়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন অধিকাংশ সময় ডাঙাতেই কাটান। আমরা এতে খুশীই হলাম। তাছাড়া আমাদের মেটও ছিলেন বেশ সদাশয় প্রকৃতির। কিছুদিন মহা আনন্দে কাটল, কিন্তু শেষ রক্ষা হতে পারেনি। ক্যাপ্টেন যেখানে অত্যন্ত কঠিন ও বদমেজাজী এবং মেট ঠিক তার বিপরীত সেখানে দুজনের মধ্যে খিটিমিটি লাগতে বাধ্য। আমাদের জাহাজেও এই নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল। আমরা এইরকমই আশঙ্কা করেছিলাম। মাল্লাদের সামনেই ক্যাপ্টেন কয়েকবার মেটের কাজ করা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কানাঘুষায় শোনা গেল দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য চলেছে। এই অবস্থায় হয় মাল্লাদেরই বিপদ। প্রধান

মেটকে জব্দ করার জন্য ক্যাপ্টেন পদে পদে তার কাজে বাধা দিতে থাকেন। উলুখাগড়ার প্রাণ যায় লাভের মধ্যে হয় এই।

॥ ১০ ॥ দক্ষিণে ঝড় ॥

সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আমাদের সতর্ক থাকতে বলা হল। আকাশের দক্ষিণ ও পূর্ব কোণের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়তে পারে জেনে আমরা তাড়াতাড়ি শুতে গেলাম। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখি মাল্লাদের একজন উপর থেকে পাহারা সেরে এসে আলো জ্বালাচ্ছে। সে বললে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বাতাস আরম্ভ হয়েছে, সমুদ্রও দুলছে বেশ। সে এইমাত্র ক্যাপ্টেনকে খবর দিয়ে নীচে আসছে। এই বলে সে জামাকাপড় সুদ্ধ তার তক্তার উপর শুয়ে পড়ল। ডাক এলেই এখনি আবার উঠতে হবে তাই আর পোশাক ছাড়বার কষ্ট করলে না। আমি শুয়ে শুয়ে বেশ অনুভব করলাম জাহাজের নোঙরের কাছে টান পড়ছে, কাছিগুলো আছড়াচ্ছে জোরে জোরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় তিনবার ধাক্কা, হাঁক পড়ল উঠে পড়, পাল তুলতে হবে। আমরা লাফিয়ে উঠে জামাকাপড় পরতে শুরু করেছি ইতিমধ্যে মেট আবার হাঁক দিয়ে জানালেন শীঘ্র কর, নইলে নোঙর ছিঁড়বে। চক্ষের নিমেষে আমরা ডেকে উপস্থিত হলাম। একজন মাল্লাকে দেখেই ক্যাপ্টেন বড় পালটা ওঠাতে আদেশ করলেন। দড়ি নিয়ে টানাটানি করতে করতে দেখি আয়াকুচোর মাল্লারা মাস্তলের দড়ি টানতে টানতে গান জুড়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন উইলসন বহুদিনের পুরোনো নাবিক, আবহাওয়ার ধরন অতি সহজেই বুঝতে পারেন—সম্ভবত ওদের দেখেই আমাদের ক্যাপ্টেন এত তৎপর হয়ে উঠেছেন। আমরা একজন করে মাস্তলের উপরে উঠলাম। অন্যেরা নীচে মাস্তলের দড়ির কাছে দাঁড়াল, দড়ি লাগাতে লাগাতে দেখা গেল আয়াকুচো আমাদের নোঙরের সঙ্গে তেরছা ভাবে হাওয়ার দিকে মুখ করে শিকারী কুকুরের মত কান খাড়া করে, তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে। মনে হল একটি পাখী যেন ভয় পেয়ে ডানা মেলে দিয়েছে। অপূর্ব দৃশ্য। আমাদের পালে দড়ি পরানো, মাস্তল সংলগ্ন পালদণ্ড টেনে ধরা, সামনের

মাস্তলের দড়ির উপর পাল টাঙ্গানো, বয়াগুলি সরিয়ে আনা যদি সমাপন হলে আমরা নোঙরের কাছি তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন "সব ঠিক তো?" মেট সম্মতি জানালে। গলুইএর ফুটোর মধ্যে দিয়ে নোঙরের কাছি টেনে তোলা হতে লাগল, কপিকলে দড়ি উঠতে লাগল, পালে ঠেকে হাওয়ার বেগ লাগল কাছিতে, পরমুহূর্তেই আমরা ভেসে পড়লাম। বেশ জায়গা রেখে জাহাজ এগিয়ে গেল, যাতে নোঙর করার জায়গায় আবার ধাক্কা না খেতে হয়। ক্যাপ্টেন মেটকে বললেন নাঙ্গীও বেরিয়ে পড়েছে দেখছি। গলুইএর উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখা গেল পাঁচমিশেলী ধরনের জাহাজটিও পাল তুলে আসছে আমাদের পিছন পিছন।

অন্ধকার হয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল, কিন্তু বেশ এগিয়ে না যাওয়া অবধি ক্যাপ্টেন কিছুতেই পাল কমাতে রাজী হলেন না। আমরা কূল ছেড়ে সমুদ্রে পড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল গোটাবার আদেশ এল। উপরের প্রত্যেকটি পালের বিস্তার কমিয়ে আমরা মন্থরগতি ভেসে চললাম। দক্ষিণপূর্ব থেকে ঝোড়ো হাওয়া এলে পাল কমিয়ে হাওয়া থেমে যাওয়ার অপেক্ষা করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করার থাকে না। এই হাওয়া অনেক সময় দুদিন অবধি থাকে, আবার কখনো কখনো বারো ঘণ্টার মধ্যে কমে যায়। তবে দক্ষিণে হাওয়া আবার বইতে আরম্ভ করার আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে থাকে। পাহারার দলকে ছুটি দিয়ে মেট নীচে যেতে বললেন, কিন্তু তখন কাদের পাহারার পালা সেইনিয়ে একটু বিতর্ক উপস্থিতহল। মেট সমস্যার সমাধান করলেন—ওঁর নিজের দলকে ছুটি দিয়ে বললেন এর পরের বার যাত্রার সময় ওরা আগে পাহারায় যাবে। আমরা অবিরলধারে বর্ষণের মধ্যে ডেকে রইলাম। পরের বার পাহারা ভোর চারটেয়। তখনো বেশ অন্ধকার। হাওয়া একটু কমলেও আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। আমরা তেলা কাপড়ের বর্ষাতি আর টুপি পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। জাহাজে কোথায়ই বা ছাতা, কোথায়ই বা বৃষ্টি থেকে বাঁচবার আশ্রয়।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় সেই ছোট জাহাজটি পাল গুটিয়ে যেন ছায়ামূর্তির মত পাশ দিয়ে ভেসে চলে গেল। একটিমাত্র লোক চাকা ধরে বসেছিল, তাছাড়া আর জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখা গেল না। সকাল বেলা ক্যাপ্টেন সিঁড়ি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দ্বিতীয় মেটকে বললেন এসময় বাতাসের

দিক বদলের সম্ভাবনা, সকলে যেন সতর্ক থাকে। ক্যাপ্টেনের অনুমান ঠিক। খুব বৃষ্টির পর বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তারপর হঠাৎ দ্বিগুণ জোরে অন্যদিক থেকে বইতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব একেবারে স্থির, বৃষ্টি বন্ধ। জাহাজের গতি এত মন্থর যে, হাল চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আমরা পালদণ্ড নামিয়ে সবচেয়ে নীচের পাটাতন থেকে টাঙ্গানো পাল টেনে ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই দিকদর্শন যন্ত্রের ঠিক উল্টো দিক, উত্তর-পশ্চিম থেকে ভীষণ বেগে হাওয়া আরম্ভ হল। আমরা অবশ্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। ক্যাপ্টেন ডেকে নেমে এলেন। আমরা পালের দড়ি টেনে রইলাম। হাওয়া দিক পরিবর্তন করার ফলে আবহাওয়াও অনেকটা বদলে গেল। দুঘণ্টার মধ্যে ঝড় কমে অল্প অল্প হাওয়া আরম্ভ হল—যেমন এদিকে সচরাচর হয়ে থাকে, অনেকটা বাণিজ্য বায়ুর মত। রোদ উঠল, আমরাও সব পাল তুলে সান্টা বারবারার দিকে ভেসে পড়লাম। লরিয়েট আমাদের আগে আগেই ছিল, কিন্তু আয়াকুচোকে কোথাও দেখা গেল না। অল্পক্ষণ পরে সান্টা রোজা দ্বীপের দিক থেকে তাকে আসতে দেখা গেল, ঐখানে থেমে ছিল সারা রাত। আমরা আয়াকুচোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। ভাল জাহাজ বলে বছর ছয়েক ধরে আয়াকুচোর উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে বেশ সুনাম আছে, তাকে হারিয়ে দেওয়া কৃতিত্বের কথা। হালকা হাওয়ায় আমাদের একটা সুবিধা ছিল, কেননা আমাদের দুদিকেই পাল—তাছাড়া অল্প হাওয়াতে টাঙ্গাবার অপরিসর পালও তোলা ছিল। ওদের কেবল উপরে বড় পাল ছাড়া আর কিছু খোলা ছিল না। কিছুক্ষণ আমরা এগিয়ে রইলাম, কিন্তু কূলের কাছাকাছি নোঙরের জায়গায় এসে পালের দড়ি কষে টেনে ধরতে হল। সেই অবসরে ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেল। পরে ওদের ক্যাপ্টেন বলেছিলেন আমরা হাওয়া থাকলে মন্দ চলি না তবে পাল টেনে চলতে হলে আমাদের যত পালই থাকুক না কেন ওদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠব না।

আয়াকুচো আমাদের চেয়ে প্রায় আধঘণ্টা আগে নোঙরের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখি ওদের পাল গোটান হচ্ছে। নোঙর না ফেলে আগেকার জাহাজ বাঁধবার জায়গার মধ্যে পৌঁছতে গেলে বেশ অভি-জ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন উইলসনের এই কাজে নৈপুণ্য সর্ব-জনবিদিত। আমরা হাওয়ার দিকে এগিয়ে গোটাবার আগে পালের নীচের

প্রান্ত দুটি মাস্তলের উপর টেনে আনলাম। একটি নৌকা নামিয়ে দেওয়া হল, সেটি বয়ার চতুর্দিকে কাছি বেঁধে দিল। দড়ির অপর প্রান্তটি আমরা টেনে এনে দড়ি জড়াবার কাঠের যন্ত্রে লাগিয়ে দিলাম, তারপর সেটা ধরে টানতে টানতে কাছিটা কপিকল অবধি নিয়ে গিয়ে কাছি ঢোকাবার ফুটোর মধ্যে দিয়ে কপি-কলের চারপাশে বেশ ভাল করে জড়িয়ে দেওয়া হল। এই কাজে সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে পালের সাহায্য নিতে হচ্ছিল। অবশেষে আবার পুরোনো জায়গায় জাহাজ বাঁধা সমাপ্ত হল। মেট বললে এতো ক্যালিফোর্ণিয়ার সামান্য একটু নমুনা মাত্র।

পাল নামাবার পর রাত্রের খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় লরিয়োটকে আসতে দেখা গেল। ওরা রাত্রের আগেই নোঙর ফেলল। সূর্যাস্তের পর আমরা কূলে নামলাম। সেখানে লরিয়োটের নৌকা আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ইংরাজী জানা কানাকাটির মুখে খবর পেলাম আমাদের কোম্পানীর দালাল মিঃ রবিনসন ও আরো কয়েকজন যাত্রী নাকি আমাদের সঙ্গে মণ্টারি যাবেন। শহরে এই কথা শুনেছে সে আমরা নাকি আজকেই যাত্রা করব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন টমসন দুজন ভদ্রলোক ও এক জন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে প্রচুর মালপত্র। সেগুলি নৌকায় রেখে আমরা দুজন মাল্লা ভদ্রমহিলাকে কোলে তুলে জলের উপর দিয়ে পার করে নৌকায় তুললাম। তিনি এতে বেশ কৌতুক অনুভব করলেন মনে হল। তাঁর স্বামী এতে আপত্তি করলেন না, কেন না এই করে তাঁর নিজের পা ভেজানোর কষ্ট থেকে অব্যাহতি পেলেন। আমি ওঁদের কাছেই দাঁড় বাইছিলাম, কাজেই কথাবার্তার খানিকটা অংশ কানে এল। বুঝলাম ইউ-রোপীয় পোশাক পরা অল্পবয়সী লোকটি আমাদের দালাল, আর যাঁর পরনে স্পেনীয় পোশাক তিনি ক্যাপ্টেনের ভাই, বহুদিন এই অঞ্চলে ব্যবসা করছেন। ভদ্রমহিলা তাঁর স্ত্রী, অভিজাত বংশের মেয়ে। আমরা আজ রাত্রেই রওনা হব, একথাও শুনলাম।

জাহাজে পৌঁছে নৌকা উঠিয়ে রাখা হল, কপিকলের সামনে মাল্লারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, দড়াদড়ি খোলা হতে লাগল, কাছিতে টান পড়ল, মিনিট কুড়ি ধরে চলল পাল ওঠান, টানাদড়ি তোলা ইত্যাদির পালা। তারপর আমরা মণ্টারির পথে ভেসে পড়লাম। লরিয়োটও ঐ পথেরই যাত্রী, কিন্তু ওরা কূলের কাছ ঘেঁষে চলল, আমাদের থেকে বেশ দূরে। খানিকক্ষণের মধ্যেই

ওদের আর দেখা গেল না। অনুকূল হাওয়া পেয়ে আমরা বেশ আশ্চর্য হলাম, কেননা এ অঞ্চলে কূলের কাছে সাধারণতঃ উত্তর দিক থেকে হাওয়া বয়।

॥ ১১ ॥ উপকূলে ॥

পরদিন সূর্যাস্তের আগেই আমরা দ্বীপপুঞ্জ ফেলে এগিয়ে চললাম। দুপুর বারোটায় অন্তরীপ পেরিয়ে পৌঁছলাম সমুদ্রে, এখানে ডাঙ্গা অনেকটা সমুদ্রের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। জনমানবহীন স্থান, প্রচণ্ড হাওয়ার জন্য অখ্যাতি আছে, বিশেষতঃ শীতকালে। এখানে দমকা হাওয়ার ঝাপটা না খেয়ে জাহাজ ঢোকাতে পারা মহা সৌভাগ্যের কথা। দুদিকে অল্প হাওয়ার ছোট পাল খাটিয়ে চলেছিলাম আমরা,কিন্তু অন্তরীপ পার হয়েই বাতাসের প্রতিকূলে পড়ে হাওয়ার দিকের পালটা নামাতে হল। ক্রমে হাওয়ার বেগ বাড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি হালকা পাল নামিয়ে ফেলা হল, অন্যদিকের ছোট পালটা কিন্তু টাঙ্গানো থাকল। মাস্তুল সংলগ্ন পালদণ্ড সামনের দিকে টানা হল। পাল ছড়াবার দণ্ডটি প্রায় এসে পড়ল কোনাকুনি দণ্ডটির উপর। জাহাজের গতিক দেখে ক্যাপ্টেনের ভাই ও মিঃ রবিনসন উদ্বিগ্নভাবে কি যেন মন্তব্য করলেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। জাহাজ কি করে চালাতে হয় ওঁর নাকি যথেষ্ট ভালোভাবে জানা আছে। অর্থাৎ নিজের বিদ্যা জাহির করার চেষ্টা! হাওয়ার দিকে এসে ক্যাপ্টেন মাস্তুলের দড়ি ধরে দাঁড়ালেন। মাস্তুলের সঙ্গে লাগানো পালদণ্ডগুলি আর কতক্ষণ হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করতে পারবে দেখবার জন্য। হঠাৎ দমকা হাওয়া এমন জোরে আছড়ে পড়ল যে আর ভাবনা চিন্তার সময় রইল না, তাড়াতাড়ি পাল গোটাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। একসঙ্গে সব পালের প্রান্ত টেনে নামাতে গিয়ে আরম্ভ হল বিষম হৈ চৈ। কোথাও কিছু ভাল করে বাঁধা নেই, হাওয়ায় সব বিশৃঙ্খল অবস্থা। আমাদের মেক্সিকোবাসীনী যাত্রী সিঁড়িতে দেখা দিলেন, ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা চেহারা। মেট প্রাণপণে নীচের হালকা পালগুলি টেনে নামাচ্ছেন। পালটি উড়ে কোনাকুনি একটি দণ্ডের সঙ্গে

জড়িয়ে গিয়েছিল। এদিকে সবচেয়ে উপরের ছোট পালটি ছড়াবার দণ্ডের কাছ থেকে ভেঙ্গে পড়ল। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম উপরে, কিন্তু আমার চোখের সামনে পালের কোণ ছিঁড়ে টুকরো হয়ে উড়ে গেল। পাল তোলবার দড়িটিও ইতিমধ্যে ছেড়ে গেছে। পাল তুলতে অত দুরবস্থা আমার আর কখনো হয় নি। যাই হোক পালের অবশিষ্ট অংশটি কোন গতিকে উপরে তোলা হল, তুলে বেঁধে রাখছি এমন সময় ক্যাপ্টেনের নির্দেশ এল "ডানা, উপরেই থাক, মাস্তুলের চতুর্থ অংশের পাল গোটাতে হবে।" আমি দুই মাস্তুলের মাঝখানের কাঠটির উপর উঠে গেলাম। কিন্তু এখানকার অবস্থা খুব আশাপ্রদ মনে হল না। মাস্তুলের উপরের অংশটি ভীষণ ক্যাঁচকোঁচ শব্দ সহকারে দুলছে, সব কিছু এমন বেঁকে আছে যে যে কোন মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়তে পারে।

কিন্তু মাল্লারা তো হুকুমের বান্দা, হুকুমের উপর কথা বলে সাধ্য কি। আমি তো দণ্ড বেয়ে উঠলাম, এখানে অবস্থা আরো সঙ্গীন। পালের টানা দড়িগুলো খুলে ফেলা হয়েছে, ডাণ্ডাগুলো খোলা দরজার মত দুলছে, মাথার উপর উড়ছে পালের কাপড়। আমি নীচের দিকে তাকিয়ে বৃথাই কথা বলার চেষ্টা করলাম। হাওয়ার দাপট, জলের গর্জন আর পালের ঝাপটানিতে আমার গলার স্বর ডুবে গেল। তখন দিনের আলো, কেবল এইটুকুই যা সুবিধা। হালের লোকটি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে হাত পা নেড়ে বহুকষ্টে একজনকে আমার সাহায্যের জন্য দড়ি টেনে ধরতে বলল। এই অবসরে আমি আমার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম। ডেকের উপর শশব্যস্ত দৌড়াদৌড়ি আর সমুদ্রে ঝড়ের উদ্দাম তাণ্ডব। তার মধ্যে আমাদের ছোট জাহাজটি পাগলের মত ছুটে চলেছে, ঢেউ এসে জাহাজের এদিক থেকে ওদিক চলে যাচ্ছে, মাস্তুলগুলি বেঁকে আছে ভীষণভাবে। দেখলাম অপর মাস্তুলটির চূড়ায় ষ্টিমসন পাল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, কোন মতে ধরতে না ধরতে পালটি ওর হাত ছাড়িয়ে আবার উড়ে যাচ্ছে। আমার নীচে পালের প্রান্ত দুটি অবশেষে গোটাবার জন্য টেনে আনলাম, ফলে মাস্তুলটি খালি পাওয়াতে আমার পক্ষে পাল গোটাতে সুবিধা হল। কাজ শেষ করে নীচে নামলাম বটে কিন্তু ঝ'ড়ো হাওয়ায় আমার নতুন ত্রিপলের টুপিটি উড়ে গিয়ে মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে রইল। আধঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তির পর অবশেষে পালের অবস্থা আয়ত্তে আনা গেল।

আবার মন্টারি অভিমুখে যাত্রা শুরু হল। একশো মাইল দূরের পথ, পথে প্রচণ্ড হাওয়ার বাধা। রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হল। পাঁচদিন ধরে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে আমরা গতিপথ থেকে প্রায় কয়েক শ মাইল দূরে চলে গেলাম। ইতি-মধ্যে দেখা গেল সামনের মাস্তলের উপর ভাগ বেঁকে গেছে। মাস্তল খুলে ফেলে আমরা যতদূর সম্ভব কম পাল খাটিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদের যাত্রী চারজনের এই কয়দিন মোটেই দেখা পাওয়া যায়নি—সমুদ্র পীড়ায় তাঁদের উত্থানশক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। ছয় দিনের দিন মেঘ কেটে রোদ উঠল, কিন্তু তখনো বাতাসের নর্তন সমানেই চলেছে। সমুদ্রে ঢেউ-এর অশান্ত মাতামাতি। মনে হল মহাসমুদ্রের মাঝখান দিয়ে চলেছি, কোন দিকে উপকূলের চিহ্নমাত্র নেই। যাত্রীরা এতদিনে বাইরে দর্শন দিলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে বড়ই করুণা হল। বস্টন ছাড়ার পর তিনদিনের মধ্যেই আমি সমুদ্র পীড়ার জের কাটিয়ে উঠেছিলাম। তারপর থেকে আর কাউকে ঐ অসুখে পড়তে দেখিনি। জাহাজে যারা কাজ করে সকলেই সমান সক্ষম, সমুদ্রের দোলানিতে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। এখন ঐ যাত্রীদের দুরবস্থা দেখে নিজেদের সঙ্গে তাদের মনে মনে তুলনা না করে থাকতে পারলাম না। আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছি, এমনকি মাস্তলে চড়ার মত দুরূহ কাজও অনায়াসে সম্পন্ন করছি। আর যাত্রীরা কোনমতে টলতে টলতে বাইরে এসে বসছে। মাথা ঘুরছে তাদের, আমাদের উপরে চড়া অতিকষ্টে মাথা তুলে দেখছে। সুস্থ মানুষের কাছে এই যাত্রীরা বড়ই কৃপার পাত্র।

মন্টারি উপসাগরের মুখে পিনোস অন্তরীপ। আমরা কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছলাম। উপকূল ভাগের সবুজ শ্যামলিমা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল; কনসেনসন অন্তরীপের চেয়ে এ অঞ্চল অনেক বেশী শস্যশ্যামল। পরে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা হয়েছে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ হিসাবে দেশটিকে ঠিক দুভাগে ভাগ করা চলে। কনসেপসন অন্তরীপের যত উত্তরে যাওয়া যায় ততই গাছপালার সংখ্যাধিক্য, জলের প্রাচুর্য। মন্টারি ও সানফ্রানসিসকো এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। দক্ষিণে সান্টা বারবারা, সান পেড্রো ও বিশেষ করে সান ডিয়াগো অঞ্চলে কেমন একটা নিষ্পত্র, নিরাভরণ চেহারা। অবশ্য এ অঞ্চল যে অনুর্বর তা নয় কিন্তু গাছপালার অভাবে সমতলভূমি কেমন যেন শ্রীহীন।

প্রবেশ পথে মন্টারি উপসাগর বেশ প্রশস্ত। দুই প্রান্তের মধ্যে বিস্তার প্রায় কুড়ি মাইল, কিন্তু যতই শহরের দিকে এগোনো যায় ততই ক্রমশঃ অপরিসর হয়ে এসেছে। অন্তরীপ থেকে আঠারো মাইল অভ্যন্তরে যেখানে উপকূল অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকে আছে সেখানে শহরের অবস্থান। আমরা যখন পৌঁছই তখন ঘোর বর্ষা, পাইন গাছের অরণ্য ঘোর সবুজ হয়ে আছে, ঘাস পাতায় সর্বত্র নবজীবনের সমারোহ। গাছে গাছে পাখীর কিচিমিচি, বুনো হাঁস উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে অন্ততঃ দক্ষিণ-পূর্ব ঝ'ড়ো হাওয়ার উপদ্রব থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়। আমরা কূলের অনতিদূরে নোঙর ফেললাম। সেখান থেকে শহরের দৃশ্য চমৎকার। সাদা একতলা বাড়ীগুলির লাল টালির ছাদ, সবুজ ঘাসের সঙ্গে মিলে অপূর্ব রঙের শোভা। সান্টা বারবারার বাড়ীগুলি মেটে মেটে রঙের, তার চেয়ে এখানকার বাড়ীঘর অনেক সুদৃশ্য। বাড়ীগুলি মাঠের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, কোথাও বেড়া দেখা গেল না। এটা ক্যালিফোর্ণিয়ার সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি। শুধু যে বেড়া নেই তা নয়, রাস্তা অবধি নেই। এ অঞ্চলের এটাই বিশেষত্ব।

সেদিন শনিবার বিকেল। সূর্য তখনও পশ্চিম আকাশে। অস্ত যেতে ঘণ্টাখানেক দেরী। শহরের প্রধান বাড়ীটিতে মেক্সিকোর পতাকা উড়ছে। সৈন্যদলের বাজনার ঝঙ্কার জলের উপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই আনন্দিত। মনে হল এতদিনে সভ্য দেশে এসে পৌঁছেছি। ক্যালিফোর্ণিয়ার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় মোটেই সুখকর হয়নি—সান্টা বারবারার উন্মুক্ত সমুদ্র কূল থেকে তিন মাইল দূরে নোঙর ফেলা, ঝড় এলেই নোঙর তুলে আবার ভেসে পড়া, ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিধ্বস্ত হয়ে কূলে নামা, অজানা অন্ধকার শহর, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কেবল কানাকা, চামড়া আর চটির থলে। তার পরে পথে যে প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হতে হল সেকথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে মন্টারিতে আসার সময় আমাদের মনের অবস্থা কি—এখানেও ঐ একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হবে আশঙ্কা ছিল, কিন্তু এখানকার শান্ত সমুদ্র দেখে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

যাত্রীদের ও দালাল মহাশয়কে নামিয়ে দেওয়া হল। তাঁদের জন্য অনেকে তীরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের বেশভূষা স্থানীয় অধিবাসীদের মত হলেও অনেকে ইংরাজ ও মার্কিন, বিবাহাদি করে ঐ দেশেই আছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ না করলে এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এখানে জাহাজ নোঙর ফেলার পর আমি প্রথম আমার নৌবিদ্যায় নৈপুণ্য দেখাবার বিশেষ অবকাশ পাই। এখানেই আমি মাস্তুলের চতুর্থ অংশের উপরের প্রসারিত পাল নীচে নামানোর দুরূহ কাজ কৃতিত্ব সহকারে করি। সমুদ্রে কয়েকবার এই পাল নামাতে দেখেছি। কি করে কি করা হয় সে সম্বন্ধে একজন পুরোনো মাল্লার কাছে আগেই জেনে নিয়েছিলাম। সেই মাল্লাটি আমাকে বলেছিল বন্দরে জাহাজ ভিড়বার পর যেন কোন রকমে একবার নিজে হাতে ঐ কাজটি করে দেখি। এখন সেই সুযোগ উপস্থিত হল। দ্বিতীয় মেটের সঙ্গে আগে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাকে অনুরোধ করলাম ঐ পালটি নামাবার সময় যেন আমাকে উপরেপাঠানো হয়। সুতরাং যথাসময়ে আমার ডাক পড়ল। আমি মনে মনে কার্যপ্রণালী ভেবে নিয়ে উপরে উঠলাম। একের পর এক সুশৃঙ্খলে কাজ শেষ করার পর যখন দণ্ডটি ডেকে পৌঁছল মেট আমাকে প্রশংসা করে বললেন বেশ কাজ হয়েছে। সেই শুনে আমার যে খুব আনন্দ হল বলাই বাহুল্য। কেমব্রিজে ল্যাটিন রচনার শেষে ভালো নম্বর পেলে মনের ভাব অনুরূপ হত।

॥ ১২ ॥ মণ্টারি ॥

রবিবার সাধারণ বাণিজ্য জাহাজে কাজকর্ম হয় না। সুতরাং ঐ দিন মাল্লাদের ছুটি, সেদিন তাদের কূলে নামবার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা বহুদিন ধরে এই ছুটির আশায় দিন গুনছিলাম, এমন সময় একটা দুঃসংবাদ শোনা গেল। উপরের মাস্তুলের যে অংশটি বেঁকে গিয়েছিল সেটি নামিয়ে এনে তার জায়গায় একটি নূতন কাঠের দণ্ড তোলা হবে, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক পাল ও পালের দড়ি ঠিকঠাক করতে হবে। এই শুনে আমরা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হলাম। নাবিকদের ছুটি বন্ধ করে দিলে তারা বড়ই বিরক্ত হয়—আর কোন কিছুতে বোধ করি তারা এত অপ্রসন্ন হয় না। রবিবার যে তারা চিত্তের উন্নতির জন্য উপাসনা ইত্যাদি করে তা নয়, তবে ঐ দিনটিই তাদের একমাত্র বিশ্রামের দিন। সপ্তাহের ঐ একটি ছুটির দিনও অনেক সময় ঝড় ঝঞ্ঝায় নষ্ট হয়। নিরাপদ বন্দরে থাকার সময়ে তাদের কাছ থেকে

অকারণে ছুটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে সকলেই বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হল। রবিবারে আমাদের কাজ করতে বাধ্য করার একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে—সোমবার দিন শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের জাহাজে আসার কথা। তাঁরা এসে যেন জাহাজের যাবতীয় সরঞ্জাম নিখুঁত অবস্থায় দেখেন। যদিও জাহাজে কর্মরত মাল্লারা ক্রীতদাস বই আর কিছু নয়, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাতে গেলে তাদেরও প্রভুকে নানা উপায়ে জব্দ করার কৌশল জানা আছে। প্রয়োজন বোধে তারা দৈত্যের মত পরিশ্রম করে কিন্তু যদি কোন কারণে তাদের ধারণা হয় যে তাদের বিনা কারণে খাটান হচ্ছে তবে তারা কাজে একেবারে ঢিলে দেয় এবং কাজ কিছুতেই এগোতে চায় না। তারা অবশ্য কাজ করতে বাধ্য, প্রতিবাদ করা তাদের শোভা পায় না, কিন্তু কি করে কাজ করার ভান করেও কিছু না করা যায় সে বিষয়ে যে তিনমাস জাহাজে কাজ করেছে সেই অভিজ্ঞ। সেদিন সকালে কাজের ছুতায় কেবল কাজ ভণ্ডুল হতে লাগল। কাউকে নীচে কোন জিনিস আনাতে পাঠান হল, সে একটা আনতে চারটে জিনিস উল্টে ফেলে অনাবশ্যক দেরী করে, শেষে বহুবার ডাকাডাকির পর তাকে পাওয়া যায়। কাছিতে লাগাবার লোহার ছুঁচ কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ছুরিতে কেবলই অনর্থক ধার দেওয়ার দরকার পড়ে, ধার দেবার যন্ত্রের কাছে একসঙ্গে সকলে মিলে ভিড় করে, মাস্তুল দণ্ডের উপরে উঠে মনে পড়ে যায় দরকারী কোন জিনিস নীচে পড়ে আছে। অতএব আবার সে খুব ধীরেসুস্থে নামতে থাকে, কোন কাজে তাড়া-হুড়ো নেই এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব। কপিকল তিনজনের বদলে ছজন এসে টানছে, মেট চোখের আড়াল হলেই সবাই কাজ ছেড়ে বসে যাচ্ছে। এইভাবে সকালের খাওয়ার সময় অবধি চলল। দেখা গেল সকালে যেমন ছিল অবস্থার তার থেকে এক তিলও উন্নতি হয়নি।

খাওয়ার সময় আমরা সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করলাম। একজন প্রস্তাব করলে সরাসরি প্রতিবাদ জানানো হোক, কিন্তু সে তো রাজদ্রোহ, অতএব কেউই তাতে রাজী হল না। বস্টনে নাবিকদের যাজক টেলারের বাণী উদ্ধৃত করে একজন বললে তাঁর মতে নাবিকদের যদি রবিবার দিন জোর করে কাজ করানো হয় তবে তাদের পাপ হবার কথা নয়। খাওয়ার পর কানাঘুষোয় শোনা গেল তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারলে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়া যেতে পারে। এই শুনে যারা মাছ ধরায় উৎসাহী তারা

খুবই আগ্রহ প্রকাশ করল, এবং সকলেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করায় মন দিল। দুপুর দুটোর মধ্যে কাজকর্ম সমাধা করে আমরা পাঁচজন একটি নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পিনোস অন্তরীপের দিকে। আমাদের কূলে নামবার অনুমতি দেওয়া হল না। এখানে লরিয়োট নামে জাহাজটিকে আসতে দেখা গেল। আমরা কড, পার্চ প্রভৃতি মাছ প্রচুর ধরলাম। আমাদের পূর্বেকার দ্বিতীয় মেট ফস্টারের ছিপে একটি প্রকাণ্ড শুক্তি উঠল। পরে জানলাম এই অঞ্চল নাকি শুক্তির জন্য বিখ্যাত। লোকে জাহাজে করে শুক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সেগুলি আমেরিকায় বিক্রি করে বেশ অর্থাগমও হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার হলে আমরা ফিরলাম। দেখি আমাদের জাহাজের পাশে লরিয়োট নোঙর ফেলেছে। পরদিন আমরা খুব ভোর থেকে মালপত্র গুদাম থেকে বার করে সাজাতে আরম্ভ করে দিলাম। আটটার সময় শুল্ক বিভাগের পাঁচজন কর্মচারী জিনিসপত্র, মালের চালান ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে এলেন। মেক্সিকোর রাজস্ব আইন বড় কড়া, সেই অনুসারে জাহাজ বোঝাই মাল কূলে নামিয়ে পরীক্ষা করে আবার জাহাজে তোলার কথা. কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি এ সম্বন্ধে আগেই কথাবার্তা বলে রেখেছিলেন, ফলে ঐ অপ্রীতিকর কাজ থেকে আমরা রেহাই পেলাম। কর্মচারীদের মাথায় ছিল চওড়া কাল টুপি, তাতে সোনালী পটি জড়ানো, গলা খোলা কাজ করা ছোট কোর্তা, মখমলের জরিদার প্যাণ্ট, হাঁটুর নীচে থেকে কাটা, সাদা মোজা, কারুকার্য খচিত হরিণের চামড়ার জুতো। কোমরে জড়ানো লাল কোমরবন্ধ, তার আকৃতি নির্ভর করে সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর। এছাড়া আছে উড়ুনি, সেটি না হলে অভিজাত ক্যালিফোর্ণিয়াবাসীর বেশভূষা সম্পূর্ণ হয় না। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের উড়ুনিতে মখমল ও জরির প্রাচুর্য, কারুকার্যের পরিমাণ ক্রমশঃ মানের ক্রমানুসারে কমতে কমতে শেষে রেড ইণ্ডিয়ানদের কম্বলে এসে পৌঁছয়।

মধ্যবিত্তশ্রেণী একরকম চৌকো কাপড় গায়ে দেন, তার মধ্যে মাথা গলাবার জন্য একটি ফুটো থাকে। মোটা কাপড়ে তৈরী হলেও এর নানা রঙের বুনন দূর থেকে দেখতে অতি চমৎকার। মেক্সিকোবাসীদের কেউই কায়িক পরিশ্রম করে না—এই কাজের জন্য রেড ইণ্ডিয়ানরা আছে। প্রত্যেক ধনী লোকের চালচলন সম্রাটের মত, এমন কি গরীব লোকদের দেখলে মনে হয় তারা এককালে ধনী ছিল, এখন অবস্থার বিপাকে এই দুর্দশা।

আমি বহু কালিফোর্ণিয়াবাসীকে সুসজ্জিত ঘোড়ায় উত্তম পোশাক পরে বিচরণ করতে দেখেছি, আদব কায়দা অতি সুন্দর, কিন্তু তাদের সঙ্গে এক কপর্দকও নেই, হয়তো কিছুদিন যাবৎ খাবারও জুটছে না।

। ১৩ ॥ মণ্টারিতে কেনাবেচা ॥

পরদিন মাল বেচাকেনা শুরু হল। নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশটি হল দোকান ঘর, সেখানে নানাবিধ মালের নমুনা সাজিয়ে রাখা হল। বস্টন থেকে আমাদের সঙ্গে মেলাস নামে একটি যুবক এসেছিল, সে আগে সওদাগরী অফিসে কেরানীর কাজ করত, কাজেই এখন তাকে ঐ কাজে বহাল করা হল। কিছুদিন যাবৎ বাতে ভুগে বেচারার পক্ষে খোলা হাওয়ায় কাজ করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুতরাং এই কাজটি তার বেশ মনোমত হল বলা চলে। তারপর দিনদশেক প্রচণ্ড কাজের ধুম পড়ে গেল। আমরা নৌকায় করে কখনও বা যাত্রী কখনও মাল নিয়ে ক্রমাগত জাহাজ ও কূলে যাতায়াত আরম্ভ করলাম। মাল কিনতে যে সব খরিদ্দাররা আসছিলেন তাঁদের কারোই নৌকা ছিল না, আমাদেরই উপর ছিল তাঁদের পৌঁছে দেবার ভার। কেনার ইচ্ছা থাক বা না থাক সকলেই সুন্দর পোশাকে সেজে জাহাজে আসতে ইচ্ছুক। আমাদের দালাল ও তার লোকজনেরা কেনা-কাটার দিকটা তত্ত্বাবধান করছিলেন, আর আমরা জাহাজের খোলে অথবা নৌকা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের মালপত্রের মধ্যে যাবতীয় জিনিস—চা, কফি, চিনি, মশলা, কিসমিস, গুড়, বাসনপত্র, কাঁটা-চামচ, পোশাক পরিচ্ছদ, রেশম বস্ত্র, জুতা, শাল, গহনা, চিরুনি, আসবাব—এমনকি গাড়ীর চাকা অবধি সব কিছুই ছিল।

ক্যালিফোর্ণিয়াতে প্রচুর আঙ্গুর ফলে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এমনই কুঁড়ে যে, তাদের দ্বারা কিছুই তৈরী হয় না ; তারা বস্টনের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মদ বহু দাম দিয়ে কেনে তবু নিজেরা মদ চোলাই করার কথা চিন্তা করে না। আমাদের কাছে ওরা কাঁচা চামড়া টুকরা প্রতি দুই ডলার

হিসাবে বিক্রি করে, পরিবর্তে আমাদের কাছ থেকে যা পায় তার মুল্য বস্টনের হিসাবে এক ডলারের তিন চতুর্থাংশ। তৈরী জুতো ওরা আমাদের কাছ থেকে তিন চার থেকে পনেরো ডলার পর্যন্ত দামে কেনে। এখানে ব্যবসা করলে অতি সহজে শতকরা তিনশত ভাগ লাভ পড়ে। আমদানী জিনিসের উপর এখানকার সরকার প্রচুর শুল্ক বসিয়েছেন, যাতে দেশের টাকা বিদেশে না চলে যায়। তাছাড়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জিনিসপত্র আনার খরচ বহন করে খুব বেশী সংস্থা এই ব্যবসায় উদ্যোগী হয় না। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বাণিজ্য একটিই সংস্থা পরিচালনা করে—আমাদের জাহাজও তাদেরই দ্বারা নিয়োজিত।

আমরা উদয়াস্ত প্রচুর পরিশ্রম করছিলাম, কিন্তু এই ধরনের কাজে নূতন বলে উৎসাহও বোধ করছিলাম প্রচুর।

অনবরত যাত্রী পারাপার করে ঐ দেশবাসীদের পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বেশ জ্ঞানলাভ হয়েছিল আমাদের। পুরুষদের পোশাকের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। মহিলাদের গাউন অনেকটা ইউরোপীয় ধরনে কাটা, তবে হাতকাটা ও কোমরের নিকট ঢিলাঢালা—আঁটো অন্তর্বাস পরার চল নেই বোঝা গেল। জুতা চামড়া অথবা মসৃণ রেশমের, কোমরে রঙিন বন্ধনী, এছাড়া প্রত্যেকেরই কানে ও গলায় গহনা। মেয়েদের টুপি পরার প্রচলন নেই। সান ডিয়াগোতে কেবল একজন আমেরিকান ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে প্রচুর ফিতা সমন্বিত একটি খড়ের টুপি পরতে দেখেছিলাম। সেটি তাঁর স্বামী বিদেশ থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েদের চুল কখনো ঘাড়ের নীচে বাঁধা,অনেক সময় বিনুনীবদ্ধ অথবা খোলা। বিবাহিতা মহিলারা চিরুনি দিয়ে উঁচু করে খোঁপা বাঁধেন। চুলের রঙ গাঢ় বাদামী অথবা কাল। রৌদ্রতাপ থেকে আচ্ছাদন হিসাবে মেয়েদের অনেক সময় একটা কাপড় ঢাকা দিতে দেখেছি, সাধারণতঃ বাইরে যাবার সময় সেটি ব্যবহার করা হয়। বাড়ীর সামনে বসে থাকবার সময় চিত্রবিচিত্র করা ছোট চাদর মাথায় বাঁধা থাকতে দেখেছি। মাথায় গহনার মধ্যে তারকা বা অন্য কোন চিহ্ন খচিত মালা পরতে দেখা যায়। স্পেনীয় প্রভাব অনুসারে এদের গায়ের রঙের তারতম্য—এবং সামাজিক প্রতিপত্তিও সেই হিসাবেই ঠিক হয়। যাদের বংশে আদিবাসীদের সঙ্গে কখনোও বিবাহাদি ঘটেনি তাদের গাত্রবর্ণ অতি পরিষ্কার—অনেকটা ইংরাজ মেয়েদের মত। এই

ধরনের পরিবার খুবই কম। যাঁরা আছেন তাঁরা কর্মোপলক্ষ্যে এদেশে এসে পরে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এঁরাই এখানকার উচ্চতম সমাজ। এঁরা মেলামেশা, বিবাহ ইত্যাদি সমাজের বাইরে না করে নিজেদের আভিজাত্য বজায় রেখেছেন। এঁদের আকৃতি, হাবভাব, বেশভুষা সবই স্বতন্ত্র, তাছাড়া এঁদের শুদ্ধ ক্যাষ্টিলীয় ভাষা শুনেও এঁদের আলাদা করে চেনা যায়। অন্য শ্রেণীর লোকেরা মিশ্র শ্রেণীর ভাষা বলে থাকে। উচ্চতর সামাজিক শ্রেণী থেকে যতই নীচে নামা যেতে থাকে ততই গায়ের রঙ তামাটে হতে হতে ক্রমে রেড ইণ্ডিয়ানদের মলিন রঙে পরিণত হয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের পোশাক বলতে কোমর থেকে ঝোলানো কয়েকটি কাপড়ের টুকরো। যার ধমনীতে স্পেনীয় রক্তের পরিমাণ যত বেশী তার প্রতিষ্ঠাও সেই অনুপাতে বেশী। এক ফোঁটা রক্ত থাকলেও সুসজ্জিত হয়ে থাকবার এবং ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার জন্মায়।

মহিলাদের সাজসজ্জার প্রতি আসক্তি তাঁদের পতনের অন্যতম কারণ। তাঁদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে গেলে একটি সুন্দর চাদর বা কর্ণাভরণ উপহার দেওয়াই যথেষ্ট। অতি সাধারণ দুই কামরাওয়ালা ঘরে যিনি থাকেন তাঁকে মহামূল্য বসনে ভূষণে সজ্জিতা হয়ে থাকতে দেখা অতি সাধারণ ব্যাপার। সোনার গহনা না জুটলে নকল গহনাও চলবে, কিন্তু গহনা চাই। এইসব বিলাসসামগ্রী যদি স্বামী জোগাড় করে দিতে না পারেন তবে অন্যের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতে এঁরা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নন। এদেশের মেয়েরা দলে দলে আমাদের জাহাজে এসে জিনিসপত্র দেখে সময় কাটাতেন। তাঁদের কেনাকাটার বহর দেখলে বস্টনের বড় বড় দর্জিদের চক্ষুস্থির হবার কথা।

সাজসজ্জার প্রতি অনুরাগ ছাড়াও আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, সেটি এদের মেয়েপুরুষের উভয়েরই মিষ্টি কণ্ঠস্বর আর সুন্দর বাচনভঙ্গী। মোটা জামা পরা কদাকার চেহারার লোকের মুখেও শোনা যায় অপূর্ব স্পেনীয় ভাষা। অর্থ না বুঝলেও শুধু ধ্বনি শুনতেই আমার ভাল লাগত। কথার ভাবে একটি সুন্দর টান আছে— ব্যঞ্জনবর্ণগুলি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করে স্বরবর্ণে এসে দীর্ঘকাল স্থিতির ভঙ্গীটি বড় হৃদয়গ্রাহী। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কথা বলার ভঙ্গী আরো

মনোরম ঘোড়ায় করে যখন কোন গাড়ীর চালক সংবাদ দিতে আসে মনে হয় যেন কোন রাষ্ট্রদূত রাজসমীপে এসেছেন। আমার মনে হত এরা এক উন্নত জাতি, ভগবানের অভিশাপে আজ এই দুরবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আভিজাত্যের সমস্ত লক্ষণ এদের হাবে-ভাবে কথাবার্তায় পরিস্ফুট।

এদেশে টাকা লেনদেনের পদ্ধতিও বড় বিচিত্র। মন্টারিতে যত কাঁচা টাকার কারবার দেখলাম তেমন আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এরা ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন জায়গায় টাকা সংরক্ষণের উপায় জানে না। টাকা বিনিয়োগের একমাত্র উপায় গৃহপালিত পশু। কাঁচা চামড়াও অবশ্য টাকার বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়। নাবিকরা চামড়ার নাম দিয়েছিল ক্যালিফোর্ণিয়ার কড়ি। যা কিছু কেনাবেচা চলে সব হয় টাকা নয় চামড়ার বিনিময়ে। ওরা খচ্চরের পিঠে দুভাঁজ করে চামড়া আনে আর টাকা নিয়ে যায় রুমালে বেঁধে এক ডলার বা আধ ডলার মুদ্রায়।

আমি কলেজে স্পেনীয় ভাষা শিখিনি। যখন জুয়ান ফার্ণাণ্ডিজে থাকি তখন একবর্ণও বুঝতাম না। কিন্তু তার পরে একটি স্পেনীয় ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে এবং শুনে শুনে বেশ চলনসই গোছের স্প্যানিশ রপ্ত করেছিলাম। মাল্লাদের মধ্যে এ ভাষা কেউই জানত না। আমি এছাড়াও জানতাম ফরাসী ও ল্যাটিন। কাজেই ভাষাবিদ বলে আমার যথেষ্ট সুনাম হয়েছিল। শহরে কোন কাজে যাবার দরকার পড়লে ক্যাপ্টেন আমাকেই পাঠাতেন। এমনও বহুবার হয়েছে যে, যে কাজে আমাকে পাঠানো তার অর্থই আমি বুঝিনি। কিন্তু অজ্ঞতা প্রদর্শন না করে আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েছি। সম্ভব হলে একবার নীচে গিয়ে অভিধান খুলে মানেটা দেখে নিতাম। হাত পা নেড়ে, দু-চারটি ফরাসী ল্যাটিন শব্দ জুড়ে কোনমতে কাজ চালিয়ে নিতাম। ভাষা শেখার পক্ষে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। বই পড়ে শিখলে যতদিন লাগত তার চেয়ে অনেক আগেই আমি শিখে গেলাম। উপরন্তু জাহাজের একঘেয়েমি থেকে ছুটি, আরো লাভ, এখানকার অধিবাসীদের অভ্যাস সম্বন্ধে ধারণা করা।

সমস্ত ক্যালিফোর্ণিয়ার মধ্যে মন্টারিকেই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বাস-যোগ্য ও সুসভ্য স্থান বলা চলতে পারে। মেক্সিকো সরকার কর্তৃক এখানকার সব শহরেই প্রথমে একটি দুর্গ নির্মিত হয়, সেই দুর্গকে ঘিরে গড়ে ওঠে শহর। প্রধান শাসন-কর্তা এখানে থাকেন—শাসনকার্য-এখান থেকেই চলে। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি খোলা জায়গা, চারিদিকে কয়েকসারি একতলা বাড়ি, মধ্যে ছয়টি কামান। মন্টারির দুর্গটি মোটেই সুরক্ষিত নয়। এখানে বড় বড় উপাধিধারী কয়েকজন উচ্চ কর্মচারী আছেন। সৈন্যসংখ্যা আশী, তবে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা নিয়মানুবর্তিতা কিছুই উচ্চ শ্রেণীর নয়। প্রধান শাসন-কর্তা আবার সৈন্যদলের অধিনায়কও বটে।তাঁকে মেক্সিকো সরকার মনোনীত করেন। এছাড়া প্রত্যেক শহরে একজন করে সহকারী সেনাপতি আছেন। তাঁদের কাজ দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিদেশী জাহাজের সঙ্গে ব্যবসা করা। নাগরিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত দুজন প্রতিনিধি বেসামরিক কাজ দেখাশোনা করেন। আইন বা আদালত বলতে যা বোঝায় এদের সে সব কিছুই নেই। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কীয় ছোটখাটো ব্যাপারের বিচার এই বেসামরিক কর্মচারীরাই করেন। বৃহত্তম শাসন, সামরিক এবং বিদেশীদের ব্যাপারের ভার শাসন-কর্তার সহ-কারীদের উপর। প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবার অধিকার আছে একমাত্র প্রধান শাসনকর্তার। দোষী দূরে থাকলে তিনি অকুস্থলে অনুচর পাঠিয়ে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হন। ক্যালিফোর্ণিয়াতে প্রোটেস্ট্যান্টরা সব রকম রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না, এমন কি কয়েক সপ্তাহের বেশী এই দেশে বাস করাও অপরাধ। অবশ্য বিদেশী জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের এই সব আইন কানুন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে যেসব ইংরাজ ও আমেরিকানরা আসেন তাঁরা প্যাপিস্ট সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হর্ণ অন্তরীপ পার হয়ে আসার সময় সমস্ত ধর্মবিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়ে আসতে হয়—তাদের মধ্যে এই জাতীয় একটি কথা প্রচলিত আছে।

মন্টারির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্যত্র যেমন এখানেও বাড়ীগুলি তেমনি একতলা ও পোড়া ইঁটের তৈরী। ইঁটগুলি আকারে বেশ বড়, তিন থেকে চার ইঞ্চি পুরু। রোদে পুড়িয়ে এগুলি শক্ত

করে নেওয়া হয়। ইঁটগুলি কাটামাটির প্রলেপ দিয়ে একসঙ্গে গাঁথা। মেঝে মাটির, জানালায় শিক আছে কিন্তু কাঁচের শার্শি নেই। কিছু কিছু সঙ্গতিশালী নাগরিকের বাড়ীর মেঝে কাঠের, জানালায় শার্শিও আছে। বাড়ীগুলি সবই বাইরের দিকে চুনকাম করা। বাড়ীর দরজা সদাসর্বদা খোলা থাকে। অধিকাংশ বাড়ীতে দুটি বা তিনটি করে ঘর, ঘরে আসবাবের মধ্যে বিছানা, গুটি কয়েক চেয়ার, টেবিল, আয়না, ক্রসচিহ্ন এবং রঙিন কাঁচের ভিতর আঁকা সাধুসন্তদের ছবি। ঘরের ভিতরে আগুনের চুল্লীর কোন ব্যবস্থা নেই, কেননা এদেশে আগুন জ্বালাবার মত ঠাণ্ডা কখনো পড়ে না। রান্নাঘরটি বাসস্থান থেকে একটু দূরে। যাবতীয় কাজকর্ম রেড ইণ্ডিয়ানরাই করে। প্রত্যেকের বাড়ীতেই দুটি বা একটি চাকর। চাকরদের কেবল খাওয়া ও পরিধেয় বস্ত্র দিলেই তারা সন্তুষ্ট। মেয়েদের মোটা গাউন ও ছেলেদের একটুকরো কাপড়, চাকরদের পোশাক বলতে এই। জুতা বা মোজার ধার ধারে না ওরা।

ক্যালিফোর্ণিয়াতে প্রচুর ইংরাজ ও আমেরিকাবাসী আছেন। তাঁরা ঐ দেশেই বিবাহ করে ও ধর্মান্তর গ্রহণ করে ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। নিজেদের যত্ন, পরিশ্রম ও উদ্যোগে দেশের সব ব্যবসা বাণিজ্যেই প্রায় এদের করতলগত। সমস্ত দোকানপত্র এরাই চালায়। আমাদের কাছর থেকে পাইকারী দরে মাল কিনে এরা খুচরা বিক্রি করে। দেশের ভিতরেও বহু জিনিস চালান করে এরা, তার বদলে দাম হিসাবে নেয় কাঁচা চামড়া। সেই কাঁচা চামড়া দিয়ে আবার আমাদের কাছ থেকে অন্য জিনিস কেনে। পশ্চিম উপকূলের প্রায় প্রত্যেক শহরেই বিদেশীদের এই ধরনের দোকান চালাতে দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা অবশ্য বিদেশী-দের একটু সন্দেহের চোখে দেখে। ওদের আস্থা অর্জনের জন্য বিদেশীরা ধর্ম পরিবর্তন করে, স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে, স্থানীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করে এবং ছেলেমেয়েদের ইংরাজী ভাষা শেখায় না। এই ভাবে বহু বিদেশী এদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বেসামরিক কর্মচারীর পদে নিযুক্ত বিদেশীর সংখ্যাও একেবারে বিরল নয়।

মন্টারিতে এত অধিক সংখ্যক ঘোড়া আছে যে লোকে পায়ে খুব কমই হাঁটে। জুয়ান ফার্ণাণ্ডিজে যেমন পথে ঘাটে মুরগী ও কুকুরের আধিক্য, এখানে ঘোড়াও ঠিক সেই রকম। আস্তাবল নেই, ঘোড়াগুলি ইচ্ছামত মাঠে

মাঠে চরে বেড়ায়। তাদের গলায় লম্বা চামড়ার ফাঁস লাগানো থাকে, তাকে ল্যাসো বলে। প্রয়োজন মত ল্যাসো টেনে ঘোড়াগুলি ধরা হয়। লোকেরা সকালে একটি ঘোড়া ধরে তার গায়ে জীন ও লাগাম পরিয়ে সারাদিন ধরে চড়ে। তারপর সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দেয়। পরদিন সকালে আর একটি ঘোড়া ধরে। দূরের পথ যেতে হলে লোকে খানিকক্ষণ একটি ঘোড়ায় চড়ার পর জীন ও লাগাম খুলে নিয়ে ঘোড়াটি ছেড়ে দেয়, পরে অন্য একটি ঘোড়া ধরে তার পিঠে চড়ে, কিছু দূরে গিয়ে আবার ঘোড়া বদল। এই ভাবে সারা পথ চলে। এদের মত ভালো অশ্বারোহী বোধ হয় পৃথিবীতে কোথাও নেই। আশৈশব এরা ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যাতে গাছে আটকে না যায় সেজন্য জীনের পা-দানিটি সামনে তুলে রাখা থাকে। এদের জীনগুলি বেশ ভারী, খুব আঁট করে ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা থাকে। সামনে একটি গোলাকার কাঠের খণ্ড, ল্যাসোটি জড়িয়ে রাখার জন্য। এদের সকলের বাড়ীর সামনে দু-চারটি ঘোড়া সব সময়েই বাঁধা থাকে। এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী যেতে হলেও এরা সচরাচর পায়ে হাঁটে না। ব্যস্তভাব দেখাতে হলে এরা পাদানিতে পা না দিয়ে লাফ দিয়ে জীনে সওয়ার হয়, আর কাঁটাওয়ালা জুতো দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঠোক্কর মেরে তীরবেগে ছুটতে আরম্ভ করে। এদের জুতোর নীচে প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা মরচে পড়া ভোঁতা পেরেক লাগান থাকে, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তার ব্যবহার করে এরা। ঘোড়ার দুইপাশ কেটে রক্তাক্ত হয়ে যায়, যখন গরু তাড়িয়ে এরা বাড়ী ফেরে ঘোড়াদের পা বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে। ক্যালিফোর্ণিয়ার লোকেরা তাদের অশ্বচালনানৈপুণ্য দেখাতে খুবই ভালবাসে। তবে আমরা ছুটির দিনে কূলে নামতে পাইনি, তাই ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ধরা বা ঐ জাতীয় কোন খেলা দেখার সুযোগ হয়নি। মণ্টারিতে মোরগ লড়াই, নানাবিধ জুয়াখেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের প্রচুর আয়োজন আছে। রকি পর্বতমালার উপর থেকে যে সব শিকারীরা চামড়ার জন্য জন্তু শিকার করতে আসে তারা প্রায়ই এই সব প্রলোভনে পড়ে শেষ অবধি সর্বস্বান্ত হয়ে দেশে ফিরে যায়।

মণ্টারির জলবায়ু ভাল, মাটি খুবই উর্বর, জলের অভাব নেই, শহরের অবস্থানও অতি উত্তম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র নাগরিকদের

উদ্যমের অভাবে এটি একটি বড় শহর হয়ে উঠতে পারেনি। বন্দরের অবস্থানও সুন্দর, উত্তরে হাওয়া ছাড়া বাতাসের প্রকোপ বিশেষ নেই। জাহাজ ঘাটটি সর্বোৎকৃষ্ট বলা না গেলেও এখানে কোন দুর্ঘটনার কথা বড় একটা শোনা যায় না। কেবল একটি মেক্সিকোর জাহাজ আমরা আসার কয়েকমাস আগে এখানে জলমগ্ন হয়, কিন্তু সেটা ক্যাপ্টেনের অসাবধানতা বা নির্বুদ্ধিতার জন্য। বস্টনের লাগোডা জাহাজটিও সে সময় ঐখানেই ছিল, তারা ঝড়ের সময় নির্বিঘ্নে নোঙর তুলে ভেসে পড়েছিল, কিছুই ক্ষতি হয়নি।

আমাদের সঙ্গে আর একটিমাত্র জাহাজ ওখানে নোঙর ফেলেছিল—লরিয়েট। ওদের স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী মাল্লাদের সঙ্গে আমরা বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম, প্রায়ই যেতাম ওদের জাহাজে। তাদের মধ্যে একজন অল্প ইংরাজী জানত, তার কাছ থেকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা গেল। এদের চেহারা নিগ্রোদের মত কালো নয়। তামাটে রঙ, চোখ ও চুল কাল, মুখে চোখে বুদ্ধির আভা। অনর্গল কথা বলা এদের বদভ্যাস বিশেষ। মাল্লাদের আস্তানায় সর্বক্ষণ বিজাতীয় ভাষায় চেঁচামেচি চলেছে। শুনতে বেশ কর্কশ, তবে ক্রমে কানে সহ্য হয়ে এলে মনে হয় নানা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আছে এই ভাষার। কথাবলার সময় এদের মুদ্রাদোষ অনবরত হাত পা নাড়া। এরা নৌ-বিদ্যায় খুব পটু। ঢেউয়ে নৌকা চালাতে এদের জুড়ি নেই, জাহাজের পালতোলা প্রভৃতি কাজেও খুব চটপটে এরা, তবে অভিজ্ঞ লোকদের মতে এরা ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়ে। পোশাক পরিচ্ছদে এদেব আমাদের থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। এরা ছাড়া ঐ জাহাজে দুজন ইংরাজ নাবিক ছিল, কাছি, নৌকা ইত্যাদি দেখাশোনার কাজে। এদের মধ্যে একজনের কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। সত্যকার ইংরাজ নাবিক বলতে যা বোঝায় এ ছিল তাই। অল্প বয়স থেকে সে নাবিকের কাজে আছে। আমার সঙ্গে যখন দেখা তখন তার বয়স পঁচিশ। দীর্ঘাকার চেহারা, অথচ শরীরের গঠনের জন্য তাকে সহসা দীর্ঘ বলে ভ্রম হয় না এমনই তার প্রশস্ত কাঁধ ও বুক। তার বাহু দুটি প্রচণ্ড শক্তি ধরত। হাতের বজ্রমুষ্টির প্রতিটি শিরা যেন শক্ত কাছি—একটি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রতিমূর্তি। অথচ হাসলে তাকে এমন কোমল দেখাত, তখন তার

শুভ্র দাঁত, বাদামী গাল ও কালো চুলে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠত তা তুলনা-হীন। চোখ দুটি যেন হীরকের মত স্বচ্ছ দ্যুতিতে ঝলমল করছে। চোখের মণি কালো কিন্তু আলো পড়ে তা থেকে নানা বর্ণের আভা বিচ্ছুরিত হত। মাথার কালো ত্রিপলের টুপির ফাঁক দিয়ে কপালে কালো চুলের গোছা এসে পড়েছে। সাদা পাজামা, নীল জামা, নীল রুমাল গলায় ঢিলাভাবে জড়ানো—তার চেহারায় এমন একটা পুরুষোচিত সৌন্দর্য ছিল যা খুবই দুর্লভ। তার প্রশস্ত বুকে ছিল একটি উলকি—একটি জাহাজ ছাড়বার উদ্যোগ করছে, কূলে এক নাবিক তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে—নীচে দুটি নামের আদ্যক্ষর, একটি তার নিজের, অপরটি নিশ্চয় তার অতি পরিচিত কারো নাম। উলকিটি হাভ বন্দরের এক পেশাদার কারিগরকে দিয়ে আঁকানো—খুবই সুন্দর। এক হাতে ক্রস চিহ্ন অন্য হাতে ভাঙ্গা নোঙরের ছবি।

লোকটির বই পড়ার অভ্যাস ছিল। আমাদের কাছে যত বই ছিল সব ও নিয়ে পড়ে ফেলেছিল। ওদের ক্যাপ্টেন ওর সম্বন্ধে প্রশংসা ছাড়া অন্য কথা বলতেন না। ওর দৃষ্টি শক্তিও ছিল খুব প্রখর। লোকটির নাম বিল জ্যাকসন। হয়ত ভবিষ্যতে আর ওর সঙ্গে কখনো দেখা হবে না, দেখা হবার কোন সম্ভাবনাও নেই, অথচ এই অর্ধপরিচিত নাবিকটি সম্বন্ধে এত কথা আমার পরিষ্কার মনে পড়ে। কোন কোন লোক কেন জানি না মনের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে যায়—বিল জ্যাকসন তাদের মধ্যে একজন। অন্য কারো পরিবর্তে একবার তার সঙ্গে দেখা হলে আমি বড়ই আনন্দিত হই। লোকটি বন্ধুবৎসল এবং সহকর্মীরূপেও চমৎকার। ওর সঙ্গে যাদের কাজ করার সুযোগ হবে তারা ভাগ্যবান।

আবার রবিবার এল। কিন্তু আমরা যাত্রীদের পৌছাতে ও মাল নামাতে এত ব্যস্ত যে সময়ে আহার পর্যন্ত করা হয়ে উঠছিল না। ফস্টার কিন্তু কূলে নামবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফস্টার আগে আমাদের দ্বিতীয় মেট পদে নিযুক্ত ছিল।

ভদ্র বেশভূষা পরে, জুতায় পালিশ লাগিয়ে অনুমতি নেওয়ার বাসনায় সে ক্যাপ্টেন সন্দর্শনে উপরের ডেকে গেল। এর থেকে নির্বুদ্ধিতার কাজ আর কিছু হতে পারে না। প্রথমতঃ ছুটির কোন আশাই ছিল না, দ্বিতীয়তঃ অনুমতি চাইতে হলে ময়লা নাবিকের পোশাকে

যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেন না নাবিকদের কোন কিছু প্রত্যাশা করাই অনুচিত। কিন্তু ফস্টারের চিরকালের অভ্যাস উল্টো পাল্টা কাজ করা। ওকে যেতে দেখে আমরা মনে মনে বললাম আজ ফস্টারের কপালে দুর্ভোগ আছে। ক্যাপ্টেন উপরের ডেকে পায়চারি করছিলেন, ফস্টার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একপাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। একপাক ঘুরেই ক্যাপ্টেনের চোখ পড়ল ওর উপর। দেখেই উনি ফস্টারের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আঙ্গুল তুলে কি যেন বললেন, নিম্নস্বরে, আমাদের কানে গেল না। তবে শোনা মাত্র সুবোধ বালকটির মত ফস্টার বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে নেমে এল। এসেই তৎক্ষণাৎ পোশাক পরিবর্তন করে আবার আগেকার ময়লা পোশাক পরে নিল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর কি কথা হয়েছিল ঠিক জানা গেল না, তবে ওঁর কথাগুলি যে মন্ত্রের মত কাজ করেছিল সেটা চাক্ষুষ দেখা গেল।

।১৪ ।। অসন্তোষ ।।

কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসায় মন্দা পড়ল। আমরা নোঙর উঠিয়ে, পাল তুলে, তারকা চিহ্নিত পতাকা উপরে উঠিয়ে একটা তোপধ্বনি করে শহর ছাড়লাম। শহরের দুর্গ থেকে প্রত্যুত্তরে আর একটি তোপ-ধ্বনি হল। আবার সান্টা বারবারার দিকে চললাম আমরা। এবারে অনুকূল বাতাস, পিনোস অন্তরীপ পেরিয়ে আমরা হালকা হাওয়ায় বাইরের পাল টাঙ্গিয়ে চললাম, গতি আট থেকে নয় সামুদ্রিক মাইল। যাবার সময় আমরা তিন সপ্তাহে যে পথ অতিক্রম করেছি এখন একদিনে সেই পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করতে লাগলাম। হু হু হাওয়া, আমরা পক্ষীরাজের মতো পিনোস অন্তরীপ পেরিয়ে গেলাম। উল্টো দিকে বাতাস থাকলে এই হাওয়াতে যথেষ্ট বেগ পেতে হত। সান্টা বারবারার দ্বীপগুলির কাছে এসে হাওয়ার বেগ একটু মন্দীভূত হল। মন্টারি ছাড়বার পর তিরিশ ঘন্টাও কাটেনি, আমরা আবার সেই পুরোনো জায়গায় এসে নোঙর ফেললাম।

এখানকার অবস্থা যেমন দেখে গিয়েছিলাম তার থেকে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি—সেই নির্জন বন্দরে অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, অন্ধকার শহর, পিছনে তরুহীন গিরিশ্রেণী। দক্ষিণে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমরা সব রকমে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বয়াতে দড়ি পরিয়ে, পাল গুটিয়ে, মাস্তুলের সঙ্গে লাগা পালদণ্ডে পাল লাগাবার দড়ি বেঁধে। এখানে আমরা ছিলাম প্রায় দু' সপ্তাহ। ঢেউএর প্রকোপ কম থাকলে বেচাকেনার কাজ চলত। তবে মণ্টারিতে যেমন ব্যবসা করা হয়েছিল এখানে তার অর্ধেকও হ'ল না। জাহাজ উপকূল থেকে তিন মাইল দূরে, আরো এক মাইল ভিতরে গেলে শহর আরম্ভ। সুতরাং আমাদের পক্ষে সেখানে থাকা আর আন্দিজ পর্বতের গিরিশৃঙ্গে থাকা একই কথা। মাঝে মাঝে আমরা নৌকা করে মাল নামাতে যেতাম। রেড ইণ্ডিয়ানরা বিরাট বিরাট গরুর গাড়ী ভর্তি করে সেগুলি নিয়ে যেত। আমাদের কাছে চামড়া আসত, আমরা আবার সেগুলি মাথায় করে নিয়ে আসতাম। এই কাজটি রপ্ত হওয়া বেশ সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

চামড়াগুলি পশুদের গা থেকে ছাড়াবার সময় দুই পাশে গর্ত করে নেওয়া হয়। শুখোবার সময় যাতে কুঁকড়ে ছোট না হয়ে যায় সেই জন্য গর্তের মধ্য দিয়ে শলাকা চালিয়ে টান টান করে পেতে রাখা হয়। তারপর লম্বালম্বি ভাবে দু ভাঁজ করে খচ্চরের পিঠে অথবা গাড়ীতে করে সেগুলি উপকূলে জোয়ারের দাগের একটু উপরে এনে জমা করা হয়। সেখান থেকে আমরা একটি দুটি করে মাথায় তুলে হাঁটুজল ভেঙ্গে নৌকায় বোঝাই করি। মাথা বাঁচাবার জন্য টুপি থাকত, তবে তাতে পরিশ্রম বিশেষ লাঘব হত না। ক্যালিফোর্ণিয়ায় নাকি মাথায় করে মাল বহন করাই রীতি। তাছাড়া সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউ থেকে দূরে রাখার জন্য চামড়াগুলি যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। চামড়ার টুকরোগুলি কাঠের মত শক্ত ও বেশ চওড়া, ওগুলি অন্য কোন উপায়ে বহন করা যায় কি না দেখেছি। কেন না আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা মাথায় করে মাল নিয়ে গেলে নিগ্রোদের মত দেখায়—কিন্তু বহু পরীক্ষার পর দেখা গেল এ ছাড়া উপায় নেই। মাটি থেকে ভারী ভারী চামড়াগুলি বহুকষ্টে মাথায় তুলেছি এমন সময় দমকা বাতাসে সব উল্টে পড়ে গেল—এমনও বহুবার হয়েছে। এখন সেই সব দৃশ্যের কথা ভাবলেও হাসি পায়। ক্যাপ্টেন আমাদের বোঝার উপর

শাকের আঁটি চাপালেন, আদেশ হল এখানকার রীতি একসঙ্গে দুটি করে চামড়া মাথায় করে আনা—আমরাও যেন তাই করি। এতে আমাদের পরিশ্রম দ্বিগুণ হল। যাই হোক প্রথম দু'মাস ঐভাবে কাজ করার পর অন্যদের দেখাদেখি আমরাও একটি করে চামড়া নিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম। তাতে পরিশ্রম একটু লাঘব হল।

কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকদের মত মাথায় ছুঁড়ে জিনিস নেওয়ার কায়দা বেশ রপ্ত হয়ে গেল। তখন অল্পক্ষণের মধ্যে দুশো থেকে তিনশো চামড়া অনায়াসে পার করে দিতে পারতাম। সর্বক্ষণ নোনা জলে ভিজে জুতোর অবস্থা শোচনীয় হবে, তাই আমরা খালি পায়েই হাঁটাহাঁটি করতাম, ফলে পায়ের যা দুরবস্থা হল অবর্ণনীয়। এরপর কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড় বেয়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করা।

বন্দরে জাহাজ ভিড়লে নাবিকদের কাজের ধরন কিছুটা বদলে যায়। সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। খুব ভোরে আলো ফোটবার আগে সকলের ডাক পড়ে। রাঁধুনী উনন জ্বালায়, স্টুয়ার্ড নিজের কাজে লেগে যায়, মাল্লারা ডেক ধুতে আরম্ভ করে। প্রধান মেট সমস্তক্ষণ ডেকে থাকলেও কাজে বিশেষ হাত লাগাবার চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয় মেট বেচারাকে পাজামা গুটিয়ে মাল্লাদের সঙ্গে কাজে নামতে হয়। সকাল আটটা অবধি চলে পরিষ্কার করার কাজ। আধঘণ্টার জন্য খাওয়া, তারপর নৌকা নামানো হয়। সেদিন কি ধরনের কেনাবেচা হবে তার উপর নির্ভর করে মাল্লাদের কূলে পাঠান হয়। যদি মালপত্র পৌঁছতে এবং কাঁচা চামড়া আনতে হয় তবে একজন উচ্চ কর্মচারীর সঙ্গে সমস্ত মাল্লাদের নৌকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া জাহাজের খোলেও কাজ পুরোদমে চলতে থাকে। মালপত্র বার করা, সরিয়ে চামড়া রাখার জন্য জায়গা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ইত্যাদি ছাড়াও নিত্যকার কাজ, যেমন দড়িদড়া মেরামত, শন কেটে কাছি তৈরী করা এই সব তো আছেই। বন্দরে থাকা অবস্থায় এই সমস্ত কাজ করায় সুবিধা। তবে সমুদ্রে পাহারার থেকে বন্দরে পাহারা দেওয়ার পদ্ধতি একটু পৃথক। সমুদ্রে দুই ভাগ করে মাল্লাদের পাহারায় ডাকা হয়—বন্দরে সারাদিন সকলকে কাজ করতে হয়। কেবল রাত্রে নোঙরের কাছে দুজন করে পাহারার পালা পড়ে। খাওয়ার জন্য এক ঘণ্টা ছুটি, তারপর ডেক ধুয়ে নৌকা তুলে আটটার মধ্যে সব অন্ধকার, কেবল দিগদর্শন যন্ত্রের

কাছে একটি আলো জ্বলে, আর নোঙরে পাহারা আরম্ভ হয়। বন্দরে যদিও সব কাজ দিনে, রাত্রে প্রত্যেকের দুঘন্টা পাহারা ছাড়া অন্য কাজ নেই—কিন্তু আলোর অভাবে ছেঁড়া কাপড় সেলাই বা পড়াশোনার কাজকর্ম রবিবারের জন্য তুলে রাখতে হয়। অনেক ক্যাপ্টেনের ধর্মভাব প্রবল, তাঁরা মাল্লাদের নিজেদের কাজকর্মের জন্য শনিবার বিকেলে ছুটি দেন—সুতরাং রবিবার সমস্ত দিনটা তারা বিশ্রামের জন্য পায়। আমরা কিন্তু অল্পেই সন্তুষ্ট—সপ্তাহে একটি রবিবার কাজ না করতে হলেই হল। অনেক সময় তা থেকেও আমরা বঞ্চিত হতাম। ছুটির দিন কাঁচা চামড়া এসে পৌঁছলে আমাদের তৎক্ষণাৎ নৌকা নিয়ে রওনা হতে হত; চামড়া বয়ে আনা, নৌকায় তোলা, নৌকা বেয়ে ফিরে আসা, এসব করতে করতেই দিনের অর্ধেক সময় শেষ। তা ছাড়া আর এক কারণে আমাদের রবিবার দিন নিরবিচ্ছিন্ন ছুটি ভোগ করার উপায় ছিল না। এখন সারা সপ্তাহের মাংসের সরবরাহ এসে পৌঁছত রবিবারে। সে মাংস ছাড়ান, পরিষ্কার করা, জাহাজে নিয়ে আসা ছিল আমাদেরই কাজ। সপ্তাহের অন্য দিন অনেক সময় সন্ধ্যার দিকে চামড়া এসে পৌঁছত, ফলে রাত বেড়ে যেত, তারার আলোয় আমরা নৌকা বেয়ে জাহাজে ফিরতাম।

এইসব অসুবিধা অবশ্য নাবিকদের ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত নয়—এবং আমরা হয়ত এই নিয়ে কোনদিন অভিযোগ করার কথা মনেও আনতাম না। কিন্তু আমাদের দেশে ফেরার অনিশ্চয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। কতদিন এই অচেনা অর্ধসভ্য দেশে চামড়া সংগ্রহ করে বেড়াতে হবে, কতদিন পরে আবার বস্টনে ফিরে পরিচিত জনদের মুখ দেখব এই চিন্তায় আমরা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। অথচ এ সম্বন্ধে সঠিক কোন খবরই কেউ দিতে পারছিল না। বস্টন ছাড়ার সময় শোনা গিয়েছিল দেড় দুই বছরের মধ্যে আমরা দেশে ফিরে আসব। কিন্তু এখন পশ্চিম উপকূলে পৌঁছে জানা গেল চামড়া পাওয়া ক্রমেই দুরূহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হয়ত আমাদের এক বছর অবধি এখানেই অপেক্ষা করতে হতে পারে। নিজেদের জাহাজে মাল বোঝাই করা ছাড়াও আমাদের বাণিজ্য সংস্থার অন্য একটি জাহাজের জন্য আমাদের মাল সংগ্রহ করে দিতে হবে—এবং সে জাহাজটি যে কবে আসবে তার কোন ঠিক নেই। ক্যাপ্টেন ও মেটের আলোচনা থেকে

আমরা আভাসে ইঙ্গিতে জেনেছিলাম যে একটি জাহাজ আসার কথা আছে, কিন্তু তখন গুজব মনে করে আমরা সে খবরে তত গুরুত্ব দিইনি। এখন চিঠি পেয়ে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। ক্যালিফোর্ণিয়া নামে জাহাজটি দুবছর ধরে এই অঞ্চলে চামড়া সংগ্রহ করে এখন সান ডিয়াগোতে আছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বস্টন যাত্রা করবে। যতগুলি সম্ভব চামড়ার টুকরো সংগ্রহ করে আমাদের সান ডিয়াগোতে জমা করে আসতে হবে, সেখান থেকে অন্য জাহাজ সেগুলি তুলে নেবে। সে জাহাজে চল্লিশ হাজার চামড়ার টুকরো যাবার কথা। তারপরে আমরা আবার নতুন করে আমাদের জাহাজের খোল ভর্তি করতে আরম্ভ করব। এই শুনে আমাদের সব আশা ভরসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ক্যালিফোর্ণিয়ার চেয়ে অনেক ছোট জাহাজ লাগোডা, তাদের বত্রিশ হাজার টুকরোর বেশী নেবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু দুবছর হতে চলল তাদের এখনো চামড়া জোগাড় করা শেষ হয়নি—আর আমরা নিজেদের জাহাজ ছাড়াও অন্য এক জাহাজের জন্য চল্লিশ টুকরা সংগ্রহ করে দেব—তার উপর চামড়া ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে জাহাজটির কথা আমরা গুজব মনে করে অবিশ্বাস করে এসেছি, সেটি যে সত্যিই চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে এবং তার নাম ধাম সবই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেল। আমরা বস্টন ছাড়ার কয়েক মাসের মধ্যেই জাহাজটি ওখানে পৌঁছবার কথা ছিল—জাহাজের নাম অ্যালার্ট। আমরা হতাশ হয়ে ভাবলাম এখানে নির্ঘাত এখনো তিন চার বছর! মাল্লাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তারা বলতে লাগল বোধ হয় ইহজীবনে আর বস্টনের মুখ দেখতে পাব না, ক্যালিফোর্ণিয়াতেই দেহ রাখতে হবে। এতদিনের জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত হয়ে আসিনি, পোশাকে টান পড়তে লাগল, অন্যান্য জিনিসও ফুরিয়ে এল, কিন্তু কোনটিই আমাদের কেনার সাধ্য নয়, দাম এত বেশী। আমার অবস্থা তো আরো শোচনীয়। সারা জীবন নাবিক হয়ে কাটাবার কোনই বাসনা ছিল না আমার, কেবল দেড় দুই বছরের জন্য এই পেশা অবলম্বন করেছিলাম। তিন চার বছর এইভাবে কাটাবার পর হয়ত ইচ্ছা করলেও আর আগের জীবনে ফিরে যেতে পারব না—মনে এই আশঙ্কা দৃঢ়মূল হল। ততদিনে আমার বন্ধু ও সহপাঠীরা এত দূর এগিয়ে যাবে যে আমার পক্ষে বিদ্যার্জন শেষ করে কোন ভদ্র জীবিকা অবলম্বন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শেষে সমস্ত জীবন কাটবে নাবিক হয়ে—বড় জোর কোন জাহাজের কর্তৃত্ব করা অবধি যাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৌড়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার কষ্ট, দেশে ফেরার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ছাড়াও আমাদের নিরুৎসাহের আর একটি কারণ ছিল। যে পাণ্ডববর্জিত দেশে আমরা কয়জন ছিলাম সেখানে না আছে আইন, না আছে শৃঙ্খলা, ক্যাপ্টেনই সর্বেসর্বা, তিনিই হর্তাকর্তা বিধাতা। তেমন প্রয়োজন হলে সুবিচার প্রার্থনা করার মত কেউ নেই। আমাদের মনোবল একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিন ধরে পরিশ্রম করে অন্যের জন্য চামড়া সংগ্রহ করে যাচ্ছিলাম যন্ত্রের মত। নিজেদের মনে মনে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করলাম।

সকলের যখন এইরকম মানসিক অবস্থা তখন যে অকারণে পুঞ্জীভূত আক্রোশ ফেটে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি। গণ্ডগোল আরম্ভ হল প্রধান মেটকে নিয়ে। মেট ছিলেন খুবই সত্যনিষ্ঠ ও দয়াবান, বোধহয় আমাদের জাহাজের পক্ষে একটু বেশী মাত্রায় দয়ালু। উনি কোনদিন মাল্লাদের কাউকে একটিও কটু কথা বলেননি, প্রহার তো দূরের কথা। এদিকে ক্যাপ্টেন টমসনের ছিল বিপরীত চরিত্র। বজ্রকঠোর হাতে জাহাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন উনি। নিজে যেমন রুক্ষ, কঠিন, আশা করতেন ওর কর্মচারীরাও তেমন হবেন। ওঁর শরীর ছিল যেন ইস্পাতে তৈরী, তাতে কমনীয়তার চিহ্ন মাত্র নেই। অবসাদ কাকে বলে উনি জানতেন না। আমি কখনো ওঁকে ডেকে দাঁড়িয়ে ছাড়া বসতে দেখিনি। ওঁর সন্দেহ হল মেট মাল্লাদের সঙ্গে যথোপযুক্ত কঠোর ব্যবহার করছেন না, এবং শাসনে শৈথিল্য দেখা দিচ্ছে! ফলে প্রত্যেক ব্যাপারে উনি হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। যেহেতু মেট আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন সেজন্য আমাদের সহানুভূতিও ছিল ওঁর দিকে—তাতে ক্যাপ্টেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দেখা গেল ক্যাপ্টেন, ওঁর কর্মচারী এবং মাল্লারা, কেউই কাউকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়—যে যা করতে যায় তাতেই হয় হিতে বিপরীত। প্রবাসে দীর্ঘ দিন থেকে একেই আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি, তার উপর ক্যাপ্টেন আরো বেশী করে আইনানুবর্তিতা জারি করতে লাগলেন। সুবিচারের কোন আশা নেই দেখে আমাদের অস্বস্তির সীমা ছিল না, ক্যাপ্টেন দেখলেন এই সুযোগ। যেহেতু তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা,

সুতরাং তাঁর কথা শোনা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। অত্যাচার থেকে বিক্ষোভ, বিক্ষোভের আভাস দেখে আরো অত্যাচার—এইভাবে চলল। অনিচ্ছুক লোকদের দিয়ে যে ভাল কাজ পাওয়া যেতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। নাবিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে উপরওয়ালার কাছ থেকে একটু সদয় ব্যবহার পেলে কোন কষ্টই তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের বেঁধে রাখা হল অবিশ্রাম খাটুনির চক্রে। সকাল থেকে রাত অবধি ডেকে কাজ, অন্ধকার হলে নীচে নেমে ঘুম—এইভাবে সময় কাটছিল। কাপড় কাচা বা পড়াশোনা করার কোনই উপায় নেই। বন্দর থেকে বন্দরে যাতায়াতের সময় পালা করে সারাদিন পাহারার পরিবর্তে আমাদের সকলকে সমস্তদিন অকারণে ব্যস্ত রাখা হত। কিছু করার না থাকলে শনের নুড়ি কুড়োও। প্রবল বৃষ্টির সময় আমাদের খোলা ডেকে ত্রিপলের টুপি পরে দাঁড়িয়ে পুরোনো দড়ি কুচোতে বা পাল বাঁধার দড়ি টাঙ্গাতে হত। পাছে আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলি এজন্য আমাদের বেশ দূরে দূরে দাঁড়াতে হত। বন্দরে যখন দুটি নোঙরই ফেলা, একজনের বেশী ডেকে পাহারায় থাকার দরকার নেই, তখনও ঐ একই ভাবে আমাদের জব্দ করা হত।

সান্টা বারবারাতে আর একটি দক্ষিণে ঝড়ের কবলে পড়েছিলাম। গতবারের মত এবারেও রাত্রের দিকে আরম্ভ হল ঝড়। দক্ষিণ কোণ থেকে কালো কালো কুণ্ডলীকৃত মেঘ এসে পর্বত, বাড়ীঘর ঢেকে দিল, মনে হল যেন বাড়ীর ছাদ ছুঁয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের তাণ্ডব আর ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে আমরা পাল উঠিয়ে চারদিক ভেসে বেড়ালাম। চারদিন সমানে বর্ষণ চলল, মনে হল বছরের বাকি সময়টা আর বৃষ্টি না হলেও চলবে। পঞ্চম দিনে আকাশ পরিষ্কার হল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হুড়হুড় করে আবার বৃষ্টি, চার ঘণ্টা ধরে ধারাজলে স্নান করে দেখি আমরা নোঙরের জায়গা থেকে দশ লীগ * সরে এসেছি। বাতাস একটু কমবার পর আমরা ষষ্ঠ দিনে আবার নোঙর ফেললাম। এবার অনুকূল বাতাসে সান ডিয়াগো যাত্রা করার তোড়জোড় চলল। সেখানে ক্যালিফোর্ণিয়া নামধারী জাহাজটির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। কিন্তু পথিমধ্যে সান পেড্রো নামে আর একটি

* লীগ—প্রায় দেড় ক্রোশ।

বন্দরে আমাদের থামবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কয়েক হপ্তা থাকতে হবে, অথচ ক্যালিফোর্ণিয়া ইতিমধ্যে সান ডিয়াগো ছেড়ে যাত্রা করে দেবে—কাজেই আমাদের সঙ্গে তাদের আর মিলিত হওয়ার সুযোগ হল না। জাহাজ ছাড়ার ঠিক আগে ক্যাপ্টেন মির রাসেল নামে এক ব্যক্তিকে জাহাজে নিয়ে এলেন, বেঁটেখাটো দুর্বৃত্তের মত চেহারা, এক চোখ কানা, চুলগুলি লাল। ক্যাপ্টেন তাকে উচ্চ কর্মচারী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালেন তিনি নাকি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এই সমাচারে আমরা মোটেই প্রীত হলাম না। একে তো আমাদের লোকাভাব, একজন সমুদ্রে ডুবে গেছে, অন্যজন দ্বিতীয় মেটের পদে উন্নীত হয়েছে। তার পরিবর্তে আমাদের উপর নজর রাখার জন্য আরেকজন কর্মচারী বহাল হলেন! এই নিয়ে উপরওয়ালা হলেন সব সুদ্ধ চার। আর আমরা মাল্লা সর্বসাকুল্যে ছজন।

আমরা কূল ঘেঁষে চললাম। ভূমি অসমতল, সর্বত্রই বালি, কোথাও গাছপালা দেখা গেল না। ডাঙ্গার একটি উঁচু মুখের কাছে এসে আমরা নোঙর ফেললাম, কূল থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে। এ যেন নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে নামবার জন্য গ্রেট ব্যাঙ্কস এ নোঙর ফেলা। জমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে আসার জন্য দূরত্ব আরো বেশী মনে হচ্ছিল। আমরা মনে করলাম জাহাজ না এনে এখানে তো আমরা অনায়াসে নৌকা নিয়ে আসতে পারতাম। এখানে যে কি জন্য আসা তাও আমাদের বোধগম্য হল না। গাছপালাশূন্য নির্জন প্রান্তর, কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। নোঙর ফেলার পর আমরা দক্ষিণে হাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই রইলাম কেননা জায়গাটা খোলা, যে কোন দিক থেকে বাতাস বইতে পারে। নৌকা নামান হতে আমাদের নবনিযুক্ত কর্মচারী মহাশয় হাল ধরে বসলেন। এ অঞ্চলে তাঁর নাকি আসা যাওয়া আছে। তখন ভাঁটার সময়, আমরা জলের নীচে পাথরগুলিতে সামুদ্রিক গুল্ম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। নৌকা ভিড়িয়ে আমরা খালি পায়ে তীরে এলাম। জোয়ারের জলের দাগ সেই অবধি পৌঁছেছে। কেবল সর্ষে গাছের চারা ছাড়া কোথাও কোন উদ্ভিজ্জের চিহ্নমাত্র নেই। সামনেই একটি নীচু পাহাড়, সেটি তিরিশ চল্লিশ ফিট উঁচু, জাহাজ থেকে চোখে পড়েনি। পাহাড়ের অপর পার থেকে তিনটি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদের পোশাকে স্থানীয় পরিচ্ছদ ও

নাবিক বেশের একটা সংমিশ্রণ। কাছে আসতে বোঝা গেল তারা ইংরাজ। তাদের জাহাজ নাকি ঝড়ে এইখানে এসে লাগে, তারপর থেকে তারা এইখানেই বাস করছে। পাহাড় পেরিয়ে তাদের ছোট বাড়ী। বাড়ীতে একটিমাত্র ঘর, বাকিটা সম্পূর্ণ হয়নি। ঘরে জিনিসপত্র বলতে চুল্লী, রান্নার সরঞ্জাম ও মাল রাখার জায়গা। বাড়ীটি তৈরী করেছে পুয়েব্‌লো শহরের জনকয়েক ব্যবসায়ী, তারা এটা গুদাম হিসাবে ব্যবহার করে এবং জাহাজ ভিড়লে তারা যখন কেনাবেচা করতে আসে তখন এইখানেই বাস করে। জিনিসপত্র দেখাশোনা করার ভার দিয়ে তারাই এই লোক তিনটিকে রেখেছে। এরা বৎসরাধিক কাল এখানে আছে, কাজকর্ম বলতে বিশেষ কিছুই নেই, আহার্যের মধ্যে আছে মাংস, বরবটি ও শক্ত রুটি। ধারে কাছে জনবসতি নেই। সবচেয়ে কাছের খামারটি তিন মাইল দূরে। আমাদের সঙ্গের কর্মচারীর অনুরোধে ওদের একজন সেই খামারে ঘোড়া আনতে গেল, যাতে কর্মচারী মহাশয় অশ্বপৃষ্ঠে পুয়েব্‌লো শহরে যেতে পারেন। তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল সান ডিয়াগো থেকে সান পেড্রো বাতাসের দিকে গেলে আশী মাইল। সেখান থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া জাহাজটি বস্টনের দিকে পাড়ি দিয়েছে, লাগোডাতে এখনও মাল তোলা হচ্ছে। আয়াকুচো ও লরিয়োটও এখন ওখানেই আছে। সান ডিয়াগো ছোট হলেও সুন্দর বন্দর, পোতাশ্রয়টি উত্তম, জলে ঢেউ নেই, চারিদিক ঘেরা। এটি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যেক জাহাজের নিজস্ব মাল গুদাম আছে সেখানে চামড়া সংগ্রহ করে গুদামজাত করা হয়। তারপর উপকূলবর্তী সমস্ত অঞ্চল থেকে যা সংগ্রহ করার করে এইখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে মাল জাহাজে তুলে দেশের দিকে যাত্রা করে। লাগোডাতে এখন মাল তোলা আরম্ভ হয়েছে। আমাদের হয়ত এই অবস্থায় পৌঁছতে বছর দুই লেগে যাবে—একথা মনে না এসে পারল না।

আমরা যে পাণ্ডববিবর্জিত কূলে জাহাজ ভিড়িয়েছিলাম সেটাই নাকি চামড়া সংগ্রহের সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা—শুনে বেশ আশ্চর্য বোধ হল। মাইল তিরিশ ভিতরে গেলে সুন্দর সমতলভূমি, সেখানে পশু প্রচুর। পুয়েব্‌লো ডি লস এঞ্জেলস এই অঞ্চলে অবস্থিত, ক্যালিফোর্ণিয়ার সবচেয়ে বড় শহর, বহু ধনী ধর্মসম্প্রদায়ের বাস। এই সমস্ত অঞ্চলটির একমাত্র বন্দর সান পেড্রো।

পরদিন ঘোড়ার ব্যবস্থা হবার পর আমরা আবার সেই শেওলা ঢাকা

পাথরের উপর দিয়ে ফিরে চললাম। অন্ধকারে জাহাজ দেখা যাচ্ছিল না। আমরা যখন ফিরলাম তখন মাল্লারা খেতে বসে গেছে। আহারাদির পর ধূমপান করতে করতে যথারীতি আমাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে হল। জায়গাটি যে বিশেষ সুবিধার নয় একথা আমরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলাম। চামড়া মাথায় করে পাহাড়ে উঠতে হতে পারে এই সম্ভাবনা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা হল, তারপর আমরা সান ডিয়াগো, লাগোডা জাহাজ ইত্যাদির কথা বলাবলি করলাম।

পরদিন দালাল মহাশয় পুয়েব্লো শহরের দিকে রওনা হলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর যাওয়ার ফল দেখা গেল* গরুর গাড়ী ও খচ্চর বোঝাই কাঁচা চামড়া আসতে আরম্ভ করল। আমরা নানাধরনের মালপত্র নৌকায় তুলে কূলে পৌঁছলাম। কূলে নেমে কাঠের বাক্সগুলি গড়িয়ে দিয়ে আমরা গরুর গাড়ীগুলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সেটা মনঃপূত হল না। উনি বলদের কাজও আমাদের দিয়ে করাবেন। বললেন ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমাদের মাল বহন করে পাহাড়ে উঠতে হবে। বৃষ্টিতে পিছল মাটি, তার উপর পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠতে আমাদের যে কি অসুবিধা হল তা সহজেই অনুমেয়। ভারী পিপেগুলি কাঁধ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে কোনমতে উপরে উঠতে লাগলাম। প্রতিমুহূর্তেই পদস্খলনের আশঙ্কা,তা হলেই বাক্সগুলি আমাদের ঘাড়ে পড়বে। সবচেয়ে বিপদ হচ্ছিল চিনির পিপেগুলি নিয়ে। পিপেগুলি দাঁড়ের মধ্যে ঝুলিয়ে সেই দাঁড় কাঁধে তুলে ধীর মন্থর গতিতে আমরা চড়াই ভাঙ্গতে লাগলাম যেন শোকযাত্রা চলেছে। ঘণ্টা দুই বাদে সমস্ত মাল পাহাড়ের ওপারে পৌঁছে গেল। সেখানে চামড়া বোঝাই সারি সারি গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে। চামড়া নামিয়ে আমাদের মাল গাড়ীতে ভর্তি করা আরেকটি শ্রমসাধ্য কাজ। গাড়ীর চালক রেড ইণ্ডিয়ানরা কাছেই বসে ছিল, একটি আঙ্গুল তুলেও তারা আমাদের সাহায্য করতে এগোল না। আমরা অনুরোধ করতে তারা কেবল মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে।

গাড়ী বোঝাই হলে ষাঁড়দের লম্বা ছপটি দিয়ে আঘাত করে রেড ইণ্ডিয়ানরা চলতে আরম্ভ করল, এক একটি ষাঁড়ের দুপাশে দুজন করে। এবার আমাদের নৌকায় চামড়ার টুকরোগুলি নিয়ে যাওয়ার পালা। আমরা পাহাড়ের খাড়াই-এর কাছে নৌকা নিয়ে এলাম। পাহাড়ের মাথা থেকে

চামড়াগুলি গড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল, কয়েকটি অবশ্য মাঝপথে আটকে গেল, তখন আমাদেরই নেমে গিয়ে সেগুলি ঠেলে দিতে হচ্ছিল। ফলে শরীর ও পোশাকের যে ধূলিধূসরিত অবস্থা হল তা অবর্ণনীয়। তারপর পাথুরে মাটি ও জল ভেঙ্গে সেগুলি নৌকায় তোলা। সেই অবস্থায় কোন জুতোই আস্ত থাকতে পারে না, কাজেই আমরা কাজ করছিলাম খালি পায়ে। এইভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করে কয়েকদিন কাটল। প্রায় দুহাজার টুকরা চামড়া সংগ্রহ হবার পর ব্যবসায় একটু মন্দা পড়ল। তখন আমাদের জাহাজের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার রাত্রে উত্তরদিক থেকে দমকা বাতাস আসায় আমাদের একটি নোঙর নামাতে হল। রাত্রে মাস্তুলের চতুর্থ অংশের উপরের পালদণ্ডটি নামাবার জন্য আমাদের ডাক পড়ল। স্টিমসন ও আমি দুজনে মিলে কাজে লেগে গেলাম। ততদিনে আমরা এই সব কাজে বেশ পটু হয়ে গেছি। মাল্লাদের মধ্যে একটি অল্পবয়সী ছেলে ছাড়া আমরা দুজনেই ছিলাম সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ।

॥ ১৫ ॥ উত্তম মধ্যম ॥

এরপর কিছুদিন যাবৎ ক্যাপ্টেনের মেজাজ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে রইল। যা দেখেন তাতেই বিরক্ত। ডেকে কাঠ ফেলেছে বলে রাঁধুনীকে ভর্ৎসনা করলেন। মেটের সঙ্গে অযথা বিবাদ আরম্ভ করলেন। মেট উত্তরে বললে নাবিকের কর্ম তার ভালোমত জানা আছে, তার শিক্ষাগুরু ছিলেন সত্যকার নাবিক—এই শুনে ক্যাপ্টেন রাগে গুম্ হয়ে রইলেন। সাধারণতঃ ক্যাপ্টেনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ত স্যাম নামে একটি নিরীহ প্রকৃতির মাল্লার উপর। দোষের মধ্যে সে কথা বলত আস্তে আস্তে, কাজকর্মেও তেমন চটপটে ছিল না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। তবু ক্যাপ্টেন ওকে কিছুতেই দেখতে পারতেন না। কুঁড়ে মনে করে সব কাজে তার দোষ ধরতে আরম্ভ করলেন। নাবিকদের মধ্যে একটা কথা আছে যে বদনামের ভাগী হওয়ার থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়াও ভাল। মাস্তুলের দণ্ড থেকে একটা লোহার ফলক হাত ফসকে পড়ে গেল, দোষ হল স্যামের। শুক্রবার দিন ক্যাপ্টেন সমস্তক্ষণ জাহাজে ছিলেন, ফলে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। অনিচ্ছুক কর্মী নিয়ে কাজ করানো যায় না, আমাদের অবস্থাও হল তাই। শুক্রবার

ছুটি হতে হতে রাত অনেক হয়ে গেল, আবার শনিবার ভোর না হতেই ডাক পড়ল সবার। দশটা আন্দাজ আমাদের নূতন উচ্চ কর্মচারী মিঃ রাসেলকে কূলে নিয়ে যাবার জন্য ডিঙ্গি বার করতে আদেশ দেওয়া হল। মিঃ রাসেল আমাদের মধ্যে একেবারেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। যাই হোক আমরা প্রস্তুত, জন নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে, আমি ও মিঃ রাসেল প্রবেশ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করছি, এমন সময় ক্যাপ্টেনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কার সঙ্গে ওঁর বচসা হচ্ছিল, মেট না কোন 'মাল্লার সঙ্গে, ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তারপরেই শোনা গেল প্রহারের শব্দ। আমি জনকে আসতে ইঙ্গিত করে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে উঁকি মেরে নীচে কি হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছু দেখা গেল না। তবে ক্যাপ্টেন যে কাউকে উত্তম মধ্যম দিয়েছেন ওঁর গলার স্বরে পরিষ্কার বোঝা গেল—

"দেখছো! নিজের অবস্থাটা দেখছো! আর কখনো আমার মুখের উপর কথা বলার সাহস হবে, কি আস্পর্ধা!" কোন উত্তর নেই, ভারী নিঃশ্বাস পতন ও নড়াচড়ার শব্দ, লোকটি প্রাণপণ শক্তিতে ওঠার চেষ্টা করছে মনে হল। "একটু নড়াচড়ার চেষ্টা কোরো না, খবরদার। উঠেছো কি মরেছো! কি? আর কখনো মুখের ওপর চোটপাট করবে?"

"আমি তো চোটপাট করিনি", স্যামের গলা।

"আমি সেকথা জিগেস করিনি। আর কখনো আমার সামনে অভদ্রতা করবে?"

"আমি তো অভদ্রতা করি নি", ক্ষীণকণ্ঠে বললে স্যাম।

"আমার কথার উত্তর দাও নইলে হাড় কখানা একেবারে চ্যাপ্টা করে দেব।"

"আমাকে কি নিগ্রো চাকর পেয়েছেন?" স্যাম বললে।

"তোমাকে দেখাচ্ছি চাকর কি চাকর নয়" বলেই ক্যাপ্টেন এক লাফে ডেকের উপর চড়ে কোট খুলে জামার হাতা গুটিয়ে মেটকে বললেন "ওকে নিয়ে আসুন উপরে, আজ দেখাচ্ছি কে কার চাকর।"

ক্যাপ্টেনের পিছন পিছন অন্যেরা সকলে উপরে উঠে এল। বেশ কয়েকবার বলার পর মেট স্যামকে নিয়ে এলেন। স্যাম বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করলে না।

সুইডেনবাসী জন ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করলে "খামোখা ওকে মারছেন কেন?"

এই শুনে ক্যাপ্টেন খাপ্পা হয়ে জনের দিকে ফিরলেন, কিন্তু ওর সঙ্গে একা এঁটে উঠতে পারবেন না জেনে রাসেলকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন আর স্টুয়ার্ডকে বললেন লোহার হাতকড়া নিয়ে আসতে। উনি জনের কাছে এগোতেই জন বললে "আমাকে ধরবার জন্য গায়ের জোর দেখাবার প্রয়োজন নেই—এই নিন লাগান হাতকড়া" বলে হাত এগিয়ে দিলে। জনকে হাতকড়া বেঁধে উপরের ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। স্যামকে ইতিমধ্যে জামা খুলে মাস্তুলের দড়ির সঙ্গে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। ক্যাপ্টেন কয়েক ফুট দূরে একটা শক্ত দড়ি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে, কর্মচারীরা ঘিরে দাঁড়িয়ে, মাল্লারাও একটু দূরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে জড়। ঈশ্বরের হাতে তৈরী একজন মানুষের এই অবমাননা দেখে ক্রোধে অপমানে ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। এই লোকটি আমার নিত্যকার কাজে, আহারে, বিহারে সঙ্গী—একে এরকম পশুর মত নির্দয়ভাবে প্রহার করতে দেখে আমি যন্ত্রণায় মূর্ছিত প্রায় হলাম। প্রতিবাদ করার ইচ্ছা যদিও বা কারো মনে জেগে থাকে সেটা কাজে পরিণত করার উপায় নেই। এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে দু জন বন্দী। স্টিমশন আমি ও একটি বালক ছাড়া বাকি ছিল আর দুজন মাল্লা। বিদ্রোহ করার মত লোকবল কই? আমাদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন, তিনজন কর্মচারী, স্টুয়ার্ড, দালাল ও কেরানী, তা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ওদের হাতে। অস্ত্রবল ছাড়াও ওদের আর একটি সুবিধা ছিল। মাল্লারা প্রতিবাদ করলে সেটা হল বিদ্রোহ, জিতে গেলে সেটা হল ডাকাতি। অপরাধের শাস্তি তারা কোন না কোন সময়ে পাবেই। যদি কোন দিন ধরা না দেয় তবে সে নাবিকের ভবিষ্যৎ কি? উচ্চ কর্মচারীর আদেশ অমান্য করলে দুটি পথ খোলা আছে। বিদ্রোহ করে জাহাজ অধিকার করা কিংবা আইনের হাতে ধরা দেওয়া। সুতরাং আমরা নিরুপায় আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন দড়ি ঘুরিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে স্যামের পিঠে মারলেন —একবার, দুবার, ছবার। "আর কোনদিন আমার মুখের ওপর কথা বলার সাহস হবে?" স্যাম যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, কিন্তু কোন কথা বললে না! আবার চলল অমানুষিক অত্যাচার—একবার স্যাম কি যেন বলার চেষ্টা করল। তাতে প্রহারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। শেষে যথেষ্ট হয়েছে বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন ওকে ছেড়ে দিলেন।

"এবার তোমার পালা" বলে ক্যাপ্টেন জনের হাতের হাতকড়া খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে জন এক ছুট লাগাল। "ধর, ধর" চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন। দ্বিতীয় মেট প্রথমদিকে ছিল আমাদেরই একজন। সে ডেকের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেট অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগোবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমাদের তৃতীয় কর্মচারীটি কাজ দেখাবার উৎসাহে ওকে দৌড়ে ধরতে গেল। জন তাকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে ফেললে। ক্যাপ্টেনের দু চোখ রাগে জ্বলতে লাগল। হাতের দড়ি আছড়ে সমানে চেঁচাতে লাগলেন, "ধরে আন শয়তানকে, আজ ওর মজা বার করছি।" মেট এবার জনকে মৃদুকণ্ঠে ডাকলে, জন দেখলে ধস্তাধস্তি করে লাভ নেই, সুতরাং নিজেই এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলে। ক্যাপ্টেন ওকে বাঁধবার উদ্যোগ করতেই আবার টানা হ্যাঁচড়া আরম্ভ করলে। মেট ও রাসেল ওকে ধরাধরি করে বেঁধে দিলে। ক্যাপ্টেন হাত গুটিয়ে মারবার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দিকে ফিরে জন জিজ্ঞাসা করলে কি অপরাধে তাকে মারা হচ্ছে। "আমি কখনো কাজে গাফিলতি করেছি? আমাকে কখনো অভদ্রতা বা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে দেখেছেন?"

"না, আর সেজন্য তোমাকে আমি শাস্তি দিচ্ছিও না, তুমি অযথা প্রশ্ন করেছিলে তাই শাস্তি পাবে।" "আমাদের কি প্রশ্ন করলেও মার খেতে হবে?" "নিশ্চয়।" রাগে দিশেহারা হয়ে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠলেন। "এই জাহাজে আমি ছাড়া আর কারো মুখ খোলার অধিকার নেই।" ঘুরে ঘুরে চাবুক পড়তে লাগল, "কেন মারছি যদি জানতে চাও তবে শোনো, আমার ইচ্ছে তাই মারছি, বুঝলে—আমার ইচ্ছে।"

জন ছটফট করতে করতে শেষে আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান।" বিদেশীরা সাধারণতঃ উচ্ছ্বাস বা দুঃখ প্রকাশ করতে ভগবানের নাম করে, আমরা তত করি না।

ক্যাপ্টেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন "ভগবানকে ডেকে কি হবে—ভগবান তোমার কি করবে। ডাকতে হয় ডাকো ক্যাপ্টেন টমসনকে। আমিই তোমাদের ভগবান।"

এই কথাগুলি কানে যেতেই আমার শিরায় শিরায় বরফের স্রোত বয়ে গেল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে অন্য দিকে ফিরলাম। নীচে জলের দিকে চেয়ে ভাবলাম আমার কি অসহায় অবস্থা। মুহুর্মুহুঃ

চাবুকের আওয়াজ হচ্ছে। আহত লোকটির কাতর আর্তনাদ আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত গোলমাল করে দিতে লাগল। দেশে ফিরে কি করে এই পাষণ্ড ক্যাপ্টেনের যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় এই চিন্তা একবার মনে উদয় হল। ক্রমে মার বন্ধ হল। ফিরে দেখি মেট জনের বাঁধন খুলে দিয়েছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কোনো মতে নীচে নেমে গেল জন। আমরা সকলে স্থাণুর মত যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্যাপ্টেনের রাগ তখনো কমেনি। দম্ভভরে পায়চারি করতে করতে আমাদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী বর্ষিত হতে লাগল—"এবারে বুঝেছো আমি তোমাদের কি হাল করতে পারি? আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছ তোমরা, একটু নড়চড় দেখলেই সব কটাকে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেব। ক্যাপ্টেন টমসনকে চেনোনি এতদিনে? এবার ভাল করে চিনে রাখো। আমার কাছে কারো নিস্তার নেই—ঐ ছোট ছেলেটারও না। ক্রীতদাসদের যেমন করে খাটায় তেমনি করে তোমাদের খাটিয়ে মারব—আবার যদি শুনি তোমরা নাকি চাকর নয়। তোমরা ক্রীতদাস নয় তো ক্রীতদাস কে?" ভবিষ্যতে যাতে ওঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস না পায় সেজন্যেই এই শাসানি। আমরা নীরবে শুনে গেলাম। ক্যাপ্টেন চলে যাবার খানিকক্ষণ পরে জন এসে স্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতস্থানে লাগাবার জন্য মলম পাওয়া যেতে পারে কি না। তার সমস্ত পিঠে ছড়া ছড়া দাগ বসে গেছে, আহত জায়গা ফুলে উঠেছে। ওর কথা ক্যাপ্টেনের কানে গিয়েছিল, চেঁচিয়ে বললেন "ওষুধ আবার কি, গায়ে জামা দাও, দিয়ে নৌকা বার কর, আমি কূলে যাব। কেউ আয়েশ করে বসে থাকতে পারবে না একথা বলে রাখছি।" মিঃ রাসেলকে ডেকে ক্যাপ্টেন বললেন নৌকায় অপরাধী দুজন এবং আরো দুজন মাল্লা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আসতে। আমিও এই দলে যোগ দিলাম। জন ও স্যাম পিঠ বেঁকাতে পারছিল না, কিন্তু ক্যাপ্টেন নিষ্ঠুরভাবে ওদের দাঁড় বাইতে আদেশ দিলেন। ওরা দাঁড় ঠিকমতই বাইল, ক্যাপ্টেন আর রাগারাগি করার সুযোগ পেলেন না। সমস্ত পথ কারো মুখে কথা নেই। কূলে পৌঁছে ক্যাপ্টেন ও তাঁর অনুচরবৃন্দ নেমে কাজে গেলেন, আমরা নৌকার কাছে রইলাম। জন ও স্যাম একটু দূরে গিয়ে একটা পাথরের উপর বসল। খানিকক্ষণ কি পরামর্শ হল, তারপর ওরা দুজনে

আলাদা হয়ে গেল। জন একে বিদেশী, অত্যন্ত বদমেজাজী, তার উপর সঙ্গে সব সময় একটা ছুরি রাখত—আমি একটু ভীত হলাম। ক্যাপ্টেন যখন একা নৌকায় ফিরবেন তখন ও কিছু করে না বসে। কিন্তু কিছুই হল না। আমরা নীরবে আবার জাহাজে ফিরে গেলাম। ক্যাপ্টেন নিশ্চয় সশস্ত্র ছিলেন। আর তাছাড়া ক্যাপ্টেনকে আক্রমণ করার পরিণতি তো ভাল করেই জানা আছে। পলায়ন ছাড়া বাঁচবার অন্য পন্থা থাকবে না। হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার অরণ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাল কাটান অথবা রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়া। পঁচিশ ডলার পুরস্কারের লোভে তারা নিশ্চয় আবার বন্দীকে ক্যাপ্টেনের হাতেই ফিরিয়ে দেবে।

সেদিন শনিবার। কিন্তু রাত্রে খাওয়ার সময় সকলেই বিমর্ষ, কোলাহল নেই, প্রণয়িনীদের স্মরণ করে গানও বন্ধ। খাওয়া হয়ে গেলে যে যার তক্তার উপর চিত হলাম। আহত লোক দুটি এপাশ ওপাশ করে ছটফট করছিল। মাথার উপর মিটমিটে ম্লান আলো। আমি শুয়ে শুয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকারের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন অবশ্য আমার গায়ে কোনদিন হাত দিতে সাহস করবেন না জানতাম, কিন্তু এই পাণ্ডব বিবর্জিত দেশে এক অত্যাচারী ক্যাপ্টেনের কাছে নিজেদের ভাগ্য সমর্পণ করে দেওয়ার কথা যতই ভাবতে লাগলাম চোখে আর ঘুম এল না। সেই সঙ্গে দেশে ফেরার অনিশ্চয়তা ও ফিরলেও সুবিচারের সম্ভাবনা কতদূর এইসব ভাবনা মনের মধ্যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে চলল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমাকে যদি ভগবান কোনদিন ক্ষমতা দেন তবে এই অসহায় মাল্লাদের যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা নিশ্চয় করব।

পরদিন রবিবার। সকালে প্রাতরাশের আগে পর্যন্ত ধোয়া মোছার কাজ। পরে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আমরা কূলে এলাম চামড়া সংগ্রহ করতে। আগের দিন রাত্রে কিছু চামড়া এনে তীরে রাখা ছিল, আমাকে সেখানে পাহারায় দাঁড় করিয়ে ক্যাপ্টেন প্রস্থান করলেন। বললেন রাত্রে আবার নৌকা আসবে। একতলা বাড়ীতে সেই তিনটি লোকের সঙ্গে আহার তারপরে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে শেষে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। কিছুই করার নেই। লোকগুলির কাছে একটা বই পর্যন্ত ছিল না। অদূরে আমাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে, যেখানে সম্প্রতি মানা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল —আর একটু দূরে একটি গাছপালাহীন ন্যাড়া দ্বীপ। সেখানে এক ইংরাজের

সমাধি আছে, তিনি এক বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন, এখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই জনহীন নির্জন দ্বীপে ঐ সমাধি আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার করল। মনে হল একাকী বন্ধুহীন অবস্থায় শেষ শয্যায় শুয়ে সেই ক্যাপ্টেন কেমন যেন পারিপার্শ্বিকের নির্জনতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ সঠিক জানা যায়নি—অনেকে সন্দেহ করেন বিষপানে মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু এ নিয়ে কেই বা অনুসন্ধান করবে। কোন রকম অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া বা মন্ত্রপাঠ না করে তাড়াহুড়া করে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। এই স্থানটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল—ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্য কোন স্থান এমন রেখাপাত করেনি।

বিকেল থেকে নৌকার প্রতীক্ষা করছি। সন্ধ্যার সময় জলের বুকে একটি ছোট দাগ দেখা গেল। ক্যাপ্টেন গম্ভীরমুখে কূলে এসে নামলেন। শুনলাম চামড়াগুলি সে রাত্রে জাহাজে তোলা হবে না। আমাকে এখানেই রাত্রিবাস করতে হবে। আমার জন্য কম্বল ও মোটা জামা আনা হয়েছিল। আমার খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করে ক্যাপ্টেন বললেন চামড়াগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে। মাল্লাটিকে একান্তে পেয়ে আমি খোঁজ নিলাম জাহাজে দিন কেমন গেছে।

"খারাপ, খুব খারাপ। কেবল খাটুনি আর গাল-মন্দ।"

"সে কি? আজ সারাদিন কাজ?"

"আর বল কেন? রবিবারে ছুটি বলে আর কিছু রইল না।"

রাত্রে খেতে গেলাম। ক্যালিফোর্ণিয়াবাসীদের নিত্যকার আহার এক ধরনের বরবটি, সেগুলি ভাল করে রান্না হলে খেতে মন্দ নয়—রুটি আর কফি। খাওয়ার পর লোক তিনটি মোমবাতির আলোয় এক প্যাকেট তেলচিটে তাস নিয়ে বসে গেল। আমি চামড়া পাহারা দিতে চললাম। অন্ধকার, জাহাজ দেখা গেল না। দেড় ক্রোশের মধ্যে তিনজন লোক ছাড়া জনপ্রাণী নেই। এক ধরনের বন্য শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছিল, থেকে থেকে মুখোমুখি দুই পাহাড় থেকে ভেসে আসছিল পেঁচার কর্কশ স্বর। ঐ শব্দটি যে পেঁচার তা তখন জানতাম না। দূর থেকে কেমন যেন করুণ ও অমঙ্গলসূচক মনে হয় শব্দটা। সমস্ত রাত পেঁচাদুটির ডাকের আর বিরাম নেই। শেয়ালগুলি আমার বেশ কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল, আমি তাতে বিশেষ অস্বস্তিবোধ করছিলাম। সকালে নৌকা এসে চামড়াগুলি নিয়ে গেল।

এইভাবে চামড়া সংগ্রহ করে সান পেড্রোতে এক সপ্তাহ কাটল। আরেক দিন আমাকে ঐ পাহাড়ে পাহারা দিয়ে কাটাতে হল, কিন্তু সেদিন সৌভাগ্যক্রমে স্কটের 'জলদস্যু' বইটি ঐ বাড়ীতে দেখতে পাই। সেটি খানিকক্ষণ পড়ে যখন ভাল লাগল না তখন আমার নবপরিচিত লোকগুলির কাছ থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করতে লাগলাম। বন্দর সম্বন্ধে ওরা যা বললে তাতে বোঝা গেল এখানে সাণ্টা বারবারার চেয়েও দক্ষিণে হাওয়ার জোর বেশী, জমি সমুদ্রাভিমুখী হয়ে যেদিকে শেষ হয়েছে সেদিকে সমুদ্র এত অগভীর যে ঢেউ-এর ধাক্কা প্রায় নোঙরের জায়গা অবধি পৌঁছে যায়। সাণ্টা বারবারায় আমরা যে ঝড় পেয়েছিলাম সেই ঝড়ে এখানে উপসাগর দেড় ক্রোশ জুড়ে সমুদ্রের ফেনায় ভরে গিয়েছিল। লাগোডা নামে জাহাজটি তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে ভেসে পড়ে কিন্তু তাদের ছোট নৌকাটি খুলতে ভুলে গিয়েছিল। সেই নৌকাটি কয়েক ঘণ্টা ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে কাছি ছিঁড়ে তীরে এসে লাগে। এখানকার এই তিনটি লোক নাকি সে দৃশ্য দেখেছে।

জাহাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কাটতে লাগল। সকলেই যথাসাধ্য হাঙ্গামা এড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু একবার অশান্তির বীজ যেখানে ঢুকেছে সেখানে আগের মত সদ্ভাব ফিরে আসা কঠিন। সকলেরই কপালে দুর্ভোগ আছে—এই জাতীয় চিন্তা লোকের মনে মনে ফিরতে লাগল। এই যাত্রার যে কবে অন্ত হবে সে সম্বন্ধে কেউ কোন উচ্চবাচ্য করে না। বস্টনের উল্লেখ হলেই কেউ না কেউ হতাশভাবে বলে উঠত "বস্টন? কপাল ভাল থাকলে আবার বস্টনের মুখ দেখব। এখানেই ছাল-চামড়া বিসর্জন দিয়ে থেকে যেতে হবে মনে হয়।" অথবা—বস্টনে পৌঁছবার আগে মাথার আর একটি চুলও আস্ত থাকবে না। মাইনের পয়সা ইতিমধ্যে জামাকাপড় কিনেই খতম—যখন বাড়ী ফিরবে হাতে পরচুলো কেনার পয়সা থাকবে কিনা সন্দেহ।"

প্রহারের ঘটনাটা সম্বন্ধে আর কোন কথা ওঠেনি। কেউ কখনো ঐ সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে অন্যরা তাকে থামিয়ে দিত। নাবিকদের মধ্যে যে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি অবশিষ্ট আছে এ আমার ধারণারও অতীত ছিল। কিন্তু যে দুটি লোক মার খেয়েছিল তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রদর্শন করে চলত। স্যাম জানত জন শুধু ওরই জন্য মার খেয়েছে—

ও একা মার খেলে যত না যন্ত্রণা পেত তার চেয়ে বহুগুণে বেশী ওর বেজেছিল সেই জন্যে। জনের হাবভাবে কোনদিন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়নি যে স্যামের জন্যই তার এই অবস্থা। মাল্লারা সকলেই আশা করেছিল যে বিল ও ফস্টার ওদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। অবশ্য আমার ও স্টিমসনের কাছ থেকে কেউ কোন সাহায্য আশা করেনি। আমরা দুজন ওদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে দেশে ফিরে এর একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয় করব। তার বেশী আমরা আর নিজেদের জড়াতে চাইনি। *

আমাদের যখন সমস্ত খালি জায়গা চামড়ার টুকরায় ভরে গেল আমরা নোঙর তুলে আবার সান ডিয়াগোর দিকে ভেসে পড়ার উদ্যোগ করলাম। জাহাজ ছাড়ার সময় যদি মাল্লারা উৎফুল্ল মনে কাজ করে তবে চক্ষের নিমেষে কাছি গুটিয়ে পাল তুলে জাহাজ ছাড়ার সমবেত চীৎকার আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু তখন আমাদের যা মানসিক অবস্থা, কারোই কাজে বিশেষ উৎসাহ নেই। সকলে ধীরে সুস্থে

* পরে জাহাজ বদল হওয়ার দরুন পিলগ্রীমের এক বছর আগেই ক্যাপ্টেন টমসন বস্টনে পৌঁছান, এবং ঐ লোকেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বেই আর একবার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। আমি এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার পর ১৮৪১ সালে মিশিগানের ডেট্রয়েট থেকে স্টিমসনের একটি চিঠি পাই। চিঠি-টি নীচে উদ্ধৃত হল।

"তোমার বইয়ে মারের যে বর্ণনা দিয়েছ তাতে ক্যাপ্টেন টমসনের নিষ্ঠুরতার সম্পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যাবে না। আমি সে-সময় ঘটনাস্থলে ছিলাম, কাজেই তোমাকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে পারব। আমরা জিনিসপত্র সরিয়ে চামড়া রাখার জায়গা করছিলাম, এমন সময় একটি বাক্স তুলতে গিয়ে স্যামের হাতে আঘাত লাগে। স্যাম কটুক্তি করে উঠল। তুমি জান ওর মুখের বাঁধন একটু আলগা। ও জানত না ক্যাপ্টেন নিকটে ছিলেন। ক্যাপ্টেন রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার। স্যামের কথায় জড়তা ছিল তাই ও তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারল না, হয়ত অনিচ্ছাকৃত ভাবেই উত্তরটা খুব প্রসন্ন মনে দেয়নি, হাতের যন্ত্রণাটাও তার কারণ হতে পারে। এর পরেই তোমার বইয়ে বর্ণিত ঘটনা আরম্ভ হয়—তুমি যা লিখেছ সবই ঠিক, মোটেই অত্যুক্তি হয় নি।

কপিকলে শিকল তুলতে লাগল। মেট বেচারা একাই নানারকম উত্তেজক চীৎকার করে আমাদের মনে ফূর্তির সঞ্চার করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু শত প্ররোচনা সত্ত্বেও আমাদের কারো মুখ থেকে গানের একটি শব্দও বার হল না। নোঙর তুলে গলুই-এর আগায় যখন কাঠের টুকরোতে আটকে রাখা হয় সেই সময় সমস্বরে গান জুড়ে দেওয়ার একটা প্রথা আছে— তাতে পরিশ্রম অনেক কম বোধ হয়। কিন্তু আমরা নিঃশব্দে নোঙর তুলতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন উপরের ডেক থেকে সবই লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু আমরা কাজ ঠিকমত করছিলাম, কাজেই বলার কিছু ছিল না।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় কূল ঘেঁষে চলেছি। দূর থেকে দুটি সাদা বাড়ী দেখা গেল, দুটি সধর্মসম্প্রদায়ের আস্তানা। একটি বাড়ী পাহাড়ের চূড়ায়, পাহাড়ের নীচে অনেক জাহাজ চামড়া তোলার জন্য নোঙর ফেলে। দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে আসা অরণ্যসঙ্কুল ভূখণ্ডের সামনে এলাম। তার ঠিক পিছনেই সান ডিয়াগোর পোতাশ্রয়। সেই সময় সহসা হাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন শনিবার ১৪ই মার্চের সকালে আমরা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে বন্দরের সামনে উপস্থিত হলাম। সেটি একটি ছোট নদীর মোহানা। সকলেই নতুন জায়গাটি উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল। বন্দরের উত্তর ও পশ্চিম দিক ঘিরে একটি পর্বতমালা ক্রমে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অন্য দুই দিক শ্যামল প্রান্তর, তবে কোথাও বড় গাছ নেই। বন্দরের প্রবেশপথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, একটি জাহাজ অতি কষ্টে ঢুকতে পারে, দুই দিক প্রায় জাহাজের গায়ে এসে লাগে। কাছাকাছি কোন শহর দৃষ্টিগোচর হল না। তিনটি জাহাজ নোঙর ফেলেছে। কাছেই বালির উপর চারটি বড় বড় চামড়ার গুদাম, সেগুলি দেখতে অনেকটা বস্টনের বরফ গুদামের মত। চারিদিকে স্তূপীকৃত চামড়া, খড়ের টুপি ও লাল জামা পরা লোকেরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে। জাহাজগুলির মধ্যে আমাদের পূর্বপরিচিত লরিয়োট ছিল। দ্বিতীয় জাহাজটির নতুন রঙ। সূর্যালোকে ঝলমল করছিল, চূড়ায় রক্তবর্ণ পতাকায় সেণ্ট জর্জের ক্রস চিহ্ন। জাহাজটি আয়াকুচো। তৃতীয় জাহাজটির নাম লাগোডা, দুবছর ধরে চামড়া সংগ্রহ করে অতি জীর্ণ মলিন চেহারা। স্রোতের টানে আমরা সবেগে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তাড়াতাড়ি গোটাবার উদ্দেশ্যে উপরের পালের নীচের প্রান্ত দুটি মাস্তুলের উপর টেনে

আনা হল। ক্যাপ্টেন নোঙর নামাতে আদেশ দিলেন। হয় নোঙরটি ঠিকভাবে পড়ল না, অথবা শিকল পুরোটা ছাড়া হয়নি, ফলে আমাদের জাহাজের চওড়া দিকটি সোজা গিয়ে লাগোডার সঙ্গে ধাক্কা খেল। লাগোডার মাল্লারা তখন খেতে বসেছে। রাঁধুনী এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সকলকে খবর দিল।

সৌভাগ্যবশতঃ কোন গুরুতর অনিষ্ট হল না। আমাদের দুটি মাস্তুলের মধ্যে ওদের ত্রিকোণ পালটি বিদ্ধ হয়ে কিছু দড়াদড়ি ছিঁড়ে নিয়ে গেল, রেলিঙেও অল্প আঘাত লেগেছিল। ওরা শিকল ছাড়তে লাগল, আমরা সরে এসে অন্য নোঙরটি নামাবার উদ্যোগ করতে গেলাম। কিন্তু এবারেও আগের মত অবস্থা। কেউ কিছু বোঝবার আগেই আমরা লরিয়োটের খুব কাছে এসে পড়লাম। ক্যাপ্টেন দ্রুত নির্দেশ জারি করতে লাগলেন, কিন্তু পাল টানাটানি করেও কোন লাভ হল না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন রেলিঙে বসে হেঁকে বললেন, ক্যাপ্টেন নাঙ্গি, আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছি। এবার ওদের বাঁদিকের গলুই আমাদের ডানদিকে ঢুকে গিয়ে আমরা বেশ একটু ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। রেলিঙও ভেঙে গেল। আমাদের পূর্বপরিচিত জ্যাকসন নামে সুদর্শন মাল্লাটিকে দেখি অন্যান্য মাল্লাদের সঙ্গে আমাদের জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। শিকল ছেড়ে আমরা সরে এলাম বটে কিন্তু নোঙর ঠিকমত কিছুতেই বসে না। আমরা কাছি যত গোটাই ঢেউয়ের ধাক্কায় তত খুলে যায়। এবার আমরা আয়াকুচোর দিকে বিতাড়িত হয়ে চললাম। সেই দেখে ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলসন একটি ছোট নৌকা করে এসে উপস্থিত হলেন। ক্যাপ্টেন উইলসনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, আমাদের ক্যাপ্টেনের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড়, খুব দক্ষ নাবিক। আমাদের অবস্থা দেখে উনি যথেচ্ছ উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন, কখন থামাতে হবে, কখন নোঙর তোলার যন্ত্র চালাতে হবে, উপরের পাল কখন ছড়াতে কখন গোটাতে হবে, পালদণ্ড কখন হেলাতে বা নামাতে ইত্যাদি যখন যা করা প্রয়োজন ওর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা করতে লাগলাম। শেষে আমাদের ক্যাপ্টেন আদেশ দেওয়া নিরর্থক দেখে ক্যাপ্টেন উইলসনের উপরই কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন। উনি কিছু বলতে গেলেই ক্যাপ্টেন উইলসন বলে উঠছিলেন "আহা-হা, ওরকম নয়, না, না, ক্যাপ্টেন টমসন, পালটা এখন তুলবে কি?

একথা কি করে বলছেন ?" আমরাও ক্যাপ্টেন উইলসনের সহৃদয় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে ওঁর অধীনে কাজ করতে পেরে খুশী। দু তিন ঘণ্টা অনবরত চিৎকার আর ছোটাছুটির পর শেষে নোঙর ফেলা গেল, লরিয়োটের আগা গলুইএর ছোট নোঙরটির পাশে। সেটি ফেলার পর কাছি যাওয়ার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আবার দড়ি ফেলা হল দ্বিতীয় নোঙরটির জন্য—যেটি টানতে টানতে আমরা সমস্ত বন্দর ঘুরে বেড়িয়েছি। "অন্য জাহাজের সঙ্গে যাতে আর ঠোকাঠুকি না লাগে সেজন্যে তোমাদের ভাল একটা জায়গা দেখে দিই, দাঁড়াও" এই বলে ক্যাপ্টেন উইলসন দুটি বড় পালই খাটিয়ে আমাদের একেবারে চামড়ার গুদামের সামনে নিয়ে এলেন—ঐ গুদামেই আমাদের মাল রাখার কথা। কাজ সমাধা করে উনি বিদায় নিলেন। আমরাও পাল গুটিয়ে খেতে গেলাম। আগের দিন বিকেল থেকে অনাহারের পর আজ দুপুর অবধি খাওয়া জোটেনি। যাই হোক খাওয়ার পর আবার পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। নৌকা বার করার কাজ আরম্ভ হল, চলল রাত পর্যন্ত।

রাত্রে আহারের পর আমাদের মধ্যে দুজন ক্যাপ্টেনকে লাগোডায় পৌঁছে দিতে গেলাম। জাহাজের পাশে এসে ক্যাপ্টেন তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করতেই ওদের মেট সিঁড়ি থেকে চিৎকার করে সংবাদটি পরিবেশন করলেন —"ক্যাপ্টেন টমসন এসেছেন।" এই শুনে ওদের ক্যাপ্টেন উচ্চরবে প্রশ্ন করলেন, "জাহাজটাও সঙ্গে এনেছেন নাকি ?" জাহাজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি তাঁর গলা শোনা গেল। আমাদের ক্যাপ্টেন যে এরকম অভ্যর্থনায় বিশেষ পুলকিত হলেন না সেকথা বলাই বাহুল্য। আমাদের মধ্যে তারপর থেকে এই কথাটা ঠাট্টা হিসাবে প্রচলিত হয়ে গেল। শুধু আমাদের মধ্যে কেন, পশ্চিম উপকূলের সর্বত্রই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন উপরের ডেকে উঠে গেলেন, আমরা মাল্লাদের থাকবার জায়গার দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলাম। বারো চোদ্দজন খুব সোরগোল সহকারে খাওয়া-দাওয়া করছিল। জায়গাটি বেশ প্রশস্ত ও আলোকিত। মাল্লাদের স্বচ্ছন্দ কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টা দেখে মনে হল ওরা আমাদের চেয়ে সুখী এবং স্বাধীন। ওরা আমাদের সহর্ষ কোলাহল করে স্বাগতম জানালে। শনিবার রাত্রি, এক সপ্তাহ খাটুনির পর বিশ্রাম। সোমবার অবধি ওদের ছুটি। দুবছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার নানা রূপ দেখে এবার ওরা দেশে ফেরার জন্য প্রায় প্রস্তুত।

ঘণ্টাখানেক ওদের সঙ্গে গল্প করে কাটালাম, তারপর পিলগ্রীমের মাল্লাদের ডাক পড়ল। আমরা জাহাজে ফিরলাম। লাগোডার লোক-গুলিকে বেশ শক্তসমর্থ ও বুদ্ধিমান বলে বোধ হল। সকলের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে। জামা কাপড়ে সর্বত্র তালি মারা, বহুদিন ব্যবহারে এই দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। জাহাজে আমাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা হয় ওরা জানতে চাইলে। প্রহারের ঘটনা শুনে ওরা খুবই আশ্চর্য হল। ওদের মতে এ অঞ্চলে মারপিট বিরল নয়, তবে এরকম নৃশংসভাবে বেঁধে মারার কথা ওরা কখনো শোনে নি।

সান ডিয়াগোতে রবিবার ছুটির দিন বলে গণ্য করা হয়। জাহাজে এবং ডাঙায় সর্বত্রই সেদিন কাজ বন্ধ থাকে—এ খবরও ওদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। ছুটির দিন অনেকে শহরে বেড়াতে যায়। চামড়া ভালো ভাবে সংরক্ষণের নানারকম প্রক্রিয়াও ওদের কাছ থেকে জানলাম। আমাদের কাছ থেকে ওরা বস্টনের নূতন খবর শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলে। আমাদের খবর অবশ্য সাত মাসের পুরানো। ওরা অনেকেই নাবিকদের ধর্মযাজক ফাদার টেলার সম্বন্ধে খোঁজ নিল। তারপর মাল্লাদের স্বাভাবিক নিম্নশ্রেণীর হাসি গল্প আরম্ভ হল। অবশ্য এ সব গল্প করতে যে তথাকথিত ভদ্রলোকেরাও কিছু কম যান তা নয়।

॥ ১৬ ॥ উপকূলে ছুটির দিন ॥

পরদিন রবিবার। সকালে ডেক ধোয়া ও প্রাতরাশের পর মেট একটি সুসংবাদ পরিবেশন করলেন। পাহারার যে কোন একদলকে তীরে নামবার ছুটি দেওয়া হবে। আমাদের দলের ভাগ্যে ছুটি পড়ল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঝটিতি প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলাম। বন্দরে পরিষ্কার জল ব্যবহার করতে কোন বাধা নেই। অতএব প্রচুর সাবান মেখে চান করে আমরা কূলে যাবার উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হ'লাম। নাবিকদের পোশাক ছেড়ে অন্য জামাকাপড় বার হল। জুতো, টুপি, গলাবন্ধ বার করে ঝেড়েঝুড়ে রাখা হল। বেশভূষা পরে আমরা যাত্রীদের মত নৌকায় গিয়ে বসলাম। তীরে লাফিয়ে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করলাম শহরের দিকে। তিন মাইল পথ।

অধিকাংশ নাবিকের ধর্মভাব এত প্রবল যে রবিবার দিন উপাসনা ও আত্মোন্নতির জন্য না কাটিয়ে আমোদপ্রমোদে গা ঢেলে দিতে তাদের সংস্কারে বাধে। অথচ দীর্ঘদিন সমুদ্রবাসের পর কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্ত মাটিতে পা দেবার লোভ কাটানো দুষ্কর। ছুটির দিন সম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কোন কোন ধর্মভীরু ক্যাপ্টেন নাকি শনিবার বারোটার পর মাল্লাদের ছুটি দেন। অবশ্য সব ক্যাপ্টেন মাল্লাদের অতক্ষণ ছুটি দিতে চান না।

মুক্তির আনন্দ কাকে বলে সেদিন মাটিতে পা দিয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করলাম। হাওয়ায় ছুটির স্পর্শ, পাখিদের কূজন, জাহাজের অন্ধকার গহ্বর থেকে ছাড়া পাওয়ার উল্লাস—সে অনুভূতি বহুদিন মনে থাকবে। একদিনের জন্য আমি কারো দাস নয়, নিজের ইচ্ছামত যা খুশী তাই করার, নিজেকে উপভোগ করার সর্বময় কর্তৃত্ব আমার—মাল্লাদের জীবনের সুখ এইটুকুই। তাদের স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী হলেও তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরিপূর্ণ। স্টিমসন ও আমি পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কথা বলাবলি করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নানা জল্পনা-কল্পনা হল। কি আশ্চর্য! এখন আর ফিরে যাওয়াটা তেমন অনিশ্চিত বোধ হল না। সান্ পেড্রোতে জাহাজের অন্ধকার দুর্গন্ধ খোলের মধ্যে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি। তখন মনে হত, ফেরার আর কোন আশা নেই, কিন্তু আজ এই উন্মুক্ত উদার সূর্যালোকে সমস্ত চিন্তাধারাই যেন বদলে গেল। নাবিকদের মধ্যে মধ্যে ছুটি দিলে তাদের মানসিক স্ফূর্তি বাড়ে, কাজেও উৎসাহ আসে।

স্টিমসন আর আমি এক সঙ্গে থাকলেও আমাদের অন্য সহকর্মীদের একেবারে কাছছাড়া হইনি। কেননা আমরা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বলে ওদের মনে একটা সন্দেহ ছিল যে ডাঙ্গায় নামামাত্র আমরা ভদ্রবেশ ধারণ করে ওদের না চেনার ভান করব। কিন্তু যতদিন এক জাহাজে কাজ করছি ততদিন কিছুতেই একতা ভঙ্গ করা চলবে না। যাত্রা যতদিন না শেষ হচ্ছে একসঙ্গে থাকতে হবে, জাহাজেই হোক বা ডাঙাতেই হোক। এ বিষয়ে আমাকে সমুদ্রযাত্রার আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। পোশাক পরিচ্ছদে যথাসম্ভব বৈশিষ্ট্য বর্জন করে যথাসাধ্য ওদের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করলাম। অন্য জাহাজের মাল্লাদের সঙ্গে মিলে আমরা

প্রথমেই একটি শুঁড়িখানার দিকে চললাম—নাবিকদের যা স্বভাব। একটি ঘরওয়ালা বাড়ীতে মদ ও নানাবিধ শুকনো দ্রব্যের সমাহার—যথা ফল, রুটি, জুতো—যা যা ক্যালিফোর্ণিয়াতে বিক্রি হতে পারে। দোকানটির মালিক একজন একচক্ষু উত্তর আমেরিকান। ফল নদীর তীরে তার দেশ। তিমি শিকারী জাহাজে করে সে প্রশান্ত মহাসাগরে এসেছিল। জাহাজটি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ রেখে এখানে দোকান খুলে বসেছে। আমি ও স্টিমসন সহকর্মীদের কথায় না বলতে সাহস করলাম না। তাহলে ওরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করত। যাই হোক যত শীঘ্র সম্ভব ওদের সঙ্গ ছাড়তে মনস্থ করে আমরা মদের দোকানে ঢুকলাম। নাবিকদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকে এক একবার করে সঙ্গীদের মদ্যপান করায়, সে সময় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাগ পাবে, এমনকি দোকানী পর্যন্ত। আমরা যখন দোকানে ঢুকলাম তখন কারা আগে খাওয়াবে সেই নিয়ে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছে—শেষে পুরানো বাসিন্দাদেরই পরাজয় হল। প্রথমে স্থানীয় লোকেরা পরে অন্যান্য জাহাজের মাল্লারা সকলেই পরস্পরকে মদ্যপান করাতে লাগল। সুলভে মদ্য সরবরাহ হতে দেখে কিছু অবাঞ্ছিত লোকও সেখানে এসে জুটেছিল। নাবিকদের বদান্যতার সুযোগ নিতে তারাও ছাড়ল না। প্রতি পাত্র সাড়ে বারো সেণ্ট, ফলে মাল্লাদের বেশ কিছু অর্থদণ্ড হচ্ছিল। আমি ও স্টিমসন তখন অশ্বারোহণের জন্য অধীর হয়ে উঠেছি। আমরা আগে কেনবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু নাবিকদের অলিখিত আইন অনুযায়ী বয়ঃকনিষ্ঠদের পালা আসবে সবচেয়ে পরে—সেই রীতি ভঙ্গ করা রীতিমত অসম্মান প্রদর্শন। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া আমরা আর অন্য উপায় দেখলাম না।

কর্তব্য সমাপন করে অবশেষে আমরা শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে পড়ে বাড়ীগুলির মধ্য দিয়ে যেতে লাগলাম। সারাদিনের জন্য দুটি ঘোড়া ভাড়া করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে এই হল সমস্যা। যাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় সেই নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয়, "কে জানে"। শেষে আয়াকুচোর এক অল্পবয়সী মাল্লার সঙ্গে দেখা, সে আমাদের জিন ও লাগামশুদ্ধ দুটি ঘোড়া জোগাড় করে দিল, জিনের সামনে ল্যাসো জড়ান। এক ডলারে ঘোড়া দুটি সারাদিনের জন্য পাওয়া গেল, রাত্রে সমুদ্রের ধার অবধি এনে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। টাকা অবশ্য আগেই

দিয়ে দিতে হল। ক্যালিফোর্ণিয়াতে ঘোড়া খুব সস্তা, সবচেয়ে ভালো জাতের ঘোড়ার দামও দশ ডলারের বেশী নয়, তিন-চার ডলারে ঘোড়া পাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। জিনটির জন্যই যা পয়সা লাগে। ভাড়া খাটবার পর জিনটি ফেরত পেলেই ঘোড়ার মালিক সন্তুষ্ট, ঘোড়ার কি হল তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। এখানে সামরিক রীতিতে ঘোড়ায় চড়া হয়। আমরা অশ্বারোহণ করেই বুঝলাম ঘোড়া দুটি প্রাণশক্তিতে ভরপুর। আমরা অশ্বপৃষ্ঠে দেশভ্রমণ আরম্ভ করে প্রথমেই ভাঙ্গা দুর্গটির কাছে এসে উপস্থিত হলাম। দুর্গটি গ্রাম থেকে একটু দূরে একটি টিলার উপর অবস্থিত। সেখান থেকে সমস্ত গ্রাম পরিষ্কার দেখা যায়। দুর্গটি চৌকো, একটি দিক ছাড়া আর সব দিকেরই অতিশয় ভগ্নদশা। ভাল দিকটিতে পরিবার নিয়ে দুর্গাধ্যক্ষের বাস। দুটি কামান দেখলাম, একটির চাকা নেই। তাছাড়া জন বারো সৈনিকও ছিল, তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক বলে বোধ হল না। দুর্গের তলদেশে প্রায় চল্লিশটি বাদামী রঙের কুটীর, কয়েকটি একটু বড় ও চুনকাম করা। শহরটি ক্ষুদ্রায়তন। মণ্টারি বা সাণ্টা বারবারার অর্ধেকও নয়। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমন ভাল চলে না। দুর্গ থেকে তিন মাইল দূরে একটি মঠের দিকে চললাম। তৃণভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম ভূমি বেশ উর্বর। ঝোপঝাড় আছে, কিন্তু বড় বড় গাছ একেবারেই নেই। কয়েক মাইল স্বচ্ছন্দ অশ্বারোহণ করে আমরা মঠের সাদা দেওয়ালের কাছে পৌঁছলাম। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিধারে অসমান আকৃতির কয়েকটি বাড়ী। গির্জার চূড়ায় পাঁচটি ঘণ্টাঘর। ঘণ্টার সঙ্গে একটি করে মরচে পড়া ক্রসও রয়েছে। মঠের প্রাচীরের গা ঘেঁষে গাছপাতার কুটীর, সেখানে মঠ পরিচালকদের আশ্রয়ে আদিবাসীরা থাকে।

আমরা চত্বরে প্রবেশ করে চারিদিক প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। চারিদিকে প্রাণহীন স্তব্ধতা। চত্বরের এক দিকে গির্জা, অপর দিকে গরাদওয়ালা জানলাসমেত একটি উঁচু বাড়ী, আর একদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি বাড়ী, চতুর্থ দিকে শুধু উঁচু প্রাচীর। দুবার প্রদক্ষিণ করার পরও কোন সাড়াশব্দ নেই, হঠাৎ বারান্দা দিয়ে মুণ্ডিত মস্তক এক ধর্মযাজক বেরিয়ে এসে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমাদের মোটেই লক্ষ্য করলেন না। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম।

এবারে একদিকের বাড়ী থেকে এক ব্যক্তি দর্শন দিলে, তার গলায় রূপার শিকল, হাতে এক গোছা চাবি, পোশাক পরিচ্ছদ স্থানীয় লোকেদের মত। মনে হল সে বোধ হয় স্থানটির তত্ত্বাবধায়ক। তার সঙ্গে কথা বলতেই সে আভূমিপ্রণত নমস্কার করে আমাদের ভিতরে আসতে অনুরোধ জানালে। ঘোড়া ছুটি বাইরে বেঁধে রেখে আমরা তার অনুসরণ করলাম। একটি ছোট ঘর, আসবাবপত্র অতি সাধারণ—কয়েকটি চেয়ার, একটি টেবিল, সাধুসন্তদের ছবি ও কিছু কাঁচের বাসনপত্র। খাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করতেই লোকটি সাগ্রহে আহার্যের সন্ধানে উঠে গেল। অন্য কিছু না হলেও ক্যালিফোর্ণিয়ার বিখ্যাত বরবটি, রুটি ও মাংস অবশ্যই থাকবে, তার সঙ্গে একটু পানীয় হলেও মন্দ হয় না—এইরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভৃত্যের হাতে প্রচুর আহার্য ও পানীয় এসে পৌঁছল। খাবারের মধ্যে মাংস, পেঁয়াজ ও গোলমরিচ দিয়ে বরবটি সিদ্ধ, সিদ্ধ ডিম এবং ময়দার ম্যাকারুলি জাতীয় এক প্রকার পদার্থ। এর সঙ্গে মদ যোগ হয়ে যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হল তা আমাদের ভাগ্যে বহুকাল জোটে নি। মনে হল রাজকীয় ভোজে বসেছি। আহারের পর আমরা দাম দিতে গেলে লোকটি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে, বললে এ তো ঈশ্বরের করুণা দ্বারা প্রাপ্ত, মূল্যের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা দেখলাম উপহার হিসাবে টাকা নিতে লোকটি তেমন অনিচ্ছুক নয়। ওকে দশ বারো রিয়েল * দিতেই সে বিনা দ্বিধায় পকেটস্থ করলে। আমরা বাইরে এসে দেখি রেড ইণ্ডিয়ানদের ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় খেলা করছে, পুরুষদের অবস্থাও তথৈবচ। মেয়েদের গায়ে অতি কর্কশ কাপড়ের তৈরী পোশাক। শুনলাম পুরুষরা মঠের বাগানে কাজ করে ও পশুচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের ভাষার মত লালিত্যহীন ভাষা আর কোথাও শুনিনি—এই ভাষাতেই সব রেড ইণ্ডিয়ানরা কথা বলে থাকে। মেক্সিকোবাসীদেরও এই ভাষা কোন মতেই হতে পারে না।

একটি কুটীরের সামনে এক অতি বৃদ্ধ লোককে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। লোলচর্ম স্থবির, হাত পা শুখিয়ে কুঁচকে পোড়া চামড়ার আকার ধারণ করেছে, শরীরের আয়তন একটি পাঁচ বছরের বালকের মত।

* এক রিয়েল = সাড়ে বারো সেণ্ট

বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে চোখের পাতা তুলে ধরে আমাদের দেখলে, তারপর কৌতূহল নিবৃত্ত হতে আবার পাতা নামিয়ে নিলে। চোখ নিজে থেকে খোলবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল ওর। বয়স কত জিজ্ঞাসা করে কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। সকলেরই মুখে সেই এক উত্তর, "কে জানে।" সম্ভবতঃ বৃদ্ধের সত্যকার বয়স কারোরই জানা নেই।

আমরা এবার গ্রামের দিকে ঘোড়া ছোটালাম। ক্যালিফোর্ণিয়াতে ঘোড়ারা দুলকি চালে চলতে অভ্যস্ত নয়। তারা হয় তীরবেগে দৌড়য়, নয়ত একেবারে থেমে যায়। তার সঙ্গত কারণও আছে। রাস্তাঘাট না থাকার জন্য এখানে সাবধানে ঘোড়া চালাবার কোন প্রয়োজন হয় না, তাই অশ্বারোহীরা ঘোড়া প্রাণপণে ছোটাতেই ভালবাসে। ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা নেমে পড়ে বাকি পথ হেঁটে যায়। বহুদিন বন্দী থাকার পর সেদিন বিকেলের সুন্দর বাতাসে দ্রুত অশ্বারোহণ এমন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল যে মনে হয়েছিল সারা দিন এমনিভাবে ঘোড়ার পিঠেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। গ্রামে ঢুকে দেখলাম সেখানেও বেশ উত্তেজক কাণ্ড চলেছে। ছুটির দিন উপলক্ষ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা একটা উঁচু জায়গায় এক ধরনের বল খেলার আয়োজন করেছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধেরা গোল হয়ে বসে, বালক যুবা ও নারীরা মহা উৎসাহে বলের পশ্চাদ্ধাবন করছে— মেয়েদের ক্ষিপ্রগতি শিকারী কুকুরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সামান্য ঘটনাতেই দর্শকরা চিৎকার করে ও হাততালি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করছে। দর্শকদের মধ্যে বহু নাবিককেও দেখলাম। খেলাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। কয়েকজন নাবিক ভরসা করে ঘোড়ার পিঠে চড়েছে, কিন্তু তারা ভাল অশ্বারোহী নয় দেখে মেক্সিকানরা ইচ্ছা করেই তাদের তেজী ঘোড়া দিয়েছে। ফলে অনেকেই উলটে পড়ছে, সেই দেখেও দর্শকরা প্রচুর আমোদ পাচ্ছে। অবশ্য কয়েকজন মাল্লাকে বন্যদের মত উল্লাসধ্বনি করতে করতে ঘোড়ার পিঠে ঘুরতে দেখলাম, তারা সকলেই স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী।

সূর্য ডুবছে দেখে আমি আর স্টিমসন ফেরার উদ্যোগ করলাম। সমুদ্র-তীরে যাওয়ার আগে আমরা একটি বাড়ীতে ঢুকে একটু বিশ্রাম করছিলাম, ইতিমধ্যে সেখানে বিদেশী নাবিকদের দেখবার জন্য ভিড় জমে গেল। একটি মেয়ের আমার রেশমী রুমালটি এতই পছন্দ হয়ে গেল যে আমি সেটি

তাকে উপহার দিয়ে দিলাম। তাতে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি তো হলই, উপরন্তু আমরা পরিবর্তে পেয়ার ও অন্যান্য ফল লাভ করলাম। বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেখি ঘোড়া দুটি অন্তর্ধান করেছে। যার কাছ থেকে ভাড়া করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কেবল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, "কে জানে।" তার হাবভাব দেখে আমাদের সন্দেহ হল। সে জিন দুটি সম্বন্ধেও কোন উচ্চবাচ্য করে না দেখে আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না যে এ কার কাজ। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আমরা আরো চার রিয়েল দিয়ে দুটি ঘোড়া ভাড়া করে সমুদ্রতীর অবধি গেলাম। লাগাম ও জিন ফেরত আনার জন্য দুটি স্থানীয় বালক পিছন পিছন দৌড়ে এল। আমরা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম, কিন্তু ভাড়ার পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য আমরা তীরেই ঘোড়ায় চড়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। লোকেরা কেউ হেঁটে কেউ ঘোড়ার পিঠে ফিরে আসছে। আমাদের সঙ্গী দুজনের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম তাদের ঘোড়ায় করে আসতে দেখা গেছে। কিন্তু পথিমধ্যে নিশ্চয় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বা অন্য কোন কারণে আটকে গিয়ে তাদের ফিরতে দেরী হচ্ছে। ভাবগতিক দেখে তারা মাঝরাতের আগে পৌঁছবে বলে মনে হল না।

রেড ইণ্ডিয়ান ছেলে দুটির হাতে ঘোড়া সমর্পণ করে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম। সারাদিনের আনন্দ উপভোগের পর নিত্যকার কাজে ফিরে এসে ভালোই লাগছিল। মাঝ রাতে গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমাদের হারানো সঙ্গী দুজন ফিরেছে। তারা দুজনে একটি ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। পড়ে যাওয়ার জন্য দুজনেই দুজনকে দোষারোপ করছে। যাই হোক শীঘ্রই তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে আর ঝগড়ার কথা কারো মনে রইল না।

॥ ১৭ ॥ সান ডিয়াগো ॥

তখনো ভালো করে ভোরের আলো ফোটেনি আমাদের উপরে ওঠার ডাক পড়ল। ছুটি শেষ, সামনে কর্মব্যস্ত দিন। নীল কোর্তা, গলাবন্ধ, শৌখিন মোজা জুতো প্রভৃতি তুলে রেখে আমরা আবার সেই পুরাতন প্যান্টালুন, লাল জামা ও টুপি পরে চামড়া বহনের কাজে যোগ দিলাম।

তিনদিন অবিশ্রাম এই চলল। খাওয়ার সময় ছাড়া ভোর থেকে রাত্রি অবধি কেবল কাজ। সান ডিয়াগোর অপরিসর বন্দর, জলের শান্ত প্রকৃতি এবং কূলের পাথরহীন সমতল জমি—সব মিলিয়ে এখানে চামড়া তোলার পক্ষে পরিবেশ খুবই অনুকূল। এটা মাল গুদাম হিসাবে ব্যবহার হওয়ার অন্যতম কারণও এই। অন্য কোন বন্দরে চামড়া তুলতে গেলে ঢেউ-এর ধাক্কায় ভিজে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আমাদের মালগুদামটি আগে ক্যালিফোর্ণিয়া নামক জাহাজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল। গুদামটিতে প্রায় চল্লিশ হাজার টুকরা ধরে। আমাদের সঙ্গে ছিল পঁয়ত্রিশ শ টুকরা চামড়া—এই বিরাট গুদাম ভরার কাজে তা কতটুকুই বা জায়গা অধিকার করবে! আমরা গুদামে ঢুকবার সময় প্রত্যেকেই একবার মনে মনে হিসাব করে নিতাম এই বিরাট ঘর ভরতে কতদিন লাগবে।

চামড়াগুলি কাঁচা অবস্থায় এনে গুদামের বাইরে ফেলা হয়। তারপর নানারকম প্রক্রিয়ার পর সেগুলি গুদামজাত করা হয়। পরিশেষে জাহাজে তোলা। যাতে গরমে নষ্ট না হয় তাই এই সতর্কতা। চামড়ার দেখাশোনা করার জন্য কিছু সংখ্যক নাবিককে একজন উচ্চ কর্মচারীর অধীনে গুদামে কাজ করতে দেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে মিঃ রাসেল এই কারণেই এসেছিলেন। আমরা তিন চার জন তাঁর সঙ্গে গুদাম ঘরে থেকে গেলাম। আমাদের বদলে কয়েকজন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসীকে মাল্লা হিসাবে গ্রহণ করা ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু ওঁর নির্দয়তার কাহিনী ততদিনে সকলের কানেই পৌঁছে গেছে। কেউ-ই ওঁর জাহাজে কাজ করতে রাজী হল না। এমন কি মাসে পনেরো ডলার মাইনের লোভেও না। অগত্যা জাহাজে না নিয়ে তাদের কয়েকজনকে ডাঙায় মাল গুদামে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হল।

চামড়াগুলি জাহাজ থেকে নামিয়ে আমাদের পরবর্তী কাজ হল বাড়তি পাল, কাছি, দড়াদড়ি প্রভৃতি সরিয়ে জায়গা করা। যেসব জিনিসের আপাতত কোন প্রয়োজন নেই সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হল, তার মধ্যে ছিল শুয়োরের খোঁয়াড় ও একটি শুয়োর যাকে আমরা আদর করে নাম রেখেছিলাম বুড়ী বেস। হর্ন অন্তরীপ পার হবার সময় ঠাণ্ডায় সব কটি শুয়োর মারা যায়, শুধু বুড়ী বেস বেঁচে গিয়েছিল। লোক মুখে শোনা গেল বুড়ী নাকি এর আগে একবার ক্যান্টন অবধি বেড়িয়ে এসেছে।

শুয়োরটিকে আমাদের রাঁধুনী বড় ভালবাসত, তাকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াত, অনেক রকম খেলাও শিখিয়েছিল। শুয়োরটি ওর গলা চিনত। টম ক্রিঙ্গল বলত নিগ্রোরা শুয়োরদের বড় ভালবাসে। কথাটা ঠিক। কেননা যেই শোনা গেল বুড়ী বেসকে ডাঙায় নামিয়ে দেওয়া হবে সেই শুনে রাঁধুনী একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। তার দীর্ঘদিনের যাত্রার সঙ্গী ছিল ঐ শুয়োরটি—কত আনন্দ দিয়েছে ওকে। কিন্তু হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই। অতি সযতনে গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে সাবধানে তুলে দিল। আমরা কোমরে দড়ি বেঁধে শুয়োরটিকে কপিকলে তুললাম। মাস্তুল সংলগ্ন পালদণ্ডে কপিকলটি ঝোলানো হয়েছিল। তারপর এ ওর দিকে চোখ মটকে আমরা শুয়োরটিকে শূন্যে তুললাম। মেট চেঁচিয়ে বললে "যথেষ্ট হয়েছে, এবার নামাও"—অবশ্য মেটও বেশ মজা অনুভব করছিল। শুয়োরটি ভয়ে চিৎকার আরম্ভ করলে, আমাদের রাঁধুনীর কালো গাল বেয়ে জলের ধারা নামল। সে বেচারা বিড়বিড় করে কি যেন বললে তার মর্মার্থ হল "অবোলা, অবোধ জীব, তার ওপর কারো দয়ামায়া নেই!" সেই শুনে একজন বললে "একে যদি বল অবোধ জীব তাহলে আমি কি?" হাসির ধুম পড়ে গেল। রাঁধুনী কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিল না। তার শুয়োর ঠিকমত পৌঁছল কিনা দেখতেই সে ব্যস্ত তখন। বুড়ী বেস কূলে নামল। সেখানে তার জাত ভাইদের এক বিরাট জনতা তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত। অন্য সব জাহাজ থেকেও শুয়োর ছাড়া হচ্ছে। কূলে যে সব চামড়ার টুকরো, হাড়ের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি ছড়ানো ছিল সেই নিয়ে বেসের সঙ্গে অন্য শুয়োরদের লড়াই লেগে যাচ্ছিল। যুদ্ধে বেসকে জয়ী হতে দেখে উপর থেকে আমাদের রাঁধুনীর সে কি হাততালি। সারাদিন ধরে অনেক সুখাদ্যের উচ্ছিষ্ট জমিয়ে রেখে সে এক বালতি খিচুড়ি প্রস্তুত করে সেটি নৌকায় করে বেসকে দিয়ে আসার জন্য মেটের অনুমতি চাইলে। মেট সেই শুনে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন বালতি সুদ্ধ খিচুড়ি জলে ফেলে দেব এবং সেই সঙ্গে তোমাকেও। আমরা বললাম রবিনসনের গলিতে তোমার যে বৌকে ফেলে এসেছো তার প্রতিও তো তোমার এত অনুরাগ দেখি না। রাঁধুনী কিন্তু সত্যিই শুয়োরটিকে ভালবাসত। কয়েক দিন রাত্রে চুপিসাড়ে নৌকা বার করে সে তার তৈরী খাবার বেসকে খাইয়ে এসেছিল। ফিরে আসার সময়

তার মুখে সে কি গর্বের হাসি, যেন কোন এক বীরপুরুষ যুদ্ধ জয় করে ফিরলেন।

পরের রবিবার অন্যদের তীরে যাবার পালা। আমরা জাহাজেই ছুটি কাটালাম। চামড়া তোলা নেই, ঝড়ের ভয় নেই। নিশ্চিন্ত মনে বসে আমরা সেলাই, রিফু ও বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। লাগোডা জাহাজে চিঠিপত্র দেবার জন্য অনেকে চিঠি লিখতেও বসে গেল। দুপুর বারোটায় আয়াকুচোর বড় পালাটি নীচু হল—জাহাজ ছাড়ার সঙ্কেত। বাঁধন খুলে ওরা কাছি টেনে উপসাগরের দিকে এগোল। সেখান থেকে জাহাজ যাত্রা আরম্ভ করবে। এই সমস্ত ব্যাপারটি বেশ সময়সাপেক্ষ। ভার তোলার যন্ত্রের কাছে মাল্লাদের বহুক্ষণ ধরে কাজ করতে হল। একসঙ্গে দড়ি টানতে হলে সাধারণতঃ মাল্লারা সমস্বরে গান ধরে, কপিকল যেমন যেমন টানা হয় সেই মত উঁচু নীচু সুরে। ওদের জাহাজে মাহানা নামে একজন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী গলা ছেড়ে গান জুড়েছিল। তার গলায় ছিল অপূর্ব বন্য মাধুর্য, ঠিক নাবিক সুলভ রুক্ষ স্বর না হলেও নির্জন বন্দরের পর্বত-শ্রেণীর গায়ে প্রতিহত হয়ে বহুদূর অবধি সেই গানের সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। সন্ধ্যার সময় হাওয়া উঠল। পালের দড়ি টান টান করে আয়াকুচো ভেসে চলল। সুন্দর দেখাচ্ছিল। বন্দরের বাইরে জাহাজটি দেখা গেল। তারপর দক্ষিণের দিকে চলে গেল। ওরা যাবে প্রথমে কালাও ও পরে স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে। আট নয় মাসের মধ্যে আবার এই উপকূলে ফিরে আসার কথা।

সেই সপ্তাহের শেষে আমরাও যাত্রা করব কিন্তু ফস্টারের অন্তর্ধানে রওনা হতে কয়েকদিন দেরী হয়ে গেল। ফস্টার আগে আমাদের দ্বিতীয় মেট ছিল কিন্তু অকর্মণ্যতার জন্য পদচ্যুত হয়। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার একথা বুঝে সে বহুদিন থেকেই পালাবার ফন্দি আঁটছিল। মাল্লাদের সঙ্গেও ওর মোটেই বনিবনা ছিল না। ক্যাপ্টেন ওকে সর্বসমক্ষে 'সেপাই' *

* সেপাই বলা নাবিকদের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক। এর অর্থ যে নাবিক ঠিকমত কাজ করে না এবং ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। কোনো নাবিককে লাঠি কাঁধে ডেকে পায়চারি করতে হুকুম দেওয়ার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এই রকম শাস্তি পাওয়ার থেকে মার খাওয়াও বহুগুণে শ্রেয়। এতে নাবিকদের মনোবল একেবারে নষ্ট হয়।

বলে গালি দিতেন এবং উচিত শাস্তি দেবার ভয় দেখাতেন। ফস্টার লাগোডায় করে বাড়ী ফেরার অনুমতি চেয়েছিল, তাও ওকে দেওয়া হয়নি। একদিন রাত্রে ফস্টার একজন উচ্চ কর্মচারীর কথা অমান্য করে তার সঙ্গে নৌকায় আসতে অসম্মতি জানায়। সে কথা যথাকালে ক্যাপ্টেনের কানে পেঁৗছল। ফস্টার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে জাহাজে এসে উপস্থিত হল। ক্যাপ্টেন ওকে ডেকে বললেন এবার মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। এই কথা শুনে ফস্টার ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ক্যাপ্টেন আমাকে মারবেন না, মারবেন না। ক্যাপ্টেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একগাছা দড়ি দিয়ে ওকে কয়েক ঘা মেরেই ছেড়ে দিলেন। তাতে তেমন না লাগলেও ফস্টার ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। সেদিন রাত্রেই ও জাহাজ ছেড়ে পালাবে মনস্থ করল। ওর বিছানাপত্র আগেই লাগোডার একটি মাল্লার হাতে সমর্পণ করেছিল। সে সেটি নতুন কেনা জিনিস এমন ভান করে তার জাহাজে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়। পালানোর ব্যাপারটা ও বেশ সুপরিকল্পিত ভাবে ঠিক করেছিল—অনেক আগে থেকেই। ফস্টারের জীবনে বোধহয় এই প্রথম একটি কাজ সুচারুরূপে সমাধা হল। নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও মূল্যবান জিনিসপত্র একটা থলিতে ভরে ঘুমোতে গেল। রাত্রের পাহারায় আমরা ছিলাম। ফস্টার বলেছিল ওকে রাত বারোটায় তুলে দিতে। যথাসময়ে উপরে উঠে এদিক ওদিক দেখে ফস্টার থলে সমেত নিঃশব্দে একটি নৌকায় উঠে পড়ল। তারপর জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলে গেল। জাহাজ থেকে বেশ কিছু দূরে যাবার পর দাঁড় বেয়ে তীরে গিয়ে উঠল।

পরদিন সকালে ফস্টারকে দেখতে না পেয়ে মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। আমরা কেউই ওর পলায়ন বৃত্তান্ত ফাঁস করিনি। তবে ওর থলি তোরঙ্গ এবং একটি নৌকা উধাও দেখে ক্যাপ্টেনের আর বুঝতে বাকি রইল না যে ফস্টার পালিয়েছে। দেখা গেল নৌকাটি কূলে পড়ে আছে। ফস্টারকে ধরে দিতে পারলে কুড়ি ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা হল। দিন কয়েক ধরে সান্ত্রীরা ও স্থানীয় লোকেরা মিলে ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত দেশ তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোথায় ফস্টার! ফস্টার এমন জায়গায় লুকিয়ে ছিল যে কারো খুঁজে পাবার সাধ্য নয়। লাগোডার মালগুদামের অনতিদূরে

লোকচক্ষুর আড়ালে একটি ঝোপঝাড়ে ঢাকা গুহা ছিল। সেখানে আমি একবার গিয়েছিলাম কিন্তু পরে বহু খুঁজেও জায়গাটি পাইনি। সেখানে লাগোডার মাল্লারা ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। ওরাই ওকে আহার্য ও পানীয় সরবরাহ করত। ওরা আশ্বাস দিয়েছিল পিলগ্রীম চলে যাওয়া অবধি ওরা ফস্টারকে ওখানে লুকিয়ে রাখবে এবং পরে ওদের ক্যাপ্টেনকে অনুনয় বিনয় করে ওদের জাহাজে ফস্টারের স্থান করে দেবে।

ফস্টারের জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করে ক্যাপ্টেন এবার যাত্রা করার আদেশ দিলেন। বাঁধন খুলে আমরা পাল ওঠালাম। জোয়ার ও হাওয়ার সাহায্যে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। আমাদের চিঠিপত্রগুলো ক্যাপ্টেন ব্রাডশকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা এই কূল ছাড়ার আগেই ওঁরা আবার ফিরে আসছেন শুনে বড় মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা অন্তরীপটি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু হাওয়া ছিল তাও গেল থেমে, আমরা দু দিনে তিন মাইল পথও অতিক্রম করলাম কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় দিন বন্দরের অন্য জাহাজগুলি সমস্তক্ষণ আমাদের দৃষ্টিপথেই ছিল। তৃতীয় দিনে সমুদ্রের হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠল। আমরাও জল কেটে এগোতে লাগলাম। সন্ধ্যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে সান জুয়ান অবধি পৌঁছলাম। সান ডিয়াগো থেকে সান জুয়ানের দূরত্ব চল্লিশ মাইল। আমাদের লোকবল ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে চলেছিল। একজনের সমুদ্রে মৃত্যু, দ্বিতীয় জনের পদোন্নতি, তৃতীয় জন পলাতক। এখন আমি ও স্টিমসন ছাড়া শক্তসমর্থ মাল্লা বলতে আর মাত্র তিনজন, অল্পবয়সী ছেলেটিকে বাদ দিয়ে। লোকবল কম, তার উপর মানসিক উদ্বেগ—এই নিয়ে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে আমাদের কয়েক বছর যুদ্ধ করতে হবে। তবু ফস্টার যে পালিয়ে বেঁচেছে এতে আমরা সকলেই খুশী। জাহাজে ওর যা দুরবস্থা আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে ও যে পরিত্রাণ পেয়েছে এটুকুই যথেষ্ট। দুমাস পরে সান ডিয়াগোতে ফিরে খবর পাই ফস্টার লাগোডাতে মাল্লার কাজ পেয়ে ওদের সঙ্গে চলে গেছে।

পাঁচদিন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে বুধবার, ১লা এপ্রিল আমরা আবার সান পেড্রোতে সেই পুরোনো জায়গায় নোঙর ফেললাম। সান ডিয়াগোর হৈচৈ, আমোদ-প্রমোদ, কর্মব্যস্ততার পর এখানকার জনহীন সমুদ্রোপকূল আবার নতুন করে বিরসতার সঞ্চার করল। কিছুদিনের মধ্যে মাল চালান

আসতে আরম্ভ হল। আবার সেই পাহাড় বেয়ে ওঠা, মাল গড়িয়ে দেওয়া, জল ভেঙ্গে নৌকায় তোলা। আমরা ওখানে থাকা অবস্থায় উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি শুধু মেক্সিকোর যে জাহাজটি ঝড়ে উলটে পড়েছিল সেটি মেরামত করবার একটা প্রচেষ্টা হয়। জাহাজটা বালুতটে পাথুরে জমিতে সোজা দাঁড় করান ছিল। আমাদের ছুতার মিস্ত্রী দেখে মন্তব্য করলে যে মেরামত করলে আবার চালানোর উপযুক্ত হতে পারে। জাহাজের মালিক কয়েক দিনের মধ্যে পুয়েবলো থেকে এসে উপস্থিত। কাছি, দড়াদড়ি ও আমাদের মাল্লাদের সাহায্যে জোয়ারের সময় কয়েকবার চেষ্টার পর জাহাজটি জলে নামান গেল। যে তিনজন নাবিক এতদিন তীরে বাস করছিল তারা এই উপকূল ছেড়ে যাবার আশায় পুলকিত হয়ে জাহাজে উঠল।

জাহাজে আবার সেই গতানুগতিক জীবন। মারামারির ঘটনার পর যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল সেটাও কমে গেছে। কিন্তু যে দুটি লোক মার খেয়েছিল তাদের বড় আশ্চর্য রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জন বিদেশী, একটুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সে সমস্তক্ষণ প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবত, যদি বস্টনে ফিরে যাওয়া ভাগ্যে থাকে তবে ক্যাপ্টেনকে কি করে জব্দ করা হবে সেই তার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু স্যাম এসব কিছুই বলত না—সে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল। স্যাম আমেরিকাবাসী এবং শিক্ষিত, এই ঘটনায় ও গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল। ও ছিল হাসিখুশী প্রকৃতির। দক্ষিণাঞ্চলে ওর বাড়ী। নিগ্রোদের সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প বলে প্রায়ই ও আমাদের চিত্তবিনোদন করত। কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে স্যামকে আর কখনো হাসতে দেখা যায় নি। মনে হত ওর বাঁচবার স্পৃহা অবধি লোপ পেয়েছে। অহোরাত্র চিন্তা করত কতদিনে এই যাত্রার শেষ হবে। অনেক সময় একলা বসে ওকে আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছি।

পক্ষকাল ওখানে থাকবার পর আবার আমরা সান্টা বারবারা অভিমুখে চললাম। ইতিমধ্যে একবার দক্ষিণে ঝড়ে আমাদের নোঙর তুলে সমুদ্রে চলে যেতে হয়েছিল। তখন এপ্রিলের মাঝামাঝি, ঝড়ের সময় কেটে গেছে—হাওয়া সুন্দর। উপকূল বরাবর হাওয়া বইতে থাকে এই সময়। আমরা হাওয়ার প্রতিকূলে এগোলাম। তিন দিনে নব্বই মাইল পার হয়ে সান্টা বারবারায় প্রবেশ করলাম। প্রথমবার জেনোয়া থেকে আগত একটি

জাহাজ যেখানে নোঙরবদ্ধ অবস্থায় দেখেছিলাম এখনও সেটি ঠিক সেই অবস্থায় আছে দেখা গেল। জাহাজটি আকারে বৃহৎ ও কেমন যেন কোলকুঁজো চেহারা। সানফ্রানসিস্কো ও মণ্টারি হয়ে এসে এখন জাহাজটির ভালপারাইসো ও কাডিজে ফিরে যাবার কথা, পথে সান পেড্রো ও সান ডিয়াগোতে থামতে হবে। এখন গুডফ্রাইডে। ক্যাথলিক মাল্লারা সকলে জুডাসের প্রতিমূর্তি তৈরী করে মাস্তুলের দণ্ড থেকে গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসি দেওয়ার অনুকরণ করছিল। ক্যাথলিক জাহাজে এই রীতি প্রচলিত আছে।

॥ ১৮ ॥ ইস্টারের রবিবার ॥

পরের রবিবার ইস্টার—আমাদের কূলে নামার ছুটি। সান পেড্রোতে ছুটি পাওয়া যায়নি। সকালে প্রাতরাশের পর এক নৌকা বোঝাই ইটালীয়ান মাল্লা রঙবেরঙের জামা, লাল টুপি, নীল কোর্তা পরে গান গাইতে গাইতে আমাদের গলুইএর তলা দিয়ে গেল। তাদের গান শুনে আমার যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি উদয় হল—চোখের সামনে দেখলাম সুসজ্জিত বসার ঘরে সুন্দরী মেয়েরা পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে—সে সব কথা এখন চিন্তা করা অর্থহীন। সারাদিন কূলে কাটান সম্ভব নয়, এখানে ঘোড়ায় চড়ে যাবার মত স্থানই বা কোথায়, অগত্যা আমরা দুপুর অবধি জাহাজে থাকাই মনস্থ করলাম। যখন নৌকা নামান হল তখন যাত্রীদের ভঙ্গীতে বসলাম। যে সব মাল্লারা ছুটিতে আছে তাদের পক্ষে দাঁড়ে হাত দেওয়াটাও কাজ করার সামিল। সন্ধ্যার মধ্যে সমুদ্রতীরে ফিরে আসব জানিয়ে আমরা শহর পরিদর্শনে বার হলাম। দেখি শহর উৎসবের সাজে সজ্জিত। প্রত্যেকেই ভাল জামা কাপড় পরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে আছে। স্ত্রীলোকেরা দরজার সামনে গালচে বিছিয়ে বসে। চত্বরের বারান্দায় সেজেগুজে বসে কিছু লোক বেহালা ও স্পেনীয় গীটার বাজাচ্ছে দেখলাম। এছাড়া ওদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে ঢাক ও সানাই জাতীয় বাজনা। অন্য কোন বাজনা এখানে প্রচলিত নয়। পরে একটি উৎসব উপলক্ষে এদেশের যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র জড় হতে দেখেছিলাম—সেখানে তিনটি বেহালা ও দুটি গীটার ভিন্ন আর কিছু দেখিনি। তখন বেলা বেশ বেড়েছে।

নাচের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা বেড়াতে বেরোলাম। শোনা গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাম থেকে একটি ষাঁড় ধরে এনে খেলা দেখান হবে। একজন মার্কিন স্থানীয় মেয়ে বিবাহ করে এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে খবর পেয়ে আমরা তার সন্ধানে গেলাম। তার দোকানের সামনে স্পেনীয় ভাষায় কি যেন লেখা ছিল। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই। জিনিসপত্রও সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে লোকটি এসে আমাদের কাছে যৎপরোনাস্তি ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল— আমাদের দেবার মত কিছুই নেই, কেননা আগের দিন ওর বাড়ীতে উৎসব ছিল, অতিথিরা খেয়ে দেয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। "তাও তো বটে, ইস্টারের ছুটি এখন" আমি সমর্থন জানিয়ে বললাম।

"না, না" লোকটির মুখে অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল, "আমার মেয়েটি মারা গেছে কিনা—এখানকার এই রীতি।" এই শুনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কি বলে লোকটিকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত আমি সেই কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভাবলাম এবার প্রস্থান করলেই হয় কিন্তু লোকটি ইতিমধ্যে পাশের দরজা খুলে আমাদের ভিতরে যেতে অনুরোধ জানালে। ভিতরে ঢুকেও আমি কম আশ্চর্য হলাম না। ঘর ভর্তি ছোট ছোট মেয়ে, বয়স চার থেকে ষোল, সাদা জামা পরা, মাথায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের তোড়া—মহা আনন্দে খেলা করছে। এক কোণে টেবিলের উপর সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া তিন ফিট লম্বা একটি কফিন। খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরের অবস্থাও চোখে পড়ল। সেখানে সাধারণ পোশাক পরিহিত কিছু লোক সমবেত হয়েছে। দেওয়ালে দাগ, আসবাবপত্রের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে গত রাত্রের উৎসবের কথা সহজেই অনুমান করা গেল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রশ্ন করে জানলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই শবানুগমন হবে—তারপর আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম।

সময় কাটান দরকার। আমরা ঘোড়া ভাড়া করে উপকূলের দিকে গেলাম। সেখানে কয়েকজন ইটালীয় নাবিক বালির উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘোড়দৌড় করছে। সেই দেখে আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম, বেশ মজার খেলা। সমুদ্রের হাওয়া ও তরঙ্গ গর্জনে চঞ্চল হয়ে ঘোড়াগুলি প্রাণপণ শক্তিতে ছুটছিল, তাদের পায়ের ক্ষুরে বালি ছিটকে পড়ছিল। এক মাইল লম্বা উপকূল.আমরা এইভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে বার বার পরিক্রমণ

করতে লাগলাম। সেখান থেকে শহরে ফিরে দেখি শব শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়েছে। প্রায় মধ্য পথে আমরা গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগদান করলাম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মৃতের বাড়ীতে যেমন শোক প্রকাশের নমুনা দেখা গিয়েছিল এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখলাম না। আটটি ছোট মেয়ে শবাধার বহন করে চলেছে। তাদের স্থান নেবার জন্য অন্যদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে, অনেকে ছুটে আসছে ধরবার জন্য। মনে হল শোভাযাত্রায় শহরের সমস্ত বালিকা যোগ দিয়েছে। সকলের পোশাক সাদা, হাতে ও মাথায় ফুল। কয়েকজন বর্ষিয়সী মহিলাও ছিলেন। তাঁদের পিছনে যুবক ও বালকেরা, কেউ পদব্রজে, কেউ অশ্বপৃষ্ঠে হাসাহাসি করতে করতে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, শবাধারের দুইপাশে দুটি লোক বন্দুক তুলে ধরে অবিরাম আকাশে গুলি করতে করতে চলেছে। সম্ভবতঃ অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে। এছাড়া অন্য কি ব্যাখ্যা হতে পারে আমি ভেবে পেলাম না।

শোভাযাত্রা মঠের কাছে পেঁৗছতেই মঠের বিরাট ফটক খুলে গেল। ভিতরে পাদ্রী ক্রস হাতে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিলেন। মঠের ভগ্নপ্রায় অবস্থা, লোকজনের বাস নেই বললেই হয় তবে এককালে যে এর উত্তম অবস্থা ছিল দেখলেই বোঝা যায়। গির্জার প্রবেশ পথের ঠিক সামনে একটি বিরাট ফোয়ারার চারটি মুখ দিয়ে জল নির্গত হচ্ছে। এখানে আমরা ঘোড়া থামিয়ে পশুগুলিকে জলপান করাতে যাচ্ছিলাম এমন সময় মনে হল সেটা হয়ত অনুচিত হবে। আচম্বিতে কর্কশ বেসুরো ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হল—শোভাযাত্রা ততক্ষণে ভিতরের চত্বরে প্রবেশ করেছে। আমার ভিতরে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার সঙ্গীর ঘোড়াটি হঠাৎ ভিড় দেখে ঘাবড়ে গিয়ে শহরের দিকে দৌড় দিল। আরোহী মাটিতে ধরাশায়ী হলেন। দৌড়তে গিয়ে একদিকের জিনের মধ্যে ঘোড়ার একটি ক্ষুর ঢুকে গেল। সেই অবস্থায় ছুটলে অল্পক্ষণের মধ্যেই জিনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হবে, তাছাড়া আমার সঙ্গী একবর্ণও স্পেনীয় ভাষা জানে না, কাজেই তাকে সাহায্য করার জন্যও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হল। সে বেচারা জিনের ছেঁড়া অংশটি হাতে নিয়ে প্রাণপণে গালি দিতে দিতে দৌড়চ্ছিল। আমরা ঘোড়ার মালিকের কাছে গেলাম বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে। সে অতি সহজেই আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। জিনের ছেঁড়া অংশগুলি এনে দিতে

দেখা গেল মেরামত করার মত অবস্থায় আছে। লোকটি ছয় রিয়েল পেয়েই সন্তুষ্ট হল। আমরা মনে করেছিলাম অন্তত কয়েক ডলার চাইবে। ঘোড়া ততক্ষণে পাহাড়ে পলায়ন করেছে। সেদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে আমরা জানতে চাইলাম ঘোড়া সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে। লোকটি মাথা নেড়ে বললে "ঠিক আছে"।

শহরে ফিরে দেখি চকের কাছে বেশ ভিড়। মোরগের লড়াই চলেছে। বালক বৃদ্ধ নর নারী সকলে সেই দেখতে সমাগত। মোরগ দুটি ঘাড় কাত করে এ ওর উপর প্রচণ্ড বিক্রমে লাফিয়ে পড়ছে দেখে দর্শকদের সে কি উত্তেজনা, যেন দুজন লোকের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখছে। ষাঁড় পালিয়ে যাওয়াতে সকলের বড়ই আশা ভঙ্গ হয় তাই মোরগের লড়াই দেখেই আশ মেটাচ্ছে। একটি মোরগ অন্যটির চোখ ঠুকরে নিল, সেটি পরাজয় স্বীকার করার পর দুটি বিরাটাকার মোরগ আনা হল। এইবার আসল খেলা শুরু। দুটি লোক হামাগুড়ি দিয়ে মোরগ দুটিকে উৎসাহ দিতে লাগল। বাজি ধরা হল। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যেমন হয়ে থাকে—প্রথমে কিছুক্ষণ কোন দিকে জয়ের সম্ভাবনা ঠিক বোঝা গেল না। মোরগ দুটি বহুক্ষণ ধরে লড়ল। ওদের মনিবরাও এতক্ষণ চালাতে পারত কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত সাদাটি না লালটি কে জিতেছিল আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু যেই হোক প্রতিযোগীর ভূলুণ্ঠিত চেহারার দিকে চেয়ে তার বিজয়দৃপ্ত ঘোরার ভঙ্গীটি আমার বেশ মনে আছে। জুলিয়াস সিজারের সদম্ভ উক্তি "আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম" তখন তার মুখে বেশ মানানসই হত।

মোরগ লড়াই তো শেষ হল, এবার সমবেত জনতা ছুটল আর একদিকে। তাদের অনুসরণ করে আমরা শহরের ঠিক বাইরে একটা সমতল জায়গায় এসে পেঁাছলাম। ঘোড়দৌড়ের মাঠ, প্রতিযোগীদের জন্য দাগ কাটা, ঘোড়াদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। বিচারক ও দর্শক মিলিয়ে প্রচুর জনসমাগম। ডন কার্লোস ও ডন ডমিঙ্গো নামে দুজন সুন্দরকান্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দড়ি ধরে প্রস্তুত হলেন। আমরা কিছুক্ষণ ধরে ঘোড়াদের অধৈর্য পদচারণা ও পা ছোঁড়া দেখছিলাম, এবার একটা চিৎকার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দৌড় আরম্ভ হল। ঘোড়া ও চালক প্রচণ্ড জোরে ছুটতে লাগল। তাদের ঘাড় এগিয়ে এল, চোখ জ্বলতে লাগল। তীরবেগে আমাদের পাশ দিয়ে সব কটি অশ্বারোহী পাশাপাশি বেরিয়ে গেল। ওদের

ছুটন্ত ক্ষুর ও ধূলো ছাড়া আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। ঘোড়ারা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাদের পিছু পিছু ছুটল। লক্ষ্যে পৌঁছে দেখি ঘোড়াগুলি ধীর মন্থর গমনে ফিরে আসছে। শোনা গেল সবচেয়ে লম্বা ও শক্ত গঠনের ঘোড়াটিই নাকি আগে পৌঁছেছে, যদিও পরেরটির সঙ্গে তার পার্থক্য কমই ছিল। অশ্বারোহীদের পরনে ছোট আঁট পোশাক, হাত পা দুই-ই খোলা, মাথায় রুমাল বাঁধা একহারা চেহারা। আমাদের বস্টনের আস্তাবলে যেমন সুসভ্য কৃশকায় ঘোড়া দেখা যায় এখানকার ঘোড়ার আকৃতি তেমন নয়। এরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, জ্বলজ্বলে চোখ, সুগঠিত শরীর। ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে সব আলোচনা শেষ হয়ে যাবার পর সকলে আবার শহরের দিকে ফিরে চলল।

বড় চত্বরে ফিরে দেখি বাজনা তখনও সমান তালে চলেছে। সারাদিন ধরে গীটার ও বেহালা বাজিয়েও বাজনদারদের ক্লান্তি নেই। তখন বিকেল পড়ে এসেছে। অনেকে বাজনার সঙ্গে নাচ শুরু করল। ইতালীয় নাবিকরা এতে যোগ দিল। একজন পা ঘষে ঘষে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নাচ নাচতে শুরু করল, সেই দেখে দর্শকদের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। তখনও স্থানীয় ভদ্রলোক ও মহিলাদের সমাগম হয়নি। তাঁদের নাচ দেখার প্রবল ইচ্ছা সম্বরণ করে আমাদের সমুদ্রতীরে ফিরে যেতে হল। কেননা সূর্যাস্তের সময় জাহাজে পৌঁছবার কথা, তার একঘণ্টার বেশী দেরি করা মোটেই সঙ্গত হবে না। সারাদিন মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করে এবার আমরা আবার কারাগারে ফিরে চললাম। পৌঁছে দেখি চারিদিক গভীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অন্ধকারে তরঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে আমাদের নৌকা আসছে। জাহাজে পা না দেওয়া অবধি আমরা আইনত ছুটিতে আছি। কাজেই মহা আরামে নৌকায় আরোহণ করে আমরা বলাবলি করতে লাগলাম কী সৌভাগ্য গায়ে জল লাগাতে হল না। কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল—এক বিরাট ঢেউ নৌকার এদিক থেকে ওদিক আছড়ে পড়ে আমাদের সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত করে দিল। নৌকাও জলে ভরে গিয়ে ভারী হয়ে গেল। প্রতিটি ঢেউয়ে ক্রমশঃ নীচে নেমে যেতে লাগলাম আমরা। প্রায় হাঁটু অবধি জল। ঐ অবস্থায় বালতি এবং বালতি অভাবে টুপিতে করে জল তুলে তুলে ফেলা হতে লাগল। জাহাজে পৌঁছে নৌকা তুলে রেখে বেশ পরিবর্তন করে যথারীতি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বসলাম। এইভাবে আমাদের দ্বিতীয় দিনের ছুটি কাটল।

একদিনের পক্ষে যথেষ্ট আমোদপ্রমোদ হয়েছে—এবার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাদের পরদিন সকাল থেকেই রঙ করার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। দড়াদড়ি, কাছি, মাস্তুলের দড়ি, মাস্তুলের উপর থেকে পাটাতন অবধি বিস্তৃত দড়ি ইত্যাদি সব রঙ করতে হবে। আমরা আবার বাক্স থেকে পুরানো ময়লা রঙলাগা জামাকাপড় বার করে পরলাম। কেউ কেউ দড়ি বেয়ে উপরে উঠল। এইভাবে কাজ চলল। ইতালীয় জাহাজটির ক্যাথলিক মাল্লারা ইস্টার উপলক্ষে তিনদিন ছুটি পেল। তারা সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে কূলে গেল, আমরা রঙমাখা অবস্থায় চেয়ে চেয়ে দেখলাম। প্রোটেস্ট্যাণ্ট হওয়ার এই তো সুখ। নিউ ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম যদি কখনও প্রসার লাভ করে তবে নিয়ম করে ছুটির দিনগুলি কমাতে হবে। উত্তর আমেরিকাবাসীদের ছুটি কাটাবার সময় কোথায়। তারা এতই কাজের মানুষ। প্রোটেস্ট্যাণ্ট জাহাজে বড়দিন উদযাপন করা হয় না। ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস কবে আসে কেউ তার খেয়ালও করে না। ফলে মাল্লাদের কপালে ছুটি একেবারেই নেই। এই উপায়ে প্রোটেস্ট্যাণ্ট জাহাজের মালিকরা বছরে তিন সপ্তাহ বেশী কাজ আদায় করে থাকে।

দুপুরের দিকে একটি পাল চোখে পড়ল। জাহাজটি কাছে এলে তাদের আমেরিকান পতাকা দেখে আমরাও আমাদের পতাকা তুললাম। দেশের খবর পাওয়া যাবে ভেবে আমরা সকলেই উৎসাহিত। কিন্তু পরে দেখা গেল জাহাজটির মালিকানা আমেরিকান হলেও ক্যাপ্টেন ও উচ্চ কর্মচারী ছাড়া সকলেই স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের বাসিন্দা। তাদের বিজাতীয় ভাষায় কথাবার্তা শুনে আমরা বড়ই হতাশ হলাম। জাহাজটির নাম কাটালিনা—আয়াকুচো ও লরিয়োটের সঙ্গে একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত। আমাদের পাল দেখে মনে ক্ষীণ আশা হয়েছিল যে হয়ত এই জাহাজটিই বস্টন থেকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে আসছে। কিন্তু সে আশাও ধূলিসাৎ হল।

সেখানকার যাবতীয় চামড়া সংগ্রহ করে আমরা সান পেড্রোতে উপনীত হলাম। সেখানে আমাদের পূর্বপরিচিত ইতালীয় জাহাজটির সঙ্গে দেখা। ইংরাজ, স্পেনীয়, অর্ধস্পেনীয়, মার্কিন, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী মিলিয়ে প্রায় তিরিশজন মাল্লা। যদিও জাহাজটি আয়তনে ছোট কিন্তু এত লোক সত্ত্বেও ওদের কাজ বিশেষ এগোচ্ছিল না। আমেরিকাবাসী অথবা ইংরাজ মাল্লারা যত কর্মপটু অন্য দেশবাসীরা তত নয়। অনুরূপ আয়তনের অ্যালার্ট নামে

একটি জাহাজ পরে ঐ কূলে আসে। তাদের দুটি নোঙর ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগল তার দ্বিগুণ সময় ইতালীয়রা কেবল কপিকলের জন্য চেঁচামেচি ও দৌড়াদোড়ি করেই কাটাল।

কেবল একটি বিষয়ে ওদের কাছে আমাদের কিছু শিখবার আছে। সেটি ওদের স্বাভাবিক গান গাইবার ক্ষমতা। মার্কিনরা অত্যন্ত মিতব্যয়ী, কিন্তু সঙ্গীত কি করে কাজে লাগান যায় এটা তারা এখনো জানে না। তারা বিরস বদনে ভারী ভারী নৌকা বাইবে, কিন্তু সে সময় সমস্বরে গান গাইলে যে পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হয় সেটা ইতালীয়দের দেখলে বুঝতে পারা যায়।

দক্ষিণে হাওয়ার কাল যখন শেষ হল আমরাও নিশ্চিন্তে সান ডিয়াগোর দিকে রওনা হলাম। পথিমধ্যে সান জুয়ানে থেমে নিতে হবে।

তখন বসন্তকাল। তিমিরা বৎসরান্তে ঐ সময় অগভীর জলে চলে আসে। সান পেড্রো ও সন্নিহিত অঞ্চলের উপকূলে ঐ সময় প্রচুর তিমির আগমন হয়। আমরা প্রথমে কয়েকদিন এই অদ্ভুত জীবগুলি খুব বিস্ময়ভরে নিরীক্ষণ করতাম। তিমির নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিনকি দিয়ে ওঠা জল দেখতে পেলেই তাড়াতাড়ি পরস্পরকে ডেকে দেখাতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কয়েকবার ওরা খুব কাছেও এসে পড়েছিল। একদিন কুয়াশাবৃত রাত্রি, হাওয়া বন্ধ, আমি নোঙরের কাছে পাহারায় দাঁড়িয়ে, এমন সময় একটি তিমি আমাদের কাছিটি প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেল। ধাক্কা লাগাটা ওরও তেমন মনঃপূত হয়নি মনে হল, কেননা সঙ্গে সঙ্গে ও দ্রুতগতি সরে গেল। জলের ফোয়ারা দেখে বুঝলাম বেশ নিরাপদ ব্যবধানে চলে গেছে। একদিন আমাদের ডিঙি হঠাৎ একটি তিমির সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রায় উলটোবার উপক্রম হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হাল ধরে ছিলেন, আমরা উলটোদিকে মুখ করে দাঁড় বাইছি, হঠাৎ ঠিক সামনেই তিমির নিঃশ্বাসের শব্দ কানে গেল। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠলেন "উলটো দাঁড় টান, শিগগির, প্রাণ বাঁচাতে চাও তো উলটো দাঁড় টান—" আমরা উলটো দাঁড় বাইলাম। ফেনায় ভরে গেল চতুর্দিক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একটা বিরাটাকার কুঁজো পিঠ জলের নীচে নেমে যাচ্ছে, আমাদের গলুই থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। নৌকা না থামালে আমরা সোজা তিমির গায়ে গিয়ে পড়তাম। তিমিটি ভ্রূক্ষেপ না করে আস্তে আস্তে ডুবে গেল, ল্যাজটি

খানিকক্ষণ জেগে রইল জলের উপর। খুব কাছ থেকে জীবটি দেখলাম, লোহধূসর গায়ের রঙ, অতি কদাকার মোটা চামড়া—পুনর্বার ঐ দৃশ্য দেখবার ইচ্ছা নেই। যেসব তিমি থেকে তেল পাওয়া যায় সেগুলি তত হিংস্র হয় না; কিন্তু পিঠকুঁজো এই ধরনের তিমিগুলি ধরা খুব কঠিন, ধরলেও তেল এত কম থাকে যে পরিশ্রমে পোষায় না। তিমি ধরা জাহাজগুলি সেজন্য এই উপকূলে বড় একটা আসে না। আমাদের ক্যাপ্টেন একবার লরিয়োটের ক্যাপ্টেন নাঈএর সঙ্গে মিলে তিমি ধরার মতলব করেন। কিন্তু মাত্র দুটি হারপুণ থাকায় সে চিন্তা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।

মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে এইসব তিমি ঝাঁক বেঁধে সান্টা বারবারা ও সান পেড্রোর উন্মুক্ত বন্দরে ভেসে বেড়ায়। দু-একটি কদাচিৎ কখনো সান ডিয়াগো ও মণ্টারির সুরক্ষিত পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়ে। গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি আবার এরা চলে যায়। আমরা সান জুয়ান যাবার পথে অনেক তেলওয়ালা তিমি দেখলাম। এগুলির নিঃশ্বাসের ফিনকি দেখেই বোঝা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের কূল ধরে আমরা ভেসে চললাম। স্থির সমুদ্র, তীরে পাহাড় মাথা উঁচু করে জলের উপর এসে পড়েছে। সেখানে কুড়ি ফ্যাদম জলে আমরা নোঙর ফেললাম। এই পর্বতময় উপকূলের কথা আমরা লাগোডার মাল্লাদের মুখে আগেই শুনেছিলাম। স্থানটি নোঙরের পক্ষে মোটেই সুরক্ষিত নয়, ঝড়ের আভাস দেখলেই কূল ছেড়ে প্রাণভয়ে সমুদ্রে পালাতে হয়। আমরা সব রকম সম্ভাবনার জন্যই প্রস্তুত হয়ে রইলাম। আমাদের দালাল কূলে নামলেন। পাহাড়ের অপর দিকের মঠটি তাঁর গন্তব্য স্থল। তিনি চলে গেলেন। আমরা নৌকা কূলে বেঁধে জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে লাগলাম।

সান জুয়ান এই অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র সুন্দর জায়গা। মালভূমি সমুদ্রকূলে এসে হঠাৎ খাড়া পাহাড়ে শেষ হয়েছে, নীচে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে। কয়েক মাইল জুড়ে সমুদ্রতট বলতে কিছু নেই। জল থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। আমরা যেখানে নৌকা ভিড়ালাম সেখানে অল্প একটু বাঁকের মধ্যে সামান্য বালুতট, এখানে ছাড়া নৌকা বাঁধার অন্য জায়গা নেই। সামনে চার পাঁচশ ফিট খাড়া

পাহাড়। এখান থেকে মঠে কি করে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, চামড়াই বা কি করে আনা হবে আমরা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ঐ খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা বাঁদর ছাড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দালাল অনেক ঘুরপথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁকে ক্রমাগত উঁচু-নীচু ফাঁক ফোকর ইত্যাদি লাফিয়ে পার হতে হচ্ছিল। ওঁর আসতে দেরী হবে বুঝে আমরা ঝিনুক কুড়িয়ে ও কূলের শোভা নিরীক্ষণ করে সময় কাটাতে লাগলাম। সমুদ্র যেখানে পর্বত কন্দরে, গুহা গহ্বরে সাদা ফেনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ছে সেখানে ঝড়ের সময় উন্মত্ত সমুদ্রের আছড়ানিতে না জানি কি অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। জায়গাটি দেখে নিউপোর্টের পাহাড় অঞ্চলের কথা মনে পড়ল। কিন্তু এখানকার দিগন্তবিস্তারী নির্জনতা যেন এক আশ্চর্য রূপ রচনা করেছিল। কোথাও জনপ্রাণী নেই, সারা দিনরাত ব্যাপী কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের হৃদয়-স্পন্দন। পিছনের পর্বতশ্রেণী আমাদের সভ্য জগৎ থেকে আড়াল করে একেবারে সমুদ্রের মুখোমুখি করেছে। আমি একা একটি পাথরের উপর চুপ করে বসে রইলাম, সেখানে সমুদ্র ভিতরে ঢুকে ঝরনার মত উপছে উঠছে। বহুক্ষণ বসে বসে আমি সেই বিজন একাকীত্বের আস্বাদ নিতে লাগলাম। বাড়ী ছাড়ার পর এই প্রথম কোলাহলের বাইরে নিজের সত্ত্বাকে অনুভব করার সুযোগ পাওয়া গেল। ভেবেছিলাম জাহাজের সহস্র ক্ষুদ্রতার চাপে বোধহয় আমার সমস্ত রসবোধের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সেই কঠিন বর্ম ভেদ করেও যে আমার মনে কাব্যনির্ঝর বয়ে চলেছে সে কথা উপলব্ধি করে আজ আশ্বস্ত বোধ করলাম। এতদিন যে সব উপকূলে কাটালাম তার বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে এই পর্বতসঙ্কুল সমুদ্রতীর যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের ছোঁয়া এনে দিল। সহসা সঙ্গীদের ডাকে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। দালাল মহাশয় কাজ সেরে ফিরেছেন। অতএব জাহাজে ফিরতে হবে।

জাহাজে ফিরে দেখি বড় নৌকাটি মালপত্র বোঝাই করে তৈরী। খাবার পর ডিঙির পিছনে নৌকা বেঁধে আমরা আবার ফিরে চললাম। পৌঁছে দেখা গেল একটি গরুর গাড়ী নিয়ে দুটি লোক পাহাড়ের নীচে অপেক্ষা করছে। ক্যাপ্টেন আগে আগে চললেন। আমরা দুজন মাল্লা তাঁর অনুসরণ করলাম। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে ফণীমনসার ঝোপ-

ঝাড় ভেঙ্গে উপরে পৌঁছলাম। মালভূমি এখানে একেবারে সমতল—জনবসতির মধ্যে কেবল সাদা মঠের বাড়ীটি, তার চারিদিকে রেড ইণ্ডিয়ানদের কুটীর। পাহাড়ের ধারে রেড ইণ্ডিয়ানরা স্তূপীকৃত চামড়া নিয়ে বসে ছিল। মঠের দিক থেকে চামড়া বোঝাই আরো গাড়ী আসতে দেখা গেল। ক্যাপ্টেন বললেন এইবার চামড়া ছুঁড়তে শুরু করা হোক। এছাড়া ওগুলো আর নীচে নিয়ে যাবার অন্য কোন উপায় নেই—একেবারে চারশ ফুট নীচে ফেলে দেওয়া ছাড়া। উপর থেকে নীচের দিকে তাকালাম, মাল্লাদের দেখাচ্ছিল ছোট ছোট পিঁপড়ের মত—

অতি ক্ষুদ্র মুষিকের মত
উপকূলে লোকগুলি; তরণী বিশাল
এত উচ্চ হতে যেন বায়ু যন্ত্র সম
বোধ হয়; বায়ু যন্ত্র নাহি যায় দেখা।

শক্ত দুপাট করা চামড়াগুলি নিয়ে আমরা প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম। টুকরোগুলো সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত হাওয়ায় ভেসে ভেসে নীচে নামতে লাগলো। এখন ভাঁটার সময়, কাজেই জলে পড়ার ভয় নেই। নীচে মাল্লারা চামড়াগুলি উঠিয়ে নিয়ে মাথায় করে নৌকায় তুলতে লাগল। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পাহাড়ের শিখর থেকে চামড়াগুলির ভেসে ভেসে নীচে নামা, নীচে পিঁপড়ের আকৃতি মানুষদের সেগুলি নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত আনাগোনা।

গোটা কয়েক চামড়ার টুকরো পাহাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে আটকে রয়ে গেল, সেগুলি উদ্ধার করার আশায় আমরা ঐ দিকে আরো চামড়া ছুঁড়লাম, সেই ধাক্কায় চামড়াগুলি স্থানচ্যুত হল। কিন্তু তা না হলে মহা বিপদ হত। ক্যাপ্টেনকে বলতে শুনলাম তাহলে নাকি উনি জাহাজ থেকে পাল নামাবার দড়ি আনিয়ে আমাদের কাউকে সেই দড়ি ধরে নীচে নামতে বাধ্য করতেন। কয়েক বছর আগে নাকি একটি ইংরাজ জাহাজের মাল্লাকে ঐভাবে নামতে হয়েছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হল সামান্য দু-এক টুকরো চামড়ার জন্য কাজটি দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু আদেশ হলে তাই-ই করতে হবে। ভবিষ্যতে যে কার কপালে কি আছে কে জানে। মাস ছয়েক বাদে আমাকে সেই একই জায়গায় দড়ি বেয়ে নামতে হয়েছিল সামান্য দুখানা চামড়া বাঁচাবার জন্য।

সমস্ত চামড়া নীচে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আমরা নৌকায় গিয়ে উঠলাম। সব মাল তুলে নৌকা ছাড়ল। জাহাজে উঠে চামড়াগুলির সুব্যবস্থা করে আবার সান ডিয়াগোর দিকে যাত্রা। তখনও সূর্য অস্ত যায় নি।

শুক্রবার, ৮ই মে, ১৮৩৫। সান ডিয়াগো বন্দর একেবারে ফাঁকা, লাগোডা, আয়াকুচো, লরিয়োট যে যার কাজ সেরে চলে গেছে। আমাদেরটি ছাড়া অন্য সব মালগুদাম বন্ধ। কেবল জনকুড়ি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী, যারা এতদিন ঐ জাহাজগুলি দ্বারা নিযুক্ত ছিল, হাতে টাকা পেয়ে মহা ফূর্তিতে বসবাস করছে। কয়েক বছর আগে একটি রুশ জাহাজ ঐ তীরে এক বিরাট চুল্লী প্রস্তুত করেছিল। সেই চুল্লীটিকে এরা বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করছে দেখলাম। চুল্লীতে আট দশ জন লোক স্বচ্ছন্দে ধরে যায়। একটি দরজা ও উপরের দিকে একটি ফাঁক আছে। ঝড় বাদলে উপরের ফুটোটি বন্ধ করে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে এরা নিশ্চিন্ত আলস্যে, মদ্যপান করে, তাস খেলে, গানবাজনা করে দিন কাটায়। সপ্তাহে একদিন একটি ষাঁড় কিনে সাতদিন ধরে সেটি খাওয়া হয়। শহর থেকে মদ ও অন্যান্য আহার্য কিনে আনার জন্য রোজ একজন বাজারে যায়। লাগোডা থেকে এক পিপে ভর্তি রুটি ও ময়দা এরা নামিয়ে নিয়েছিল। আমাদের জাহাজে তখন লোকের দরকার, ক্যাপ্টেন টমসন এদের মধ্য থেকে লোক নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই অভিপ্রায়ে উনি চুল্লীর ভিতরে গিয়ে ওদের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুই কথাবার্তা চালালেন।[১] তাদের সর্দারের নাম মান্নিনি, সম্ভ্রম করে তাকে মিঃ মান্নিনি বলে ডাকা হত। বেশ স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায়, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা—সমস্ত ক্যালিফোর্ণিয়ায় তার নাম সুবিদিত। তার সঙ্গেই ক্যাপ্টেন কথা কইলেন। মাসে পনেরো ডলার মাইনে, এক মাসের আগাম দিতে চাওয়া সত্ত্বেও তারা কেউই আসতে রাজী হল না। বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর মত অবস্থা। হাতে টাকা থাকলে তারা কিছুরই পরোয়া করে না, তখন পঞ্চাশ ডলারের চাকরিও ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না—আবার টাকা ফুরিয়ে গেলে দশ ডলারে রাজী হওয়াও কিছু আশ্চর্যের কথা নয়।

"এখানে আপনারা কি করেন মিঃ মান্নিনি?" ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন।

"ওহ! তাস খেলি, মদ খাই, ধূমপান করি, যা ইচ্ছে।"

"আপনারা জাহাজে এসে কাজ করতে চান?"

"না, না। আমাদের কাছে এখন অনেক টাকা। এখন কাজ করবো না। টাকা না থাকলে কাজ।"

"কিন্তু এভাবে টাকা আর কতদিন থাকবে?"

"জানি জানি। আস্তে আস্তে সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। তখন কানাকারা কাজ করবে।"

এদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। ক্যাপ্টেন ঠিক করলেন ওদের টাকা ফুরিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করবেন।

আমাদের সংগৃহিত চামড়া ও চর্বি এখানে জমা করে আবার হাওয়ার অনুকূলে চলবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এমন সময় ক্যাপ্টেন আর একবার কানাকাদের রাজী করাবার শেষ চেষ্টা করলেন। এবার একটু সুফল ফলল। ক্রমশঃ ওদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কমে আসছিল, কাজেই মিঃ মান্নিনির এবার মন ভিজল। তিনি নিজে তিনজন সঙ্গী নিয়ে মালপত্র সমেত আমাদের জাহাজে এসে উঠলেন। আমার ও কমবয়সী মাল্লাটির উপর আদেশ হল কিছুদিনের জন্য মালগুদামে আস্তানা বাঁধতে। আমি একটু অবাক হলাম, কিন্তু বৈচিত্র্যের মোহ আমার চিরদিনের। কাজেই সানন্দে আমার জিনিসপত্র নিয়ে গুদামে উপস্থিত হলাম। আমার চোখের সামনে জাহাজ চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তারপর মাসকয়েকের মত থাকবার ব্যবস্থা করতে চললাম।

॥ ১৯ ॥ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসীদের বৃত্তান্ত ॥

চক্ষের পলকে আমার জীবনে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। নাবিক থেকে উপকূলবাসীর বৃত্তি গ্রহণ করার মধ্যে আকস্মিকতা তো আছেই, তদুপরি আছে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতার ভাব। কাজেই এই পরিবর্তনে মনে মনে বেশ আনন্দই হল। আমাদের বিরাট মালগুদামটিতে চল্লিশ হাজার টুকরো চামড়া রাখার স্থান ছিল। বাড়ীটির কোণে আলাদা একটি ঘর, তাতে চারজনের শোবার জায়গা। ঘরের মেঝে কাঁচা মাটির। এক দিকের দেয়ালে একটি গর্ত, তাতে জানলার কাজ চলে। তা ছাড়া একটি টেবিল ও বাসনপত্র রাখার আলমারি। আমরা বাক্স নামিয়ে বিছানা

বিছিয়ে এই ঘরে বসবাসের উদ্যোগ করলাম। এই ঘরের উপরে আরেকটি ঘর, সেখানে আমাদের পূর্বপরিচিত মিঃ রাসেল একা রাজকীয় মর্যাদায় খেয়ে এবং ঘুমিয়ে কাল কাটান। এ ছাড়া তাঁর করবার মত তৃতীয় কাজ নেই। আমাদের জাহাজের অন্য মাল্লাটির বাড়ী মার্বলহেড। অল্পবয়সী ছেলে, নাম স্যাম। তার উপর পড়ল আমাদের রান্নার ভার। চারজন কানাকা ও আমি ছাড়া নিকোলাস নামে বিশাল বপু এক ফরাসী সেখানে বাস করত। স্যাম, নিকোলাস ও আমি ঐ ঘরে থাকতাম। কানাকারা আমাদের সঙ্গে কাজ করত ও খেত কিন্তু ঘুমোবার সময় যেত চুল্লীর ভিতর। নিকোলাসের মত বিরাটাকৃতি লোক আমি খুব কম দেখেছি। সে যে জাহাজে করে এখানে আসে সেটি ডুবে যাওয়াতে ও এখানেই থেকে গেছে। এখন বিভিন্ন মালগুদামে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। লোকটি লম্বায় ছয় ফুটের উপর, গঠনও এত চওড়া যে একটা দর্শনীয় বস্তু হিসেবে গণ্য হবার মত। তার শরীরের মধ্যে দ্রষ্টব্য অংশ হল তার বিরাট পায়ের পাতা। এত বড় মাপের জুতো সারা ক্যালিফোর্ণিয়া খুঁজে পাওয়া যায় নি। অগত্যা ওকে ওয়াহু থেকে এক জোড়া জুতো আনাতে হয়, কিন্তু সে জুতোও ওকে পিছনটা মুড়ে পরতে হত। ওর কাছে শুনেছি গুডউইন উপকূলে একবার ওর জাহাজডুবি হয়। তখন ওকে লণ্ডনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পোশাক পরিচ্ছদের শতচ্ছিন্ন অবস্থা, পায়ে জুতো নেই। রাষ্ট্রদূত ওর জন্য বিশেষভাবে জুতো তৈরী করতে দেন। জুতো না পাওয়া অবধি জানুয়ারী মাসের শীতে ওকে লণ্ডনের রাস্তায় শুধু মোজা পায়ে বেড়াতে হয়েছে। শরীরের অনুপাতে ওর শক্তিও ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু সে সম্বন্ধে ও একেবারেই সচেতন ছিল না। লোকটি ছিল শিশুর মত নিরীহ। খুব অল্প বয়স থেকেই সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরেছে, লেখাপড়া শেখার সুবিধা হয় নি। যুদ্ধজাহাজ, বাণিজ্য জাহাজ, ক্রীতদাস ধরা জাহাজ সব রকম জাহাজেই কাজের অভিজ্ঞতা আছে ওর। দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা ছাড়াও আরো গুরুতর ও দোষণীয় কাজেও ও জড়িত ছিল, সে কথা আমাকে একবার গোপনে জানিয়েছিল। দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটনে একবার ওর প্রাণদণ্ডাদেশ হবার উপক্রম হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েও ওর ভয় ঘোচেনি— তারপর থেকে ও আর আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেনি। আমি ওকে

কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না যে এক অপরাধের জন্য কেউ দু'বার অভিযুক্ত হতে পারে না। একবার নিজের প্রাণটি অতিকষ্টে বাঁচিয়েছে সুতরাং আর সে দেশের ছায়াও মাড়াবে না, এই ছিল ওর অভিমত।

ওর অতীত জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে জানলেও আমি কিন্তু ওকে মোটেই ভয় পেতাম না। আমাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। আমার চেয়ে আকৃতি, শক্তি ও বয়সে বড় হলেও ও আমাকে বেশ সমীহ করে চলত, সম্ভবতঃ আমার শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার জন্য। ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যেও এই বোধটুকু আছে।

ও বলত "পরে তো তুমি ক্যাপ্টেন হয়ে এসে আমার উপর জুলুম করবে, তাই এখন থেকে তোমার সঙ্গে ভাবসাব রাখি।" আমরা দুজনে একসঙ্গে মিলে উচ্চ কর্মচারীকে বেশ দাবিয়ে রেখেছিলাম, কেননা নিকোলাসকে তিনি বিলক্ষণ ভয় করে চলতেন। আমাদের বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস করতেন না। আমার অন্য সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্যগুলিও বেশ লক্ষ্যণীয়।

স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের সঙ্গে ক্যালিফোর্ণিয়ার বাণিজ্য বেশ কিছুকাল ধরে চলে আসছে। সব জাহাজেই মাল্লার কাজ করত ঐ দ্বীপের বাসিন্দারা। ওরা কোন রকম লেখাপড়া করে কাজে যোগ দিত না, যখন ইচ্ছা হত কাজ ছেড়ে দিত। জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওরা অনেকে সান ডিয়াগোতে চামড়া শুখোবার কাজ নেয়। এই ভাবে সান ডিয়াগোর উপকূলে ওদের একটা উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আয়াকুচো ও লরিয়োটে কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিল। এখন মিঃ মান্নিনি ও আরো তিনজন আমাদের জাহাজে যোগদান করাতে ওদের লোকসংখ্যা কমে বোধহয় আর জনকুড়ি বাকী ছিল। এদের মধ্যে চারজন আমাদের গুদামে কাজ নিয়েছিল, আয়াকুচোর গুদামে ছিল আরো চারজন। বাকি কানাকাদেরও টাকা ফুরিয়ে এসেছিল। তারা অন্য জাহাজে চাকরি পাবার আশায় বিনাকাজে দিন কাটাচ্ছিল।

আমি যে চারমাস ওদের মধ্যে ছিলাম সেই সময়ে ওদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি আয়ত্ত করার খুবই চেষ্টা করি। ভাষাটা শিখেছিলাম, কিন্তু বইয়ের অভাবে পড়তে শেখা হয়নি। কানাকারা অনেকে ধর্মপ্রচারকদের কাছ থেকে লেখাপড়া শিখেছিল। সামান্য ইংরাজী বুঝতো ওরা। উপকূলে আমরা একধরনের পাঁচমিশালী ভাষা

ব্যবহার করতাম যাতে সকলেরই সুবিধা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বত্রই স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসীদের সংক্ষেপে কানাকা বলা হয়। কানাকা কথাটি ওদেরই ভাষা থেকে উদ্ভূত, অর্থ মানুষ। ওরা নিজেদের বর্ণনা করতে "মানুষ" শব্দটি এবং শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের জন্য "হাওল" নামে একটি শব্দ ব্যবহার করে। 'কানাকা' কথাটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দুই-ই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ওদের নামগুলি এত বড ও উচ্চারণ করতে কষ্টকর যে ক্যাপ্টেন ও মাল্লারা ওদের জাহাজের নামানুসারে অথবা খেয়ালখুশিমত নামকরণ করত। কারো নাম দেওয়া হত জ্যাক, টম, বিল, কেউ বা পেলিকান, কাছি বা মাস্তুল। আমাদের সঙ্গী চারজনের নাম ছিল বিচিত্র। ওয়াহুতে এক ধর্মযাজকের নাম থেকে একজনের নাম দেওয়া হয়েছিল মিঃ বিংহ্যাম। আর একজনের নাম হোপ। ঐ নামে একটি জাহাজ এসেছিল। টম ডেভিস নামে তৃতীয় ব্যক্তির নামকরণ হয়েছিল তার প্রথম ক্যাপ্টেনের নাম অনুসারে। চতুর্থজনেব সাদৃশ্য ছিল পেলিকান পাখীর সঙ্গে, অতএব তার নাম হল পেলিকান। তাছাড়া ছিল লাগোডা-জাক, ক্যালিফোর্ণিয়া-বিল। নাম যাই হোক না কেন লোকগুলি ছিল অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির, বুদ্ধিমান ও চিত্তাকর্ষক। ওদের প্রতি আমি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়েছিলাম। এখনো পর্যন্ত কানাকাদের নাম শুনলেই আমার সেই সব সুখস্মৃতিব উদয় হয়।

টম ডেভিস যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছিল। ও অঙ্ক ও ইংরাজী মোটামুটি রকম জানত। ক্যালিফোর্ণিয়ার সাধারণ লোকেদের মতই ওর বুদ্ধিমত্তা, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী। ওকে নৌবিদ্যা ও বিজ্ঞান শেখালে ও সহজেই উন্নতি করতে পারত মনে হয়। মিঃ বিংহ্যামের বয়স পঞ্চাশের উপর, লেখাপড়া না জানলেও অতি উদারচেতা ভদ্রলোক। ইংরাজী তেমন জানতেন না। ওঁর সামনের দুটি দাঁত ছিল না। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের রাজা কামেহামেহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ ওঁর বাবা দাঁত দুটি উপড়ে দিয়েছিলেন। আমরা রসিকতা করে বলতাম ক্যাপ্টেন কুককে ভোজন করতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। মিঃ বিংহ্যাম এমনিতে শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু এই কথা শুনলেই বিষম চটে উঠতেন। উত্তেজিত হয়ে অসংলগ্ন ভাবে বলতেন "না, না, আমি না। আমি এতটুকু—এত বড় নই। আমার বাবা ক্যাপ্টেন কুককে দেখেছেন। আমি দেখিনি,

না, না।” নাবিকদের ধারণা ছিল ক্যাপ্টেন কুকের নরখাদকের হাতে প্রাণ গেছে। কিন্তু কানাকারা কেউই এই নিয়ে ঠাট্টা সহ্য করতে পারত না। ওরা বলত “নিউজিল্যাণ্ডের কানাকারা সাদা লোক খায়, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের কানাকারা নয়। তোমাদের কাছে সবই সমান।

মিঃ বিংহ্যাম ওদের মধ্যে দলপতি গোছের ছিলেন। সকলে ওঁকে মান্য করে চলত, কিন্তু ইনি লেখাপড়া না জানায় মিঃ মান্নিনিই ছিলেন কানাকাদের একচ্ছত্র অধিপতি। মিঃ বিংহ্যামের সঙ্গে অবসর সময়ে আমি নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম, ওঁদের সামাজিক রীতিনীতি, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের বিখ্যাত রাজা কামেহামেহা ও তাঁর উত্তরাধিকারী রিহো রিহো, যে ইংলণ্ডে মারা যায়—ইংলণ্ড থেকে তার মৃতদেহ ব্লণ্ড নামক যুদ্ধজাহাজে করে আনা হয়। তাছাড়া আমি ওঁকে ক্যাপ্টেন লর্ড বায়রণের কথাও জিজ্ঞাসা করতাম। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান মিঃ বিংহ্যামের স্পষ্ট মনে ছিল। ওঁদের সামাজিক জীবনে ধর্মযাজকরা কি কি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সে কথাও হত। অবশ্য কোন সময়ে যে ওঁদের সমাজে মনুষ্যমাংস ভক্ষণ করার রেওয়াজ ছিল একথা উনি কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতেন না। এই সভ্য, সুন্দর ও বুদ্ধিমান জাতি যে মাত্র কিছুদিন আগেও নরখাদক ছিল একথা মনে রাখলে এদের প্রতি অবিচার করা হয়। পৃথিবীর কোন অসভ্য জাতির ইতিহাসে সভ্যতার আগমন এত দ্রুত ও বিস্ময়কর ভাবে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। আমি এদের হাতে নিজেকে নিঃসংশয়ে ছেড়ে দিতে পারতাম। এমনকি কোন উপকারের প্রয়োজন হলে আমি নিজ দেশবাসীর কাছে সাহায্য চাইবার আগে এদের কাছে যেতাম। পরস্পরের সঙ্গে এদের ব্যবহারে এমন সরল মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায় যা সভ্য সমাজে দুর্লভ। এদের মধ্যে আপন পর ভেদ একেবারেই নেই। টাকাকড়ি, খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড় সব কিছুই এরা মিলে মিশে ব্যবহার করে থাকে, এমনকি তামাক পর্যন্ত সকলে মিলে পান করে। একবার একজন উত্তর মার্কিনী ব্যবসাদার মিঃ বিংহ্যামকে নিজের অর্থ সঞ্চিত করে রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। মিঃ বিংহ্যাম অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে তাকে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে না, আমরা আপনাদের মত নয়। আমাদের একজনের টাকা থাকা মানে সকলেরই টাকা। আপনাদের মধ্যে একজনের টাকা থাকলে

সে সিন্দুকে বন্ধ করে রেখে দেয়। কোন কর্মের নন আপনারা। কানাকারা সকলে এক।” ওরা এমনই উদারহৃদয় যে খাবার সময় অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে তাকে না দিয়ে খায় না। একজনকে জানতাম, তার অর্থের অবস্থা ছিল অতি সঙ্গীন। এমন সময় সে একটি বিস্কুট পায়। সেটিকেও সে পাঁচভাগ করে সঙ্গীদের দিয়ে তবে খেয়েছিল।

আমার কানাকা সহকর্মীদের মধ্যে যে লোকটি উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল তার নাম হোপ। এক বছরেরও অধিক সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি কিন্তু কোনদিন তাকে রাগতে দেখিনি। যেমন বুদ্ধিমান তেমনই হৃদয়বান ও ভদ্র ছিল সে। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও জাহাজের মেটদের কটুকাটব্য সে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করত। উপকারীর উপকার ও কখনো ভুলত না। একবার ওর অসুখ হয়, তখন আমি ওর সেবা করেছিলাম। জাহাজ থেকে ওষুধপত্রও এনে দিয়েছিলাম। কোন ক্যাপ্টেন কিন্তু ওর চিকিৎসার ভার নিতে রাজী হন নি। লোকটি আমার উপকারের কথা চিরজীবন স্মরণ রেখেছিল। কানাকাদের প্রত্যেকেরই একটি করে বিশিষ্ট বন্ধু থাকে, তার জন্য সে জীবন পর্যন্ত পণ করতে পারে। আমি হোপের এই অন্তরঙ্গ বন্ধু পদে অভিষিক্ত হয়েছিলাম। আমাকে ওর কিছুই অদেয় ছিল না। তার পরিবর্তে আমি ওর মার্কিন বন্ধু হিসাবে ওকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান করতাম, অক্ষর পরিচয় থেকে আরম্ভ করে সংখ্যা গোনা ইত্যাদি। শিক্ষালাভের আগেই বেচারা ঘরছাড়া, এদিকে শিখবার আগ্রহও প্রচুর। বস্টন সম্বন্ধে ওর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। ওদের কাছে বস্টনও যা আমেরিকাও তাই। বস্টনের বাড়ীঘর, লোকজন কেমন প্রায়ই জানতে চাইত ও, ছবি দেখবার ইচ্ছাও প্রকাশ করত। অনেক কঠিন কঠিন জিনিসও ওরা অতি তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলত। ওদের প্রশ্ন করার ধরন থেকেই বুঝতে পারতাম এত অল্পে ওদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত হয় নি—ওরা আরো জানতে চায়। আমার সঙ্গে আনা খবরের কাগজের পাতায় রেলগাড়ী ও বাষ্পীয় জাহাজের ছবি ছিল, কিন্তু সেগুলি বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। গাড়ী তৈরী, রাস্তা নির্মাণ, রেললাইন ইত্যাদির ব্যাখ্যা তো করা গেল, কিন্তু বাষ্প শক্তিতে গাড়ী চলার ধারণা কিছুতেই ওদের বোধগম্য হল না। শেষে আমি বাসন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখাতাম, কিন্তু আমার নিজের অক্ষমতার জন্যই

হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক ব্যাপারটা তবু ওদের কাছে ধোঁয়াটে থেকে গেল। বাষ্পীয় পোতের চালন প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা না করে আমি গতির একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম। টম এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সায় দিল, কেন না টম ন্যানটুকেট থেকে একটি ছোট বাষ্পীয় পোত নিউ বেডফোর্ডের দিকে যেতে দেখেছিল। টম হর্ণ অন্তরীপ পেরিয়ে আমেরিকার পূর্ব উপকূল ঘুরে এলেও কেবল ন্যানটুকেট ছাড়া আমেরিকার অন্য কোন জায়গা ও দেখেনি। তাই ও যখন ওর আমেরিকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিত আমি বেশ কৌতুক অনুভব করতাম। একটি পৃথিবীর মানচিত্র খুলে ধরলে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর মনোযোগ সহকারে দেখত, ও বিভিন্ন জায়গার দূরত্ব জানতে চাইত। হোপ একবার একটি অত্যন্ত হাস্যকর মন্তব্য করে। মেরু প্রদেশের যে দুটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর কোন নাম ইত্যাদি নেই, সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে "এখানে কি শেষ হয়ে গেছে?"

রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ীর নামকরণ ও সংখ্যা দেওয়ার পদ্ধতি ও তার সুবিধা ওরা অনায়াসে স্বীকার করল। আমেরিকা দেখার ইচ্ছা সকলেরই কিন্তু হর্ণ অন্তরীপের ঠাণ্ডাকে সকলেই যমের মত ভয় পায়। ওদের যে সব স্বজাতীয়েরা ঐ পথে ঘুরে এসেছে তাদের কাছে বর্ণনা শুনেই ওরা আর এগোতে সাহস পেত না। ওদের ধূমপানের পদ্ধতি বড় বিচিত্র। একটি বড় গোল পাত্রে খুব ছোট নলবিশিষ্ট হুঁকার প্রচলন আছে। হুঁকাটি ধরিয়ে মুখের কাছে এনে ওরা লম্বা টান দেয়, তারপর নাকমুখ দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ে। হুঁকাটি তারপর অন্যদের দেওয়া হয়। এইভাবে ধূমপান চলে। প্রায় বারোজনের ধূমপান একই হুঁকায় হয়। ইউরোপীয়দের মত এরা অনবরত ছোট ছোট টান দিয়ে ধূমপান করে না। একটি টান এক ঘণ্টার পক্ষে যথেষ্ট। নাবিকরা একে বলত "ওয়াহু টান"। প্রত্যেক কানাকারই নিজস্ব হুঁকা, তামাক, চকমকি ও ছুরি থাকে। তবে একবার হুঁকা ধরালে সেটা সমবেত ভাবে ব্যবহার হয়। *

বিদেশীদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করার মত জিনিস ওদের গান গাইবার পদ্ধতি। সুর বিশেষ নেই, কথাও তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে বানানো। ঠোঁট

* তখনও দেশলাইএর প্রচলন হয়নি। ঐ অঞ্চলে কোন জাহাজেও দেশলাই ব্যবহৃত হত বলে মনে পড়ে না। আমরা চকমকির বাক্স থেকে আগুন জ্বালাতাম।

ও জিভ প্রায় না নাড়িয়ে গলার মধ্য থেকে একরকম নীচু সুরে আওয়াজ বার করে ওরা। আশেপাশের লোকজন সম্বন্ধে গান বাঁধা ওদের স্বভাব এবং ইচ্ছা করে এমনভাবে গান বাঁধত যাতে ওরা ছাড়া কেউ বুঝতে না পারে। এ ভাবে গান গাইতে ওরা বেশ দক্ষ, কেন না আমি বহু চেষ্টা করেও কখনো ওদের গানের একটি কথাও ধরতে পারি নি। মিঃ মান্নিনি ছিলেন মুখে মুখে গান বাঁধতে সবচেয়ে ওস্তাদ। অনেক সময় ইংরাজ ও মার্কিনদের মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি উচ্চরবে গান ধরতেন, সেই শুনে অনতিদূরে অন্য কানাকারা অট্টহাস্য করে উঠত। বুঝতাম শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীদের নিয়ে মস্করা হচ্ছে। কানাকারা অতি চমৎকার অনুকরণ করতে পারে। আমাদের মুদ্রাদোষগুলি বেশ নকল করে দেখিয়ে দিত ওরা।

নিকোলাস, অল্পবয়সী ছেলেটি এবং মিঃ রাসেল ছাড়া উপকূলে যাদের সঙ্গে আমাকে কয়েক মাস কাজ করতে হয়েছিল তারা সকলেই কানাকা। এ ছাড়াও ছিল অগণিত কুকুর, একবার কোন জাহাজ থেকে ছেড়ে দেবার পর বংশবৃদ্ধি করে তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি বছর বহু কুকুর জলে ডুবে বা অন্য দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েও এই সংখ্যা। কুকুর-গুলি রাত্রে পাহারার কাজ করত। চামড়ার গুদামের আধ মাইলের মধ্যে কারো রাত্রিবেলা আসার উপায় ছিল না। সাচেম নামে যে কুকুরটি ঐ নামের জাহাজে করে প্রথম এদেশে পদার্পণ করেছিল অবশেষে অতি বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। আমার সামনেই যোগ্য সম্মান সহকারে তাকে কবরস্থ করা হয়। কুকুর ছাড়া মুরগী ও শূকরও ছিল। এই সব পশুদের এক একটি মাল গুদামে খাবার দেওয়া হত।

পিলগ্রীম চলে যাওয়ার পর কয়েক ঘণ্টাও কাটেনি "ঐ জাহাজ" চিৎকারে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। একটি মেক্সিকো দেশী জাহাজ বাঁক ঘুরে বন্দরে ঢুকল, তারপর এসে নোঙর ফেলল। জাহাজটির মিত্র প্রকৃতির চেহারা, নাম 'ফাজিও', সান পেড্রোতে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখানে চর্বি জমা করতে এসেছে। ওরা তীরে তাঁবু খাটিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিল। আমাদের সামাজিক জীবনে এটা বেশ বড় রকমের পরিবর্তন। ওদের তাঁবুতে গিয়ে ইংরাজী, স্পেনীয়, ফরাসী, কানাকা ও রেড ইণ্ডিয়ান কত রকম ভাষাই যে শুনতাম, তবু তার মধ্যে কিছু কিছু সর্বজনবোধ্য কথাও যে ছিল না তা নয়।

জাহাজ থেকে নামার পরদিন আমি চামড়া শুখোনোর কাজে লেগে গেলাম। এই কাজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে গেলে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চামড়া তৈরীর ইতিহাস জানা দরকার। পশুদের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার পর দুদিকে দুটি গর্ত করে তার মধ্যে দিয়ে খুঁটি পুঁতে টান টান করে সেগুলি রোদে শুখিয়ে নেওয়া হয়। তারপর দুই ভাঁজ করে জাহাজে পাঠান হয়। জাহাজগুলি চামড়া সংগ্রহ করে সান ডিয়াগোতে এসে ঐগুলি গুদামজাত করে। তারপর আরম্ভ হয় আমাদের কাজ।

প্রথমে চামড়াগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ভাঁটার জলে নিয়ে গিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা ভিজতে দেওয়া হয়। এটা হল পরিষ্কার করার উপায়। এতে চামড়া একটু নরমও হয়। প্রতিদিন আমরা সকলে মিলে এক শ পঞ্চাশ টুকরো চামড়া জলে ভেজাতাম, এক একজনের ভাগে পড়ত পঁচিশটি। তারপর দুপাট করে ঠেলাগাড়ীতে তুলে সেগুলি এনে একটি গামলায় ফেলা হত। গামলায় সমুদ্র জলের সঙ্গে আরো নুন মেশানো থাকত। এভাবে রাখা হত আটচল্লিশ ঘণ্টা। এখান থেকে তুলে একটি সমতল উঁচু জায়গায় ভাল করে পেতে শুখোতে দেওয়া হত। ভিজে ভিজে অবস্থাতেই ছুরির সাহায্যে বাড়তি চর্বি বা মাংসের অবশিষ্টাংশ সাবধানে কেটে নেওয়া হত। এগুলি থেকে গেলে পচে যাবার ভয় থাকে। আবার একটু অসাবধান হলেই ছুরি দিয়ে চামড়া কেটে যাবার সম্ভাবনা। ছয়জনে মিলে এই এক শ পঞ্চাশটি চামড়া পরিষ্কার করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম প্রথম হাঁটু গেড়ে কাজ করতে গিয়ে পিঠে অসম্ভব যন্ত্রণা হত। আমি প্রথম দিন আটটির বেশী চামড়া ছাড়াতে পারি নি। শেষে রপ্ত হয়ে যাবার পর প্রত্যহ পঁচিশটি শেষ করে ফেলতে পারতাম।

দুপুরের আগেই অপরিষ্কৃত অংশ ছাড়িয়ে শেষ করে ফেলা দরকার, কেন না দেরী হলে চামড়া শক্ত হয়ে যায়। রোদে যে সব তেল বার হয়েছে সেগুলি এবার চেঁচে ফেলার পালা। তারপর দুভাঁজ করে শুখোতে দেওয়া হয়। বিকেলে একবার এসে ওগুলি উলটে দেওয়া হয়ে থাকে। পরদিন আবার রোদে ফেলে শুখোনো। সম্পূর্ণ শুখিয়ে গেলে রাত্রে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল একটি খুঁটির উপর ফেলে ওগুলি ভাল করে ঝাড়া হয়, যাতে ধুলো না থাকে। এত সব কাণ্ডের পর চামড়াগুলি গুদামজাত করা হয়। পরে জাহাজে করে ওগুলি বস্টনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জুতো বা

অন্য জিনিস তৈরী হয়ে খুব সম্ভব আবার ক্যালিফোর্ণিয়াতেই ফিরে আসে। হয়ত সেই জুতো পরেই ষাঁড় ধরতে বা চামড়া পিটোতে থাকে লোকেরা।

প্রতিদিন এক শ পঞ্চাশটা করে টুকরো নিয়ে কাজ করতে হত আমাদের। জলে ভেজানো, শুখোনো, পরিষ্কার করা, ঝাড়া, পাট করে তুলে রাখা। রবিবার দিন অবশ্য ছুটি পেতাম। এক অলিখিত আইন অনুসারে এই উপকূলে রবিবার ছুটি বলে গণ্য হয়ে এসেছে। কোন ক্যাপ্টেনই এই নিয়ম ভঙ্গ করতে সাহস করেন নি। শনিবার রাত্রে চামড়াগুলি ঢাকা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। সেই ঢাকা সোমবারের আগে খোলা হয় না। রবিবার কখনো কখনো ষাঁড় মারা ছাড়া আমাদের অন্য কাজ থাকত না। চামড়া শুখোবার কাজে একটা বড় সুবিধা এই ছিল যে কাজের পরিমাণ ঠিক করা থাকত, সেটুকু হয়ে গেলেই সারাদিনের মত নিশ্চিন্ত। সেজন্যে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য আমাদের কখনো বলতে হত না। ভোরের আলো না ফুটতেই আমরা উঠে কাজে লেগে যেতাম। আটটার সময় খাওয়ার জন্য অল্প সময় ব্যয়, আবার একটা দুটো অবধি একটানা কাজ। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুম। বিকেল বেলা আমরা ইচ্ছামত সময় কাটাতাম। সূর্যাস্তের পর চামড়াগুলি ঝাড়া ও তোলার পর্ব। রাত্রে খাওয়ার পর আবার ছুটি। পাল নামানো নেই, পাহারা দেওয়া নেই। সন্ধ্যাবেলা আমরা পরস্পরের গুদামে বেড়াতে যেতাম। চুল্লীটাকে নাবিকরা রসিকতা করে নাম দিয়েছিল কানাকা হোটেল বা ওয়াহু কফিখানা। বিকেলবেলা আমি লেখাপড়ার কাজ করতাম, এছাড়া অনেক সময় জামাকাপড় সেলাই ও রিফু—প্রয়োজন বোধে এগুলি শিখতে হয়েছিল। কানকারা চুল্লীর মধ্যে ঢুকে খেয়ে ঘুমিয়ে ও গল্প করে সময় কাটাত। আমার সঙ্গী নিকোলাস লিখতে পড়তে জানত না, কাজেই ওর সারা বিকেল কাটত ঘুমিয়ে, অথবা ধূমপানে। আমাদের অবসর সময় কাটানো নিয়ে ক্যাপ্টেনরা কখনো কিছু বলতে আসতেন না। আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করি, সুতরাং ঐটুকু আমাদের পাওনা সে বোধ তাঁদের ছিল। বেশী বাড়াবাড়ি করলে কাজ এগোবে না এমন ভয়ও ছিল তাঁদের। আমাদের গুদামের অধিকারী মহাশয় কাজের সময় ছাড়া কখনো আদেশ জারি করতেন না। ওঁর অনুমতি নিয়ে তবে আমরা শহরে যেতে পারতাম, কিন্তু উনি কোনদিন যেতে বাধা দেন নি, চাইলেই অনুমতি পাওয়া যেত।

চামড়া শুখিয়ে পরিষ্কার করার কাজে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি করতে হত তাতে অভ্যস্ত হওয়া সময় সাপেক্ষ। তবে ক্রমে ক্রমে সবই সহ্য হয়ে যায়। ময়লা বালতির দুর্গন্ধ জলে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে চামড়ার পরিচর্যা করা কিংবা ভারী ভারী টুকরোগুলি ঘাড়ে করে ঠেলায় তোলাও পরে তত কঠিন মনে হত না। কাজের শেষে ছুটির আনন্দের কথা চিন্তা করে পরিশ্রমকেও ততটা ভয়াবহ মনে হত না। অন্তত এখানে কেউ খুঁত ধরতে বা বকাবকি করতে আসছে না এতেই আমরা যথেষ্ট নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। দিনের কাজ শেষ হলে অবশ্য সপ্তাহে দুবার আমাদের কাঠ আনতে যেতে হত। রান্নার জন্য কাঠ কাছাকাছি কোথাও ছিল না, দড়ি ও কুঠার হাতে মাইল দুই দূরের জঙ্গলে আমরা কাঠের সন্ধানে যেতাম। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হওয়ার ফলে বাড়ী গরম করার জন্য আগুন জ্বালাতে হত না এইটুকুই রক্ষা। কাঠ দরকার হত কেবল রান্নার কাজে। আমরা সঙ্গে ঠেলাগাড়ীও নিতাম তবে অসমতল পাহাড়ে জমিতে ঠেলা নিয়ে যাওয়া যেত না। আমাদের পিছন পিছন যেত কুকুরের দল। আমরা ঠেলাগাড়ী যতদূরে সম্ভব নিয়ে গিয়ে গাড়ীটি রেখে প্রত্যেকে এক এক দিকে কাটবার মত কাঠের খোঁজে যেতাম। কখনো কখনো ঠেলাগাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে চলে যেতে হত। মনোমত একটি গাছ নির্বাচন করে প্রথমে নীচের দিকের ঝোপ জঙ্গল ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হত। গাছগুলি মোটেই উঁচু নয়, পাঁচ থেকে ছয় ফুট, সবচেয়ে লম্বা গাছটি বড় জোর বারো ফুট। অত পরিশ্রম করে গাছ কেটে কতটুকুই বা কাঠ পাওয়া যেত। কিছু কাঠ সংগৃহীত হলে দড়ি দিয়ে বোঝা বেঁধে পিঠে করে সেই চড়াই উতরাই ভেঙ্গে ঠেলায় রেখে আসতে হত। প্রত্যেকে দুবার করে বোঝা বয়ে আনলে ঠেলা ভরে যেত, তখন আবার ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে উপকূলে ফেরা। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। তারপর কাঠ নামিয়ে চামড়া চাপা দিয়ে আমাদের সে দিনের মত কাজ শেষ।

কাঠুরিয়াদের মত এইভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানর মধ্যে কেমন একটা মাদকতা আছে। পিছনে কুকুরের দল, আমাদের পায়ের শব্দে ঝোপে-ঝাড়ে পাখীরা চমকে উঠে উড়ে যাচ্ছে, সাপের সরসর, খরগোশ ও শেয়ালের ভীত চকিত পলায়ন। কত বিচিত্র ফুল, লতা, গুল্ম, পাখীর বাসা—এ এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা। জাহাজের একঘেয়েমির পরে এখানকার জীবন

এক নতুন রোমাঞ্চ এনে দিয়েছিল। নানারকম লোমহর্ষক ঘটনাও ঘটত। ক্যালিফোর্ণিয়ার সর্বত্র কোয়োট নামে এক রকমের হিংস্র জন্তু দেখা যায়। শেয়াল ও নেকড়ের সংমিশ্রণ, লোমশ ল্যাজ, মাথাটা মস্ত, কর্কশ ডাক। ওদের একবার দেখতে পেলেই আমাদের সঙ্গের কুকুরগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করতে দৌড়ত। কিন্তু ওদের ধরা যেত না। তবে আমাদের কুকুরগুলো আক্রমণ করত দল বেঁধে, কাজেই সেটাকে ঠিক ন্যায় যুদ্ধ বলা চলে না। একটি ছোট কুকুরকে একটি কোয়োট একবার এমনভাবে আক্রমণ করেছিল যে আমরা সময়মত গিয়ে না পড়লে হয়ত কুকুরটা মারাই পড়ত। ওয়েলী নামে আমাদের একটি বলবান কুকুর ছিল, তার কবলে পড়ে বহু কোয়োটকে প্রাণভয়ে পালাতে হয়েছে। কুকুরটি ছিল চমৎকার তেজী, সুন্দর চেহারা, দৌড়তে খুব পটু। ওর মত ক্ষিপ্রগতি কুকুর আমি খুব কমই দেখেছি। ওর বাবা ছিল ইংরাজ ডালকুত্তা, মা গ্রেহাউণ্ড। গ্রেহাউণ্ডের সরু দীর্ঘদেহ ও দ্রুত চলনভঙ্গীর সঙ্গে ডালকুত্তার ভারী মুখের গঠন ও শক্ত চোয়াল মিলে তার শরীরে চমৎকার সামঞ্জস্য সাধন হয়েছিল। সান ডিয়াগোতে এই কুকুরটি আগমনের সময় এক নাবিক মন্তব্য করে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সঙ্গে নাকি এর মুখের সাদৃশ্য আছে। সেই নাবিকটি ডিউককে স্বচক্ষে দেখেছিল। সত্যি সত্যি কুকুরটির মুখের সঙ্গে ডিউকের ছবির মিল বেশ লক্ষ্যণীয়। সেই থেকেই ওয়েলী নামকরণ। এই কুকুরটিকে নিয়ে আমরা সকলে খেলা করতাম। অন্য কুকুরদের ওয়েলী সব সময় দৌড়ে হারিয়ে দিত। দুটো কোয়োটও মেরেছিল ও। জঙ্গলের মধ্যে একবার কোয়োটের ডাক শুনতে পেলেই হল, তীরবেগে ছুটতে শুরু করবে কুকুরের দল। ওয়েলী ঝোপ-ঝাড়ের উপর দিয়ে যেন উড়ে চলত। পিছনে পিছনে ছুটত ফ্যানি, ফেলিসিয়েনা, চাইল্ডারস ও অন্যান্য। বুলডগ, স্প্যানিয়েল, টেরিয়ার সব রকম জাতের কুকুরই ছিল। কিন্তু বৃথাই দৌড়ন, আধ ঘণ্টার মধ্যে কুকুরগুলি হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে আসত।

কখনো কখনো খরগোশও মারত ওরা। জঙ্গলে প্রচুর খরগোশ। আমরা খাবার জন্যে এগুলি গুলী করে মারতাম। অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের মধ্যে ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর সরীসৃপ—সাপ। বসন্তকালে এখানে সাপ খুব বেশী দেখা যায়। প্রথম কয়েক মাস জঙ্গলে গেলেই কারো না কারো সঙ্গে সাপের সাক্ষাৎকার হত। শেষের দিকে

সাপ বড় একটা চোখে পড়ত না। মনে পড়ে আমার প্রথম সাপ দেখার অভিজ্ঞতা। আমি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে একা চলেছি, সঙ্গীরা দূরে, হঠাৎ ঝোপের ঠিক মাঝখানে আমার কয়েক গজের মধ্যেই সাপের হিস হিস শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক যেন জাহাজ ধোঁয়া ছাড়ছে। ঝোপ কাটার আওয়াজ আসছিল, বুঝলাম সঙ্গীরা কাছেই আছে। চিৎকার করে আমার অবস্থার কথা জানালাম। আমার ভয় দেখে তারা হেসেই উড়িয়ে দিল, সুতরাং আত্মসম্মান রক্ষার্থ আমিও সেখান থেকে নড়তে পারলাম না। এই খড়খড়ে সাপগুলো চলবার সময় আওয়াজ করে না, সুতরাং যতক্ষণ আওয়াজ কানে আসছে ততক্ষণই নিশ্চিন্ত। আমার গাছ কাটার শব্দে ভয় পেয়ে সাপটি নড়াচড়া করছিল না, মাঝে মাঝে আওয়াজ বন্ধ হতেই আমি ঝোপ লক্ষ্য করে একটা কিছু ছুঁড়ছিলাম, তখন আবার খড়খড় শব্দ শুরু হচ্ছিল। আমিও স্বস্তিবোধ করছিলাম। এইভাবে যতক্ষণ কাঠ কাটলাম সাপটাকে এক মুহূর্তও চুপ করতে দিইনি। বোঝা বেঁধে ভাবলাম এইবার সকলকে ডেকে আমার অসমসাহসের কথা জানাই। এই মনে করে সঙ্গীদের খুঁজতে বেরোলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে জড় হয়ে সমবেত ভাবে ঝোপটাকে আক্রমণ করলাম। নিকোলাস ঠিক আমার মতই কাছে যেতে ইতস্তত করছিল। এমনকি কুকুরগুলো পর্যন্ত দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। বেশী কাছে যাবার উৎসাহ দেখাল না। কানাকারা কিন্তু নির্ভয়ে লাঠি হাতে ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। সাপটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল, তারপর কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ দেখতে পেল না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল এই বুঝি পায়ের নীচে থেকে তাঁর আবির্ভাব হয়। বহু ঢিল পাটকেল ছোঁড়ার পর আবার খটখট ধ্বনি। সেই শব্দ অনুসরণ করে আমরা আবার অগ্রসর হলাম। তাড়া করে করে অবশেষে সাপটাকে খোলা জায়গায় আনা গেল। খাড়া হয়ে পালাবার মতলব আঁটছিল সাপটা এমন সময় ঢিলের আঘাতে তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হল। প্রায় পনেরো কুড়ি ফিট নীচে গিয়ে পড়ল সাপটা। সত্যিই মারা গেছে কিনা ভাল করে পরীক্ষা করে আমরা কাছে গেলাম। একজন কানাকা ওর চামড়াটা ছাড়িয়ে নিল। চামড়ায় যে দাগ থাকে সেই দেখে নাকি ওদের বয়স বোঝা যায়। অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের ধারণা কোন সাপটি কটি জীবহত্যা করেছে তার হিসাব থাকে ঐ দাগে! আমরা সাপের চামড়া সযত্নে জমিয়ে রাখতাম, এরকম

অনেক জমেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কাউকেই কখনো সাপে কামড়ায়নি। কেবল একটি কুকুরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। কানাকাদের নাকি এক রকমের ভেষজ উদ্ভিজ্জ জানা আছে, যা সর্পাঘাতের মহৌষধ, তবে আমাদের সেটা কখনো ব্যবহারের দরকার হয়নি।

খরগোশ ছাড়া ছিল প্রচুর বুনো হাঁস। শীতকালে এদের আগমন হত। আর ছিল অগণিত কাক। চামড়ার উপর থেকে খুঁটে খুঁটে মাংস খেতে আসত। উপকূলের উত্তরাঞ্চলে ভাল্লুক ও নেকড়েও বিরল নয়। সান পেড্রো থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি লোক ভাল্লুকের হাতে প্রাণ হারায় শুনেছিলাম। আমাদের বাসস্থানের কাছাকাছি অবশ্য ভাল্লুক ছিল না। অন্যান্য পশুর মধ্যে ঘোড়া ছিল সর্বপ্রধান। উপকূলবাসীদের ছিল প্রায় দশ বারোটি ঘোড়া। তাদের গলায় ল্যাসো বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হত, তারা ইচ্ছামত বিচরণ করে খাবার সংগ্রহ করত। উপকূলে একটি কুঁয়ো ছিল, এখানে তারা জল খেতে আসত। পাহাড়ে কোথাও জল পাওয়া যেত না। দুই থেকে আট ডলার ছিল এই ঘোড়াগুলির দাম, তবে এদের সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হত। আমরা অন্তত একটা ঘোড়া সবসময় দরজার পাশে বেঁধে রাখতাম, যাতে তার পিঠে চড়ে আরো ঘোড়া ধরতে পারা যায়। ঘোড়াগুলি ছিল চমৎকার, তাদের পিঠে চড়ে আমরা দুর্গে যেতাম, মাঠে ঘাটেও অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি।

॥ ২০ ॥ নবাগত ॥

কিছুদিন কাটল। আমরা আবার একঘেয়ে কাজের চক্রে বাঁধা পড়েছি, এমন সময় দুটি জাহাজের আগমনে আমাদের জীবনে একটু নতুনত্বের সূচনা হল। একদিন সকলে খেতে বসেছি, হঠাৎ শোনা গেল "ঐ জাহাজ" চিৎকার। সব সময় যে পাল দেখা গেলেই এমন চিৎকার করা হত তা নয়, রাস্তার উপর কোন স্ত্রীলোক বা গরুর গাড়ী বা অন্য কোন জিনিস যা সচরাচর চোখে পড়ে না, দেখা গেলেই 'ঐ জাহাজ' ধ্বনিতে সকলকে অবহিত করা হত। যাই হোক আমরা এই আহ্বানবাণীতে বিশেষ কান দিলাম না। কিন্তু উপকূলের চারিদিক থেকে এই চিৎকার ভেসে আসতে লাগল। অগত্যা আমরা বাইরে এসে দেখি সত্যই বাঁকের মুখে দুটি পাল, উত্তর পশ্চিম বায়ু

ভরে হেলে পড়েছে। একটি জাহাজ বেশ বড়, অন্যটি দুই মাস্তুলওয়ালা, ছোট। জাহাজ দুটির পরিচয় সম্বন্ধে নানা আলোচনা শুরু হল। কেউ বললে পিলগ্রীম ফিরে আসছে, সঙ্গে নিশ্চয় বস্টন থেকে আগত সেই বহু প্রতীক্ষিত জাহাজ। আরো কাছে আসতে সে সন্দেহ দূর হল। জাহাজটি পিলগ্রীম তো নয়ই—মরচে পড়া খোল ও মাস্তুলের উপরাংশের ছিন্নাবশেষ দেখে বস্টনের কোন জাহাজ বলেও মনে হয় না। আরো কাছে আসার পর দেখা গেল বড় জাহাজটির পিছনের অংশের পাটাতন বেশ উঁচু, সেটি ইতালীয় জাহাজ রোজা, অপরটি ক্যাটালিনা, যেটি সান্টা বারবারাতে আমরা দেখেছিলাম। এরা আসছে ভালপারাইসো থেকে। নোঙর ফেলে জাহাজ দুটি চামড়া ও চর্বি নামাতে শুরু করল। লাগোডাদের গুদামটি রোজা কিনে নিয়ে সেখানেই জিনিসপত্র নামাল। আমাদের ও আয়াকুচোর গুদামের মধ্যে একটি খালি বাড়ী ছিল, সেটি ক্যাটালিনা অধিকার করে বসল। সব গুদাম ভর্তি হয়ে যাওয়াতে উপকূল বেশ জমজমাট। স্থানীয় কানাকারা ক্যাটালিনার কানাকা মাল্লাদের চুল্লীতে নিয়ে এসে খুব আপ্যায়িত করল। রোজাতে ছিল দুজন ফরাসী মাল্লা। তারা প্রায় রোজই আসত নিকোলাসের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের কাছে পিলগ্রীমের গতিবিধির খবর পাওয়া গেল। আমাদের জাহাজ এখন সান পেড্রোতে। আমেরিকা থেকে আগত অন্য কোন জাহাজ এখন ঐ কূলে নেই। ইতালীয় মাল্লারা গুদামে এসে শুত। সেখানে সর্বক্ষণ গানবাজনা লেগেই থাকত—তাছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় গানের আসর বসত আরেকটি তাঁবুতে, যেখানে ফ্যাজিও নামক জাহাজের মাল্লারা থাকত। ওরা সমবেত কণ্ঠে গাইত পল্লীগীতি বা কোন করুণ রসের গান। অনেকেরই গলা ভাল, বেশ দরদ দিয়ে গাইত। একজনের গলা ছিল বাঁশীর মত চিকণ, বিশেষতঃ উঁচু পর্দায় উঠলে।

মাল্লারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় জাহাজ থেকে নেমে আসত। আমরা পরস্পরের বাড়ী দেখা করতে যেতাম। নানারকম ভাষায় কথা হত, তবে তার মধ্যে স্পেনীয় ভাষাই প্রধান, সেটি সকলেই একটু আধটু জানত। আমরা ছিলাম চল্লিশ পঞ্চাশ জন, আমাদের মধ্যে সর্বজাতি সমন্বয় ঘটেছিল। দুজন ইংরাজ, তিনজন মার্কিন, দুজন স্কটল্যাণ্ডবাসী, দুজন ওয়েলসবাসী, একজন আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক, তিনজন ফরাসী, একজন ডাচ, একজন অস্ট্রিয়া

থেকে, দু-তিন জন খাস স্পেনদেশী, জন বারো স্পেনীয়-এমেরিকাবাসী, চিলি থেকে দুজন রেড ইণ্ডিয়ান, একজন নিগ্রো, কুড়িজন ইতালীয়, একজন টাহিতিবাসী, একজন কানাকা—মার্কুইস দ্বীপ থেকে আগত।

জাহাজ দুটি আবার যাত্রা করার আগের দিন রাত্রে রোজার মাল-গুদামে আমাদের জলসা বসল। সকলেই যে যার জাতীয় সঙ্গীত গাইবার চেষ্টা করল। এক ইংরাজ ও স্কট মিলে গাইল ব্রিটানিয়ার প্রশস্তি। ইটালীয়, জার্মান, স্পেনীয় প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইলে, যদিও তার মর্মার্থ কিছুই আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা তিনটি মার্কিন পুঙ্গব তারকাখচিত পতাকার জয়গান করলাম। এইভাবে দেশ বন্দনার পালা শেষ হবার পর একজন অস্ট্রিয়ান একটি সুন্দর প্রেম-সঙ্গীত শোনালে। তারপর এক ফরাসী উচ্ছ্বাস সহকারে এক গান জুড়ে দিলে। আমি যখন চলে এলাম তখন সকলেরই নেশা বেশ ঘোরতর। নেশার ঝোঁকে সকলেই একসঙ্গে কথা বলবার ও গান গাইবার চেষ্টা করছে, এবং যে যার মাতৃভাষায় যথেষ্ট গালিবর্ষণও করে যাচ্ছে।

পরদিন জাহাজ দুটি হাওয়ার মুখে রওনা হল। উপকূলে নেমে এল আগেকার স্তব্ধ ভাব। তবে ইতিমধ্যে খালি গুদামগুলি ভরে ওঠাতে এবং কিছু কিছু নতুন মুখের আমদানী হওয়াতে যা একটু পরিবর্তন দেখা দিল। রবার্ট নামে এক স্কচ বৃদ্ধ ছিল ক্যাটালিনার গুদামের তত্ত্বাবধানে। লোকটি মোটামুটি শিক্ষিত, এবং নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করত। এ সবই তার জাতিগত বিশেষত্ব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মানু-বর্তিতায় তার জুড়ি মেলা ভার। সে শুয়োর, মুরগী, টার্কি, কুকুর প্রভৃতি প্রতিপালন করে এবং অবসর সময়ে ধূমপান করে সময় কাটাত। কারো সঙ্গে মিশত না। এমন অসামাজিক প্রকৃতির লোক দিয়ে আমাদের যে বিশেষ দলবৃদ্ধি হল তা বলা চলে না। অপরের জন্য সে কখনো এক কপর্দকও খরচ করত না। লোকে বলত আসলে সে মাল্লাই নয়। ডাবলিন নামক ইংরাজ জাহাজে কর্মচারী ছিল, সেটাই ওর অহেতুক অহংকারের হেতু। রোজার চামড়া গুদামে ছিল স্মিদ। জাতে অস্ট্রিয়ান, চারটি ভাষা অনর্গল বলতে ও লিখতে পারত। মাতৃভাষা জার্মান ছাড়াও ইতালীয়, ইংরাজী ও স্পেনীয় ভাষায় ছিল ওর সমান দক্ষতা। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। ওর মধ্যে জাহাজী বেপরোয়া ভাব ও গোঁড়ামির একটা

অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। অল্পবয়সী ছেলে ও কানাকাদের ও সর্বদাই সৎপথে চলার উপদেশ দিত, কিন্তু নিজে যখন শহরে যেত একেবারে নেশায় চুর না হয়ে ফিরত না। একদিন বেশ মজার ব্যাপার ঘটে, তারপর থেকে ওর প্রতি সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা একেবারে লোপ পায়। রবার্টের সঙ্গে শহরে গিয়ে স্মিদ আকণ্ঠ মদ্যপান করে এ ওকে উপদেশ দিতে দিতে একটিই ঘোড়ায় দুজনে পিঠোপিঠি বসে কূলে ফিরে আসছিল। ঘোড়াটি থামা মাত্র দুজনে ধপ করে বালির মধ্যে পড়ে গড়াগড়ি। যাই হোক এর পর থেকে আর স্মিদের সদুপদেশে কেউ কান দিত না। রোজার গুদামে যেদিন গানবাজনা হয় সেদিনকার একটা ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। দেখি স্মিদ একটা পিপে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলে চলেছে, "ধরো স্মিদ, ধরো বাবা, আঁকড়ে ধরো, নইলে একদম কুপোকাত।" এই চরিত্র-দোষ সত্ত্বেও স্মিদ কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান ও দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিল। ওর কাছে ছিল এক বাক্স বোঝাই বই, আমি চাইলেই পড়তে দিত। ওদের গুদামে এক ফরাসী ও এক ইংরাজ ছিল। ইংরাজ লোকটি যুদ্ধ-জাহাজের মাল্লাদের ধরনের শক্ত পোক্ত, দিলদরিয়া মেজাজের কিন্তু বেজায় নেশাখোর। সে যতবারই দুর্গের দিকে যেত আকণ্ঠ নেশা করে আর বাড়ী অবধি পৌঁছতে পারত না, রাস্তায়ই কোথাও পড়ে থাকত। যখন ফিরত ওর সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। এছাড়া ছিল একজন চিলির লোক ও জন বারো কানাকা, এই হল সংক্ষেপে নতুন আগন্তুকদের পরিচয়।

সমস্ত চামড়গুলি শুখিয়ে পরিষ্কার করে গুদামজাত করতে আমাদের ঠিক ছ সপ্তাহ লাগল। তারপর সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলে আমরা কিছুকালের মত বেকার হয়ে গেলাম। জাহাজের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সপ্তাহে দুবার কাঠ আনতে যাওয়ার বদলে আমরা ঠিক করলাম এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন জঙ্গলে গিয়ে সারা গ্রীষ্মকালের মত কাঠ সঞ্চয় করে ফেলব। প্রতিদিন ভোরে খাবার খেয়েই আমরা কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়তাম, সূর্য ঠিক মাথার উপরে এলেই বুঝতাম মধ্যাহ্ন ভোজনেব সময় হয়েছে। জাহাজের মত এখানে পাহারায় হাঁক দেবার ব্যবস্থা ছিল না। তখন খেতে ফিরতাম। আবার দড়ি, কুঠার ও ঠেলাগাড়ী ঠেলতে ঠেলতে ফিরতাম জঙ্গলে, বোঝা বেঁধে ফিরতাম সন্ধ্যায়। এইরকম সাতদিন কাঠ কাটার পর আমাদের দেড়মাস, দুমাসের মত যথেষ্ট কাঠ হয়েছে মনে হল।

তখন কিছু কালের মত ক্ষান্ত দিয়ে মহা স্বস্তিবোধ করলাম। বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে বা কাঠ কাটতে আমার আপত্তি ছিল না কিন্তু পরে হাঁটু গেড়ে বসে বোঝা বেঁধে সেটি পিঠে তুলে চড়াই উতরাই ভেঙ্গে কাঁটা ঝোপের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে আসাটাই ছিল বিশেষ অসুবিধাজনক। আমার একটি জামাও আর আস্ত ছিল না।

কাজ তখনকার মত শেষ। এবার শুধু জাহাজ আসার প্রতীক্ষা। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রসদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। মিঃ রাসেল চা, ময়দা, চিনি, গুড় ইত্যাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করে প্রচুর নষ্ট করতেন। আমাদের সন্দেহ ছিল উনি বোধহয় সেগুলি শহরেও পাঠান। রেড ইণ্ডিয়ান মহিলাদের প্রায়ই উনি গুড় দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। কেবল শুকনো রুটি আর কফি খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে আমরা কয়েকজনে মিলে কিছু খাদ্যদ্রব্য আনাব ঠিক করলাম। আমি একটি বড় থলি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চললাম—পকেটে কয়েক বিয়েল। আমরা মার্কিন জাহাজের লোক এবং খাদ্যাভাবে বড়ই দুর্দশায় পড়েছি শুনে ফলবাগানের একটি মেয়ে আমাদের অকৃপণ হাতে প্রচুর বরবটি, পেঁয়াজ, তরমুজ, পেয়ারা ও অন্যান্য ফল দিলে। এইসব খাবার দুই হপ্তা চলল। এই কয়দিন আমরা খুবই বাদশাহী চালে কাটালাম। খাবার তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠতাম না। আমার তোরঙ্গটি ভাল করে ঝেড়ে মুছে আবার সাজালাম। জামাকাপড়ে তালির উপর তালি দিয়ে সব ঠিকঠাক করা হল। তারপর একটি পুরোনো নৌবিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকা খুলে তার আদ্যোপান্ত পড়ে সব অঙ্কগুলি কষে ফেললাম।[2] তখনো পিলগ্রীমের কোন চিহ্ন নেই। তখন স্মিদের কাছ থেকে বই ধার করতে আরম্ভ করলাম। ক্রমে যার কাছে যা বই ছিল সব আমার পড়া হয়ে গেল। শেষে এমন অবস্থা হল যে ছোটদের গল্পের বই বা জাহাজের আধখানা দিনপঞ্জী পেলে তাও সাগ্রহে পড়ি।

একটা রঙ্গরসিকতার বই এমন ভাবে একদিন পড়ে ফেললাম যেন কোন উপন্যাস পড়ছি। একদিন স্মিদের বাক্সের নীচে থেকে 'ম্যাণ্ডেভিল' নামে পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস আবিষ্কার করলাম। লেখক গডউইন। এই নামটির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। এতদিন ধরে শ্রেণীভেদ না করে যথেচ্ছ বই পড়ার পর এমন একজন সুলেখকের বই পেয়ে বড়ই আনন্দ হল। আমি বইগুলি নিয়ে গেলাম। তারপর দুদিন ধরে ভোরে উঠে ও রাত জেগে সেই

বই শেষ করে যে আনন্দ পেলাম তাকে শুষ্ক মরুর বুকে ঝরনার শীতল প্রাণস্পর্শের মত বললেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হবে না।

বুধবার, ৪৮ই জুলাই। পিলগ্রীম জাহাজের আগমন। সঙ্গে সঙ্গে রসভঙ্গ। সাহিত্য রসাস্বাদন থেকে একেবারে ভূতলে পতন। পিলগ্রীমের অঙ্গসজ্জার নানারকম পরিবর্তন দেখে আমরা একেবারে চমৎকৃত। মাস্তুলের উপরের ছোট অংশটি নেমে গেছে, পালের দড়াদড়ি খোলা, তার জায়গায় অন্য রকম ভাবে নতুন দড়ি লেগেছে, মাস্তুলের সঙ্গে লাগাও পালদণ্ড থেকে পাল ছড়াবার ডাণ্ডা নামান, তুই মাস্তুলের সঙ্গে শোয়ানো কাঠের খণ্ডগুলিও যথাস্থানে নেই, এই জাতীয় আরো নানা পরিবর্তন চোখে পড়ল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন—আমাদের পুরোনো ক্যাপ্টেনের পরিবর্তে এক তামাটে চেহারার খর্বকায় ব্যক্তি সবুজ কোট ও চামড়ার টুপি পরে উপরের ডেক থেকে অপরিচিত কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছেন। আমরা কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠলাম। ভাবলাম কতক্ষণে জাহাজ থেকে নৌকা এসে তীরে ভিড়বে। অবশেষে পাল গুটিয়ে জাহাজের নোঙর পড়ল, আর সেই বহু প্রতীক্ষিত নৌকাও তীরে এসে পৌঁছল। আমরা তাদের মুখ থেকে সব সমাচার অবগত হলাম। বস্টন থেকে যে জাহাজটির আসার কথা ছিল সেটি সান্টা বারবারায় পৌঁছলে ক্যাপ্টেন টমসন সেই জাহাজের ভার নিয়েছেন এবং তাদের ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজে এসেছেন। এই নূতন অধিনায়কের নাম ক্যাপ্টেন ফকন। এর বেশী সংবাদ পাওয়া গেল না, কেননা নৌকা আবার তখনই ফিরে গেল। আমরা অধৈর্য হয়ে উঠলাম। কোনমতে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করে রাত্রি হতেই একটি ডিঙি নিয়ে আমরা জাহাজের অভিমুখে রওনা হলাম। জাহাজে পৌঁছতেই দ্বিতীয় মেট আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিলেন, এলার্ট জাহাজটির নামাঙ্কিত, সেটি আমার কাছে এসেছে। আমি বহুকষ্টে তখনই সেটি খোলবার ইচ্ছা দমন করে নীচে গেলাম। পরিচিত লোকদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে বড় আনন্দ হল। নতুন জাহাজ ও বস্টনের সর্বশেষ সমাচার সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসাবাদ চলল। স্টিমসন দেশ থেকে চিঠি পেয়েছে—সেখানকার খবর যথাপূর্বম। এলার্ট সম্বন্ধে সকলের মতামত শুনলাম—"খাসা জাহাজ।" "রোজার থেকেও বড়।" "ক্যালিফোর্নিয়ায় যত চামড়া আছে সব ধরে যাবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্যাপ্টেন টমসনের নেতৃত্বে জাহাজটি মণ্টারি

অভিমুখে গেছে, সেখান থেকে যাবে সানফ্রানসিস্কো। সান ডিয়াগো ফিরে আসতে দুই কি তিন মাস। পিলগ্রীমের মাল্লাদের অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে জাহাজটির পাটাতন নাকি বেলেপাথর দিয়ে ঘষে মেজে একেবারে চকচকে। মাল্লারাও সকলে অতি চমৎকার। তিনজন মেট, একজন ছুতোর, একজন পালের মিস্ত্রী আছে ওদের। "আর ওদের মেট! মানুষের মত মানুষ। আমাদের মেটের মত ভেড়া নয়। নিজে কাজ করে, কাজ করাতে জানে, ক্যাপ্টেন কি মাল্লা কারো পরোয়া করে না।" নতুন ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে আমি জানতে কৌতূহলী হলাম। তখনো তিনি নবাগত, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ খবরাখবর পাওয়া গেল না। শুধু শুনলাম তিনি এসেই প্রথম দিন থেকে বেশ কড়া হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। সমস্ত দড়াদড়ি ও পালের সরঞ্জামের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

খবর পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আমরা আবার নৌকা বেয়ে মালগুদামে ফিরে এলাম। এবার ব্যস্ত হাতে মোড়কটি খুলে পাওয়া গেল বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠি—সবসুদ্ধ এগারোটি। তাছাড়া সুতী ও পশমী জামা কাপড়, জুতো, কিছু খবরের কাগজ। কাগজ পড়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস কবে উদ্‌যাপিত হল জানতে পারলাম—"ব্রায়ান্ট স্টার্গিস অ্যাণ্ড কোম্পানির জাহাজ এলার্ট ক্যাপ্টেন ফকনের নেতৃত্বাধীনে ক্যালাও ও ক্যালিফোর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে"—এ খবরও পড়লাম। যারা বহুদিন নিঃসঙ্গ সমুদ্রযাত্রায় কাটাবার পর কখনো দেশের সংবাদপত্রের মুখ দেখতে পায় তারাই কেবলমাত্র আমার আনন্দের পরিমাপ করতে পারবে। আমি কাগজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়লাম—বাড়ী ঘর ভাড়া, হারানো প্রাপ্তি, নিলাম, কিছুই বাদ দিলাম না। বস্টন দৈনিক সমাচার নামটি যেন কানে মধুবর্ষণ করল। খবরের কাগজের এমনি মোহিনী শক্তি যে পড়তে পড়তে মনে হয় সত্যিই যেন দেশে ফিরে গেছি।

পিলগ্রীম থেকে আরো কাঁচা চামড়া নামান হল। আমরা সেই পুরোনো কাজে লেগে গেলাম। শুখোনো, ভেজানো, পরিষ্কার করা, ধুলো ঝাড়া ইত্যাদি। একদিন আমি একটা ছড়ানো চামড়ার টুকরোর উপর বসে ছুরি দিয়ে চর্বি পরিষ্কার করছি এমন সময় ক্যাপ্টেন ফকন নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ক্যালিফোর্ণিয়া কেমন লাগছে। বলে নিজেই ল্যাটিনে একটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন।

খুবই সময়োপযোগী চিন্তা, আমি মনে মনে বললাম। আপনি যে ল্যাটিন জানেন তাও বোঝা গেল। যাই হোক ক্যাপ্টেনের মনোযোগ আকর্ষণ করা খুবই সম্মানের বিষয়। ক্যাপ্টেন অতি মহানুভব। ক্যাপ্টেন টমসন এতটা দয়া প্রদর্শন করতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু আমাদের নূতন ক্যাপ্টেন শিক্ষিত ও সদ্বংশজাত। প্রকৃত গুণীর সমাদর করতে জানেন।

শনিবার, ১১ই জুলাই। পিলগ্রীম আবার বাতাসের দিকে যাত্রা করল। আমরা নিজেদের কাজে লেগে গেলাম। কাঠ যথেষ্ট ছিল, কাজেই আর কাঠ কাটতে যাবার প্রয়োজন হত না। গ্রীষ্মের দিনও দীর্ঘ, আবহাওয়া সুন্দর। আমাদের কাজ সেরে হাতে প্রচুর সময় থাকত। বাড়ী থেকে সুতী কাপড়ের যে মোড়ক এসেছিল তাই দিয়ে আমি জামা, প্যাণ্ট ও টুপি তৈরী করে আপাদমস্তক স্বহস্ত রচিত সজ্জায় ভূষিত হয়ে প্রতি রবিবার সগর্বে ঘুরে বেড়াতাম। পড়াশোনা, সেলাই, রিফু, খরগোশ শিকারে যাওয়া, কখনো কখনো ঝোপের মধ্যে খড়খড়ি সাপের সঙ্গে মুখোমুখি, অনেক সময় দুর্গ অবধি বেড়াতে যাওয়া—এই ছিল আমাদের অবসর যাপনের উপায়। আর একটি মজার খেলা ছিল। চিংড়ি মাছের খোঁজে জলে আগুন লাগান। মাছ ধরার বর্শা জোগাড় করা হত, লম্বা লাঠির আগায় আলকাতরা মাখান দড়ি জড়িয়ে মশাল বানান হত। ছোট ডিঙিতে একজন হালে বসত, একজন মশাল ধরে, দুজন নৌকার দুপাশে বর্শা নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে মাছের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তাম। তীরের বেশ কাছে, যেখানে জল তিন-চার হাত গভীর, নীচে পরিষ্কার বালি, সেখানে মশালের আলো ফেলে জলের একেবারে নীচে অবধি দৃষ্টি চলে। চিংড়ি মাছগুলো অতি সহজেই গাঁথা যেত, অন্য মাছ খুব সহজে ধরা যেত না। আমরা প্রচুর মাছ ধরে ফিরতাম। পিলগ্রীম জাহাজে অনেকগুলো মাছ ধরা ছিপ ছিল, সেগুলো ওরা আমাদের দিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো দিয়ে তীরে বসে মাছ ধরা যেত না বটে তবে বাঁক অবধি ডিঙিতে এসে আমরা ছিপ দিয়ে কড ও ম্যাকারেল ধরতাম। এই রকম এক শিকারের রাত্রিতে এক কানাকার সঙ্গে একটি শার্কের বিষম লড়াই বেধেছিল। শার্কটি অন্য মাছদের তাড়িয়ে আমাদের ডিঙির চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। টোপে দাঁত বসাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু একটুর জন্যে আমরা ওকে ধরতে পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা

বিষম চেঁচামেচি শোনা গেল। দুজন কানাকা আমাদের ঠিক উলটো দিকে মাছ ধরছিল। তাদের ছিপে শার্কটি গেঁথে গিয়ে আরম্ভ হল বেজায় টানাটানি। শার্কও ছাড়ে না, এদিকে কানাকাদেরও গোঁ। শেষে ছিপটি ভেঙ্গে গেল, কানাকারা অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তারাও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সে কি টানাটানি। শার্কটা গভীর জলে পালাবার আগেই একজন ওর ল্যাজটা ধরেছে চেপে, তারপর বালির উপর দিয়ে টানতে টানতে দৌড়। শার্কটা ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার হাতে এক কামড় বসাতে গেছে, কানাকাটি এক লাফে হাত ছেড়ে দিতেই এই সুযোগে শার্কটি জলে পলায়ন করল। কিন্তু লোক দুটি আবার ল্যাজ ধরে টেনে আনল শার্কটাকে, একজন লাঠি ও পাথর দিয়ে শার্কটাকে পিটোতে লাগল। শার্কটি আবার কামড়াবার উপক্রম করতেই আগে থাকতে সে হাত ছেড়ে সরে গেছে। কিন্তু এবার শার্কটা গভীর জলে পালাল, ওরা দুজন সাঁতরে গেল বটে কিন্তু খানিকক্ষণ জলযুদ্ধের পর শার্কেরই জয়লাভ হল। ক্ষতবিক্ষত শরীরে পালাল সে, ছিপ ও টোপ সমেত।

॥ ২১ ॥ ক্যালিফোর্ণিয়া—দেশ ও মানুষ ॥

সে বছর গ্রীষ্মকালে আমরা প্রায়ই দুর্গে যাতায়াত করতাম। স্থানীয় সকলের সঙ্গেই পরিচয় হল। এইভাবে ওখানকার ভাষা, আদবকায়দা ইত্যাদি মোটামুটি রপ্ত হল। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ হল কিছুটা।

ক্যালিফোর্ণিয়া কে আবিষ্কার করেন এই নিয়ে একটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ১৫৩৪ সালে জিমেনেস, আবার অনেকের মতে প্রকৃত আবিষ্কারক কর্টেস, ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে যাঁর এখানে প্রথম আগমন হয়। তারপর থেকে অবশ্য এখানে বহু দুঃসাহসী ব্যক্তির পদক্ষেপ ঘটেছে। স্পেনের সম্রাটের আদেশেও এসেছেন অনেকে। তখন এই অঞ্চল নানা রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত। আবিষ্কারকরা এসে দেখেন এই দেশের ভূমি উর্বর, সোনার খনি ও মুক্তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে একটা জনশ্রুতিও ছিল। এই নবাবিষ্কৃত ধনসমৃদ্ধ মহাদেশে আসার জন্য জেসুইট

সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টধর্মী সাধুরা সর্বপ্রথম অনুমতি প্রার্থনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্যালিফোর্ণিয়ার নানা স্থানে এঁদের মঠ স্থাপিত হয়। আদিবাসীদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা এবং তাদের মধ্যে সভ্যতার আলো ছড়ান—এই ছিল এঁদের প্রধান কাজ। ক্রমে এ দেশে স্পেনের তুটি তুর্গ স্থাপিত হয়, একটি সান ডিয়াগো ও অপরটি মণ্টারিতে। মঠগুলির প্রতিরক্ষা এবং আদিবাসীদের উপর স্পেনের প্রভুত্ব বজায় রাখা এই তুই ছিল তুর্গ স্থাপনের উদ্দেশ্য। শাসনের সুবিধার জন্য ক্যালিফোর্ণিয়াকে তুটি ভাগে ভাগ করে এই তুটি তুর্গ থেকে শাসনকার্য চালান হত। পরে আরো তুর্গ নির্মিত হয়। সাণ্টা বারবারা, সানফ্রানসিস্কো ও অন্যান্য স্থানে। সেই অনুযায়ী দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা হয়। যেসব সৈন্যসামন্ত ঐসব তুর্গে বাস করত তারা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য স্থানীয় মেয়েদের বিবাহ করে ওখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করে। ফলে তুর্গগুলি ঘিরে ছোটখাট উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সেগুলি ক্রমে শহরে রূপান্তরিত হয়। এর পর ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে বাণিজ্য জাহাজও এসে লাগতে লাগল। মঠগুলির কাছে তারা কাঁচা চামড়ার বিনিময়ে জিনিসপত্র বিক্রি করত। এই ভাবে ক্যালিফোর্ণিয়ার বিখ্যাত চামড়ার কারবারের সূচনা। দেশের প্রায় সমস্ত পশু ছিল ঐ মঠগুলির সম্পত্তি। বিরাট বিরাট এইসব পশুপালগুলি দেখাশোনা করত স্থানীয় লোকেরা। তারা মঠ কর্তৃপক্ষদের দাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন ভ্যাঙ্কুভার সান ডিয়াগোতে আসেন সেই সময় এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা রাজার প্রাপ্য বহু অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এই অপরাধে ওরা স্পেনের শাসনাধীন অঞ্চল থেকে বহিষ্কৃত হয়। মঠগুলিতে ফ্রানসিস্কান সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা এসে কার্যভার গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাতে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হল না। মেক্সিকো স্বাধীন হবার পর থেকে মঠধারীদের ক্ষমতা ক্রমে কমে আসতে থাকে, শেষে আইন করে সব রেড ইণ্ডিয়ানদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এর পর তারা স্বাধীনভাবে পশুপালন করার অধিকার পেল। কেবল ধর্মসংক্রান্ত কাজ ছাড়া সন্ন্যাসীরা অন্য সব ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেন। আদিবাসীরা নামে মাত্র স্বাধীন, কার্যতঃ তারা সেই আগের মত ব্যবহার পেতে লাগল। কিন্তু মঠের ভিতরের ব্যবস্থার একেবারে আমূল পরিবর্তন হল। ধনসম্পত্তির অধিকার চলে গেল তাঁদের কাছ থেকে নবনিযুক্ত

শাসকদের হাতে। এইসব শাসকরা স্পেন-সম্রাট দ্বারা নিযুক্ত—তারা যে কয় বছর ক্যালিফোর্ণিয়াতে থাকে কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত আয়ের চিন্তাতেই নিয়োজিত থাকে। তারা ফিরে যাবার পর দেখা যায় সেই বিভাগের অবস্থা আরোই শোচনীয়। সন্ন্যাসীদের হাতে যখন শাসনক্ষমতা ছিল তখন এতটা দুরবস্থা হয়নি। সন্ন্যাসীরা নিজেদের মঠের সুনাম রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, আদিবাসীদেরও নিজেদের স্বার্থে যথাসাধ্য ভালভাবে রাখতেন। তাছাড়া আর একটি কারণ ছিল। তাঁরা এসেছিলেন এদেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শাসনকর্তারা ছিলেন আগন্তুক, এদেশ সম্বন্ধে তাঁদের না ছিল কোন ঔৎসুক্য, না ছিল উপকার করার চেষ্টা। যাঁরা শাসনভার নিয়ে আসতেন তাঁরা প্রায় সকলেই সৈন্য বা রাজনীতিজ্ঞ, অবস্থার বিপাকে বা কোন অপ্রস্তুত অবস্থা এড়াতে এখানে আসতেন। যত শীঘ্র সম্ভব নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করাই ছিল এঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা এ অঞ্চলে আসার কিছুদিন আগে এই সব পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু এই অল্পদিনেই আমদানি রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম হয়ে গিয়েছিল এবং মঠগুলির অতিশয় ভগ্নাবস্থা।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় সবসুদ্ধ চারটি দুর্গ আছে, উত্তরে সানফ্রানসিস্কো, তারপরে মণ্টারি, তারপরে সাণ্টা বারবারা ও সর্বদক্ষিণে সানডিয়াগো। নানারকম সম্প্রদায়ের মঠ এদের শাসনাধীনে আছে, এবং অন্যান্য শহরগুলিও সেই পর্যায়ভুক্ত। সাণ্টা বুয়েনাভেণ্টুরা নাকি মঠ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানকার জমি উর্বর এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলিও উত্তম। ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে সন্ন্যাসীরা মেক্সিকোর সর্বপ্রধান ধর্মাধ্যক্ষের অধীনস্থ প্রজা এবং পার্থিব ব্যাপারে প্রধান শাসনকর্তার অধীন। প্রধান শাসনকর্তা দেশের সামরিক ও অসামরিক নেতা।

গণতন্ত্রের নামে এদেশে যথেচ্ছাচার চলে। কোন সর্ববাদিসম্মত আইন কানুন বলে কিছু নেই—বিচারালয়ের ব্যবস্থাও নেই। ব্যবস্থাপক সভার খামখেয়াল অনুযায়ী আইন তৈরী হয় বা রদ হয়। ব্যবস্থাপক সভার ভাঙ্গাগড়াও অহরহ চলছে। মেক্সিকোতে মহাসভায় প্রত্যেক দেশ প্রতিনিধি পাঠায় বটে কিন্তু সেখানে যেতে আসতে কয়েকমাস লেগে যায়। সেজন্য কেন্দ্রের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ রাখাও কঠিন। প্রতিনিধিরা রাজধানীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। দেশে হয়ত ইতোমধ্যে বিপ্লব

বেধে গেছে, তিনি আর কষ্ট করে খবরাখবর নেবার চেষ্টাও করেন না। অন্য কোন প্রতিনিধি পাঠান হলে পুরনো প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। যিনি জয়লাভ করেন রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁরই প্রাপ্য।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় নিত্যই বিদ্রোহ হচ্ছে—এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। আমাদের দেশেও যেমন এখানেও তেমনি দু-একজন সাধারণ লোকের প্ররোচনায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। সভাসমিতি, গালিগালাজ ও আবেদন নিবেদনের পথে না গিয়ে এরা দুর্গ আক্রমণ করে খাদ্যদ্রব্য যা পায় লুঠপাট করে নতুন শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করে। আইন কানুনের ধার ধারে না এরা, জোর যার মুলুক তার এই পদ্ধতিতে শাসন চলে। একজন মার্কিন স্থানীয় মহিলাকে বিবাহ করে এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। একদিন সে তার বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করছে এমন সময় হঠাৎ এক মেক্সিকোবাসী এসে তাকে ছোরা বিদ্ধ করে হত্যা করে। দুজনের মধ্যে পুরানো শত্রুতা ছিল। অন্যান্য মার্কিন নাগরিকরা আততায়ীকে বন্দী করে রাখে এবং প্রধান শাসনকর্তার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করে পাঠায়। শাসনকর্তা এ বিষয়ে কিছু করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর মার্কিন নাগরিকরা বিচারের ভার নিজেদের হাতেই তুলে নিল, সেকথা তারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও দিল। ঠিক সেই সময় পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন শিকারী এসে শহরে আড্ডা গেড়েছিল। তাদের প্রত্যেকেরই বন্দুক ছিল। এদের সঙ্গে মিলে মার্কিন ও ইংরাজ নাগরিকরা শহরটি অধিকার করে ফেলে। উপযুক্ত বিচারের পর অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হল। লোকটিকে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করান হল রাস্তায়। সমস্ত লোকেদের নাম কাগজের টুকরায় লিখে একটি টুপির মধ্যে ফেলে তার থেকে কাগজ তোলা হল, বারোজনের গুলী ছোঁড়ার পালা পড়ল। তারা বন্দুক নিয়ে প্রত্যেকে একসঙ্গে গুলী ছুঁড়ে খুনী লোকটাকে হত্যা করে। তারপর তাকে যথারীতি সমাধি দেওয়া হল। কার্যসিদ্ধি হবার পর পুরাতন শাসনকর্তার হাতে আবার নগরের ভার ছেড়ে দেওয়া হল। সান গেব্রিয়েলে এক বিরাট লম্বাচওড়া উপাধিধারী সেনাপতি ছিলেন, তিনি ঘোষণা করলেন বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু দুর্গের বাইরে এক পা দেবারও ভরসা তাঁর ছিল না। চল্লিশ জন কেণ্টাকীবাসী শিকারী ও বারোজন ইংরাজ ও মার্কিনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার দুঃসাহস তাঁর

অলস অকর্মণ্য অর্ধভুক্ত সৈন্যদলের ছিল না। যখন এই ঘটনা ঘটে আমরা তখন সান পেড্রোতে। ঘটনাটি লোক পরম্পরায় আমাদের কানে আসে। এই সময় আরেকটি হত্যাকাণ্ডের কথা শুনি। পুয়েবলো থেকে সান লুই রে যাবার পথে এক ব্যক্তি নিহত হয়। হত্যা করে তার স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রণয়ী। কেউ কেউ বলল বিদেশীরা দুজনকেই হত্যা করেছে, আবার অনেকে বলল তারা স্থানীয় অধিবাসী বলে তাদের কিছুই করা হয়নি। সান ডিয়াগোতে একটি লোককে আমরা প্রায়ই দেখতাম, অনেকের কাছে শুনলাম সেই নাকি হত্যাকারী। আমার মনে হয় এই দুটি ঘটনা একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

রেড ইণ্ডিয়ানদের বেলায় অবশ্য বিচার অথবা প্রতিহিংসা কোনটিই অযথা বিলম্ব হয় না। একদিন রবিবার বিকেলে একজন রেড ইণ্ডিয়ান তার ঘোড়ায় করে কোথায় যাচ্ছিল। আমি তখন সান ডিয়াগোতে ছিলাম। এমন সময় তার এক শত্রু বিনা বাক্যব্যয়ে এসে তার ঘোড়ার বুকে আমূল ছুরি বসিয়ে দেয়। পড়ন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে লোকটি আততায়ীর বুকে ছুরি মেরে তাকে নিমেষের মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করল। লোকটিকে তৎক্ষণাৎ ধরে বেঁধে হাজতে আটকান হল। মণ্টারিতে খবর গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন হাজতের সামনে লোকটিকে দেখি, শেকল দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা, হাতে হাতকড়া। বুঝলাম এর প্রাণের আশা কম। যদিও তার অতি প্রিয় ঘোড়াটি প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হল কিন্তু সুবিচারের কোন প্রশ্নই ওঠেনা, কেননা সে রেড ইণ্ডিয়ান। এক সপ্তাহ পরে শুনলাম তাকে গুলী করে মারা হয়েছে। এই হল ক্যালিফোর্ণিয়ায় ন্যায় বিচারের নমুনা।

সামাজিক অবস্থার কথা ছেড়ে এবার এদের পারিবারিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এখানেও চিত্রটি এমন কিছু অন্য রকম নয়। পুরুষেরা অত্যন্ত বেহিসেবী, অহঙ্কারী এবং পাকা জুয়াড়ী। মেয়েরা সকলেই সুন্দরী বটে, কিন্তু অশিক্ষিত এবং চরিত্র দোষ-দুষ্ট। পাতিব্রত্য বা একনিষ্ঠতা এদের মধ্যে কম হলেও যতটা মনে করা যায় ততটা নয়। নানারকম দোষের সমন্বয়ে কোন একটি বিশেষ দোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। অসৎচরিত্র স্ত্রীলোকের স্বামীরা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিদ্বন্দ্বীকে এরা এক কথায় হত্যাও করে ফেলতে পারে। একটু অবিবেচনার জন্য যে কত লোকের প্রাণ গেছে তার ইয়ত্তা নেই। উচ্চ বংশে এইরকম প্রচেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং

অসুবিধাজনক, ধরা পড়ে যাবার ভয় পদে পদে। অবিবাহিত স্ত্রীলোকদের প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। বিবাহ দেবার সময় মেয়েদের সুনাম অতি প্রয়োজনীয় সেজন্যই মা বাবারা এত সাবধান। সহচরীর সজাগ চক্ষু এবং পিতা ও ভাইদের শাণিত অস্ত্র মেয়েদের পাতিব্রত্য রক্ষার সহায়ক। যেসব পুরুষরা তাদের পরিবারের মেয়েদের সম্মান রাখতে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে তাদেরই আবার অন্য রমণীর প্রতি অনুরক্ত হলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হয়।

দরিদ্র আদিবাসীদের রক্ষার কোন সুব্যবস্থা নেই। সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা এদের অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখেন সেকথা ঠিক এবং অন্যায় আচরণের জন্য কঠিন শাস্তিও বিধান করেন—কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় বলে মনে হয় না। আদিবাসীদের মধ্যে নীতিজ্ঞান ও দাম্পত্য দায়িত্ব-বোধের ভাব একেবারেই নেই। তা না হলে বহু আদিবাসী তাদের স্ত্রীদের নাবিকদের মনোরঞ্জনের জন্য উপকূলে নিয়ে আসত না। স্ত্রীর অর্জিত অর্থের ভাগ নিতেও তারা কুণ্ঠিত বোধ করে না। বরং সেই অর্থের লোভেই আসে। কোন মেয়ে অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন করছে খবর পেলে সন্ন্যাসীরা তাকে বেত্রাঘাত করে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করেন—যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, ইঁট বওয়া ইত্যাদি। কিন্তু কয়েক রিয়েলের লোভে তারা আবার সেই কাজ করে। আদিবাসীরা খুবই পানাসক্ত। তবে মেক্সিকোর লোকেরা একেবারেই মদ স্পর্শ করে না, আমি কখনো একজনকেও নেশা করতে দেখিনি।

এই সুন্দর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের এই হল সম্যক পরিচয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার কয়েক শত মাইল উপকূল, সুন্দর সুন্দর বন্দর, উত্তরের ঘন অরণ্যানী, জলে অপর্যাপ্ত মাছ, মাঠে প্রচুর শস্য, সমতলভূমিতে অগণিত গবাদি পশু, জলহাওয়া অতি উত্তম, দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব নেই। এই সোনার দেশ যদি তেমন কর্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়ে তবে কতই না উন্নতি করতে পারে। কতদিন এখানকার লোকেরা এই অবস্থায় পড়ে থাকবে? যে সব বিদেশী, বিশেষত মার্কিন ও ইংরাজরা এদেশে এসেছে, অধ্যবসায় ও কর্মপটুতার গুণে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের করতলগত। কিন্তু তাদের বংশধরেরা মেক্সিকোর প্রথামত মানুষ হয় এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার বিখ্যাত কর্মবিমুখতা তাদেরও পেয়ে বসে।

॥ ২২ ॥ অ্যালার্ট ॥

শনিবার ১৮ই জুলাই। ফাজিও নামে যে মেক্সিকো দেশী জাহাজটি ঝড়ে পড়ে এত দিন সান ডিয়াগো বন্দরে আটকে ছিল, অবশেষে সান ব্লাস ও মজোটলানের দিকে যাত্রা করল। যাত্রা করার আগে শুল্ক সংক্রান্ত কিছু গোলযোগ হয়, তাই যাবার দিন পিছিয়ে দিতে হয়। অবশেষে হালকা হাওয়া দেখে জাহাজটি ভেসে পড়ল, বন্দরের মুখ অবধি পৌঁছেছে মাত্র এমন সময় দুজন রাজকর্মচারী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত। জাহাজে একটি অত্যন্ত জরুরী চিঠি পাঠান প্রয়োজন। কিন্তু তীরে একটিও নৌকা নেই, তখন তাঁরা কানাকাদের বহু অর্থের লোভ দেখিয়ে চিঠিখানি সাঁতরে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করলেন। একজন সুগঠিত দেহ উৎসাহী কানাকা গায়ের জামা খুলে টুপির মধ্যে চিঠিটি পুরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজ তখন ঠিক এক মাইল দূরে, কিন্তু যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, কাজেই ওর জাহাজের কাছে পৌঁছতে বিশেষ দেরী হল না। ছোট বাষ্পচালিত পোত জল কেটে চলে গেলে যেমন দাগ পড়ে এই লোকটির সাঁতারের গতিবেগে ঠিক তেমনি সোজা তরঙ্গরেখার সৃষ্টি হল। ওরকম সাঁতার আমি জীবনে কখনো দেখিনি। জাহাজের লোকেরা ওকে আসতে দেখল বটে কিন্তু কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে মনে করে থামল না। লোকটি জাহাজের সঙ্গে সাঁতার কেটে এগোতে লাগল, অবশেষে জাহাজের উপরে উঠে চিঠিটি দিল। ক্যাপ্টেন চিঠি পড়ে বললেন কোন উত্তর নেই, লোকটিকে এক পাত্র ব্রাণ্ডি খাইয়ে আবার তাকে লাফ দিয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কানাকাটি আবার সাঁতার কেটে কূলে ফিরে এল। আমাদের কাছে যখন এসে উপস্থিত তখন একঘণ্টা কেটে গেছে। তার চেহারায় কিন্তু ক্লান্তির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং ব্রাণ্ডি খেয়ে এবং কয়েক ডলার বখশিশ পেয়ে তার ভারী ফূর্তি দেখা গেল। জাহাজ যেমন যাচ্ছিল তেমনি যেতে লাগল। যে দুজন রাজকর্মচারী ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আরো কিছু অর্থ লাভের আশায় জাহাজ থামাবার নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

সান্টা বারবারা থেকে এলার্ট যাওয়ার পর তিন মাস হয়ে গেল। আমরা রোজই জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকি। চামড়ার ঘরের আধ মাইল পিছনে একটি ছোট টিলা ছিল, আমরা সেখানে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখতাম কোথাও কোন পালের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু প্রতিদিনই আমাদের হতাশ হয়ে ফিরতে হত। আমি অন্যদের চেয়ে বেশীই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম কেননা বাড়ীর চিঠিতে জানলাম আমার বন্ধুদের অনুরোধে বস্টনে কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এলার্টে করে দেশে ফিরতে, যদি পিলগ্রীমের আগেই এলার্ট দেশে ফেরে। এই খবরটি যথাস্থানে পৌঁছেছে কিনা এবং এলার্টই বা এখন কোথায় জানবার জন্য আমার অস্থিরতা সহজেই অনুমেয়। দু-এক বছরের হেরফেরে হয়ত অন্যের কাছে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে এখন একবছর অত্যন্ত মূল্যবান। বস্টন ছাড়ার পর এক বছর কেটে গেছে। এখন যাত্রা করলেও কোন জাহাজের পক্ষে আট-নয় মাসের আগে দেশে পৌঁছান সম্ভব নয়। সুতরাং সব মিলিয়ে আমার অনুপস্থিতি দাঁড়াচ্ছে দুবছর। দুবছরে এমন কিছু অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে না, কিন্তু এর চেয়ে বেশী দেরী হলে হয়ত আমাকে চিরজীবনের মত নাবিক হয়েই কাটাতে হবে। আমি অবশ্য নিজেকে একরকম ভাগ্যের হাতেই সমর্পণ করেছিলাম, কিন্তু বাড়ী থেকে এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি সম্ভাবনার আভাসে আমি আবার নতুন করে আশায় বুক বাঁধলাম। আবার ফিরে গিয়ে নিজের হাতে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার নেব ভাবতেই আনন্দ আর বাঁধ মানল না। তাছাড়া যদি আমার কপালে সমুদ্রজীবনই লেখা থাকে তবে কূলে চামড়ার গুদামে বসে থেকে কিই বা লাভ হবে। কাঁচা চামড়াকে যেসব প্রক্রিয়া করে ব্যবহারযোগ্য করা যায় সেসব ভালো ভাবেই শিখেছিলাম—তাছাড়া অবসর সময়ে নৌচালনা বিষয়ে বই পড়ে জ্ঞানলাভ করার সুযোগও হয়েছিল। কিন্তু আসল নৌবিদ্যা বা চলনেনৈপুণ্য একমাত্র জাহাজেই শেখা সম্ভব। আমি জাহাজে ফিরে যাবার জন্য আবেদন করব একেবারে মনস্থির করে ফেললাম। আগস্ট মাসের প্রথম দিনের মধ্যেই আমরা সব চামড়া পরিশুদ্ধ করে গুদামজাত করে ফেলেছিলাম। তারপর দুদিন ধরে গামলা থেকে ছমাসের সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার

করা হল—সে যা দুর্গন্ধ সেখানে কোন গাধাও টিঁকতে পারত কিনা সন্দেহ। জাহাজের জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত, হাতে তখনও তিন চার সপ্তাহ সময়। আমি বই পড়ে, সেলাই-রিফু করে, জঙ্গলে জঙ্গলে কুকুর নিয়ে বেড়িয়ে, মাছ ধরে, কখনো বা দুর্গ অবধি বেড়িয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। জামা কাপড়ও তৈরী রাখলাম, যদি যেতে হয়। আমি একটি ছোট কুকুরছানা পুষেছিলাম, তার থাবাগুলি সাদা, গা বাদামী রঙের। তার জন্য একটি ঘর তৈরী করে তাকে সেখানে বেঁধে রাখতাম। তাকে নিজে হাতে খাওয়াতাম আর অনেক রকম ভাবে আমার আদেশ পালন করতে শেখাতাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ও আমার খুব অনুগত হয়ে পড়ল। ওর মত সুন্দর কুকুর তীরে খুব কমই ছিল। ওর নাম দিয়েছিলাম ব্রাভো—ওকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবলে বড় কষ্ট হত। কানাকা সঙ্গীদের কাছে বিদায় নিতে হবে সে চিন্তাও যথেষ্ট কাতর করেছিল আমাকে।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু কোথায় জাহাজ! আমাদের দিন রাত্রি কেবল ঐ একই আলোচনা। জাহাজটি এখন কোথায়, তাতে মালের পরিমাণ কত, সানফ্রানসিস্কোতে এসে পৌঁছল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মঙ্গলবার, ২৫শে আগস্ট। আমাদের গুদামরক্ষক আজ বাঁকের মুখ পেরিয়ে ডিঙি করে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে দুজন কানাকা। আমরা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কূলের চারদিক থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল "জাহাজ আসছে, জাহাজ।" সঙ্গে সঙ্গে সকলে গুদাম থেকে দৌড়ে বাইরে এসে উপস্থিত। একটি সুন্দর দীর্ঘাকায় জাহাজ বাঁকের দিক থেকে দ্রুতগতি এগিয়ে আসছে, বিকেলের হাওয়া লেগে উপরের হালকা পালগুলি একটু বেঁকে আছে। সমস্ত পাল টেনে বাঁধা, উপরে তারকাখচিত পতাকা উড়ছে। জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটি যেন ক্ষিপ্রগামী অশ্বের গতিতে ধেয়ে এল। ছ মাস হয়ে গেল সান ডিয়াগোতে কোন জাহাজ নোঙর ফেলে নি, সুতরাং এই অবস্থায় সকলেই নতুন জাহাজ দেখতে খুবই উৎসুক। জাহাজটি একটি ছবির মত দেখাচ্ছিল, একটি একটি করে পাল গুটিয়ে ফেলা হল, তারপর নোঙর পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে উপরের পালদণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে মাল্লারা উপরের পালগুলিও নামিয়ে দিল, তারপর দড়ি বেয়ে নেমে এসে, বিভিন্ন পাল এবং ছোট ত্রিকোণ পালটি

গুটিয়ে ফেলল। সব কাজ খুবই সাবধানতা সহকারে করা হচ্ছিল। যত্ন করে পালগুলি মুড়ে থলের মধ্যে রাখা হল এবার। কপিকল উঠল, সব দড়াদড়ি খুলে নেওয়া হল। বড় একটি নৌকা বার হল, নোঙর নামল। এই সেই এলার্ট।

নৌকায় করে জনকয়েক কমবয়সী মাল্লা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে কূলে এল। নৌকাটি শিকারী নৌকা, সুন্দর রং করা, বসবার গদীমোড়া আসন। আমরা অবিলম্বে এদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। আমাদের কত কি প্রশ্ন, বস্টনের কথা, ওদের সমুদ্রযাত্রা। ওরাও প্রত্যুত্তরে আমাদের তীরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। একজন আমার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করতেও রাজী হল। আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম। এখন কেবল ক্যাপ্টেনের অনুমতির অপেক্ষা।

খাবার পর মাল্লারা মাল নামাতে আরম্ভ করল। আমাদের বিশেষ কোন কাজ না থাকায় আমরাও হাত লাগালাম। এই সুযোগে জাহাজের ভিতরের চেহারাটা দেখে আসা গেল, কেননা সম্ভবতঃ ঐ জাহাজেই আমাকে আগামী এক বছর কাটাতে হবে, জাহাজের ভিতর ও বাহির দুই দিকই সমান নয়ন মনোহর। প্রশস্ত পাটাতন, পরিষ্কার ঝকঝক করছে। শুনলাম ক্রমাগত বেলে পাথর ঘষার জন্য এত উজ্জ্বল ও মসৃণ। এখানে কাজ অর্থে লোকদেখানো ছেলেখেলা নয়, সব কিছু নিখুঁত। কোথাও ময়লা নেই, মরচে নেই, দড়িদড়া কোথাও অনাবশ্যক ভাবে ঝুলছে না। পালদণ্ডগুলি কোথাও এতটুকু বেঁকে নেই। সব কিছু যথাযথ, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। মেট নিজের কর্তব্য কর্মে খুব সজাগ, গম্ভীর গলা, মনিব হিসাবে কড়া বলে মাল্লারাও ওকে বেশ সম্ভ্রম করে চলত। এ ছাড়া দ্বিতীয় মেট, তৃতীয় মেট, ছুতোর, পালের মিস্ত্রী, ভাণ্ডারী, রাঁধুনী ও বারোজন মাল্লা—এই নিয়ে জাহাজের জনসমষ্টি। জাহাজে তখন ছিল কয়েক হাজার চামড়ার টুকরো, তাছাড়া শিং ও চর্বি। একসঙ্গে দুদিকের প্রবেশ দ্বার থেকে নৌকায় মাল বোঝাই করা হতে লাগল। দ্বিতীয় মেট বড় নৌকার ও তৃতীয় মেট ছোট ডিঙির ভার নিলেন। কয়েকদিন ধরে মাল নামানর পর আমরা আবার সেই পুরানো কাজে লেগে গেলাম—চামড়ার পরিচর্যা।

শনিবার, ২৯শে আগস্ট। বাতাসের দিক থেকে ক্যাটালিনা জাহাজের আগমন।

রবিবার, ৩০শে আগস্ট। রবিবার দিন শহরে যাবার জন্য এলার্টের মাল্লারা খুব উদগ্রীব হয়ে ছিল। ঘোড়া ভাড়া খাটাবার জন্য সকাল থেকেই স্থানীয় লোকেদের ঘোড়া নিয়ে সমাগম হতে লাগল। যেসব মাল্লারা ছুটি পেয়েছিল তারা দুর্গের দিকে বা মঠের দিকে চলে গেল, কেউই সূর্যাস্তের আগে ফিরল না। সান ডিয়াগোতে আমার আর নতুন করে দেখার কিছু ছিল না, তাই জাহাজেই বেড়াতে গেলাম। মাল্লারা নিজেদের থাকবার কামরায় যে যার কাজ-কর্ম করছে। শুনলাম ওরা ক্যালাওতে তিন সপ্তাহ ছিল। বস্টন থেকে ক্যালাও ওরা মাত্র আশী দিনে এসেছে, খুবই অভূতপূর্ব ঘটনা। পথে ওদের সঙ্গে কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও কয়েকটি ইংরাজ ও ফরাসী জাহাজের দেখা হয়েছে। ক্যালাও থেকে ওরা সোজা এসেছে ক্যালিফোর্ণিয়া, পথে সব কটি বন্দরেই থেমেছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার কোন বন্দর বাদ পড়েনি। সানফ্রানসিস্কোতেও গিয়েছিল ওরা। আমাদের জাহাজের তুলনায় এদের ঘরটি দেখলাম বেশ আলোকিত, পরিষ্কার, প্রশস্ত—সব মিলিয়ে বাসোপযোগী। জাহাজের নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ ঘরটি ধোয়া মোছা হয়। মাল্লারা নিজেরাও পরিচ্ছন্ন, তারা নানা উপায়ে থাকবার জায়গাটি পরিষ্কার রেখেছে। সিঁড়ির নীচে পিকদানি জাতীয় একটি বাক্স রাখা বা ভিজে কাপড় টাঙ্গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে করেছে। শুনলাম প্রত্যেক শনিবারে মেঝে বেলেপাথর দিয়ে ঘষে চকচকে করা হয়। জাহাজের পিছনের দিকে একটি কাজ করার কামরা, খাবার ঘর এবং একটি শোবার ঘর। মাঝামাঝি জায়গায় আর একটি পাটাতন, নোঙর দণ্ড থেকে তার উচ্চতা সাড়ে ছ ফিট। এখানে মিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতি থাকে এবং বাড়তি দড়াদড়িও রাখবার সুবন্দোবস্ত আছে। মাল্লাদের অনেকে এখানে শোয়। পাটাতনের চারদিক কাঠের তক্তা দিয়ে আঁট করে বন্ধ করা যায়। মাল্লারা বলল এই জাহাজের সবই ভাল তবে একটি দোষ, জোরে গেলে সামনের দিকটা জলে ভিজে যায়—এটা অবশ্য অল্পবিস্তর সমস্ত দ্রুতগামী পোতেই হতে দেখা যায়। জাহাজটি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনলাম। মাল্লারা সকলেই জাহাজের খুব অনুরক্ত। তারা মনে করে এ জাহাজের কখনো কোন অনিষ্ট হতে পারে না। কখনও কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি। তৃতীয় মেট নাকি খুব ছেলেবেলা থেকেই এই জাহাজে আছে। এখন তার বয়স আঠারো। প্রধান মেট তো জাহাজটিকে তার ঘরবাড়ি বানিয়েই বসে আছে।

এক সপ্তাহের উপর বন্দরে কাটাবার পর জাহাজের যাত্রা করার সময় হল। আমি ক্যাপ্টেনের কাছে আমার প্রস্তাব নিবেদন করলাম। ক্যাপ্টেন বললেন যদি আমার বয়সী কোন মাল্লাকে আমার জায়গায় দিয়ে যেতে পারি তবে তাঁর আমাকে নিতে কোন আপত্তি নেই। এতে কোন অসুবিধাই হল না। কেননা সেই মাল্লাটি জাহাজের একঘেয়েমির হাত এড়াবার জন্য অতি সহজেই কয়েক মাস কূলে কাটাতে রাজী হল। তাছাড়া সামনে শীত ও দক্ষিণে ঝড়ের কাল। সে সময় সমুদ্রে কাটাতে কেই বা চায়। অগত্যা আমি আবার বাক্সপত্র নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লাম।

॥ ২৩ ॥ নতুন জাহাজ ও সহকর্মীরা ॥

মঙ্গলবার, ৮ই সেপ্টেম্বর। আজ থেকে নতুন জাহাজে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হল। নাবিকের জীবন সর্বদাই একরকম, যে জাহাজেই থাকুক। কিন্তু পিলগ্রীমের চেয়ে এখানকার বহু নিয়মকানুন আলাদা। সকালে ঘুম-ভাঙ্গার ডাক দেওয়ার পর পোশাক পরার জন্য প্রত্যেককে সাড়ে তিন মিনিট সময় দেওয়া হয়। অবশ্য তার চেয়ে বেশী দেরী হলে বাক্যবাণ বর্ষণ করার জন্য মেট আগে থেকেই উপস্থিত থাকেন। তাঁর হুঙ্কারে জাহাজের এদিক থেকে ওদিক কেঁপে ওঠে। তারপর জল দেবার কলটি খুলে সমস্ত পাটাতন ধোয়ার পর্ব। এই কাজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেটও হাত লাগান কিন্তু প্রধান মেট ভুলক্রমেও বুরুশ ও ঝাড়ু স্পর্শ করেন না। তিনি উপরের পাটাতনে পায়চারি করতে করতে আদেশ দিতে থাকেন। উপর থেকে নীচ, সবকটি পাটাতন, মাল্লাদের থাকবার অংশ, রেলিং চতুর্দিক ঝাঁটা ও ভিজে কাপড় দিয়ে ঘষে মেজে নেবার পর ডেকে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয় ও তারপর বেলে পাথর দিয়ে ঘষা আরম্ভ হয়। বেলে পাথর এক ধরনের নরম পাথর, নীচেটি মসৃণ, দড়ি বাঁধা আছে, সেই ধরে দুজন মাল্লা পাথরটি ডেকের এদিক থেকে ওদিক টেনে নিয়ে যায়। যেসব আনাচে কানাচে বেলে পাথর ঢোকে না সেখানে হাতে করে ছোট বেলে পাথরের টুকরো ব্যবহার করা হয়। এক ঘণ্টা থেকে দু ঘণ্টা চলে এই পরিষ্কার করার কাজ। তারপর জল দিয়ে সমস্ত বালি ধুয়ে ফেলা হয়, অতঃপর মেঝে মুছে শুকিয়ে ফেলা হয়। তারপর চলে যায় যে যার নির্দিষ্ট কাজে। আমাদের জাহাজে

পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের নৌকা ছিল—বড় নৌকা থেকে আরম্ভ করে জেলে ডিঙি অবধি। প্রত্যেকটির জন্য একজন সারেঙ—নৌকার যাবতীয় দায়িত্ব তার—প্রাত্যহিক ধোয়ামোছা তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রাতরাশের আগেই অন্যান্য নানা সরঞ্জাম ঘষে মেজে চকচকে করার ভার মাল্লাদের এক একজনের উপর ছিল—কেউ মুছত নোঙর তোলার যন্ত্রটির ধাতুনির্মিত অংশগুলি, কেউ পিতলের ঘন্টাটি, কেউ বা দড়ি জড়াবার খুঁটি, সিঁড়ির ধাপগুলি আর একজন—এইভাবে কাজ ভাগ হত। ইতোমধ্যে জলের পিপেগুলি ভরা হত, রাঁধুনী গামলা মেজে ফেলত। ডেক শুখিয়ে গেলে পরম মহিমময় ক্যাপ্টেন এসে দর্শন দিতেন। উপরের পাটাতনে কয়েক বার পদচারণা করে আমাদের কৃতার্থ করতেন উনি। আটটা ঘন্টা পড়লে আমরা সকলে খেতে বসতাম। আধ ঘন্টার মধ্যে খাওয়া শেষ, বাসনপত্র উঠিয়ে ফেলা—তারপর যাত্রার প্রস্তুতি। আয়তনে এই জাহাজ পিলগ্রীমের দ্বিগুণ এবং যন্ত্রপাতিও সেই অনুপাতে ভারী। কিন্তু নোঙর টানা, দড়ি গোটান প্রভৃতি কাজ চক্ষের নিমেষে একটার পর একটা হয়ে যাচ্ছিল। মাল্লাদের কাজে উৎসাহ, কাজ করার জায়গা বেশী এবং লোকবল এই তিনটি মিলে এত সুচারুরূপে সব কাজ হতে পারছিল। ভাল করে করার ইচ্ছা প্রত্যেকেরই মনে মনে। উচ্চ কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে মাল্লা অবধি সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যে সচেতন এবং খুবই কর্মপটু। যেই প্রধান মেটের কাছ থেকে পাল তোলার আদেশ এল সকলে বিদ্যুৎগতি দড়ির ওপর লাফিয়ে দণ্ড বেয়ে মাস্তুলের উপর উঠে গেল, এক একটি পালদণ্ডের উপর এক একজন স্থান নিয়ে প্রস্তুত জানাতেই নীচে থেকে প্রত্যাদেশ ভেসে এল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে জাহাজের কঙ্কালসার দণ্ডগুলিতে থরে থরে পাল ফুলে উঠল—মাস্তুলের সর্বোচ্চ অংশ থেকে ডেক পর্যন্ত। দড়ি টানবার জন্য একজন করে লোক তিনটি মাস্তুলের উপরে থাকল, বাকি সকলে নীচে নেমে এল। আমি সবচেয়ে পিছনের মাস্তুলে ছিলাম। পালদণ্ডগুলি ঠিকমত লাগান হল। নোঙর তুলে জাহাজের আগায় যে কাঠের প্রলম্বিত দণ্ড থাকে সেখানে বাঁধা হল, সমস্বরে হাঁক উঠল "হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো"। জাহাজ ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে—এক এক করে হালকা পালগুলি উপরে উঠে গেছে। বন্দরের বাঁক পার হবার আগেই সমস্ত পাল তুলে জাহাজ বেশ গতি নিয়ে নিল। মাস্তুলের চতুর্থ অংশের উপরের পালের

ভার ছিল আমার উপর—পিলগ্রীমের চেয়ে দ্বিগুণ বড় মাস্তুল, সুতরাং ছোট জাহাজে যে কাজ আমি অনায়াসে সম্পন্ন করেছি এখানে তাই করতে হিমশিম খাচ্ছিলাম। তাছাড়া নিজেকে দড়ির সঙ্গে আটকে রাখাটাও একটা সমস্যা, কেননা দুই হাত দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

যাত্রা শুরু হল, কিছুক্ষণের মত মাল্লাদের কাজে বিরতি। সহকর্মীদের কাছে শুনলাম এই উপকূলে এসে অবধি ওরা পালা করে পাহারায় দাঁড়িয়েছে। দেখলাম কঠিন শৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও এই জাহাজে মাল্লাদের কখনো অকারণে ব্যতিব্যস্ত করা হয় না, সেজন্য সকলেই খুশী মনে নিজের নিজের কাজ করে। পিলগ্রীমের অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ও অত্যাচারিত মাল্লাদের সঙ্গে এদের একটা তুলনা স্বভাবতই মনে এল।

নীচে গিয়ে মাল্লারা যে যার জামাকাপড়ের পরিচর্যা করতে বসল। আমি স্যান ডিয়াগোতেই একপ্রস্থ তোরঙ্গ গোছানর পালা শেষ করেছি, তাই বই পড়া ছাড়া আমার অন্য কিছু করার ছিল না। একজনের বাক্স থেকে একটি বই সংগ্রহ হল, বইটি বুলওয়ার প্রণীত "পল ক্লিফোর্ড"। আমি তৎক্ষণাৎ বইটি নিয়ে খোলা বিছানায় শুয়ে দুলতে দুলতে পড়তে আরম্ভ করে দিলাম। উপরে প্রবেশদ্বারের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া বইছে, জাহাজ চলেছে পূর্ণ বেগে, অপূর্ব আরামের পরিবেশ। কাহিনীতে বেশ মন বসে গেছে এমন সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়ল। খাওয়ার পর আমাদের পাহারার পালা। চার ঘণ্টা পরে আবার নীচে এসেই বইটি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে আলো না থাকার জন্য অন্ধকার হবার পর আর পড়া গেল না। তিন দিনে যখনই সময় পেতাম পড়ে পড়ে বইটি শেষ করে ফেললাম। ভাল সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন বই তখন খুবই দুষ্প্রাপ্য। এই বইটি উপভোগ করে যে বিরল আনন্দ পেলাম তা সচরাচর নাবিকদের ভাগ্যে জোটে না। বইয়ের চরিত্র চিত্রণ, বর্ণনাভঙ্গী ও চমকপ্রদ ভাষা আমার উৎসাহকে জাগ্রত করে রেখেছিল। আবার শীঘ্রই যে এরকম ভালো বই পড়তে পাব এমন আশা করলাম না।

জাহাজে আমাদের নিত্যকার জীবন সেই একই সুরে বাঁধা। দুই ডেকের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাঠ ও পালের মিস্ত্রীরা বসে নিজেদের কাজ করত, আর আমরা দড়িদড়া বাঁধতে, শন কেটে কাছি তৈরী করতে ব্যস্ত থাকতাম। যেমন বাণিজ্যজাহাজে সচরাচর কাজকর্ম হয়ে থাকে। রাত্রে পাহারা দেবার সময় আমরা একসঙ্গে সাত জন থাকতাম কাজেই সময়টা মন্দ কাটত না।

পিলগ্রীমে মাল্লাদের সংখ্যা এত কম ছিল যে পাহারার সময় কথা বলার লোক পাওয়া যেত না—একজন চাকা ধরে বসে, অন্যজন সতর্ক দৃষ্টি মেলে পাহারা দিচ্ছে—কাজেই সময়টা যেন আর কাটতেই চাইত না। দু-তিন রাত পাহারায় এসেই আমি বাঁদিকের দলের সকলের সঙ্গেই বেশ পরিচিত হয়ে গেলাম। পালের মিস্ত্রী ছিল দলের সর্দার এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। বাইশ বছর ধরে সে যে কতরকম জাহাজে করে কত দেশ ঘুরেছে তার ইয়ত্তা নেই। বাণিজ্য জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ, ক্রীতদাসধরা জাহাজ—শুধু শিকারী জাহাজে ও কখনো কাজ করেনি। ভাল নাবিকরা তিমি শিকার করাটা খুবই অগৌরবের ব্যাপার বলে মনে করে এবং পারত পক্ষে শিকারী জাহাজের দিক মাড়ায় না।

এই লোকটির প্রধান গুণ ছিল অবাস্তব গল্প বলার ক্ষমতা। সে গল্পগুলি এতই চিত্তাকর্ষক হত যে বিশ্বাস করুক আর না করুক মাল্লারা সকলেই শুনতে চাইত। পাহারার সমস্ত সময়টা এইভাবে ওর ঠাট্টামস্করায় কাটত। মাল্লাদের চোস্ত বুলি ও গালিগালাজেও বেশ পরিপক্ক ছিল লোকটি। বয়স, অভিজ্ঞতা এবং পদ মর্যাদায় ওর ঠিক পরেই ছিল হ্যারিস নামে একজন ইংরাজ। তার কথা বারান্তরে বলার ইচ্ছা আছে। এছাড়া ছিল জনকয়েক মার্কিন—তারা জলপথে দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপ যাওয়া-আসা করেছে। এদের মধ্যে একজন আগে ছিল মাছ-ধরা জাহাজে। সেগুলি দ্রুতগামী এবং আকারে ছোট। এরকম বড় জাহাজে কাজ করার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম। ছেলেটি কড অন্তরীপের লোক, * একটু মাথা মোটা। অন্য পাহারার দলে লোকসংখ্যা আমাদেরই মত। দলের নেতা ছিল সুদর্শন চেহারার এক ফরাসী, চুল ও গোঁফ কালো, নাম জন। মাল্লাদের একটির বেশী নামের দরকার করে না। ওদের দলে দুজন আমেরিকাবাসী, একজন ইংরাজ, একজন জার্মান ও দুটি বস্টনের বালক, সদ্য স্কুল ছেড়েছে। মার্কিনদের মধ্যে একজন বেশ বনেদী পরিবারের, এককালে অবস্থা ভাল ছিল এখন বাধ্য হয়ে মাল্লাদের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে। ছুতোর মিস্ত্রী অনেক সময় এদের সঙ্গে এসে যোগ দিত। সে

* বস্টনের দক্ষিণের লোক মাত্রকেই নাবিকরা কড অন্তরীপের লোক বলে সম্বোধন করে।

সুইডেনের লোক এবং ভাল হাল ধরিয়ে বলে নাম ছিল তার। ঐ কর্মে সে বহুদিন আছে। জাহাজের রাঁধুনী ও স্টুয়ার্ট ছিল নিগ্রো। ক্যাপ্টেন ও তিনজন মেটকে যোগ করলে এই হল আমাদের জাহাজের লোকসংখ্যা।

দ্বিতীয় দিনে আমরা কূল ঘেঁষে চললাম। কেননা বাতাস বাড়তে আরম্ভ করেছিল। পালের কোণগুলি বাঁধবার সময় জাহাজের নিয়মকানুন লক্ষ্য করলাম। এখানে প্রত্যেকের কাজ করার নির্দিষ্ট স্থান আছে, কেউ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে সময় নষ্ট করে না। পাল বাঁধার সময় কিসের পর কি হবে এবং কোথায় কার স্থান এসব আগে থেকে ঠিক করা থাকে। দুজন দক্ষ কর্মীকে নিয়ে প্রধান মেট জাহাজের পুরোভাগে কাজ করেন—তারা জন নামে ফরাসী মাল্লাটি ও পালের মিস্ত্রী। তৃতীয় মেটের স্থান জাহাজের মধ্যভাগে, সেখানে দুজন লোক নিয়ে তিনি পালের কোণ বাঁধা দড়ির তদারক করেন। দ্বিতায় মেট থাকেন জাহাজের সর্বপশ্চাদ্-ভাগে দড়ি ছাড়ার কাজে। সকলে নিজের নিজের জায়গা কোথায় ভাল করেই জানে এবং তার কাজের জন্য যে জবাবদিহি তাকেই করতে হবে এ জ্ঞানও আছে। আদেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যার দড়ি টেনে গুটোবে বা ছেড়ে দেবে, জাহাজ চলতে আরম্ভ করলেই সব দড়িদড়া কুণ্ডলী করে রাখা হবে সরিয়ে। সকলে নিজের জায়গায় প্রস্তুত। তখন ক্যাপ্টেন উপরের ডেক থেকে হালের লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে হাঁক দেবেন, মেট সেই কথার পুনরাবৃত্তি করলেই প্রধান মাস্তুলের দড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে। এর পরে আদেশ আসবে পালের কোণ বাঁধা দড়ি ছাড়ো। একের পর এক দড়ি খোলা হতে থাকে। ঠিক সময়ে আদেশ এলে প্রধান মাস্তুলের দণ্ডগুলি লাট্টুর মত ঘুরে যায়, কিন্তু একটু দেরী হয়ে গেলেই বেশ জোরে টানতে হয়। পিছনের পালদণ্ডগুলি এবার বেঁধে বড় দড়িটি বাতাসের দিকে ঢিলা দেওয়া হয়। তারপর আদেশমত বাতাসের প্রতিকূলে সবলে টেনে ধরা। ক্যাপ্টেন এবার নেমে এসে নিজে পর্যবেক্ষণ করে সন্তোষজনক উত্তর পেলে মাল্লাদের কিছুক্ষণের জন্য বিরতি।

গত চব্বিশ ঘন্টা আমরা কূল থেকে বেশী দূরে যাইনি। ঘন্টা চারেক পরে পরে পালের টানা দড়িতে হাত লাগাতে হচ্ছিল। এই অবসরে আমি নানারকম জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলাম। পিলগ্রীমের চেয়ে যদিও পালদণ্ড এখানে অনেক বেশী কিন্তু সেগুলি সব বেঁধে ফেলতে আমাদের এমন কিছু

বেশী সময় লাগল না। দড়িগুলো কি করে লাগান আছে, কাঠের গুঁড়িগুলো সাজানোর ধরন ইত্যাদি নানা জিনিসের উপর নাবিকদের কাজ নির্ভরশীল। পরে আয়াকুচোর ক্যাপ্টেন যখন আমাদের জাহাজে এসেছিলেন তাঁর মুখে শুনেছি ক্যাপ্টেন ফকনের চালন নৈপুণ্যের গুণে এই জাহাজ অনেক কম লোক দিয়ে চালানো সম্ভব হয়েছে। ক্যাপ্টেন ফকন এসেই জাহাজের সব রশারশি নতুন করে সাজিয়ে ফেলেছিলেন—বাড়তি গুঁড়িগুলো সরানোতে কাজের অনেক সুবিধা হয়েছিল।

শুক্রবার, ১১ই সেপ্টেম্বর। ভোর চারটায় নীচে এলাম। দুই লীগ দূরে সান পেড্রোর বাঁক। জাহাজ হালকা পালে চলেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে শিকল টানাটানির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরক্ষণেই সকলের ডাক পড়ল। নোঙর খোলার জন্য প্রস্তুত হলাম আমরা। পাটাতানের উপর ছুটোছুটি করতে করতে এক সময় কানে এল "ঐ যে পিলগ্রীম নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে"। এক মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে দেখলাম আমার পুরোনো সঙ্গীর চেহারা। সামুদ্রিক শৈবালের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে। নোঙর ফেলার সময়ও ঠিক যাত্রা করার সময়কার নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা। সকলে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে হালকা পালের প্রান্ত দুটি মাস্তুলের উপর টেনে এনে গোটান হল, সবচেয়ে নীচের পাটাতনের পাল, তিনকোণা পাল এবং সবচেয়ে উপরের পাল নীচে আনা হল, তারপর নোঙর পড়ল। এবার সবচেয়ে উপরের পালটি ভাল করে গোটাতে হবে। নাবিকদের পক্ষে এটি মহা কৃতিত্বের কাজ। জাহাজের মান এই পাল গোটানর ধরন অনুসারে ঠিক করা হয়। পালটি যতক্ষণ না জড়িয়ে একটি মসৃণ গোলাকৃতি হচ্ছে আমাদের বার বার খুলতে হয়। সব কটি পাল এভাবে জড়িয়ে ঝোলাগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দেওয়া হল।

নোঙর পড়ার পর থেকে কর্তৃত্ব ভার চলে আসে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে মেটের হাতে। সিংহনিনাদ করে মেট মহাশয় তর্জন গর্জন আরম্ভ করলেন। তবে কাজকর্ম যে ওঁর ভালভাবে করাবার ক্ষমতা ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। পিলগ্রীমের মেট বেচারা ভদ্রলোক হলে কি হবে তার যোগ্যতার একটু অভাব ছিল। সেই তুলনায় এই জাহাজের মেট খুবই কর্মতৎপর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যদি প্রধান কর্মচারীর ততটা জোর না থাকে তবেই শৃঙ্খলা শিথিল হয়ে পড়ে এবং ক্যাপ্টেনকে পদে পদে হস্তক্ষেপ করতে হয়,

ফলে বিষম গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। কিন্তু মিঃ ব্রাউন কারো আদেশের অপেক্ষা রাখতেন না, মনে হয় সুযোগ পেলে হয়ত ক্যাপ্টেনের উপরও কর্তৃত্ব করবেন। ক্যাপ্টেন টমসন তাঁর আদেশগুলি মেটকে আড়ালে বলে দিতেন এবং নোঙর ফেলা, তোলা ও পালের দড়ি লাগানর সময় ছাড়া কখনো সামনে আসতেন না। এই রকম ব্যবস্থা হলে সকলেরই সুবিধা।

সবগুলি পাল গোটান হল। এবার মাস্তুলের সবচেয়ে উপরের দণ্ডগুলি নামাতে হবে। পাঁচজন মাল্লা মিলে আমরা সব দণ্ডগুলি নামিয়ে ফেললাম। আমাদের উপর এইভাবে কাজ করার ভার পড়েছিল। কিছু ডানদিকে কিছু বাঁদিকে করে দণ্ডগুলি রেখে দেওয়া হল। পর মুহূর্তেই কপিকল বার করে একটি নৌকা ও একটি ছিপ বার করা হল, সব বেঁধে ছেঁদে বন্দরের উপযোগী সাজসজ্জায় সাজান হল জাহাজকে। জলখাবারের পর মাল নামাবার জন্য পাটাতনের দরজা খুলে দেওয়া হল। পিলগ্রীম থেকে কাঁচা চামড়া ভর্তি করা হবে। সারাদিন ধরে নৌকা আসা আর যাওয়া, শেষে সব চামড়া বোঝাই করা শেষ হল। এই চামড়াতে আমাদের খোল তেমন কিছুই ভরল না কিন্তু পিলগ্রীম এতেই জলে প্রায় ডোবাডোবা হয়েছিল। ঠিক হল, আমাদের পরিবর্তে এখন পিলগ্রীম সানফ্রানসিস্কো অভিমুখে রওনা হবে। সময়, পরদিন সকালে। রাত্রে সব কাজের শেষে ডেক পরিষ্কার হয়ে যাবার পর আমার বন্ধু স্টিমসন আমাদের জাহাজে বেড়াতে এল। দুই ডেকের মাঝখানে আমাদের বিছানায় ঘণ্টাখানেক কাটালো ও। পিলগ্রীমের অন্য মাল্লারা আমার সৌভাগ্যে খুবই ঈর্ষান্বিত, কেননা আমি ওদের চেয়ে আগেই দেশে পেঁৗছে যাব। স্টিমসন তো যেন তেন প্রকারেণ এই জাহাজে চলে আসার জন্য বদ্ধপরিকর। যদি ক্যাপ্টেন টমসন কিছুতেই সম্মত না হন তবে কারো সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে চলে আসতেও প্রস্তুত। এলার্ট যাত্রা করার পর আরো এক বছর অপেক্ষা করা ওর আর সহ্য হচ্ছিল না। সাতটার সময় একটু আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে মেট নীচে নেমে এলেন—এসেই আমাদের ঘুম থেকে তুললেন, ছুতোর মিস্ত্রী বাজনা নিয়ে বসল। স্টুয়ার্ড গেল আলো আনতে—শুরু হল নৃত্যগীত। জায়গাটা লাফাবার পক্ষে যথেষ্ট বড়, আর বেলেপাথর ঘষা চকচকে মেঝে, কাজেই নাচের ঘর হিসাবে মন্দ হল না। পিলগ্রীমের অনেকেও

এসে যোগ দিল। আটটা ঘণ্টাধ্বনি অবধি খুব নর্তনকুর্দন চলল। কড অন্তরীপের ছেলেটি বাজনার সঙ্গে তাল দিয়ে খালিপায়ে জেলেনৃত্য আরম্ভ করল। মেট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—কেউ নাচতে আপত্তি করলে তাকে দড়ি তুলে প্রহার—দেখে সকলের হাসতে হাসতে প্রাণ যাচ্ছিল।

পূর্বেকার নির্দেশানুযায়ী পরদিন সকালে পিলগ্রীম পাল তুলে হাওয়ার অনুকূলে যাত্রা করল। আমাদের খুব কাছ দিয়ে অনায়াসে জল কেটে চলে গেল ওরা। ক্যাপ্টেন ফকন এমন অবহেলা ভরে চালাচ্ছিলেন যেন ওটি মাছ ধরা নৌকা। ক্যাপ্টেন টমসনের আমলে তোড়জোড় করতে করতেই প্রাণান্ত হত, এত সহজে কিছু হবার উপায় ছিল না। ক্যাপ্টেন ফকন দেখলাম জাহাজ চালাতে খুবই দক্ষ। একথা পিলগ্রীমের মাল্লাদের কাছেও শুনেছিলাম। মাল্লারা সাধারণতঃ ক্যাপ্টেনের দোষ ধরতেই আছে, প্রশংসা বড় একটা কবতে চায় না। সুতরাং এদের মুখে নতুন ক্যাপ্টেনের নৈপুণ্যের কথা শুনে সেটা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়েছিল। আজ স্বচক্ষে দেখে সন্দেহ ভঞ্জন হল।

এর পরে ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর অবধি আমরা সান পেড্রো ছেড়ে নড়লাম না। যথারীতি মালপত্র তোলাতুলি, চামড়া লাদাই, সব কিছুই বেশ অল্প সময়ে হয়ে যাচ্ছিল। পিলগ্রীমে সব কাজই যেন বেশী কঠিন মনে হত। যত বেশী লোক হয় মাল্লাদের ফুর্তি তত বাড়ে—পালা করে করে একদিনেই বারো জন মিলে সব চামড়া নামিয়ে ফেলতে পারত। বন্ধুভাবে এবং সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করার জন্য কোন অসুবিধা হল না। তৃতীয় মেট আমাদের সঙ্গে থাকলেও তাকে নিয়ে গণ্ডগোল কমই হত। বেশ মিলেমিশে কাজ করতাম আমরা। মনে পড়ল গতবার এই জায়গায় কি দুর্ভোগই না গেছে। জাহাজে উপরওয়ালাদের অত্যাচার, অসন্তোষ এবং চামড়া কূলে আনার কাজে মাত্র চারজন লোক। কাজ করে আনন্দ পেতে হলে বড় জাহাজের মত আর কিছু নয়। এখানে শুধু যে জায়গা বেশী তা নয়, লোক বেশী, নিয়মানুবর্তিতা আছে এবং প্রাণচাঞ্চল্যও বেশী। তা ছাড়া এই জাহাজে সব সরঞ্জাম সুদ্ধ একটি সত্যকার ডিঙি ছিল—সেটি আসলে তিমি শিকারের নৌকা। পিছনের গলুই-এ বসবার জায়গা, হালের দড়ি বাঁধার কাঠি ইত্যাদি সবই ছিল তাতে। সারেঙ

ছিল চোদ্দ বছরের একটি ছেলে, সেই ডিঙিটি পরিষ্কার রাখত। আমি ও আমার সমবয়সী আরো তিনজন ছিলাম সেই নৌকার মাঝি। প্রত্যেকের দাঁড় ও বসবার আসনে চিহ্ন দেওয়া ছিল। দাঁড়গুলি চেঁচে পরিষ্কার রাখা, দাঁড় আটকাবার গুঁজি ভিতরে রাখা ও অন্য কিছুর সঙ্গে ধাক্কা বাঁচাবার জন্য পাশে কাঠের টুকরোটি তুলে রাখা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। আমরা ক্যাপ্টেন ও দালালকে কূলে নিয়ে যেতাম। যাত্রীদের জাহাজে আনা ও পৌঁছে দেওয়ার কাজে অষ্টপ্রহর আমাদেরই লেগে থাকতে হত। ছোট ছোট বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বড় বড় ব্যবসাদার, জাহাজে যারাই আসত কারো কাছে নিজস্ব নৌকা থাকত না। সুতরাং যাত্রীবহনের কাজে আমাদের এক মুহূর্তও বিরাম হত না—এমন কি সময়ে খাওয়া পর্যন্ত হয়ে উঠত না। এক একদিন সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ মাইল দাঁড় টানা হয়ে যেত। তবু আমরা এতেই খুশী, কেন না চামড়া বওয়ার কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেছে। যাত্রীদের ছোটখাটো মোট অবশ্য বহন করতে হত, কিন্তু আমাদের কাছে সেসব কিছুই নয়। ক্যাপ্টেন সঙ্গে না থাকলে আমরা যাত্রীদের সঙ্গে অবাধে হাসিগল্প ইত্যাদি করতে করতে যেতাম। কূলে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হত আমাদের। তখন একজনকে নৌকা পাহারায় বসিয়ে আমরা স্থানীয় লোকেদের বাড়ী বেড়াতে যেতাম, নয়ত ঝিনুক কুড়িয়ে, বা বালির উপর খেলাধুলো করে সময় কাটত। ঢেউ-এর ধাক্কায় কোন সময়ই আমাদের শুকনো থাকার উপায় ছিল না কিন্তু আমরা তখন তারুণ্যের উৎসাহে টগবগ করছি—তাতে এমন কিছু বিরক্ত বোধ হত না। প্রায় অর্ধেক ক্যালিফোর্ণিয়াবাসীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের পরিচিত পোশাক দেখে লোকে আগ্রহ করে এসে আলাপ করত।

সান পেড্রোতে যাবার মত কোন জায়গাও ছিল না, জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। একটি মাত্র বাড়ী। সপ্তাহে একবার অশ্বারোহণে মাংস আনতে যাওয়া, বৈচিত্র্যের মধ্যে ছিল শুধু এই।

সান ডিয়াগো থেকে এই সময় ক্যাটালিনা এসে পৌঁছল। ঠিক হল সান্টা বারবারা অবধি ওদের সঙ্গে আমাদের গতি প্রতিযোগীতা হবে। সান্টা বারবারা সেখান থেকে আশী মাইল। আমরা রাত এগারোটায় পাল ওঠালাম। তখন কূল থেকে ধীরে ধীরে বাতাস বইছে, কিন্তু সকাল

হতে বন্ধ হয়ে গেল—আমরাও নোঙরের কয়েক মাইলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্যাটালিনা আমাদের চোখের সামনে এগিয়ে গেল। ওরা আকারে ছোট, তা ছাড়া আগে যাত্রা করার জন্য বাতাস বেশীক্ষণ পেয়েছিল। বিকেলের দিকে আবার বাতাস চলাচল আরম্ভ হতেই আমরা সমস্ত পালের দড়ি টানটান করে এগোতে লাগলাম। পাঁচ ঘন্টা বেশ যাওয়া গেল। বাতাস কমতে দেখা গেল আমরা ক্যাটালিনাকে প্রায় ধরে ফেলেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমরা ছিলাম কূলের দিকে, কাজেই সেদিক থেকে হাওয়া আগে এসে আমাদের পালে লাগল, সকলে একসঙ্গে মিলে হালকা পাল তুলে ক্যাটালিনাকে ফেলে তরতর করে এগিয়ে গেলাম। ভোর হবার সময় আমরা সান্টা বুয়েনাভেন্টুরাতে পৌঁছেছি, ক্যাটালিনার চিহ্নমাত্রও নেই। অন্তরীপের কাছে আমাদের আর একবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল, এমন সময় ক্যাটালিনা আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। এই ভাবে আগুপিছু করতে করতে প্রতিযোগিতা চলল। তৃতীয় দিন সান্টা বারবারার উপসাগরে আমরা ওদের থেকে দু ঘন্টা পরে পৌঁছলাম, আমাদেরই হার হল। তবে একথা ওরা স্বীকার না করে পারল না যে অনুকূল হাওয়াতে আমরা বেশ বেগে চলতে পারি, তবে আকারে বৃহৎ হওয়ার জন্য হালকা হাওয়াতে তেমন সুবিধা হয় না।

রবিবার, ৪ঠা অক্টোবর। আমরা বন্দরে পৌঁছলাম। আমাদের ক্যাপ্টেন সব সময় বন্দরে প্রবেশ করা ও বন্দর ছাড়া এই দুটি কাজই করতেন রবিবার। অনেকে মনে করেন রবিবার শুভদিন বলেই বুঝি এমন করা হয়। কিন্তু আসল কথা তা নয়। সেদিন ছুটির দিন, মাল্লাদের মাল তোলাতুলির কাজ বন্ধ, সুতরাং এই দিন ওদের খাটিয়ে নিতে পারলে মালিকদেরই লাভ। এইভাবে আমাদের কত যে রবিবার নষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাথলিকরা সাধারণতঃ রবিবার কোন কাজকর্ম বা ব্যবসা বাণিজ্য করে না কিন্তু মার্কিনদের কোন জাতীয় ধর্ম বলে কিছু নেই—তারা যে ধর্মের ধার ধারে না সেটা বোঝাবার জন্যই রবিবারের প্রতি এই ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা।

পাঁচ মাস আগে সান্টা বারবারাকে যেমন দেখেছিলাম আবার সেই একই দৃশ্য। সেই দিগন্তবিস্তৃত বালিয়াড়ি, অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ, পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহর। উজ্জ্বল আকাশে প্রতিদিন সূর্যোদয় হত, লাল টালির বাড়ী-গুলির উপর রোদ ঝিকমিক করত, কিন্তু বাসিন্দারা সে বিষয়ে অবহিত

বলে মনে হত না। চারিদিকে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা। জাহাজেও তেমন লোক সমাগম হত না। আমরা প্রায় এক শ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করলাম। ক্যাপ্টেন সন্ধ্যাটা কাটাতেন শহরে, আমরা রাত্রিবেলা নৌকা নিয়ে ওঁকে আনতে যেতাম। বালির উপর কাঠকুটো জড় করে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালা হত। ক্যাপ্টেনের ফিরতে বেশী দেরী হলে আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে বেরোতাম, কখনো কারো বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হতাম। আতিথ্যের অবশ্য অভাব হত না। তারপর ক্যাপ্টেন ফিরতেন, আমরাও ঢেউয়ে ভিজে জাহাজে পৌঁছতাম। জামাকাপড় ছেড়ে শুতাম বটে, কিন্তু রাত্রে আবার উঠতে হত পাহারার জন্য।

ন মাস ধরে রাত্রের পাহারায় যে আমার সঙ্গী ছিল তার কথা এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লোকটির নাম টম হ্যারিস, এমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন লোক আমি কমই দেখেছি। প্রতিদিন রাত্রে একঘণ্টা তার সঙ্গে জাহাজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পায়চারি করতে করতে এতরকম জ্ঞান আহরণ করেছি যা বই পড়ে বা অন্য কোথাও থেকে জানা প্রায় অসম্ভব। শুধু ওর ব্যক্তিগত জীবন নয়, দেশ বিদেশের কথা, তাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, নাবিকজীবনের কত রকম আপদ বিপদ, জাহাজ চালনকৌশলের খুঁটিনাটি লোকটি অনর্গল বলে যেতে পারত। বাল্যকাল থেকে আজ অবধি ওর জীবনে যা কিছু দেখেছে, শিখেছে, করেছে যথাযথ পারম্পর্য রেখে বলে যেতে পারত ও, কোথাও এতটুকু স্মৃতিভ্রংশ হত না। গুণতে ও মানসাঙ্ক করতেও খুব দক্ষ ছিল ও। আমি যদিও অনেকদূর অঙ্ক শিখেছি আর ও প্রাথমিক গণিত ছাড়া কিছুই শেখেনি, তবু ওর কাছে আমাকে মাঝে মাঝে হার স্বীকার করতে হয়েছে। জাহাজের অবস্থান, গতি ইত্যাদি একেবারে ওর নখদর্পণে তো ছিলই, উপরন্তু জাহাজের খোলে মাল কোথায় কেমন ভাবে কত ধরে এ সম্বন্ধেও ওর ধারণা ছিল অতি পরিষ্কার।

যে কোন জাহাজের বিভিন্ন অংশের আয়তন, ক্ষেত্রফল ইত্যাদি জেনে নিতে ওর বেশীদিন লাগত না। একদিন রাত্রে ও চামড়ার টুকরোগুলির ঘনত্ব ও সেই সঙ্গে জাহাজের খোলের সামনের দিকে জায়গাটির আয়তনের হিসাব মুখে মুখে করে বলে দিল ওখানে কটি টুকরো ধরতে পারে। পরে ওর

গণনার খুব কাছাকাছি সংখ্যায় চামড়া রাখা গিয়েছিল, সকলেই তাতে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। মেট অনেক সময় পরামর্শ নিতে ওর কাছে আসতেন। কোন পালে কতটা কাপড় দরকার, প্রত্যেকটি পালের বিস্তার, মাস্তুলের উচ্চতা ইত্যাদি সব কিছু ছিল ওর কণ্ঠস্থ। জাহাজের গতি ও গতিপথ সম্বন্ধেও ও সমস্তক্ষণ মনে মনে হিসাব রাখত, অনেক সময় ক্যাপ্টেনের চেয়ে আগেই ও জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করে দিত। ওর কাছে কয়েকটি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বই ছিল, যেগুলি পড়তে খুবই ভালবাসত ও। একবার পড়া জিনিস ও কখনো ভুলত না। ফালকনারের 'জাহাজ-ডুবি' নামক কবিতাটি ও প্রায় অনর্গল মুখস্থ বলতে পারত, কবিতাটি বড় প্রিয় ছিল ওর। ও নাকি আজ অবধি যত লোকের সঙ্গে কাজ করেছে তাদের নাম, জাহাজের নাম, যাত্রা করার তারিখ, ক্যাপ্টেন ও অন্য কর্মচারীদের নামধাম প্রভৃতি কিছুই ভোলে নি। হ্যারিসের কোন কথা কেউ অবিশ্বাস করতে ভরসা পেত না। সত্য মিথ্যা যা নিয়েই হোক না কেন ওর তর্ক করার ক্ষমতাও ছিল আশ্চর্য। তর্কে ওর সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না। কোন বিষয়ে ওর জ্ঞান যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন ও সেই নিয়ে অনায়াসে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারত এবং সেই আলোচনায় ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হবার মত। আমি বহুবার ওর সঙ্গে তর্ক করেছি, যে সব বিষয়ে আমার জ্ঞান ওর চেয়ে বেশী তাতেও ওর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়েছে। লোকটির অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা আগেই বলেছি। কাজেই অসাবধান মন্তব্য করে ওর কাছে পার পাবার উপায় ছিল না। উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পেলে এ জীবনে কতই না উন্নতি করতে পারত—সে কথা প্রায়ই আমার মনে হত। হ্যারিসের অবশ্য শিক্ষিত লোকেদের প্রতি খুব সম্ভ্রম ছিল, যে জন্য ও আমাকে খুবই খাতির করে চলত, তার খানিকটা অহেতুক। তবে ক্যাপ্টেন থেকে আরম্ভ করে অন্য সমস্ত মাল্লাদের জ্ঞানবুদ্ধির প্রতি ওর অবহেলার সীমা ছিল না। সত্যি সত্যিই ওর মত ভাল নাবিক জাহাজে আর এক জনও ছিল না। অন্য মাল্লারা ওর সঙ্গে সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলত। কাউকে হ্যারিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে দেখলে তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলত ভাল চাও তো এই বেলা থাম। হ্যারিসের বাক্যবাণ কাকে বলে জান না কি?

মাঝে পড়ে একবার শস্য আইন সম্বন্ধে ও আমার কাছে জানতে চায়। এই বিষয়ে আমার স্বল্প জ্ঞান ছিল। তবু যতটুকু জানতাম ওকে বোঝালাম। আমার বক্তব্য শেষ হতেই ও নিজের মতামত দিতে আরম্ভ করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে বুঝিয়ে দিল যে ওর কাছে ঐ বিষয়ে আমার অনেক কিছুই শেখার আছে। আমি আমার অজ্ঞতা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। শুনলাম এই সম্বন্ধে ও লিভারপুলে একটি পুস্তিকা পড়ে তাতে কিছু তথ্য দেওয়া ছিল। ঐ বইটি পড়ে এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির সূত্রের উপর ভিত্তি করে ওর যা ধারণা হয়েছিল তার বেশী ও আর কিছু পড়েনি বা শোনেনি। যদিও সেটা বহুদিন আগের কথা কিন্তু বিষয়টা ওর মনের মধ্যে তখনো উজ্জ্বল এবং এই সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করে জ্ঞানবৃদ্ধি করার ইচ্ছা ওর বহুদিন থেকে ছিল। এতদিন সে সুযোগ ঘটেনি। বাষ্পচালিত জাহাজের চালন পদ্ধতি সম্বন্ধেও ও বেশ অবহিত, একটি বাষ্পীয় জাহাজে কয়েক মাস কাজ করার ফলে ঐ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও সংগ্রহ করে ফেলেছিল। নভোমণ্ডলের তারা থেকে আরম্ভ করে দিকদর্শন যন্ত্র ও সময় মাপক যন্ত্র কোনটিই ওর জানতে বাকী ছিল না। শুনেছি একটি মাত্র আলকাতরার বালতির সাহায্যে ও সূর্যের মধ্যরেখা বার করে ফেলতে পারত। যার এত গুণ সে কেন চল্লিশ বছর বয়সে সামান্য বারো ডলার বেতনের মাল্লাগিরিতে নিজেকে ক্ষয় করছিল সেটা খুবই আশ্চর্য। কিন্তু এ সবই ওর নিজের দোষে ঘটেছে, সেসব কথা ও আমাকে বলেছিল।

হ্যারিসের দেশ ইংলণ্ড। জন্ম ডিভনশায়ারের ইফরাকোম্ব নামক স্থান। ওর বাবা ছিলেন একটি বাণিজ্য জাহাজের অধ্যক্ষ। অল্পবয়সে মারা যান। হ্যারিসের মা চেষ্টা চরিত্র করে ওকে স্কুলে পাঠান। শীতকালে স্কুল ও গ্রীষ্মকালে ব্যবসা এই করে কাটত। শেষে সতেরো বছর বয়সে দেশ ছাড়ল হ্যারিস। ওর মা সম্বন্ধে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করে কথা বলত ও। একমাত্র মায়ের চেষ্টাতেই নাকি অন্য ভায়েরা মানুষ হয়েছে। নিজের দুরবস্থার জন্য ও কখনো নিজের একগুঁয়েমী ছাড়া অন্য কাউকে দোষ দেয়নি। ওর মা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। ওঁর শাসন ছিল খুব কড়া। ছেলে বেলায় খাবার খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি অন্য মায়েদের মত ওকে ছেড়ে না দিয়ে জোর করে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত খাবার খাওয়াতেন। হ্যারিস বলত ওর মা বেঁচে আছেন কিনা তাও ওর জানা নেই। কিন্তু ওর ইচ্ছা

এইবার সমুদ্রযাত্রা শেষ হলে মাইনেপত্র যা পাবে গিয়ে মাকে দিয়ে আসবে।

বাড়ী ছেড়ে প্রায় কুড়ি বছর দেশে দেশে জলযাত্রা করে বেড়িয়েছে হ্যারিস। নিউ ইয়র্ক ও বস্টন থেকে যাত্রা আরম্ভ হত। এই কুড়ি বছরে এমন পাপ কাজ নেই যা ও করেনি, একজন নাবিকের পক্ষে যত রকম কুপথে যাওয়া সম্ভব তার আদ্যোপান্ত ওর জানা হয়ে গেছে। কতবার দারুণ অসুস্থ হয়ে ওকে হাঁসপাতালে যেতে হয়েছে কিন্তু ওর এমনই মনের জোর যে প্রতিবারই ভাল হয়ে ফিরে এসেছে। কয়েকবার মেট পদে উন্নীত হয়েও আবার পদচ্যুতি ঘটেছে—প্রবৃত্তির সংযম করতে ও শেখেনি। বিশেষতঃ মদ ছিল ওর জীবনের অভিশাপ। বন্দরে একবার নামলেই হল, হ্যারিস পাপের পঙ্কে সম্পূর্ণ না ডুবে ফিরত না। সুতরাং কুড়ি বছর কাজ করার পরেও ওর এই দীনহীন অবস্থা। হ্যারিস প্রায়ই আমাকে দুঃখ করে সেকথা বলত। "সারা জীবনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম—আর তার বদলে কি পেলাম, তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা।" বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিসের মনে অনুশোচনা হল, বুঝল এভাবে চললে হবে না। বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দরকার। একবার হাভানাতে এক নতুন মাল্লাকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় জাহাজে তুলে আনা হয়, তার সমস্ত টাকাকড়ি, জামাকাপড় লুণ্ঠিত, ক্ষতবিক্ষত চেহারা। এই জাতীয় দৃশ্য হ্যারিসের কাছে নতুন নয়। কিন্তু সেদিন এই দেখে ও প্রতিজ্ঞা করল আর নয়, জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না। কেবলমাত্র মনের জোরে ও আজ অবধি ওর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি। একবার ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে আর নড়চড় হবার উপায় নেই। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার তিন বছর আগে হ্যারিস এই ভয়ঙ্কর শপথ গ্রহণ করে। আমি কখনো ওকে চা ও সাইডার ছাড়া অন্য কিছু পান করতে দেখিনি। মাল্লারা জানত ওকে ওর প্রতিজ্ঞা থেকে টলানো আর পাহাড়কে স্থানচ্যুত করা একই কথা। এখন ও যে কোন উচ্চ ও যোগ্যতা সম্পন্ন কাজ করার উপযুক্ত।

জাহাজ চালানোর কার্যকারণ, কোন দড়ির কি কাজ, বিপদে আপদে কি কর্তব্য ইত্যাদি সব রকম খবর আমি ওর কাছ থেকে পেতাম। এই সব মূল্যবান সংবাদের জন্য আমি ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ওর কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় কত রকম ঘটনা ঘটেছে, কত ক্যাপ্টেনের অত্যাচারে অস্থির

হয়ে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছে, মেটদের অজ্ঞতা, অসুস্থ লোকদের প্রতি নির্মম অবহেলা, মাল্লাদের উপর অন্যায় অত্যাচার—কিছু আর ওর জানতে বাকি ছিল না, কেননা ও নিজেও ছিল ভুক্তভোগী। এইসব ভীষণ অভিজ্ঞতার কথা অন্য কারো কাছে শুনলে হয়ত বিশ্বাস হত না কিন্তু হ্যারিস বাজে কথা বলার লোক নয়, সেটুকু আমার ভাল করেই জানা ছিল। ওর কাছে একজন ক্যাপ্টেনের গল্প শুনি, তিনি মাল্লাদের কোন জিনিস হাতে করে দিতেন না, ডেকের উপর রেখে লাথি মেরে দিতেন। আর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন পরোক্ষে একটি বস্টনের ছেলের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী। তাকে অসুস্থ শরীরে সুমাত্রায় এমন খাটিয়ে ছিলেন ও বন্ধ গুদামের মধ্যে ঘুমোতে দেন যে বেচারা মারা যায়। পরে অবশ্য ঐ একই অসুখে ক্যাপ্টেন নিজেও মারা যান।

শুধু নৌবিদ্যার খুঁটিনাটি নয় মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধেও এক নতুন দিক খুলে ধরেছিল হ্যারিস। ওর সঙ্গে আলোচনা করে আমি যে বিরল জ্ঞান লাভ করেছি তা সভ্য সমাজে শিক্ষিত পরিবেশে কখনো পাওয়ার সুযোগ হত না এটা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি।

॥ ২৪ ॥ আবার সানডিয়াগো ॥

রবিবার, ১১ই অক্টোবর। সকালে যাত্রা করে সান পেড্রো পার হয়ে সোজা সান ডিয়াগো অভিমুখে চলতে লাগলাম। সান পেড্রোতে যে নোঙর ফেলতে হল না এতেই আমরা সন্তুষ্ট।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই অক্টোবর। আজ সান ডিয়াগোতে আগমন। বাতাসের দিক থেকে আসা ইতালীয় জাহাজ রোসাও এখানে নোঙর ফেলেছে। তাদের কাছে পিলগ্রীমের সমাচার পাওয়া গেল। সমাচার ভাল। পিলগ্রীম এখন সানফ্রানসিস্কোয়। আমরা যথারীতি চামড়া ও চর্বি গুদাম ঘরে নামিয়ে দিলাম। দেখলাম আমার সহকর্মীরা ঠিক আগের মতই ধীর গতি জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার কানাকা বন্ধুরা আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হল, তবে আমার সাধের কুকুর ব্রাভো মারা গেছে শুনে বড় দুঃখ হল। শুনলাম আমি যেদিন এলার্টে যাত্রা করি সেদিনই ও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ও মারা যায়।

তখন শরৎকালের শেষ। দক্ষিণে ঝড় আরম্ভ হতে আর দেরী নেই। আমরা যথারীতি একটি রবিবার দেখে রওনা হলাম। হাওয়ার গতিক তেমন সুবিধার নয়। সান জুয়ান অবধি আমরা উপরের পাল গুটিয়ে এলাম—কূল থেকে তিন মাইল দূরে আবার আগের মত নোঙর ফেলা হল, ঝড় উঠলেই যাতে নোঙর তুলে ভেসে পড়া যায়। পথে এক বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গী হলেন, তিনি বিবাহাদি করে ক্যালিফোর্ণিয়াতেই বসবাস করছেন। পনেরো বছর জলে পা দেননি। জাহাজের নানা রকম পরিবর্তন দেখে তিনি খুবই বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। আমরা উপরের বড় পাল তুলেছি দেখে মন্তব্য করলেন ওঁদের সময়ে এই অবস্থায় পাল গুটিয়ে ফেলা হত। যাই হোক বাতাসের দিকে আমাদের গতিবেগ দেখে উনি বেশ প্রশংসা করে বললেন যেন নোঙরে বাঁধা ছোট দড়ি দিয়ে কেউ জাহাজ ঘোরাচ্ছে।

মঙ্গলবার, ২০শে অক্টোবর। আমাদের দালাল মঠের দিকে যাত্রা করলেন, যাতে পরদিন সকাল হতেই কাঁচা চামড়া চালান আসতে থাকে। সেদিন রাত্রে কালো মেঘ আকাশ ঘিরে এল, ঝড়ের আশঙ্কায় আমরা সতর্ক রইলাম। রাতটা নির্বিঘ্নে কাটল। সকালে ডিঙিগুলি নামিয়ে আমরা চামড়া সংগ্রহ করে আনতে চললাম। আবার সেই দীর্ঘ উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম জায়গা। নীচে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত কল্লোল, একটিমাত্র সরু পথ এঁকেবেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। পাহাড়ের শীর্ষে চামড়াগুলি এনে জমা করা। ক্যাপ্টেন আমাকে সেগুলি গুণে গুণে নীচে ফেলার কাজ দিয়ে উপরে পাঠালেন। ছয় মাস আগের মত আবার সেই পাহাড়ের মাথা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে জিনিস ফেলা, নীচে লোকেদের দেখাচ্ছে ছোট ছোট, চামড়াগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় করে ওরা নৌকায় তুলছে। দু তিনটি নৌকা বোঝাই হয়ে জাহাজের দিকে চলে গেল। শেষ নৌকাটিও ছাড়তে আর দেরী নেই এমন সময় কিছু চামড়া পাহাড়ের মাঝপথে ফোকরে আটকে গিয়ে একটু বিপদ উপস্থিত করল। উপর থেকে ঐ গুহাগুলি দেখাও যায় না, কিন্তু বস্টনে চামড়ার দাম পাউণ্ড প্রতি সাড়ে বারো সেন্ট, এবং ক্যাপ্টেন তার থেকে শতকরা এক ভাগ বখরা পান, সুতরাং ঐ কটি চামড়ার মায়া কি করে ত্যাগ করা যায়। জাহাজ থেকে এক জোড়া খুব লম্বা পালদণ্ড নামাবার দড়ি আনানো হল। ক্যাপ্টেন

বললেন ঐগুলির সাহায্যে কাউকে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে নামতে হবে। বয়স্ক মাল্লারা বললে এর জন্য চাই হালকা শরীর—কম বয়সীরা যাক। কম বয়সী মাল্লারা বললে এ কাজে অভিজ্ঞতা চাই, বরং বয়স্করাই যাবার চেষ্টা করুক। আমি দেখলাম আমার বয়সটা এদের মাঝামাঝি, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপরে উঠলাম। দড়ি ধরার জন্য একজন সঙ্গে থাকল।

একটা খুঁটি পাহাড়ের উপর বেশ শক্ত করে পোঁতা হল, যাতে আমার ভার নিতে পারে—তারপর তার থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। দড়ির প্রান্তভাগটি বালিয়াড়ি থেকে একটু উপরে ঝুলে থাকল, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নামা অসম্ভব নয়। আমার পরনে শার্ট, প্যান্ট ও টুপি, গরম কালের পোশাক, কাজেই জামা কাপড় ছাড়ার আর হাঙ্গামা না করে দুহাতে দড়ি ধরে নামতে লাগলাম; কখনো এক পা ও এক হাত পাথরের গায়ে রাখি, কখনো হাত পা দুই-ই দিয়ে দড়িটি শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। ক্রমে সেই গুহার মুখে পৌঁছলাম, যেখানে চামড়ার খণ্ডগুলো আটকে গিয়েছিল। এক হাতে দড়িটি চেপে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে ঢুকলাম, পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চামড়াগুলি ফেলে দিলাম। তারপর আবার নামতে লাগলাম। এক জায়গায় পাথরের দেওয়াল একেবারে সমুদ্রের উপর ঝুঁকে পড়েছে। নীচের দিকে চেয়ে কেবল পাথরের গায়ে ঢেউ আছড়ানো ছাড়া আর কিছু দেখলাম না। মাঝপথ দিয়ে কয়েকটি শঙ্খচিল উড়ে গেল। ধূলিধূসরিত অবস্থায় যখন নীচে এসে পৌঁছলাম তখন যে অপূর্ব সম্ভাষণ শুনতে হল তা হল এই "মাত্র কটা চামড়ার জন্য জীবনটা দিতে বসেছিলি, এমন বোকাও বটে তুই।"

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্রের দিক থেকে বিরাট কালো মেঘের রাশি ধেয়ে আসছে, সমুদ্রের জল উঠেছে উচ্ছ্বসিত হয়ে—ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। ক্যাপ্টেন যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করে আমাদের জাহাজে পৌঁছতে আদেশ করলেন। প্রায় গলা অবধি জল ভেঙ্গে চামড়ার রাশ নৌকায় বোঝাই করা হল। যত নৌকা এগোয় ঢেউ তত উত্তাল হয়ে ওঠে, নৌকা থেকে থেকে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠছিল, ডিঙিটি যে কোন মুহূর্তে ডুবে যাবার আশঙ্কা। কোনমতে তো তিন মাইল পথ পেরিয়ে জাহাজের কাছে আসা গেল। তারপর ঐ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মাল তোলা আর এক প্রাণান্তকর সমস্যা! নৌকায় দাঁড়াই তার সাধ্য কি—এমন দোলানি।

এই একবার উপরে উঠছে, পরক্ষণেই নীচে পড়ছে। বহু কষ্ট করে সব মাল জাহাজে তোলা হল। নৌকা ও ডিঙিগুলিও তুলে আটকান হল। নোঙর তোলার কাজও বেশ কঠিন, বিশেষত ঐ ঝড়ের সমুদ্রে। জাহাজের গলুই একবার ওঠে একবার নামে, কাছির গর্তের মধ্য দিয়ে জল ঢুকতে লাগল হু হু করে—শিকল আছড়াতে লাগল যেন ভার তোলার যন্ত্রটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মেট চিৎকার করে বলতে লাগল "বেঁধে জোয়ান হেঁইও, শিকল টানো হেঁইও, জোরসে জোয়ান হেঁইও, পাল উঠাও হেঁইও, হাথ লগাও হেঁইও"। মুহূর্তের মধ্যে গোটান পালটি খুলে উপরে উঠে গেল, "হাথ লগাও হেঁইও", ঝড় এসে গেছে। জাহাজ প্রায় নোঙর ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল, আমরা কোনমতে নোঙরটি বন্ধনের কাছে এনে তুললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ পাথুরে উপকূল ছেড়ে আমরা ঝড়ের সমুদ্রে সবলে পালের দড়ি টেনে চললাম, কিন্তু গতিপথ ঠিক রাখার সাধ্য কি—যা বাতাসের বেগ। মাঝখানের বিরাট পালটি নামাতে আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। আমরা কুড়িজনে মিলে পালের কোণবাঁধা দড়িটি খুলে কপিকলে বাঁধলাম। বিরাট পালটি সমান্তরাল ভাবে ফুলে উঠল, কিন্তু যন্ত্রের টান, আর আমাদের কুড়িজোড়া সবল হাতের কাছে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেমে আসতে বাধ্য হল। মাস্তুলের সঙ্গে লাগান দড়ি প্রচণ্ড জোরে টানতে লাগল মাল্লারা—জাহাজ মত্ত অশ্বের মত ছুটে চলল। গলুই থেকে চতুর্দিক ফেনায় ফেনা। কত দূর পর্যন্ত সেই ফেনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আধ ঘণ্টা পরে গোটান পালে জাহাজ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে যেতে লাগল। এবার আমরা কয়েক জন পালের কোণের দড়ি গুটিয়ে আরো কয়েকটি পাল নামাতে গেলাম। আমি সানন্দে গলা ছেড়ে ডাক দিয়ে দড়িতে হাত লাগালাম। এরপর থেকে আমরা বস্টনে পৌঁছান অবধি মেট আমাকে ও একটি ইংরাজ যুবক ছাড়া আর কাউকে উপরের মাঝখানকার পালে কাজ করতে পাঠাত না।

সমুদ্রের বেশ মাঝখানে চলে আসার পর কয়েকটি পাল তুলে আমরা সান পেড্রো অভিমুখে চললাম। সমস্ত রাত বৃষ্টি ও ঝড়ের বিরাম নেই। সকালে সব শান্ত।

বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর। আবার সান পেড্রোতে সেই কূল থেকে দূরে দমকা হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নোঙর ফেলা।

দশদিন খালি পায়ে সেই পাথুরে জমির উপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি, চামড়া বয়ে আনা, আবার জলে ভেজা।

তিনদিন পরে সান জুয়ান থেকে রোজার আগমন। মাল্লাদের কাছে শুনলাম ঝড়ের পর ওখানকার জল এখন পুকুরের মত শান্ত। আমাদের যে সব চামড়া ওখান থেকে সংগ্রহ করার কথা ছিল সেগুলি ওরা ওদের জাহাজে তুলে নিয়েছিল—প্রায় হাজার খানেক টুকরো, ঝড়ের জন্য আমাদের এই ক্ষতি। এই শুনে আমরা যে মনঃক্ষুণ্ণ হলাম সে কথা বলাই বাহুল্য, কেন না আমাদের চল্লিশ হাজার টুকরো যত শীঘ্র ভরবে তত শীঘ্র আমরা দেশে ফিরতে পারব। এরকম অবস্থায় একটি ইতালীয় জাহাজের আমাদের প্রাপ্য মাল নিয়ে নেওয়াটা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।

এখানে একজন নতুন সঙ্গীলাভ হল, ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক ইংরাজ যুবক—নাম জর্জ মার্শ। নাবিকের কাজ ভালমত জানা ছাড়াও তার গান গাইবার গলা ভাল, উপরন্তু বেশ শিক্ষিত, আমার তাতে বেশ সুবিধাই হল। খুব ছোটবেলা থেকেই ও নাকি এই বৃত্তিতে আছে; জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের উপকূলে চোরাই মাল চালানের ব্যবসা করেছে। তার ফরাসী ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান নাকি ঐভাবেই অর্জিত। কিন্তু একজন চোরাই ব্যবসাদারের পক্ষে ওর ইংরাজী হাতের লেখা, ভাষা ও সাহিত্য-জ্ঞান খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ইংলণ্ডের নানা আইনকানুন সম্বন্ধেও ওর জ্ঞান ছিল দেখতাম। জর্জ অবশ্য ওর লেখাপড়া শেখার কথাটা গোপন রাখতে চাইত, কিন্তু পরে ওর পরিচিত একজনের কাছে শুনেছি জর্জ নাকি কিছুদিন কলেজে পড়াশোনা করেছে। মনে হয় সেটা নৌবিদ্যার কলেজ, কেন না ও ল্যাটিন বা গ্রীক জানত না। তবে অঙ্কশাস্ত্র ও ফরাসী ভাষা ও ওখানেই শেখে। হ্যারিস যেমন কোনদিন স্কুল কলেজের চৌকাঠ মাড়ায়নি, যা শেখবার নিজেই শিখেছে—জর্জ তার একেবারে বিপরীত। ওর আচার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গীতে মনে হত ও বেশ ভদ্র বংশের ছেলে, আত্মসম্মান জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট প্রখর। এতদিন মাল্লাদের কষ্টের জীবন কাটিয়েও সে সব বোধ ওর এতটুকু নষ্ট হয়নি। ওর গত অভিজ্ঞতার কথা যা আমাদের কাছে বলত তার মধ্যে এতটুকুও অতিরঞ্জন ছিল না, কেন না পরে অন্যের কাছে ঐ সব ঘটনা শুনেছি।

যতদূর মনে পড়ে ও ১৮৩৩ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে 'লাসকর' নামক জাহাজে ক্যান্টন যাত্রা করে। জাহাজটি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিক্রি হয়ে যায়। ও ম্যানিলা থেকে একটি ছোট দুমাস্তুল ওয়ালা জাহাজে বেরিয়ে পড়ে। জাহাজটি লাড্রোন ও পেলু দ্বীপে ব্যবসা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রবাল প্রাকারে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবি হয়, অসভ্যরা ওদের আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন, একটি বালক ও জর্জ ছাড়া প্রত্যেকে মারা যায়। এদের বন্দী করে ডোঙায় চড়িয়ে একটি দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যে পালাবার একটা সুযোগ উপস্থিত হল। আমার সব ঘটনা ঠিক মনে নেই। তবে কোন কারণে মাত্র একজনেরই পালান সম্ভব ছিল। ওরা ক্যাপ্টেনের পালাবার ব্যবস্থা করে দিল। ক্যাপ্টেন আশ্বাস দিলেন ফিরে গিয়ে ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উনি ম্যানিলা ও সেখান থেকে পরে আমেরিকা চলে যাবার পরেও ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করলেন না। ছোট ছেলেটি ইতোমধ্যে মারা গিয়েছিল। অসভ্যরা জর্জকে একলা দেখে ওর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। ওরা জর্জের সারা দেহে উলকি এঁকে ওকে তিনটি স্ত্রী উপহার দেয়। এইভাবে ঐ অসভ্য দ্বীপে জর্জের এক বছর কাটে। সেখানকার জলবায়ু ভাল, খাবারও অভাব নেই, কিন্তু জর্জের ভাল লাগত না। ও কেবল উপকূলে ঘুরে বেড়াত, যদি কোন জাহাজের পাল নজরে পড়ে এই আশায়। একদিন জর্জ এক স্থানীয় লোকের সঙ্গে ডিঙ্গি করে মাছ ধরতে গেছে এমন সময় প্রায় দেড় লীগ দূরে একটি জাহাজের পাল দেখা গেল। জাহাজটি পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। তামাক ও মদের লোভ দেখিয়ে জর্জ তার সঙ্গীকে বহুকষ্টে জাহাজ অবধি যেতে রাজী করাল। মার্কিন ব্যবসাদারদের কৃপায় ঐ দুটি জিনিসের স্বাদ পেয়েছিল অসভ্য জাতিরা। যাই হোক ওরা জাহাজের দিকে দাঁড় বেয়ে চলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ওদের তুলে নিল। জর্জের সারা দেহে উলকি, অর্ধউলঙ্গ চেহারা, একেবারে অসভ্য লোকেদের মত আকৃতি—তবে ও যখন কথা বলতে আরম্ভ করল তখন সকলের আসল ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না। ক্যাপ্টেন জর্জকে পোশাক পরিচ্ছদ দিতেই ও পরিচ্ছন্ন হয়ে আবার সভ্যবেশ ধারণ করল। জর্জের সঙ্গী এই সব দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব। তাকে একটি ছুরি, কিছু তামাক ও সুতী কাপড় উপহার দিয়ে দ্বীপে

ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল। জাহাজটি নিউ ইয়র্ক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ম্যানিলা যাচ্ছিল, নাম ক্যাবট। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম লো। ক্যাপ্টেন লো জর্জকে সঙ্গে নিলেন। ম্যানিলা পৌঁছন অবধি জর্জ জাহাজে কাজ করল। ওখান থেকে অন্য একটি জাহাজে করে গেল স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ। সেখান থেকে ক্লিমেন্টাইন নামক ইংরাজ জাহাজে করে মণ্টারি অবধি আসে। ঐ জাহাজে জর্জ দ্বিতীয় কর্মচারী হিসাবে কাজ করে, কিন্তু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে শেষ অবধি জাহাজ ছেড়ে দেয়। পরে সান পেড্রোর উপকূলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এর ছ মাস পরে বস্টন থেকে পাঠান কাগজপত্রের সঙ্গে একটি চিঠি দেখি, সেটি ক্যাপ্টেন লো নিউ ইয়র্কে ফিরে প্রকাশ করেন। জর্জের সম্বন্ধে সব সমাচার এই চিঠিতে ছিল। ক্যাপ্টেন লো লেখেন তিনি জর্জকে ম্যানিলায় নামিয়ে দেন, সেখান থেকে ওর ওয়াহু যাবার কথা ছিল, এর বেশী তিনি আর কিছুই জানেন না।

পেলু দ্বীপের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে জর্জ একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিল। ওর মুক্তার মত সুন্দর হস্তাক্ষরে ও সুন্দর ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটি। *

* ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বস্টনে আমার ঘরে এক নাবিক দেখা করতে আসে। আমার বইটিতে আর এক পরিচিত ব্যক্তির কথা পড়ে সেকথা আমাকে জানাতে এসেছিল সে। লোকটি মেরী ফ্রেজার নামক জাহাজের দ্বিতীয় মেট, ক্যাবটের সঙ্গে ওরা একসঙ্গে বাটাভিয়া থেকে যাত্রা করে ম্যানিলার দিকে। পেলু দ্বীপের কাছাকাছি এসে এক নৌকায় দুটি অসভ্য লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ওরা শোনে তাদের মধ্যে একজন নাকি শ্বেতাঙ্গ, তাকে ক্যাবট তুলে নিয়েছে। ম্যানিলাতে এরা পৌঁছবার আগেই ক্যাবট সেখানে পৌঁছে যায়। জর্জ বার কয়েক ওদের জাহাজে এসেও ছিল। জর্জের মুখে ওর অতীত জীবনের গল্প শুনেছে ওরা। লোকটি বললে যে জাহাজে ধাক্কা লাগায় জর্জ অসভ্যদের হাতে গিয়ে পড়ে সেই জাহাজের নাম ছিল ড্যাশ।

এই লোকটির নাম বোচাম্প। ওদের জাহাজ খৃষ্টীয় সাধুদের নিয়ে ওয়াহু যায়। বোচাম্প পরে দীক্ষা নিয়ে ওয়াহুর মঠে যোগদান করে।

॥ ২৫ ॥ যুদ্ধের গুজব ॥

রবিবার, ১লা নভেম্বর। আবার এক রবিবারে যাত্রা। সান্টা বারবারায় পৌঁছলাম ৩ই। সান্টা বুয়েনাভেন্টুরা পার হয়ে নোঙর ফেলার সময় দেখা গেল দুটি জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। একটি ছোট, বিশেষ কোন জাহাজের চিহ্নবিশিষ্ট নয়, অন্যটি যাবতীয় সরঞ্জাম সুদ্ধ বেশ বড় আয়তনের, অনেকে মনে করল পিলগ্রীম। কিন্তু পিলগ্রীম দেখে আমার না চেনার কথা নয়, কাছে আসতে দেখা গেল আমার কথাই ঠিক। জাহাজটি পিলগ্রীম নয়। আরো কাছে আসতে জাহাজের লম্বা সরু আগা গলুই ও একটু হেলান মাস্তুল দেখে অনেকের সন্দেহ হল যুদ্ধজাহাজ বলে। আমি কিন্তু ঠিকই অনুমান করেছিলাম। শেষে জাহাজের সাদার মধ্যে রক্তবর্ণের কিনারায় ক্রস্ অঙ্কিত সেন্ট জর্জের নিশান দেখে বোঝা গেল ঐটি আয়াকুচো। খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা পাশে এসে নোঙর ফেললাম। নয় মাস আগে আমরা যখন পিলগ্রীমের সঙ্গে সান্টা বারবারায়, সেই সময় সান ডিয়াগো থেকে বেরিয়ে ওরা ভ্যালপারাইজো, ক্যালো ও স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ হয়ে আবার ফিরে এসেছে। ক্যাপ্টেন উইলসন একটি নৌকা করে আমাদের জাহাজে এলেন, দেখতে দেখতে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। নানারকম অবাস্তব কাহিনী মাল্লাদের কানে আসতে লাগল, প্রশান্ত মহাসাগরে নাকি ভীষণ যুদ্ধ চলেছে ইত্যাদি। আয়াকুচোর এক মাল্লার মুখে শোনা গেল ওরা ক্যালোতে একটি আমেরিকান ও ফরাসী জাহাজের মধ্যে লড়াই হতে দেখে এসেছে, সেই যুদ্ধে ব্লণ্ড নামে একটি ইংরাজ জাহাজ মধ্যস্থতা করেছিল। এই শুনে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। আমাদের ধারে কাছে কোথাও কোন স্বদেশীয় যুদ্ধজাহাজ নেই। এই দীর্ঘ পথ অরক্ষিত অবস্থায় পাড়ি দিয়ে পৌঁছুতে হবে বস্টন। হয়ত বস্টনের পরিবর্তে আমাদের কপালে কোন ফরাসী জেলখানা লেখা আছে। যাই হোক সব কথা অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করার মত অনভিজ্ঞ আমরা কেউই নই। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সঠিক খবর পাওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম আমরা। খবর অবশেষে পাওয়া গেল। জালের তত্ত্বাবধায়ক কেরানীটির সাহায্যে জানা

গেল দুই দেশের মধ্যে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে মতভেদ চলেছে। যুদ্ধের আশঙ্কা আছে এমনও অনেকে মনে করছেন, যুদ্ধের ভয়ও নাকি দেখান হয়েছে। এই শুনে আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হলাম, তবে এ সংবাদও এমন কিছু শুভ নয়। যাই হোক, নাবিকদের যেমন বেপরোয়া স্বভাব, এই শুনে দমে যাবার পাত্রই নয় তারা। নাহয় যুদ্ধ হলই। এখন চামড়া বইতে যা পরিশ্রম ফরাসী জেলখানায় তার চেয়ে এমন কি আর বেশী পরিশ্রম হবে। বহুদিন ধরে এই রকম একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় যারা আটকে থাকেনি তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে এতে মন ও বোধশক্তিকে কত অসাড় করে দেয়। যে কোন রকম পরিবর্তনের কথা শুনলেই আমরা মরুভূমির বুকে বারিবিন্দুর আগমনের মত উল্লসিত হয়ে উঠতাম। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুনে তো আমরা উল্লাসে অধীর হয়ে উঠলাম। সেদিন রাত্রে বিরাট উৎসব শুরু হল। বহু দিন এমন হয়নি। একটা বিরাট, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে যাচ্ছে এই সম্ভাবনায় আমাদের শরীরে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হল। জাহাজের গতানুগতিকতাকে মনে হল বড় তুচ্ছ। মনে জাতীয়তা বোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। আমাদের মধ্যে একটি মাত্র ফরাসী মাল্লা ছিল, তাকে নিয়ে আরম্ভ হল ঠাট্টা মস্করা।

এরপর দু মাস খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটল। যুদ্ধের আর কোন খবর নেই। শেষে স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ থেকে আগত এক ব্যক্তির কাছে শুনলাম বিবাদটা আলাপ আলোচনা করে আপাতত মিটে গেছে।

বন্দরে আর একটি জাহাজ ছিল। সুন্দর সাজানো জাহাজ, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ থেকে এসেছে, নাম অ্যাভন। রোজ সকাল সন্ধ্যায় তোপধ্বনি করে পতাকা তুলত ওরা। জাহাজে দস্তুরমত বাজনদারের দলও ছিল। হাবভাবে মনে হত ওরা যেন ফুর্তি করতে বেরিয়েছে, ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নয়। অথচ ওয়াহু থেকে আগত অন্য সব আমেরিকানদের জাহাজ —লরিয়োট, ক্লিমেন্টাইন, বলিভার, কনভয় প্রভৃতির চেয়ে অ্যাভনের ব্যবসা কিছু কম হত না। সোজাসুজি কেনাবেচা ছাড়াও অবৈধ উপায়ে ব্যবসা চালাত ওরা, চা, উদবিড়ালের চামড়া, রেশমী কাপড় ইত্যাদির।

আমরা আসার দ্বিতীয় দিনে একটি বড় জাহাজ উত্তর দিক থেকে ধীরে ধীরে এসে না থেমে সোজা দক্ষিণপূর্ব দিকে ক্যাটালিনা দ্বীপের দিকে চলে গেল। পরদিন অ্যাভনও ঐদিকে যাত্রা করল। এতে ক্যালিফোর্নিয়াবাসী

বা নির্বোধ লোকদের চোখে ধুলো দেওয়া চলে কিন্তু আমরা সবই বুঝলাম। ঐ নতুন জাহাজটি এর পরে আর এ অঞ্চলে কোথাও দেখা যায় নি। সপ্তাহ খানেক পরে প্রচুর নতুন মাল নিয়ে অ্যাভন সান পেড্রো রওনা হল।

মেক্সিকোতে আমদানী শুল্ক খুবই বেশী। এই উপায়ে অনেকে শুল্ক ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। পদ্ধতিটা সংক্ষেপে এই রকম। মন্টারিতে একটি জাহাজ এসে কেনা বেচা আরম্ভ করে। এক মাসের মধ্যে যখন বেশীর ভাগ মালই ফুরিয়ে এসেছে তখন ক্যাটালিনা বা ঐ অঞ্চলের কোন বিজন দ্বীপের দিকে জাহাজটি চলে যায়। সেখানে অন্য জাহাজ অপেক্ষমান। তাদের কাছ থেকে নতুন মাল নিয়ে জাহাজ ভর্তি করা হয়। অ্যাভন চলে যাবার দুদিন পরে ঐ দিক থেকে লরিয়োটের আগমন হল। সেও যে ঐ অজ্ঞাত জাহাজের কাছ থেকে মালপত্র সংগ্রহ করেছে এ একেবারে স্থিরনিশ্চিত।

মঙ্গলবার, ১০ই নভেম্বর। সন্ধ্যার পর যথারীতি ক্যাপ্টেনকে আনতে নৌকা নিয়ে কূলে যাওয়া হয়েছে। ফেরার পথে চোখে পড়ল আমাদের জাহাজে নিশান তোলা, এর অর্থ নিশ্চয় অন্য জাহাজ চোখে পড়েছে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে কিছুই দেখতে পাওয়ার উপায় নেই। ক্যাপ্টেন আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাঁড় বাইতে আদেশ দিলেন। আমরা প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালালাম, নৌকা তীরের বেগে চলল। একটু পরেই দ্বীপগুলি চোখে পড়ল, সেখানে একটি উপরের পাল তোলা জাহাজ নোঙর ফেলার জন্য থেমেছে। ক্যাপ্টেন আমাদের ঐ দিকে গতি পরিবর্তন করতে বললেন। আমাদের আর দ্বিতীয় বার বলার প্রয়োজন হল না। নতুন জাহাজ, নতুন মুখ, সম্ভবত দেশের খবর এবং জাহাজে ফিরে এই ঘটনার কথা বলতে পারা—এই সব উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আমরা ঐ দিকে মহোৎসাহে দাঁড় চালাতে লাগলাম। লরিয়োটের ক্যাপ্টেন নাঈ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উনিও আমাদের আরো জোরে যাবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। তখন বাতাস একেবারে শান্ত। জাহাজে পৌঁছতে আরো মাইল খানেক আছে হঠাৎ একটু বাতাস আরম্ভ হল। জাহাজটি জল কেটে চলতে আরম্ভ করল। আমরাও অগত্যা হতাশ হয়ে অ্যালার্টে ফিরে এলাম। সমস্ত রাত বাতাস বইল, পরদিন সকালে জাহাজটি নোঙর ফেলল।

নোঙর ফেলা হতেই আমরা সেই নতুন জাহাজে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিমি শিকারী জাহাজ, নিউ বেডফোর্ড থেকে বেরিয়েছে, নাম উইলমিংটন অ্যাণ্ড লিভারপুল প্যাকেট, উনিশ শ পিপে তেল সংগ্রহ করে ফিরছে। জাহাজটি যে তিমি ধরার সেটা আমরা চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। এখন গিয়ে হাল, মাস্তুল, পাল ও পাটাতনের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখে সে ধারণা বদ্ধমূল হল। শিকারী জাহাজে পরিচ্ছন্নতার বড় অভাব। পাটাতনে তেল পড়ে, ময়লা জমে,তেলের পিপের ঘষা লেগে দাগ ধরে অতি শোচনীয় অবস্থা, দড়াদড়ির দশাও তথৈবচ। দণ্ডগুলি থেকে রং খসে খসে পড়ছে। মাল্লাদের আকৃতি প্রকৃতি জাহাজেরই অনুরূপ। ক্যাপ্টেনের চেহারায়ও তেমন ব্যক্তিত্ব নেই—তিনি বাদামী স্যুট,চওড়া ধারওয়ালা টুপি পরে মাথা নীচু করে হাঁটেন। মাল্লাদের দেখে মনে হয় তারা বোধ হয় চাষী কিংবা জেলে।

তখন এমন কিছু শীত নয়। আমরা সুতী জামা ও প্যান্ট পরে আছি। ওদের পরনে দেখি নানারঙের রেশমী জামা কাপড়, বাদামী, ছাই-ছাই, এমনকি সবুজ। কাঁধ থেকে ফিতা আটকান এবং হাত ঢোকাবার জন্য দুই পাশে পকেট। ছককাটা গলাবন্ধ, রঙিন জামা, মোটা চামড়ার বুট এবং সব মিলিয়ে কেমন একটা তেলচিটে গন্ধ—এই হল ওদের মাল্লাদের মোটা-মুটি চেহারা। আট দশ জন করে এক একটা দিকে কাজ করছিল, আরো আট দশ জন কিছু না করে শুধুই দাঁড়িয়েছিল। জাহাজ নোঙর করার সময় মাল্লাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হলাম। ওদের মধ্যে একজন বললে তার হাতে আঘাত লেগেছে, আর একজনের পায়ে কি রকম চর্মরোগ হয়েছে। অন্যদের দেখে যদিও তেমন রোগগ্রস্ত বলে মনে হল না, তারা বললে কাজ করার জন্য লোকের অভাব নেই। ওদের মধ্যে একজনকে একটু সত্যিকার নাবিকদের মত মেজাজ সম্পন্ন দেখলাম। সে পালগুলো গুটিয়ে ঝোলায় রাখছিল। মেট এবং আরো দু-একজন ছাড়া সকলেরই সমুদ্রযাত্রা এই প্রথম, একেবারে আনকোরা নতুন সকলেই। এরা তিরিশজন মাল্লা মিলে আধ ঘণ্টায় যে কাজ শেষ করল আমাদের জাহাজের আঠারো জনের সেই কাজ করতে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের বেশী কিছুতেই লাগত না।*

* আমার এই বর্ণনা পড়ে নিউ বেডফোর্ডের তিমি শিকারীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন শুনলাম। আমার কাহিনী কিন্তু কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত

যখন দেখলাম ওরা প্রায় দশ মাস সমুদ্রে বিচরণ করছে, দেশের খবর কিছুই রাখে না, তখন আমরা ওদের ত্যাগ করে চলে এলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা আবার আসার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হল। তখন ওরা আমাদের তিমির হাড়, দাঁত ও নানা রকম সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ উপহার দিল। তার বদলে আমরা ওদের বই দিলাম। নাবিকদের মধ্যে এইভাবে পড়া বইয়ের লেনদেন প্রথা প্রচলিত আছে। নাবিকরা সাধারণতঃ বইয়ের ভালোমন্দ বিচার করে না।

বৃহস্পতিবার, ১২ই নভেম্বর। সকালে বিক্ষিপ্ত মেঘ সত্ত্বেও দিনটি সুন্দর। ক্যাপ্টেনরা সারাদিন কাটাতে কূলে নামলেন। দুপুরের দিকে পাহাড় ঘিরে মেঘ নামল, কাল ছায়া নেমে এল সান্টা বারবারা শহরের উপর। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে সমুদ্রে ঢেউ আসতে লাগল। মেট তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়ে মাল্লাদের কূলে যেতে আদেশ দিল। অন্য সব জাহাজ থেকেও নৌকা নেমেছে ততক্ষণে—নিজেদের মধ্যে এই সুযোগে বাইচ খেলার লোভ হল আমাদের। আয়াকুচো ও লরিয়োটের ডিঙিকে আমরা অতি সহজেই হারিয়ে দিলাম, কিন্তু তিমি শিকারীদের ছয় দাঁড়ওয়ালা নৌকার সঙ্গে বেশীক্ষণ পাল্লা দেওয়া গেল না। কিন্তু কূলে পৌঁছবার আগে ওদের দাঁড়িয়ে যেতে হল। উত্তাল ঢেউ সগর্জনে তটে আছড়াচ্ছে, সেই অবস্থায় নৌকা চালান ওদের অভ্যাস ছিল না। তাই আমরা কি করি দেখবার জন্য ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। মনে পড়ল ঠিক একই জায়গায় এক বছর আগে আমরা কানাকাদের কাছ থেকে নৌকা কূলে ভিড়ান শিখেছিলাম।

আমরা অতিকষ্টে বালিতে নৌকা থামিয়েছি এমন সময় লরিয়োটের বিল জ্যাকসন দেখতে পেল ওদের জাহাজ নোঙর খুলছে। জাহাজে ক্যাপ্টেন নেই, কেবল মেট ও স্টুয়ার্ড। বিল জ্যাকসন আর ক্যাপ্টেনের জন্য অপেক্ষা না করে লাফিয়ে নৌকায় চড়ল, কিন্তু কানাকারা ঘাবড়ে

নয়, অ্যালার্টের মত জাহাজে কাজ শেখা নতুন নাবিকের কাছে তিমি শিকারী জাহাজের বিশৃঙ্খলতা দেখে প্রথমটা ঐরকমই মনে হওয়ার কথা। অভিজ্ঞতায় জেনেছি ওরা তেমন পরিচ্ছন্ন বা সুশৃঙ্খল না হলেও নাবিকবৃত্তিতে সুদক্ষ। হয়ত ওদের কাজে বাইরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভবও নয়। আমার এই নিয়ে বেশী লেখাটা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হয় নি।

গিয়ে কিছুতেই নৌকা ঠিকমত চালাতে পারে না, দুবার নৌকা জলে ভর্তি হয়ে গিয়ে প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম। জ্যাকসন ওদের গালমন্দ করতে লাগল, শাসনের ভয় দেখাল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন আমরা হাত লাগালাম। কানাকারা দুজন করে নৌকায় বসল, আমরা গলা জল অবধি নৌকা ঠেলে নিয়ে চললাম। তারপর ওরা সহজেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বেয়ে চলে গেল। ইতোমধ্যে অন্য জাহাজ থেকে নৌকা করে মাল্লারা লরিয়োটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে—সকলে মিলে একসঙ্গে অন্য নোঙরটি তুলে শিকল খুলে নিতে ওদের সাহায্য করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্টেনরা ঊর্ধ্বশ্বাসে কূলে এসে উপস্থিত, ভীষণ ঝড়ের আশঙ্কা দেখে সকলেই জাহাজে ফিরে যেতে ব্যস্ত। কূলে বিরাট ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। আয়াকুচোর নৌকায় হাল ছিল না, আমরা ওদের জলের মধ্যে দিয়ে ঠেলে না নিয়ে গেলে ওরা বোধ হয় যেতেই পারত না। তারপর তিমি-ধরা নৌকা ছাড়ল। আমরা ঢেউয়ে নৌকা চালাতে অভ্যস্ত, সুতরাং আমরা গেলাম সকলের শেষে। তিমি শিকারীরা দক্ষ নাবিক, কিন্তু এই জাতীয় তরঙ্গময় সমুদ্রে নৌকা চালাতে অনভ্যস্ত, দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও দুবার ওদের নৌকায় জল ঢুকে ওরা আবার বালির মধ্যে এসে আটকে গেল। তৃতীয় বারের বার ওরা কোনমতে বেরিয়ে পড়ল, যদিও জলে ভিজে নাকানিচোবানি কম হয় নি। নৌকায়ও বেশ জল ঢুকেছিল, কোনমতে জল সেচতে সেচতে ওরা জাহাজে পৌঁছল। তারপর আমাদের নৌকার হালে ক্যাপ্টেন বসলেন, আমি ও বেন আগা গলুই-এর দুদিক ধরে জলের মধ্যে দৌড় দিলাম। আরো দুজন দাঁড় ধরল। দু তিন জন মেক্সিকোবাসী মাথায় উড়ুনি জড়িয়ে আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখছিল, আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে বক্রোক্তি করছিল। জলে ওদের জাতিগত বিতৃষ্ণা, জলঘটিত কোন ব্যাপারেই ওদের উৎসাহ প্রকাশ পেত না।

আমাদের নৌকা চালানর নৈপুণ্য দেখাতে আমরা তখন বদ্ধপরিকর। দৌড়তে দৌড়তে যখন পায়ের তলা থেকে মাটি অদৃশ্য হল আমরা লাফ দিয়ে নৌকায় উঠলাম, তাও অতি সন্তর্পণে। খানিকক্ষণের জন্য মনে হল নৌকা বুঝি যায়। এক একবার সোজা জলের নীচে তলিয়ে যায়, নীচে ঢেউএর এত জোর যে আমাদের প্রায় আছড়ে ফেলে

আর কি। আমাদের চার জনের দাঁড় ও ক্যাপ্টেনের সবল হাত মিলে আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম। লরিয়োটের পাশে এসে আমরা ওদের ক্যাপ্টেনকে নামালাম। আমাদের জাহাজে মিঃ ব্রাউন সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। কেবল নৌকাটি উঠিয়ে নিয়ে পাল তোলার আদেশ হল। আমরা যখন পালের ডাণ্ডাগুলি নিয়ে টানাটানি করছি দেখতে পেলাম লরিয়োট ভেসে পড়েছে। আমাদের পালদণ্ডগুলি মাস্তুল পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই আয়াকুচোর সব পাল উঠে গেল। আমাদের জাহাজের সঙ্গে তেরছা ভাবে এগিয়ে গেল ওরা। তীব্র হাওয়ায় সব পালের দড়ি টেনে একটি জাহাজকে যেতে দেখার মত সুন্দর দৃশ্য বোধ হয় আর কিছুই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নোঙর, শিকল সব তোলা হয়ে গেল, আমরাও ভেসে পড়লাম। তার পরে শিকারী জাহাজটি চলতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দর আবার শূন্য। চারটি বিরাট সাদা মেঘ সমুদ্রের দিকে ধেয়ে এল। আয়াকুচো আমাদের আগে চলে গিয়েছিল। আমরা পালদণ্ডগুলি একটু আঁট করে টেনে ধরেছিলাম। যাই হোক, সমস্ত দিনরাত ধরে চলল ঝ'ড়ো হাওয়ার নর্তন কুর্দন, সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। তিন চার ঘণ্টার আগে সে বৃষ্টির বিরাম নেই। ভোর বেলা মেঘ কেটে সূর্য উঠল। উত্তরের হাওয়ার বদলে বন্দরের দিক থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা একটু অসুবিধায় পড়লাম কেন না কেবল হাওয়ার উপর নির্ভর করে চলা হবে ভেবে আমরা কেবল হালকা হাওয়ার ছোট পালখানি সাজিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাতেই সকলের আগে নোঙরের জায়গায় পৌঁছে যাব। কিন্তু আয়াকুচো আমাদের চেয়ে প্রায় এক লীগ আগে, তার উপর অনুকূল বাতাস পেয়ে তরতর করে এগিয়ে গেল। অবশ্য লরিয়োট আর তিমি শিকারী জাহাজ দুটিই আমাদের অনেক পিছনে। আমরা পশ্চাদ্‌পদ হব কেন— যাবতীয় পালের দড়ি প্রাণপণে টেনে, পাল নামাবার দড়িতে কপিকল তুলে আঁট করে আমরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বন্দরে পৌঁছে দেখি আয়াকুচো ততক্ষণে নিশ্চিন্তে নোঙরবদ্ধ— যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব।

নির্বিঘ্নে নোঙর ফেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সব কাজ শেষ। দু ঘণ্টা পরে শিকারী জাহাজটির দর্শন পাওয়া গেল। নোঙর ফেলতে তাদের যা হিমশিম অবস্থা। তিনঘণ্টা ধরে ওদের হেঁইও হেঁইও চলল। সবচেয়ে

বড় নোঙরটি নামিয়ে কাছি বার করে সেটি নিয়ে টানাটানি। একবার তোলা একবার নামান এই রকম চলল। সন্ধ্যা অবধি পাল গোটাবার কথা ওদের মনেই পড়ল না। রাত বাড়লে লরিয়োট ফিরে এসে নোঙর ফেলল।

আয়াকুচো ও আমাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার কথা প্রায়ই আলোচনা করা হত। কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল ভিন্নমুখী, তাহাড়া বাণিজ্যজাহাজের ইচ্ছামত পথ পরিবর্তন করার উপায়ও নেই—সেজন্য প্রতিযোগিতা আর কোনদিন হয়ে উঠল না, না হয়ে সম্ভবতঃ ভালোই হয়েছে কেন না আট বছর ধরে আয়াকুচো প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচুর ঘুরেছে—ভ্যালপারাইসো থেকে আরম্ভ করে স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ, ক্যান্টন, ক্যালিফোর্ণিয়া কিছুই আর বাকি ছিল না। দ্রুতগতি বলে সুনাম ছিল আয়াকুচোর। বাল্টিমোরের অ্যান ম্যাককিম ও জন গিলপিন এই দুটি জাহাজ ছাড়া অন্য যে কোন জাহাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত আয়াকুচোকে।

শনিবার, ১৪ই নভেম্বর। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মেক্সিকোবাসী ও আমাদের দালাল মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে আজ যাত্রা করার কথা। যাত্রীদের আনতে নৌকা যখন কূলে ভিড়ল তখন ঢেউয়ের আকৃতি দেখে তাদের ভয়ার্তভাব আমাদের খুব কৌতুকপ্রদ মনে হল। ওদের একটু জলে ভেজাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাছাড়া দালাল লোকটিকে আমরা কেউই দু চক্ষে দেখতে পারতাম না। ওদের আনাড়ী বুদ্ধিতে এটা আমাদের ইচ্ছাকৃত ভাও ধরা পড়বে না জানতাম। আমরা এই উদ্দেশ্যে নৌকাটা কূল থেকে বেশ একটু দূরে রাখলাম যাতে ওদের জলে পা ভিজিয়ে আসতে হয়। ওরা এসে বসবার পর বেশ বড় একটা ঢেউ দেখে গলুই দিয়ে ইচ্ছে করে এমন গোত্তা মারলাম যে হুড়হুড় করে নৌকার উপর দিয়ে জল বয়ে গেল। যাত্রীদের আপাদমস্তক ভিজে গেল, মেক্সিকোবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়ল এবং আমাদের শাসাতে লাগল। দালাল মশায় বহু সাধ্যসাধনা করে ওদের আবার নৌকায় উঠতে রাজী করালেন আমরা এবারে আর কোন রকম দুষ্টুমির চেষ্টা করলাম না। অন্য মাল্লারা ওদের মালপত্র তুলে দিল। যাত্রীদের দুরবস্থা দেখে ওদের আনন্দ চোখেমুখে বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল।

যাত্রীরা জাহাজে এলেন—প্রস্তুতি পর্ব শেষ। আমরা পতাকা তুলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলাম, সঙ্গে সঙ্গে অন্য জাহাজগুলিও তাদের নিজ নিজ

নিশান তুলে ধরল। আমরা পালের ঝোলা বার করলাম। পাল বাঁধার দড়ি খুলে প্রত্যেক পালের ডাণ্ডার কাছে এক একজন দাঁড়িয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সব পালগুলো একসঙ্গে উঠে গেল। নোঙর তুলে কাঠের টুকরোটিতে বেঁধে চক্ষের পলকে আমরা ভেসে পড়লাম। তিমি-শিকারীদের আসল জাহাজ চালানো দেখাবার জন্য আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম। আমাদের মাল্লা সংখ্যা ওদের অর্ধেক, কিন্তু ভাল জাহাজে কি করে কাজ হয় এই সুযোগে ওদের একটু জানিয়ে দেওয়া গেল। মাস্তুলের চতুর্থ অংশের উপরের পালদণ্ড উঠে গেল, পাল ছড়াবার দণ্ডগুলিও, আমরা বেড়ালের মত ক্ষিপ্রগতি সব দণ্ডগুলি আটকে দিতে লাগলাম, পালের উপর পাল চড়ে সাদা বিরাট মেঘের মত দেখাতে লাগল। বাঁক ঘোরার আগেই জাহাজে বেশ গতি সঞ্চার হল, উপসাগর এই জায়গায় দশ মাইল চওড়া। হঠাৎ মাঝ রাত্রে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত রবিবার আমরা আটকে দাঁড়িয়ে রইলাম, সান্টা বারবারা ও কনসেপশন অন্তরীপের মাঝখানে। রবিবার রাত্রে সুন্দর হাওয়া উঠল, মনে হল সোমবারের মধ্যে কনসেপশন অন্তরীপ নির্বিঘ্নে পেরিয়ে চলে যাব। কনসেপশনকে বলা হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার হর্ণ অন্তরীপ। ওখানে সারা বছরই প্রচণ্ড ঝড় বইছে। অল্প হাওয়া থাকলেই এখানে সেটা প্রচণ্ড বাত্যার আকার নেয়। হালকা পালে চলার আশা কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হল। আটটার ঘণ্টায় যখন আমাদের পাহারার পালা শেষ তখন জলের ঝাপটায় সামনের দিকটা ভাসিয়ে দিচ্ছে—বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়বার মুখে—অথচ আকাশে একটি মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই।

আমরা বেশীক্ষণ নীচে ছিলাম না, কিন্তু তারই মধ্যে ঝড়ের সব লক্ষণ প্রকাশ পেল। জলের ঝাপটা, আর গলুই পট পট শব্দে জলের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে—যেন কেউ পেরেক ফোটাচ্ছে। উপরে মাল্লারা সমস্বরে গান গাইতে গাইতে দড়িদড়া নিয়ে টানাটানি করছে বুঝতে অসুবিধা হল না। মাল্লারা শব্দ শুনেই বুঝতে পারে কোন পালটা নামান হচ্ছে। আমরা নীচে থেকে আওয়াজ শুনে শুনে বলতে লাগলাম কোন পালের পর কোনটা নামছে। এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দগতি জাহাজ চলতে লাগল। হঠাৎ পাটাতনের ছাদে দমদম শব্দ—"উঠে পড় সকলে, উপরের পাল গোটান হবে।" তখন শীতকাল নয়, কাজেই যে যা পরেছিলাম সেই সুদ্ধই উঠে

এলাম। উঠে যে দৃশ্য দেখলাম তার স্তব্ধ সৌন্দর্য যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। আকাশ পরিষ্কার, তারাগুলি যেন বেশী উজ্জ্বল, যতদূর চোখ যায় কোথাও একটু মেঘের লেশ নেই। দিকচক্রবাল পরিষ্কার দেখা গেল—অথচ সেই নির্মেঘ আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভয়ঙ্কর গুমগুম শব্দ—খালি চোখে দেখলে মনে হবে এ যেন কোন শান্ত গ্রীষ্মের রাত্রি। একের পর এক বড় বড় পালগুলি নামান হতে লাগল, এমন সময় কড়কড় বাজের শব্দ। ছোট তিনকোণা পালটি একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—আমরা ছেঁড়া অংশগুলি নামিয়ে রাখলাম। তার জায়গায় মাস্তুলের দড়ির উপরের পালটি তোলা হল—ইতোমধ্যে মাঝখানের প্রকাণ্ড পালটি মধ্য থেকে চিরে গেল। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠলেন "গেল, গেল, শীঘ্র উপরে উঠে পালটি গুটিয়ে ফেল, সব টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এখনি—" কথা শেষ হবার আগেই আমরা দণ্ড বেয়ে উপরে উঠে পালটি গুটিয়ে ফেললাম। আমরা ডেকের উপর নেমেছি কি নামিনি—আর একটি পাল উপর থেকে নীচে অবধি ফেঁসে যাওয়ার শব্দ, এবার সামনের পাল ছিঁড়েছে একেবারে আড়াআড়ি ভাবে। আবার তাড়াহুড়ো করে গোটানর পালা। অন্য পাল বাঁধা আংটাগুলি থেকে চাপ কমিয়ে আমরা ভাল করে ফাঁস বেঁধে দিলাম।

সব দড়াদড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে সবে ভাবছি এবার বোধ হয় ছুটি, আচম্বিতে মাস্তুলের উপরের পাল দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পতপত করে উড়তে লাগল, তার ধাক্কায় মাস্তুল বেতের মত কাঁপতে আরম্ভ করল। আমাদের ছুটির আশা নিঃশেষ হল। এ এক অতি কঠিন কর্মের সম্মুখীন হলাম আমরা। পালটা হয় নামিয়ে ফেলতে হবে নয় কেটে দিতে হবে নইলে মাস্তুল যায়। ডানদিকের পাহারার দল এবার উপরে উঠল। এক এক করে সকলেই উঠল কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শেষে নাবিকশ্রেষ্ঠ ফরাসী জন দণ্ড বেয়ে উপরে উঠে গেল। ওর লম্বা লম্বা হাত পা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ যোঝাযুঝির পর পালটা আয়ত্তের মধ্যে এল। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল ও পড়ে গেল বুঝি, কিন্তু জনের শরীরের প্রতিটি তন্ত্রীতে নাবিকের রক্ত, এক একটি আঙ্গুলের জোর কি—যেন সাঁড়াশি হয়ে ডাণ্ডার গায়ে চেপে বসেছে। পাল ঠিক করে ও পালদণ্ডটি এবার নীচে পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু জাহাজের মুহুর্মুহুঃ দোলানিতে

কিছু করা প্রায় অসম্ভব। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চলল, শেষে দণ্ডটি নিরাপদে নামানো গেল। আমরা সকলেই তখন একযোগে কাজে লেগে গেছি। ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ চলল কয়েক ঘণ্টা ধরে। হালকা পালের দড়াদড়ি খুলে রাখা, পাল ছড়াবার ডাণ্ডাগুলি এঁটে বেঁধে রাখা। সেদিন রাত্রে আকাশে এত আলো যেন দিন, অল্প অল্প ঠাণ্ডা, বেশ কাজ করার উপযোগী আবহাওয়া, এই আবহাওয়ায় ঝড় আসাটাই একটা রসিকতা। আর সে কি ভীষণ ঝঞ্ঝা। বাতাস যেন হিংস্র পশুর মত সামনে লাফিয়ে পড়ে আমাদের ফেলে দিতে চায়। এত হাওয়ার জোর আমি খুব কমই দেখেছি। অন্ধকার, ভিজে হাওয়া ও ঠাণ্ডা এই তিনটি ঝড়ের আনুসঙ্গিক ঝড়ের চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়।

ডেকে উঠে আমরা সময় জানবার জন্য এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম, কেন না তখন কাদের পাহারার কথা তাও বোঝা যাচ্ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারটে ঘণ্টাধ্বনি পড়ল, অর্থাৎ অন্য পাহারা শেষ হয়ে গেছে—আমাদের পালাও অর্ধেক সমাপ্ত।

অপর দলটি সবে নীচে গেছে এমন সময় উপর দিকের একটি হালকা পাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পালটি অবশ্য বড় নয়, আমরা অন্যদের সাহায্য না নিয়েই ঠিক করে নিতে পারলাম। জাহাজের আগা থেকে পালের দড়ি বাঁধবার জন্য যে দণ্ড বেরিয়ে থাকে তার উপর বসে কাজ করতে হচ্ছিল, সর্বাঙ্গে জল বয়ে যাচ্ছিল। আর একটি পাল উদ্যোগ আয়োজন করে টাঙ্গাতে না টাঙ্গাতেই সেটিও ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, এমন কি উপরের পালেও বড় বড় ফুটো দেখা যেতে লাগল। সেটিরও যেতে আর বেশী দেরী নেই বুঝে মেট তাড়াতাড়ি সেটি গুটিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অন্য পাহারায় যে সব মাল্লারা ছিল তাদের আর ঘুম না ভাঙ্গিয়ে মিস্ত্রী, ছুতোর, রাঁধুনী, স্টুয়ার্ডদের ডাকা হল। তাদের সমবেত সাহায্যে পালটা নামিয়ে দণ্ডের চারদিকে জড়িয়ে ফেলা হল। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ের মুখে। হাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবার সাধ্য নেই, মাস্তুলের দড়ি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে না থাকলে উড়িয়ে নিয়ে যায় এমন অবস্থা। অথচ হর্ণ অন্তরীপের কাছে যে ঝড়ে পড়েছিলাম আমরা তার মত ঠাণ্ডা বা শিলাবৃষ্টি কিছুই ছিল না। আমাদের

পোশাক পরিচ্ছদও অপেক্ষাকৃত হালকা। এ সবে অনেক সুবিধা হয়। আমরা যখন ডেকে নামলাম তখন আটটি ঘণ্টা পড়ছে অর্থাৎ ভোর চারটে। অন্য পাহারার দলের পালা, কিন্তু আমাদের কপালে বিশ্রাম কোথায়। ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডব সমানে চলেছে, ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ম হাওয়া এসে বিঁধছে গায়ে। ক্যাপ্টেনও ডেকে। প্রতিমুহূর্তেই জাহাজের ঝাঁকুনি ও দোলানিতে মনে হচ্ছে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে পড়ে গেল বুঝি। পাল, মাস্তুল সব ভেঙ্গে পড় পড়। একটি নতুন বড় পাল উপর থেকে নীচে অবধি ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেল। মাস্তুল থেকে কোনাকুনি ভাবে পালের উপরের কোণ অবধি ছড়ানো দণ্ডটি বেঁকে গেল, এমনকি একটি পালের দড়ি অবধি ছিঁড়ে গেল, একটি নোঙর ঢিলে হয়ে ধাক্কা খেতে লাগল। আমাদের অর্ধেক দিনের কাজ। আধ ঘণ্টা প্রচুর পরিশ্রম করে আমাদের দল পালটি গুটিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক ধাক্কায় প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হলাম।

পালের দণ্ডগুলোতে দু বার করে দড়ি জড়িয়ে শক্ত করা হল, অন্যান্য দড়াদড়িও যতদূর সম্ভব আঁটসাঁট করে আমরা নামলাম। ততক্ষণে অন্য দলটি সামনের দিকের বিলি ব্যবস্থা করে নেমে এসেছে। শতচ্ছিন্ন পালটিকে দেখাচ্ছে যেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত। একটি খুব বড় পাল আর গোটানো উপরের পালটি ছাড়া মাস্তুলে আর তৃতীয় কোন পাল নেই, কিন্তু এতেও বিলক্ষণ অসুবিধা হচ্ছিল, তাই বড় পালটিও গুটিয়ে ফেলার আদেশ হল। মাস্তুলের লাগাও কাঠের ডাণ্ডায় মাল্লারা চড়ল, কিন্তু কিছুতেই আর পালের কোণ বাঁধা দড়িটি নামাতে পারে না। দ্বিতীয় মেট ক্রুদ্ধ হয়ে গালাগালি বর্ষণ করতে লাগলেন। দুজন অভিজ্ঞ কর্মীকে উপরে পাঠান হল। এবার সবাই মিলে আমরা লেগে গেলাম বাঁদিকের দড়াদড়ি ঠিক করার কাজে, সবলে কপ্লিকল দিয়ে সব পালের রশি টেনে ধরা হল। আমার কাজ ছিল তিনকোণা পালের দড়িটি সামলানো। আধঘণ্টা ধরে আমরা তিনজনে মিলে বহু ধ্বস্তাধ্বস্তি, বার কয়েক আমাদের উপর দিয়ে সমুদ্রের জল বয়ে গেল, কিন্তু কপিকল আর কিছুতে লাগানো যায় না। শেষে মেট ভাবলেন আমরা ডুবে না যাই—আমাদের উঠে আসতে বলা হল, তারপর নোঙরগুলি উঠিয়ে বেঁধে রাখা রেলিঙে। তবুও সমুদ্রের জলের তোড় এসে বাঁদিকের রশারশির উপর পড়ছিল, পাটাতনের জল বেরোবার রাস্তায় একমানুষ সমান জল।

ততক্ষণে সকাল নটা! আমরা এবার একটু প্রাতরাশের কথা চিন্তা করছি এমন সময় আবার এক দুর্ঘটনা। উপরের পালটি প্রায় ছেঁড়ার মত অবস্থায় এসেছে দেখা গেল। জাহাজে কোন না কোন পাল রাখতেই হবে। তাই ক্যাপ্টেন আদেশ করলেন শক্ত কাপড়ের ঝ'ড়ো হাওয়ার দুটি পাল অবিলম্বে নিয়ে এসে লাগান হোক। বড় পালটি উড়ে যায় যাক, তবে অন্তত অন্য পালগুলি লাগান পর্যন্ত যাতে টিঁকে থাকে এই তখন আমাদের চিন্তা। ঝড়ের পালগুলি পরিসরে কম, নীচে লাগাবার জন্য খুব বেশী অংশ হাওয়ার মুখে পড়ল না—মনে হল এতেই জাহাজ চলবে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে জাহাজে অন্য যেসব পাল লাগান ছিল তার একটিও আর আস্ত রইল না। ছিন্ন অংশগুলি আমরা গুটিয়ে রেখে দিলাম। উপরে পালের টান কমে যাওয়াতে জাহাজ অনেকটা স্বচ্ছন্দগতিতে এগোতে লাগল।

তখন দুপুর এগারোটা। এতক্ষণে আমরা জলখাবার খাওয়ার সময় পেলাম। ঝড় তখনো সমানে চলেছে। তিনদিন ধরে সমানে ঝড় চলল—এতটুকু বিরাম নেই, জাহাজের দোলানিও সেই সঙ্গে অবিশ্রাম চলেছে। অথচ আশ্চর্য আকাশে এতটকু মেঘ নেই। পরিষ্কার আকাশে সূর্য ওঠে অস্ত যায়। তারাগুলি নির্মেঘ আকাশে জ্বলজ্বল করে, দেখে মনে হয় যেন বস্টনের আকাশ। ফেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে পড়ে—কূলের দিশা পাওয়া যায় না।

দুটি পাটাতনের মাঝখানের ঝোলানো বিছানায় আমরা অনেকে ঘুমোতাম। হাওয়ায় যেমন শিশুদের দোলনা দোলে এও যেন অনেকটা সেই রকম, তবে দোলানিটা জাহাজ সুদ্ধ, এই যা তফাত। বাহাত্তর ঘণ্টা আমাদের পাহারা ও বিশ্রাম এইভাবে চলল। কখনো কখনো আংটা থেকে পাল উড়তে থাকে তখন আবার রশি ধরে টানাটানি। একদিন হঠাৎ চাকার দড়িটি গেল ছিঁড়ে। কি যে হত বলা যায় না কিন্তু প্রধান মেটের তৎপরতায় সেযাত্রা আমরা রক্ষা পেলাম। কুড়ি তারিখের সকল বেলা মনে হল ঝড় যেন এবার কমের দিকে। অবশ্য বাতাস তখনো প্রবল বেগে বইছে তবু আমাদের সকলের ডাক পড়ল—নতুন পাল লাগাতে হবে। একটি একটি করে বহু পরিশ্রমের পর পুরোনো পালগুলি খুলে সে জায়গায় নতুন পাল পরান হল। যে সব পাল হর্ণ অন্তরীপে ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রাখা ছিল সেগুলি মাস্তলের উপর পাঠান হল। সব পালগুলি দণ্ডের

সঙ্গে লাগিয়ে গুটিয়ে রাখতে রাখতে বারোটা বেজে গেল। পাঁচ ঘণ্টা ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে আমরা একেবারে ক্লান্ত। ভীষণ ঝড়ের মধ্যে একসঙ্গে পাঁচটি নতুন পাল দণ্ডে পরানো মোটেই সুখদায়ক কাজ নয়। রাত্রের দিকে ঝড় থেমে এল। আকাশে দেখা গেল ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ঝড় আরম্ভ হওয়ার পাঁচদিন পরে আমরা গোটান পালগুলি খাটাতে আরম্ভ করে দিলাম। আটদিন ঐ ভাবে গেল। ঝড়ের ধাক্কায় আমরা গতিপথ থেকে অনেক সরে স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলে এসেছিলাম।

হাওয়ার বেগ সত্ত্বেও যতটা সম্ভব কাজ করে করে আমরা পাল তুললাম, কেন না অনেক দিনের পথ ফিরে যেতে হবে। আট দিন পরে বাতাস বদলে হালকা দক্ষিণে বাতাস বইল। আমাদের হালকা পালে এবার গতি সঞ্চার হল।

শুক্রবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, কুড়িদিন পরে আমরা সানফ্রানসিস্কো উপসাগরের মুখে এসে পড়লাম।

॥ ২৬ ॥ সানফ্রানসিস্কো ॥

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল মন্টারি। কিন্তু ঝড়ে আমাদের অনেকটা উত্তরে এনে ফেলেছিল, তাই আমরা ঝড় কমতে সানফ্রানসিস্কোর দিকে যাত্রা করলাম। এই উপসাগর ৩৭°৫৮´ অক্ষাংশে অবস্থিত। সার ফ্রান্সিস ড্রেক এটি আবিষ্কার করেন। উপসাগরটি পোতাশ্রয় হিসাবে অপূর্ব, কয়েকটি ভাল বন্দর আছে এখানে, জলও গভীর, উপকূলবর্তী অঞ্চল উর্বর ও অরণ্যাচ্ছাদিত। উপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে উচ্চভূমির উপর দুর্গ নির্মিত হয়, ঐ কোণের পিছনে ইয়ার্বা বুয়েনা নামে একটি বন্দর, কাছেই ডলোরাসের মঠ। ওখানে বাণিজ্য জাহাজরা নোঙর ফেলে। ধারে কাছে কোথাও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল একটা কুঁড়ে বানিয়ে তাতে রিচার্ডসন নামে একটি লোক বাস করত—রেড ইণ্ডিয়ান ও জাহাজগুলির মধ্যে মালের আদানপ্রদান করার জন্য। ঐ লোকটি পরের বছর ওখানেই একটি একতলা বাড়ী তৈরী করে—সেটিই নাকি সানফ্রানসিস্কো শহরের সর্ব প্রাচীন বাড়ী। বন্দরে আর একটিমাত্র নোঙর ফেলা জাহাজ ছিল, তাতে রাশিয়ার পতাকা। জাহাজটি রাশিয়া অধিকৃত আমেরিকার সিটকা

অঞ্চল থেকে আগত। এসেছে চর্বি ও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে। ঐ মঠের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। আমরা পরদিন ওদের জাহাজটি দেখতে গেলাম। সেদিন ছিল রবিবার। জাহাজটি দেখে আমরা যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পিলগ্রীমের চেয়ে আকারে বড় নয় কিন্তু পাঁচজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সমেত কুড়ি ত্রিশ জন মাল্লার এমন তৈলাক্ত ও বুদ্ধিহীন চেহারা যে এমন আর কখনো চোখে পড়ে নি। তখন বেশ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। আমরা সুতী পোশাক পরে খালি পায়ে থাকতাম। কিন্তু ওদের প্রত্যেকের আপাদমস্তক ভারী ভারী শীতবস্ত্রে মোড়া, হাঁটু অবধি বুট, একেবারে নোভাজেম্বিয়ার উপযোগী সাজসজ্জা। গরম পড়লেও ওদের পোশাকের কোন পরিবর্তন হত না। আমাদের সকলের জামাকাপড় ওজন করলে যা হয় ওদের একজনের পোশাকই প্রায় তার অর্ধেক। ওদের চেহারায়ও কেমন একটা বন্য ভাব। খাওয়া শোয়া সবেতেই ওদের চর্বি না হলে চলত না। জামাকাপড় চর্বিতে মাখামাখি, জাহাজ ভর্তি চর্বি। রাশিয়ানদের কাছে চর্বির মত লোভনীয় জিনিস আর কিছু নেই। চর্বির থলি ওদের জাহাজে তোলা হত আর ওরা লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকত, সুযোগ পেলেই একটি থলি খেয়ে শেষ করতে ওদের বেশীক্ষণ লাগবার কথা নয়। অবশ্য থলিগুলি কড়া পাহারায় থাকত, তাই রক্ষা। ওরা চর্বি এত বেশী পরিমাণে খেত যে মনে হত শরীরের সমস্ত লোমকূপ দিয়ে চর্বি বেরিয়ে আসছে। খুব সম্ভব এই জন্যই ওদের শীত বা বর্ষা সহ্য করার ক্ষমতা খুব বেশী। গরম দেশে গেলে বোধহয় ওরা রক্তশূন্যতায় মারা পড়বে।

জাহাজের অবস্থা মাল্লাদের চেয়ে এমন কিছু ভাল নয়। এমন পুরোনো, সেকেলে ও অসুবিধাজনক যন্ত্রপাতির সমাবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। ডেকের সর্বত্র কুণ্ডলী পাকানো কাছি পড়ে আছে। মাস্তুল, পালের দণ্ডে এমন কালি পড়েছে যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওগুলি পরিষ্কার করা এদের রীতি বিরুদ্ধ। ডেকের ময়লা দেখলে যে কোন নাবিকের বমনোদ্রেক হবে। রান্নাঘর আর মাল্লাদের থাকবার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই—যেখানে রান্না হয় সেখানেই ঐ গরম, ধোঁয়া আর তেলের মধ্যে মাল্লারা ঘুমোচ্ছে। সে ঘরটিও কখনো পরিষ্কার হয় না বোঝা গেল। পাঁচ মিনিট সেখানে কাটিয়েই গরমে আমাদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল, আমরা উপরে খোলা হাওয়ায় এসে যেন বাঁচলাম. ওদের সঙ্গে আমরা কিছু জিনিসের

আদানপ্রদান করলাম। রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে তৈরী পুঁতির কাজ করা জিনিস, পাখীর পালক, চামড়ার জুতো ইত্যাদি ওদের কাছে প্রচুর ছিল। আমি একটি বিচিত্র বর্ণের পোশাক কিনলাম—সেটি কোন জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরী, নানা রঙের পাখীর পালক দিয়ে তাতে অপূর্ব শোভা হয়েছে।

আমাদের আসার দিন কয়েকের মধ্যে বর্ষা পড়ে গেল। অনবরত বৃষ্টি—তিন সপ্তাহ ধরে। আমাদের ব্যবসার এতে বিশেষ অসুবিধা হল। এখানে চামড়া আনার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। ডলোরাসের মঠে বিশেষ ব্যবসা বাণিজ্য হয় না—যেখানে হয় সেগুলি নোঙরস্থান থেকে তিরিশ চল্লিশ মাইল ভিতরে নদীর ধারে অবস্থিত। সান জোসে, সাণ্টা ক্লারা ও অন্যান্য স্থানে ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্য যে কোন অঞ্চল থেকে চামড়ার কারবার অনেক বেশী পরিমাণে হয়। মঠগুলির বিরাট বিরাট নৌকা থাকে, এক একটিতে পাঁচ ছ শ করে টুকরো ধরে। রেড ইণ্ডিয়ান চালিত সেই নৌকাগুলি জাহাজের কাছে এসে অন্য মাল নিয়ে ফিরে যায়। অনেক সময় জাহাজ থেকে মাল্লা বা কর্মচারীদের ঐ নৌকায় থাকতে হত। অন্য সময় হলে এই নদীযাত্রা সুখকর হত সন্দেহ নেই কিন্তু এখন অবিরল বর্ষার মধ্যে চার পাঁচদিন খোলা নৌকায় কাটান, ছাউনি বলে কিছু নেই, শুকনো ঠাণ্ডা খাবার—কারোই বিশেষ মনঃপূত নয়। আমাদের দুজন সঙ্গী সাণ্টা ক্লারা অবধি এই নৌকায় গিয়েছিল। তাদের দুরবস্থার আর সীমা ছিল না। প্রচণ্ড বারিপাতের মধ্যে বিনিদ্র রজনী তারা কেবল নৌকার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করে কাটিয়েছে। জাহাজে যখন ফিরল ওদের একেবারে বিধ্বস্ত চেহারা। চামড়াগুলির জলে ভিজে যা অবস্থা তাতে জাহাজের খোলে রাখার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ওগুলি পাটাতনে টাঙিয়ে যতটুকু রোদ ওঠে তাতেই শুখিয়ে নেবার জন্য জাহাজের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত কেবল দড়ি খাটান হল। সমস্ত পালের দণ্ড, পাল ও মাস্তুলের দড়াদড়ি, যেখানে যা ছিল সর্বত্র শুখোতে দেবার দড়ি বাঁধা এবং তাতে ভিজে চামড়া ঝুলতে লাগল। জাহাজে এমন কোন খোলা জায়গা ছিল না যেখানে চামড়া না ঝুলছে। চামড়ার একটা বিরাট স্তূপের মত দেখাতে লাগল জাহাজটা।

একদিন রাত আটটায় আদেশ পেলাম আমাকে ভোর রাত্রে সান জোসে যাত্রা করতে হবে—রেড ইণ্ডিয়ানরা শেষ রাতে নৌকা নিয়ে আসবে, আমি

যেন চারদিনের মত জিনিস নিয়ে প্রস্তুত থাকি। সেদিন যেমন শীত তেমনি বর্ষা করেছে। আমি বর্ষাতি কাপড়ের জামা, মোটা জুতো গুছিয়ে রেখে একটু ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম। যখন ঘুম ভাঙল দেখি সকাল হয়ে গেছে। সব মাল্লাদের উপরে ওঠার ডাক পড়ছে। রেড ইণ্ডিয়ানরা আমাকে নেওয়ার কথাটা বুঝতে না পেরেই হোক বা ভুলে গিয়েই হোক আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমি সে যাত্রা চারদিনের পথকষ্ট থেকে রক্ষা পেলাম।

কয়েকদিন পরে চারজন মাল্লা আমাদের দালালকে নিয়ে সাণ্টা ক্লারা গিয়েছিল। নৌকাটি এত ছোট যে ভাল করে নড়াচড়া করাও কঠিন। এদিকে দালাল মশায় মঠে গেলেন তো গেলেন, তাঁর আর ফেরার নাম নেই। সেই বৃষ্টির মধ্যে মাল্লারা সেই ছোট নৌকা ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না—না তাদের আছে কোন থাকা বা খাওয়ার ব্যবস্থা। এর পর তিরিশ মাইল পথ বৈঠা বেয়ে তারা যখন জাহাজে ফিরল তাদের শরীরের এমন অবস্থা যে মই দিয়ে উঠতে পারে না। বলাই বাহুল্য প্রতিনিধি মশায়ের জনপ্রিয়তা এই করে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল, যখনই সম্ভব অনাবশ্যক দেরী করে ও ঢেউয়ে নাকানি চোবানি খাইয়ে ওঁর প্রতি প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমরাও কখনো ছাড়তাম না।

চামড়া যত ছিল সংগ্রহ করা হল। এবার জ্বালানি কাঠ ও পানীয় জলের জোগাড়—এ দুটির জন্যই সানফ্রানসিস্কো প্রসিদ্ধ। নোঙরের জায়গা থেকে দুই লীগের মধ্যে একটি গাছপালায় ঢাকা দ্বীপ, গাছগুলি একেবারে জল অবধি ঝুঁকে পড়েছে। আমরা দ্বীপটির নাম দিয়েছিলাম কাঠের দ্বীপ। দুজন ক্যানিবেকবাসী মাল্লা ওখানে রোজ কুঠার নিয়ে যেত, আর কাঠ কেটে জমা করে রাখত। এক সপ্তাহে প্রায় আমাদের সংবৎসরের জ্বালানি কাটা হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় মেট, আমি ও আরো তিনজন একটি বড় খোলা নৌকা নিয়ে দ্বীপে গেলাম। নৌকাটি মঠ থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। জাহাজ থেকে যখন বেরোলাম তখন দুপুর কিন্তু যা হাওয়া আর জোয়ারের বেগ যে দ্বীপের কাছ অবধি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ঝ'ড়ো হাওয়া, বৃষ্টি আর কনকনে শীত। এই অক্ষাংশে শীতের রাত্রি প্রায় পনেরো ঘণ্টা অবধি থাকে। আমাদের সঙ্গে একটা হালকা ডিঙি ছিল সেটা নিয়ে আমরা কূলে গেলাম, কিন্তু কোথাও

আশ্রয় নেই। কিছু কাঠকুটো ও গাছের পাতা কুড়িয়ে আবার নৌকায় ফিরলাম—ঐ দিয়ে কোনমতে রাতের মত ব্যবস্থা হল। পালটা দিয়ে আমরা ছাউনি তৈরী করলাম, নীচে কাঠকুটোর বিছানা। সমস্ত পোশাক সুদ্ধ শুয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম—তখন ছটা। কিন্তু উপর থেকে জলের ছাটে সমস্ত জামা কাপড় ভিজে গেল, এদিকে কাঠের শক্ত বিছানায় শোয়ার অস্বস্তি—ঘুম হল না। আমরা একটা লোহার পাত্র ভাল করে মুছে তাতে আগুন জ্বালালাম, আগুনের কাছে শুখোবার জন্য কিছু কাঠকুটো রেখে দিলাম। আমাদের খাওয়ার জন্য যে সামুদ্রিক শুক্তি দ্বীপ থেকে এনেছিলাম সেগুলো পুড়িয়ে খাওয়া গেল। ক্ষিদে যে পেয়েছিল তা ঠিক নয়, কিন্তু কিছু করে সময়টা কাটান দরকার। এত করেও মাত্র দশটা বাজল। তখন আমাদের মধ্যে একজন পকেট থেকে এক প্যাকেট পুরোনো তাস বার করল। সেই দেখে মহা উৎসাহে আমরা আগুনের ম্লান আলোতে তাস খেলতে আরম্ভ করে দিলাম। প্রায় রাত দুটো অবধি খেলা চলল। তারপর শ্রান্তিতে যখন চোখ বন্ধ হয়ে এল তখন পালা করে এক একজন আগুনের দিকে নজর রাখতে লাগল, অন্যেরা ঘুমালো—এইভাবে চলল। ভোরের দিকে বৃষ্টি যদি বা থামল কিন্তু কি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, সেই শীতে ঘুমোয় কার সাধ্য। আলো হতেই আমরা কূলে নেমে কাঠগুলো তোলার কাজে লেগে গেলাম। ক্যালিফোর্ণিয়াতে কোথাও এমন শীত পড়তে দেখিনি। মাটিতে তুষার আস্তরণ পড়ে ছিল, ছোট ছোট ডোবাগুলিতে বরফের চাদর বিছানো। এই হাড় জমানো শীতে হাঁটুজল ভেঙে হাতে করে করে কাঠ বয়ে আমাদের নৌকায় তুলতে হল। তৃতীয় মেট থাকলেন বড় নৌকায়—দুজন মাল্লা ছোট ডিঙিতে মালপত্র সাজাতে লাগল—আর জল বয়ে শ্রমসাধ্য কাজের ভার পড়ল সবচেয়ে কমবয়সী দুটি মাল্লার উপর—তার মধ্যে আমি একজন। প্যান্টের পা গুটিয়ে খালি পায়ে হিমশীতল মাটির উপর দিয়ে সারাদিন ধরে কাঠ বওয়া চলল। ডিঙিটি যখন ভর্তি হয়ে বড় নৌকায় কাঠ তুলে দিতে যাচ্ছিল আমরা শরীর গরম রাখার জন্য বালির ওপর ছুটোছুটি করছিলাম—না হলে শীতে জমে যাবার ভয়। সন্ধ্যের দিকে যখন নৌকা একেবারে কাঠ বোঝাই আমরা নোঙর তুলে ভেসে পড়লাম। উপসাগর ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই জোয়ারের ধাক্কায় নৌকা সমুদ্রের দিকে চলে যাবার মত হল। একে নৌকা বিষম ভারী, তাতে গভীর কুয়াশায়

জাহাজ দেখতে পাওয়া যায় না—যাই হোক বহু পরিশ্রমে আমরা সমুদ্রের দিক থেকে নৌকাকে বাঁচিয়ে দ্বীপের অপর পারে এসে উপস্থিত হলাম। সে রাত্রি আরো দুঃসহ। শীতের কথা ছেড়ে দিলেও কিনারা অবধি কাঠ বোঝাই নৌকা, পা ছড়িয়ে বসার এতটুকু জায়গা নেই। পরদিন সকালে জাহাজে পৌঁছলাম, নৌকা থেকে সব কাঠ তুলে নিতে নিতে সারাদিন লেগে গেল।

জ্বালানি সমস্যার সমাধান হল, এবার চাই পানীয় জল। বড় বড় পিপে নিয়ে একদল দ্বীপ অভিমুখে রওনা হল, ভাগ্যক্রমে এবার আর আমাদের যেতে হল না। ওরা ফিরল তিনদিন পরে, শুনলাম সমুদ্রের দিকে চলে যেতে যেতে ওদের নৌকা বহুকষ্টে রক্ষা পেয়েছে। দ্বীপে ওরা একটা হরিণ শিকার করেছিল। সানফ্রানসিস্কো উপসাগরের তীরবর্তী এইসব দ্বীপে হরিণ প্রচুর আছে।

মাঝে মাঝে দ্বীপ ভ্রমণের কথা বাদ দিলে আমাদের সময়টা মোটামুটি মন্দ কাটত না। কূলের বেশ কাছেই আমরা নোঙর ফেলেছিলাম। ঝড়ের ভয় নেই, দাঁড় বাইবার ঝামেলা নেই, সমস্তক্ষণ বৃষ্টির জন্য পাটাতনের সব ফোকর ও নীচে যাবার দরজা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল—আমরা দুই ডেকের মাঝখানে বসে বসে কাজ করতাম। শনের নুড়ি কুড়োনো, সুতো কেটে দড়ি তৈরী করা, মাস্তুল সংলগ্ন পালদণ্ডে লাগাবার ছোট দড়ি, চামড়া কেটে চাকায় লাগাবার দড়ি ইত্যাদি তৈরী হত। তখন শীতকালের মাঝামাঝি, যে অক্ষাংশে ছিলাম সেখানে শীতের রাত্রি দীর্ঘ—আমরা সন্ধ্যা পাঁচটায় নৈশ আহার শেষ করতাম, উঠতে হত সকাল সাতটা।

পশ্চিম উপকূলে আসার পর প্রায় একবছর হতে চলল। এবার দেশে ফেরার চিন্তায় সকলেরই মন উতলা। যাত্রা করার আগের দু-তিন মাস কাজের চাপে নিজেদের কোন কাজ করার সময় পাওয়া যাবে না। তাই আমরা এই অবসরে নিজেদের জামা কাপড় তৈরী করতে মন দিলাম। সন্ধ্যেবেলা বসে বসে সেলাই করতাম। হর্ন অন্তরীপের জন্য বিশেষ রকম জামা দরকার। রাত্রে খাওয়ার পর এক দফা ধূমপান। তারপর সবাই বাতি ঘিরে যে যার সেলাই নিয়ে বসত। কারো হাতই খালি থাকত না। কেউ টুপি, কেউ জামা, কেউ প্যান্ট নিয়ে বসত, কেউ বা কমবয়সী মাল্লাদের জন্য সেলাই করে দিত। আমি ত্রিপলের একটা খুব মোটা টুপি তৈরী করলাম, তাছাড়া করলাম ভিতরে পরার গরম জামা। অনেকে মিলে সুতী কাপড়

কেনা হয়েছিল, তার থেকে জামা ও প্যান্ট তৈরী করে তার উপর তিসির তেল লাগিয়ে হর্ণ অন্তরীপের জন্য তৈরী করে রেখে দেওয়া হল। অনেকে আবার ত্রিপলের টুপির ভিতর দিকে গরম কাপড়ের আস্তর দিয়ে দিল। মোটমাট সকলেই ব্যস্ত কেন না এমন সুযোগ আর পরে হবে না একথা সকলেই জানতাম।

শুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর। আজ বড়দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টির বিরাম নেই। চামড়া আনা বা অন্য-কোন কাজও ছিল না। সুতরাং ক্যাপ্টেন দয়াপরবশ হয়ে আমাদের ছুটি দিলেন। বস্টন ছাড়ার পর রবিবার ছাড়া এই প্রথম ছুটি। সেদিন রাত্রে কিশমিশ দেওয়া ময়দার পিঠে—দেওয়া হল। রাশিয়ান জাহাজটি পুরাতনপন্থী। তারা এগারো দিন আগে বড়দিন উদ্‌যাপন করেছে শুনলাম। সেদিন নাকি তাদের প্রচুর মদ্যপান ও ভোজ হয়েছে—এক থলি চর্বি, এক পিপে মদ শেষ হয়েছে সেদিন।

রবিবার ২৭শে ডিসেম্বর। এই বন্দরে আমাদের কাজ শেষ। রবিবার দেখে বেরিয়ে পড়া হল, একবার রাশিয়ান জাহাজটির প্রতি ও দ্বিতীয় বার দুর্গের উদ্দেশ্যে তোপধ্বনি হল—দুইটিরই প্রত্যুত্তর ভেসে এল। দুর্গের অধ্যক্ষ ডন গুয়াডালোপ ভ্যালেজো আমাদের জাহাজে ছিলেন। তিনি সুন্দর ইংরাজী বলতেন এবং অনেকের মতে বিদেশীদের একটু পক্ষপাত প্রদর্শন করতেন।

উজ্জ্বল রোদে উদ্ভাসিত দিন, প্রায় এক মাস পরে এমন রোদ দেখতে পাওয়া গেল। উপসাগরের মাঝখান থেকে স্পষ্ট দেখলাম অনেকগুলি প্রণালী কূলের দিকে প্রবেশ করেছে। আর বৃক্ষাচ্ছাদিত ছোট ছোট দ্বীপ, ছোট ছোট নদীর মোহানা। যদি ক্যালিফোর্ণিয়া কোন দিন উন্নতিলাভ করে তবে এই উপসাগরই হবে তার প্রাণকেন্দ্র, এখানকার বন্দরের উপযোগী জায়গা, সুন্দর জলহাওয়া, উর্বর মৃত্তিকা, জল ও কাঠের প্রাচুর্য—পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। নৌচালনের পক্ষে এমন উপযোগী স্থান সমস্ত আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আর কোথাও নেই।

জোয়ার পড়ে আসতে আমরাও উপসাগরের মুখে একটি পাহাড়ের পাদদেশে নোঙর ফেললাম। পাহাড়ের ঢালে শত শত লাল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখে ওরা ভীত চকিত ভঙ্গীতে পালাতে লাগল। ওদের ভয় পাওয়াবার জন্য আমরা ইচ্ছা করে শব্দ করতে লাগলাম।

মধ্যরাতে জোয়ার এল। আমরা তারকাখচিত আকাশের নীচে আবার ভেসে পড়লাম। উত্তরে হাওয়ায় জাহাজ স্বচ্ছন্দ ধীর গতি যেতে লাগল। সোমবার দিন মণ্টারি উপসাগরের উত্তরপ্রান্ত কোণ, আনোনুয়েভো পার হলাম। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের জাহাজ ডায়নার সঙ্গে পথে বার্তা বিনিময় হল, সিটকা থেকে আসছে ওরা। মঙ্গলবার সকাল দশটায় আবার মণ্টারিতে নোঙর পড়ল। এগারো মাস আগে পিলগ্রীম থেকে যেমন দেখেছিলাম মণ্টারি তার থেকে একটুও বদলায় নি। সেই দক্ষিণের পাইন বন, উত্তরের ছোট নদী, সবুজ মাঠ, ধবধবে সাদা বাড়ী। লাল টালির ছাদ, দুর্গের তিনরঙা পতাকা, দূর থেকে ভেসে আসা দুন্দুভির শব্দ। সব মিলিয়ে একটা পরিচিত পরিবেশ। সাণ্টা বারবারার বিপরীত অভিজ্ঞতার পর দীর্ঘদিন বাদে এখানে এসে মনে হল যেন কতদিন পরে দেশে ফিরে এলাম।

॥ ২৭ ॥ নৃত্যোৎসব ॥

বন্দরে আর একটি রাশিয়ান সরকারী জাহাজ ছিল, আটটি কামান সমন্বিত। জাহাজে ছিলেন ক্যালিফোর্ণিয়ার পূর্বতন শাসনকর্তা। তিনি মাজাটলান অবধি জলপথে গিয়ে স্থলপথে ভেরাক্রুস যাবেন। আমাদের চিঠিপত্র নিয়ে তিনি ভেরাক্রুসে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের কাছে দিতে পারেন বললেন। আমরা সকলেই বাড়ীতে চিঠি দিলাম, ১লা জানুয়ারী ১৮৩৬ এই তারিখ দিয়ে। গভর্ণর তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন—চিঠিগুলি মার্চ মাসের মধ্যে বস্টন পৌঁছে গিয়েছিল—এত অল্পদিনে চিঠি পৌঁছন এক আশ্চর্য ঘটনা।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে পিলগ্রীম এখানে প্রতিদিন আমাদের অপেক্ষায় কাটিয়েছে। কেন না এইখানেই আমাদের মিলিত হবার কথা ছিল। ক্যাপ্টেন ফকন প্রত্যহ আমাদের খোঁজে পাহাড়ে গিয়ে দেখতেন। আমাদের না আসতে দেখে ওঁর স্থির বিশ্বাস জন্মে যে আমরা ঝড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। বহু জাহাজ ঐ ঝড়ে নোঙর ছিঁড়ে ভেসে গিয়েছিল। রোজা সান ডিয়াগোতে চড়ায় এসে আটকে যায়। পিলগ্রামকেও ঝড়ে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। শেষে ওরা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সান ডিয়াগোর দিকে চলে যায়।

তিন মাস হল একাদিক্রমে আমরা জাহাজ ছেড়ে নড়িনি। এখন কূলে নেমে ছুটি কাটাবার সুযোগ পাওয়া যেতে সকলেই উল্লসিত। রবিবার দিন যথারীতি সকালের কাজকর্মের পর খাওয়া শেষ হতেই আমরা যারা তীরে যাবার ছুটি পেয়েছিলাম ভাল করে সাবান দিয়ে গা রগড়ে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরের গা ঘষে দিয়ে বালতি করে এ ওর গায়ে জল ঢেলে দিতে লাগলাম। তারপর ধরাচুড়ো পরিধান। সাদা সুতী পাজামা, নীল কোর্তা, কালো গলাবন্ধ, সাদা মোজা, জুতো ও প্রচুর ফিতেওয়ালা টুপি মাথায় চড়িয়ে আমরা প্রস্তুত হলাম। রুমালের কোণে তিন চার ডলার বেঁধে নিতেই আমাদের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হল। নৌকায় করে কূলে গেলাম। শহরে পৌঁছে গির্জায় কি ধরনের উপাসনা হয় দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শুনলাম সকালে একবার ছাড়া আর প্রার্থনা হয় না। তখন আমরা শহরের আমেরিকান ও ইংরাজদের বাড়ী বেড়াতে গেলাম, পরিচিত অন্য মেক্সিকো-বাসীদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হল। দুপুরের দিকে ঘোড়া ভাড়া করে আমরা কারমেল মঠের দিকে গেলাম, শহর থেকে এক লীগ দূরে। সেখানে মাংস, ডিম, বরবটি, মদ ইত্যাদি আহার হল। অধ্যক্ষ কিছুতেই দাম নেবেন না। কিন্তু উপহার নিতে বিশেষ অনিচ্ছুক বোধ হল না। নীচু হয়ে অভিবাদন করে বললেন, "ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।"

তারপর অশ্বপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রগতি দৌড় দিয়ে সন্ধ্যার সময় শহরে এসে পৌঁছান গেল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে ঘোড়ায় চড়তে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, তারা এতক্ষণ শুঁড়িখানায় সময় কাটাচ্ছিল। নাবিকদের সঙ্গে ঘোড়া—এ যেন অহিনকুল সম্পর্ক, তাদের এইরকম ধারণা। দেখি স্থানীয় কিছু গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক তাদের কাছে জড় হয়েছে—প্রচণ্ড হৈ চৈ গোলমাল চলেছে। বোঝা গেল এই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকলে এদের টাকাকড়ি জামাকাপড় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। জোর করে ওদের টেনে নিয়ে গেলাম। স্থানীয় লোকেরা তাদের শিকার হাত ছাড়া হওয়াতে যারপর-নাই রেগে গেল। ডায়নার মাল্লারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মারপিট করে, ঝগড়াঝাঁটি করে জাহাজে ফিরবে না ভেবে আবার শহরে ফিরে যায়। পথে যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত। পরদিন ওদের জেল থেকে উদ্ধার করা

হয়। আমাদের জাহাজেও মাতালদের গণ্ডগোলে টেঁকা দায়। ছুটির দিনের শেষে যেমন হয়ে থাকে। ভোরের দিকে সকলকেই আবার উঠতে হল। মাথায় বিষম যন্ত্রণা, তার উপর জল ভেঙে চামড়া বয়ে আনা— নাবিক জীবনের যে কি সুখ তা হাড়ে হাড়ে অনুভব হচ্ছিল।

এরপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে আর একটি ব্যাপার ঘটে। দুটি কমবয়সী মাল্লার মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ হয়—সেই নিয়ে বেশ কিছুদিন আলোচনা চলল। বস্টনের স্কুল থেকে নবাগত জর্জের উপর কড অন্তরীপের ন্যাট বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। জর্জ চেহারা, বয়স ও অভিজ্ঞতা সবেতেই ছোট। তাছাড়া বেচারা এই প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছে, আস্তে আস্তে যতই আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল ও ক্রমেই নিজ স্বরূপ প্রকাশ করতে লাগল। ন্যাট কিন্তু শারীরিক পরাক্রমে ওকে সব সময় হারিয়ে দিত। একদিন বিকেলবেলা দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া শুনে আমরা উপরে এলাম, দেখি জর্জ বলছে ন্যাট যদি ন্যায়সঙ্গত ভাবে মারপিট করে তাহলে নাকি ও জর্জের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য। ক্যাপ্টেন তখন জাহাজে নেই। মেটই সর্বেসর্বা। মেট ওদের আপসে মিটমাট করে নিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তখন মেট আমাদের সকলকে ডেকের উপর দাঁড় করালেন, দাগ কেটে ছেলে দুটিকে সেখানে নিয়ে আসা হল। তারপর একটা দড়ির ফাঁস খুঁটিতে বেঁধে ডেকের এদিক থেকে ওদিক চালিয়ে দেওয়া হল। দড়িটি ওদের কোমর অবধি পৌঁছল। "দড়ির নীচে আঘাত করা চলবে না" মেট হুকুম দিলেন। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপর লড়ায়ে মোরগের মত লাফ দিয়ে পড়ল। ন্যাট ঘুঁষির আঘাতে বস্টনের ছেলেটিকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল—ও প্রতিমুহূর্তেই আশা করছিল প্রতিযোগী এইবার ধরাশায়ী হবে কিন্তু আঘাত পেয়ে জর্জ আরো ফুঁসে উঠছিল। যতবার পড় পড় হয় আবার উঠে মত্ত সিংহের মত গর্জন করে ওঠে, ঘুঁষির শব্দে দর্শকদের মনে দয়া হচ্ছিল ওর উপর। দাগ অবধি পৌঁছে গেল ও, চোখ বন্য পশুর মত জ্বলছে, গা থেকে জামা ছিঁড়ে পড়ে গেছে, ও বললে এখানে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ও লড়ে যাবে। শুনে সকলে বাহবা দিয়ে বলে উঠল, "সাবাস, সাবাস বেটা। এই তো মরদের মত কথা।" ন্যাটের মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছিল—দু একবার অন্যায়ভাবে আঘাত করার চেষ্টাও করল, কিন্তু মেটের কাছে বাধা পেল। তারপর

হঠাৎ কি হল বোঝা গেল না, ন্যাটের লম্ফঝম্ফ কেমন যেন মিইয়ে গেল। ইচ্ছা করে কি না বোঝা গেল না—ও যেন কেমন ইতস্তত করতে লাগল। ওর পক্ষে পরাজয় মানে চিরকালের মত দুর্বলের কাছে হার স্বীকার করা—আর জর্জের কাছে এটা আত্মসম্মান রক্ষার প্রশ্ন—নিজের মর্যাদারক্ষার লড়াই। যাই হোক যুদ্ধ শেষ হল। শেষ অবধি ন্যাটই পরাজয় স্বীকার করল—তবে তেমন আহত হয়নি ও। এরপর থেকে দুজনের মধ্যে আর কখনো মারপিট হয় নি। আমাদের চোখে জর্জের কদর অনেকটা বেড়ে গেল, আমরা ভাল করে ওর ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিলাম।

বুধবার, ৬ই জানুয়ারী, ১৮৩৬। মণ্টারি থেকে কয়েকজন মেক্সিকোবাসী যাত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়া হল—এবার সান্টা বারবারার দিকে। আমাদের সঙ্গে পিনোস অন্তরীপ অবধি গিয়ে ডায়ানা স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের দিকে মোড় ফিরল। রাত্রি অবধি আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করলাম—হাওয়া বেশ প্রবল। তারপর উপকূলের দিক থেকে হাওয়া বইল। আমাদের সঙ্গে এক মেক্সিকোবাসী যাত্রী ছিলেন, তাঁকে দেখে আমার "গিল ব্লাস" বইটির কয়েকটি চরিত্রের কথা মনে পড়ত। ওঁদের বংশে এখনও বিশুদ্ধ স্পেনীয় রক্ত প্রবহমান। এককালে প্রচুর যশ প্রতিপত্তি থাকলেও এখন কেবল বংশগৌরব ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ভদ্রলোকের পিতা ছিলেন জেলার শাসনকর্তা, সানডিয়াগোতে প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল, রেড ইণ্ডিয়ান দাসদাসীর সংখ্যা ছিল অগণিত। ছেলেকে শিক্ষালাভের জন্য তিনি মেক্সিকো পাঠান। সেখানে তিনি উচ্চতম সমাজে মেলামেশা করতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমেই অমিতব্যয়িতা ও বিষয়সম্পত্তিতে অমনোযোগের ফলে তাঁদের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হতে চলল। ডন জুয়ান ব্যানডিনি যখন মেক্সিকো থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি নানা গুণের অধিকারী হয়েছেন বটে কিন্তু অর্থোপার্জনে একেবারে অক্ষম। আভিজাত্যের গৌরবটুকু আছে, হৃদয়ে বাসনা অপরিমিত, উচ্চাশার আর অবধি নেই, কিন্তু কাজের বেলায় একেবারে অপটু, অবস্থার দুর্বিপাকে আহার অবধি জোটে কিনা সন্দেহ। প্রত্যেকের কাছে ধার—কিন্তু ঠাট বজায় রেখে চলতে গিয়ে সর্বস্বান্ত। অথচ তাঁদের অবস্থার কথা কারো কাছেই অবিদিত নয়। ভদ্রলোকের সুদর্শন চেহারা, ব্যবহার ও আচরণ অতি মার্জিত, ভাষা সভ্য, নাচে খুব দক্ষ। তাঁর জাহাজের ভাড়াটুকু পর্যন্ত

অন্যের দেওয়া। তবে লোকটি অতি সজ্জন, মাল্লাদের সঙ্গেও খুবই বিনয় নম্র আচরণ করতেন। স্টুয়ার্ডকে উনি বিদায় নেবার সময় চার রিয়েল বকশিশ দেন—ঐটুকুই ছিল ওঁর শেষ সম্বল। ওঁকে দেখে দুঃখ হত। জাহাজে আর এক যাত্রী ছিলেন—উত্তর আমেরিকার এক ব্যবসায়ী, স্থূলকায় এবং অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। বানডিনিদের যথাসর্বস্ব তাঁরই করতলগত হয়েছিল, তাদের জমি বাঁধা পড়েছে ওঁর কাছে, গৃহপালিত পশু থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় সম্পত্তি ওঁরই কুক্ষিগত—এখন ওদের শেষ সম্বল অলঙ্কারগুলি পর্যন্ত যায় যায়।

ডন জুয়ানের সঙ্গে এক অনুচর ছিল, তাকেও পিল ক্লাসের এক চরিত্র বলা যেতে পারে। লোকটি নিজেকে মুনশী বলে অভিহিত করত কিন্তু কোনদিন ওকে চিঠিপত্র লিখতে দেখিনি। লোকটি আমাদের সঙ্গেই থাকত, অতি বিচিত্র প্রকৃতির লোক। মনিবের সঙ্গে বহু জায়গায় বহু অবস্থায় কাটিয়েছে। ওর কাছ থেকে আমি মেক্সিকোর তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর জেনেছিলাম। আমাকে স্পেনীয় ভাষা শেখাতে ওর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কথ্য ভাষা ও নানা প্রবাদ-বাক্য ও প্রায়ই বলত আমাকে। ওর কাছে কতকগুলি মেক্সিকান সংবাদ-পত্রের টুকরো ছিল, তাতে পড়লাম সান্টা আনা বিজয়ী হয়ে ট্যামপিকো থেকে ফিরেছেন এবং টেক্সাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হচ্ছেন। "সান্টা আনার জয়" এই ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত, এমন কি ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত এই জয়ধ্বনি পৌঁছেছিল। যদিও এখানে অনেকে সান্টা আনার বিরোধী ছিলেন—ডন জুয়ান বানর্ডিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। সান্টা আনা নাস্তিক এবং মঠগুলি ভেঙে ফেলছেন এই ছিল তাঁদের অভিযোগ। এঁরা ছিলেন বাস্টামেন্টের সমর্থক। এইসব সংবাদপত্রে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কিছু কিছু খবর দেখলাম কিন্তু আঠারো মাস যাবৎ দেশের কোন সমাচার না জানায় এই সব খবরগুলি কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হতে লাগল। কৌতূহল জাগ্রত হল, কিন্তু সে কৌতূহল নিবৃত্ত করি কি করে? এক জায়গায় পড়লাম সার রবার্ট পিলের জায়গায় ভাইকাউন্ট মেলবোর্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। রবার্ট পিল যে মন্ত্রী হয়েছিলেন সেকথা জানা ছিল না। আর্ল গ্রে এবং ডিউক অফ ওয়েলিংটনের তবে কি হল? অন্যত্র দেখলাম ট্যানি আমেরিকার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। তবে কি মার্শাল পদচ্যুত

বা নিহত? ওখানে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা পড়লাম। শূন্যস্থানগুলি কল্পনায় পূরণ করা ছাড়া উপায় কি?

মণ্টারি ছাড়ার পর দ্বিতীয় দিন সকালে আমরা কনসেপশন অন্তরীপ পার হচ্ছি। উজ্জ্বল দিন, বেশ হাওয়া। দুমাস আগে এখানে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। এমন সময় যে মাল্লাটি একটি হালকা পালের দণ্ড লাগাচ্ছিল চেঁচিয়ে উঠল, "পাল, পাল, পাল দেখা যাচ্ছে"। "কোথায়, কোথায়?" "ডান দিকে"। অন্তরীপের দিক থেকে পালতোলা একটি জাহাজ এগিয়ে এল। আমরা পালের দড়ি নামিয়ে, দণ্ডগুলি টেনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জাহাজটি কাছে এল, ডেকে অনেক লোক, একদিকে চারটি করে কামান, যুদ্ধজাহাজের মত আকৃতি, কেবল মাল্লাদের পরিচ্ছদ ঠিক সেই অনুরূপ নয়। "কি জাহাজ?" "অ্যালার্ট", "কোথা থেকে?" এইভাবে কথাবার্তা চলল। ওরা স্যাণ্ড-উইচ দ্বীপ থেকে আসছে, নাম কনভয়, উদ্‌বিড়াল শিকার করা ওদের কাজ। কিন্তু নিষিদ্ধ মালের কারবারী, তাই অত অস্ত্রশস্ত্র। উদবিড়ালের দাম আছে, ও দেশের সরকার অনুমতি ছাড়া যথেচ্ছ শিকার করতে দিতেন না, আর শুল্কও প্রচুর। এই জাহাজটির অনুমতি পত্র ছিল না—এরা কাউকে কর'ও দিত না। গোপনে গোপনে অন্য জাহাজে মাল সরবরাহ করত। আমাদের ক্যাপ্টেন ওদের সাবধান হয়ে যেতে বললেন, কেন না মেক্সিকান জাহাজ আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। অবশ্য তাদের কারোই অস্ত্রসজ্জা এদের মত নয়। এই জাহাজটিই কয়েক মাস আগে সাণ্টা বারবারার কাছে দেখা গিয়েছিল। এই বেআইনী কাজে লিপ্ত জাহাজগুলি সাধারণতঃ কোন বন্দরে ভেড়ে না, মাঝে মাঝে কাঠ ও পানীয় জলের জন্য দ্বীপগুলিতে নোঙর ফেলে—নতুন সাজসরঞ্জামের দরকার হলে ওয়াহু ফিরে যায়।

রবিবার, ১০ই জানুয়ারী। সাণ্টা বারবারা। দক্ষিণে ঝড়ে বুধবার দিন নোঙর তুলে ভেসে পড়তে হয়েছিল। পরদিন আবার বন্দরে। আমরা একটি মাত্র জাহাজে ছিলাম ওখানে। পিলগ্রীম এখান দিয়ে এসে শহরের কাছে নোঙর ফেলেছিল; মণ্টারি থেকে ফেরার পথে ওরা এখানে এসে আমাদের নির্বিঘ্নে সানফ্রানসিস্কোয় পৌঁছন সংবাদ পায়।

আমাদের দালাল মহাশয়ের বিবাহ উপলক্ষে শহরে খুব উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল। পাত্রীর পিতা ডন অ্যাণ্টনিও নরীগা ক্যালিফোর্ণিয়ার

এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ডনা অ্যানিটা ডি লা গুয়েরা ডি নরীগা ই করীলোর বিবাহ। আমাদের পাচক তিনদিন ধরে শহরে গিয়ে নানাবিধ সুখাদ্য তৈরী করল, আমাদের ভাঁড়ারের অনেক কিছু ওর সঙ্গে দেওয়া হল। ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আমরা বিবাহের দিন কূলে উপস্থিত হলাম। সন্ধ্যাবেলা বিয়ের আসরে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। আমরা সেখানে যাবার অনুমতি পেলাম। জাহাজে ফিরে দেখি সম্মানসূচক তোপ দাগার আয়োজন চলছে। কামান প্রস্তুত করে প্রত্যেকটির সামনে এক একটি করে লোক মজুদ, নিশান উড়াবার জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। একটি কামানের সামনে আমার জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। কেবল ইঙ্গিতের অপেক্ষা। দশটার সময় পাত্রী তাঁর বোনের সঙ্গে কালো পোশাক পরে স্বীকারোক্তির জন্য গির্জায় প্রবেশ করলেন। এক ঘণ্টা পরে গীর্জার বিরাট দরজা খুলে গেল। বেসুরো ঘটাধ্বনির মধ্যে কনে বেরিয়ে এলেন, পরিধানে সাদা পোশাক, পিছন পিছন অন্যেরা। ক্যাপ্টেন কূল থেকে ইশারা করতেই আমাদের জাহাজ থেকে তোপধ্বনি বেজে উঠল—তার অনুরণন ফিরতে লাগল দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে পতাকা ও নিশান্-গুলি উপরে উঠে গেল। পনের সেকেণ্ড পরে পরে তোপধ্বনি হতে থাকল, সবসুদ্ধ তেইশবার। সন্ধ্যাবেলা আবার এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, আমরা ভাবলাম চারটি কামানওয়ালা জাহাজের পক্ষে এইভাবে সম্মান প্রদর্শন বেশ ভালোই হয়েছে।

খাওয়ার পরে নৌকার মাল্লাদের কূলে যাওয়ার কথা। আমরা ভাল পোশাক পরিচ্ছদ পরে 'নাচের আসরে যাবার জন্য প্রস্তুত। পাত্রীর পিতার বাড়ী তাঁবু খাটিয়ে কয়েক শ লোকের স্থান করা হয়েছিল। যেতে যেতে আমরা সেই পরিচিত গীটার ও বেহালা বাদ্য শুনলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি শহরের কারো আর আসতে বাকি নেই, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলেই ভিড় করেছেন, নাচবার জায়গাও প্রায় ভরা। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলারা সার বেঁধে বসে তালে তালে হাততালি দিচ্ছেন। সুরগুলি বেশ উত্তেজক, কয়েকটা যেন পরিচিত স্পেনীয় সুর থেকে প্রভাবান্বিত মনে হল। কিন্তু মেয়েদের নাচের ধরন দেখে একটু হতাশ না হয়ে পারলাম না। মাটির দিকে চোখ নিবদ্ধ করে শক্তভাবে হাত পা না তুলে ওরা তালে তালে পদক্ষেপ করছিল, পায়ের তলা অবধি কাপড়ে ঢাকা। কাজেই কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

গম্ভীর মুখ দেখে বোধ হল ওরা যেন পূজা উপাসনা করছে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা অনেকটা প্রাণচঞ্চল, স্পেনীয় নৃত্যে যেমন গতিভঙ্গী আশা করা যায় অনেকটা সেইমত। জড় পুত্তলিবৎ মেয়েদের সাথে পুরুষদের নাচ বেশ ভাল লাগছিল।

আমাদের পূর্বপরিচিত ডন জুয়ান বানডিনি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা শুনলাম। খানিক বাদে তিনিও উপস্থিত হলেন, সাদা প্যান্ট, গায়ে রঙের জামা। সাদা মোজা ও সরু মরক্কো চামড়ার চটিতে ওঁকে অত্যন্ত অভিজাত দেখাচ্ছিল। এমন সুন্দর ভঙ্গীতে উনি নাচলেন যে সকলেই মুগ্ধ। হরিণের মত লঘু পদক্ষেপে নাচছিলেন উনি। ওঁর হাল্‌কা শরীরে নাচের ভঙ্গীগুলি বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে উনি পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি স্পর্শ করছিলেন। অন্য সময়টা যেন হাওয়ায় ভাসছিলেন। অথচ মোটেই অতিরিক্ত বা লোক দেখাবার প্রয়াস করছিলেন না। ওঁর নাচ দেখে সকলেই খুব প্রশংসা করছিলেন। ভোজের পর ওয়ালজ আরম্ভ হল। এই নাচে কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই যোগ দেবার অধিকার। খুবই নৃত্যপটু না হলে এ নাচ করাও অসম্ভব। আমাদের বন্ধু ডন জুয়ান নববধূর বোন ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়ার সঙ্গে নাচে নেমে পড়লেন—তাঁর সঙ্গিনী খুবই রূপসী। ওঁদের নাচের সময় সম্পূর্ণরূপে ওঁদের জন্য আসর ছেড়ে দেওয়া হল, সকলে বারংবার হর্ষধ্বনি করে উঠছিল, যুবক-যুবতীরা মহানন্দে রুমাল ওড়াচ্ছিলেন। সেদিন রাত্রে একটি মজার খেলা আরম্ভ হল। একটু বিশিষ্ট রকমের খেলা। ডিমের মধ্যে সুগন্ধী ভরে সেই ডিম লোকেদের মাথায় ভাঙা। মেয়েরা ঐ ডিম লুকিয়ে সঙ্গে করে আনেন এবং পিছন থেকে ছেলেদের মাথায় ওটা ফাটিয়েই অন্তর্ধান করেন। সেই ভদ্রলোককে তখন মেয়েটিকে খুঁজে বার করে অনুরূপ অভ্যর্থনা করতে হবে। একজন বিরাট লম্বা চওড়া আকৃতির সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি পিঠের উপর হালকা স্পর্শ অনুভব করে তাকাতেই দেখি ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়া। উনি একবার আমাদের জাহাজে মণ্টারি অবধি গিয়েছিলেন, সেইজন্য ওঁকে আমরা সকলেই চিনতাম। ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়া ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে আমাকে একটু সরিয়ে দিয়ে ডনের মাথায় ডিমটি ফাটিয়েই লুকিয়ে পড়লেন। সমবেত হাস্যরোলের মধ্যে ডন ধীরে ধীরে পিছন ফিরলেন। মাথা থেকে সুগন্ধী গড়াচ্ছে! উনি খানিকক্ষণ খোঁজবার চেষ্টা করলেন। সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওঁর আর

বুঝতে বাকি ছিল না কার এই কাজ। ডনা আবার সম্পর্কে ওঁর ভাগনী হন। ওঁর খুব প্রিয় পাত্রীও বটে। কাজেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি করেন। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই খেলাটি অনেকক্ষণ ধরে চলল। থেকে থেকে প্রবল হাস্যরোল উঠছিল।

আর একটি বিচিত্র খেলা দেখলাম। যুবকেরা নৃত্যরতা তরুণীদের পিছন থেকে অতি সঙ্গোপনে নিজেদের টুপিটি পরিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইভাবে চোখঢাকা অবস্থায় খানিকক্ষণ নাচবার পর তরুণীরা টুপিটি ছুঁড়ে ফেলছিলেন, টুপির মালিককে তখন বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসে টুপিটি কুড়িয়ে নিতে হচ্ছিল—সেই দেখে দর্শকদের মধ্যে সে কি হাসির ধুম। অনেক মহিলারা আবার টুপি মাথায় রেখে নাচ শেষ করে টুপিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছিলেন—তখন টুপির মালিক অভিবাদন করে টুপিটি গ্রহণ করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এর তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। টুপিটি গ্রহণ করার অর্থ ঐ যুবককে সেদিনের মত সঙ্গদানে তরুণী অনিচ্ছুক নন। অনেক সময় কে যে টুপিটি পরিয়েছেন দেখতে না পাওয়ায় বেশ কৌতুকজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল।

দশটার সময় ক্যাপ্টেনের আদেশে আমাদের ফিরতে হল। জাহাজে ফিরে সঙ্গীদের কাছে এই নতুন অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। সাধারণতঃ এই ধরনের নাচ তিনদিন ধরে চলে। দিনের বেলা নিম্নশ্রেণীর নাচিয়েদের ভাড়া করে এনে নাচ চালিয়ে যাওয়া হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সন্ধ্যার আগে আসেন না। আমরা পরদিন দিনের বেলা একবার শহরে এসেছিলাম। তখন ঐপথে উঁকি মেরে দেখলাম বাজিয়েরা সেই একঘেয়ে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। শেষদিন রাত্রে আবার ধরাচূড়া পরিধান করে আমরা উপস্থিত হলাম, আমাদের সকলেই খুব সমাদর করল, বিশেষতঃ নাবিকদের সুন্দর পোশাকগুলি তো খুবই সমাদৃত হল। আমাদের দেশের নাচ দেখবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করলেন কিন্তু মেক্সিকানদের নাচের পর আমাদের নাচ তেমন জমবে না পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে জানা ছিল—কাজেই আমরা সে চেষ্টায় বিরত হলাম। আমাদের দালাল মহাশয় আর্টো বষ্টনের গলাবন্ধ কোট পরে যা নাচ নাচলেন তাতে মনে হল আমেরিকান নাচের যথেষ্ট নমুনা ওদের দেখান হয়েছে।

শেষের রাত্রি সকলেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চায়, কিন্তু ঝড়ের আশঙ্কায় আমাদের তাড়াতাড়ি চলে আসতে বাধ্য করা হল। এসে ভালই করেছিলাম, কেন না সে রাত্রেই নোঙর তুলে আমাদের ভেসে পড়তে হল। বারো ঘন্টা পরে ঝড় থামলে আবার বন্দরে ফিরলাম।

॥ ২৮ ॥ স্বদেশ সমাচার ॥

সোমবার, ১লা ফেব্রুয়ারী। একুশ দিন বন্দরে কাটিয়ে সান পেড্রো যাত্রা। সান পেড্রোতে আমরা সৌভাগ্যবশে অতি সহজেই পৌঁছে গেলাম। বাতাস একভাবে বইল, আমাদের প্রধান পালের দড়ি টেনে চললাম আমরা। আয়াকুচো ও পিলগ্রীম ওখানে ছিল। পাঁচ মাস বাদে আমার পুরাতন জাহাজের দর্শন পেয়ে বড় ভাল লাগল। ঐ জাহাজেই আমার নাবিক জীবনের প্রথম বছর কেটেছে, ওর সঙ্গে জড়িত কত পুরাতন স্মৃতি—বস্টনের সেই জাহাজ ঘাট, আমাদের যাত্রা, বিদায় নেওয়া—এই সব চিন্তা যেন অন্য এক জগতের সঙ্গে জড়িত ; সেখানে আবার কখনো পৌঁছব কিনা ঈশ্বরই জানেন। জাহাজে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রাঁধুনী দেখলাম আমার উপহার দেওয়া বাঁশীটি তখনো বাজাচ্ছে—আমাকে দেখে সকলেই যারপর নাই খুশী। সান্টা বারবারাতে আমাদের না দেখে ওরা প্রায় আমাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ওরা সান ডিয়াগো হয়ে গত একমাস যাবৎ সান পেড্রোতে আছে। পুয়েবলো থেকে তিন হাজার টুকরো চামড়া সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু হায়! সেগুলি পরদিনই আমাদের গর্ভে চলে গেল। ৪ তারিখে আমরা উভয়েই যাত্রা করলাম, আমরা সান ডিয়াগো, ওরা চলে-গেল সানফ্রানসিস্কো।

৬ তারিখে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। ওটাই আমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র—একটি গ্রীষ্ম ওখানে কাটিয়েছি—তাই এখানে ফিরে এসে মনে হল পরিচিত জায়গায় এলাম। একমাস আগে এখান থেকে রোজা ভালপারাইসো ও কার্ডিফ চলে গেছে, ক্যাটালিনা চলে গেছে ক্যালো। এখন বন্দর শূন্য। আমরা মাল নামিয়ে চার দিনের মধ্যে আবার যাত্রা করতে প্রস্তুত হলাম। এই শেষ বারের মত যাত্রা। তিরিশ হাজার টুকরো চামড়া ইতোমধ্যে জমা করে পরিষ্কার ও শুকিয়ে রাখা হয়েছে। পিলগ্রীম থেকে আরো [illegible]

পাওয়া যাবে তা যোগ করলেই আমাদের মালের পরিমাণ সম্পূর্ণ হয়। এবার যখন আমরা সান ডিয়াগো ছাড়ব তখন দেশের দিকে যাত্রা করা হবে ভাবতেই আনন্দে উত্তেজনায় মনে হল দেশে পৌঁছে গেছি বুঝি। অথচ তখনও বস্টন পৌঁছতে অন্তত এক বছর।

উপকূলে কানাকাদের চুল্লীতে একবার বেড়াতে গেলাম। ওদের সঙ্গে কতদিন আনন্দ করে কাটিয়েছি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম অবস্থা একেবারে অন্য রকম। দুজন বলিষ্ঠ সবল কানাকা যুবক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, দেখবার বা চিকিৎসা করার কেউ নেই। অনেকে বলেন দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে যে সভ্য মানুষ প্রথম পদার্পণ করে সেই দিন এই স্বাস্থ্যবান সুন্দর জাতির জীবনে নেমে আসে অভিশাপের ছায়া। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যজগতের যত রকম কুৎসিত ব্যাধি আছে সব প্রবেশ করে এই নির্জন দ্বীপবাসীদের জীবন কলুষিত করেছে। রোগে মহামারীতে নষ্ট হয়ে এখন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসীদের সংখ্যা প্রত্যেক বছরে এক চতুর্থাংশ করে কমছে। দুজন যুবকের মধ্যে একজন তবুও উঠে চলে বেড়াচ্ছে ও ধূমপান করছে, কিন্তু অন্যটির একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থা। চোখ ভিতরে ঢুকে গেছে, গাল বসা, হাতগুলো শীর্ণ, আর ভয়ঙ্কর কাশির প্রকোপে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। নড়বার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে তার। কানাকারা চিকিৎসার কীই বা জানে। এই দৃশ্য দেখে আমার মন অত্যন্ত অস্থির হল। আমার সেই অভিন্নহৃদয় কানাকা বন্ধু যার সঙ্গে চার মাস জলে জঙ্গলে কত সময় কাটিয়েছি তার এই দুর্দশা। আমাকে আসতে দেখে বেচারা দুর্বল হাত বাড়িয়ে মৃদু হাসলে, অতি ক্ষীণ গলায় আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালে। আমি যতদূর সম্ভব ওকে সান্ত্বনা দিলাম, আর ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ওষুধের বাক্সটি নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। ভাবলাম লোকটি এতদিন আমাদের হয়ে কাজ করেছে ক্যাপ্টেন নিশ্চয় ওর জন্য যথাসাধ্য করবেন। সেই রাত্রি চিন্তায় আমার ঘুমই এল না।

কানাকারা আমাকে শিক্ষিত বলে জানত। ওরা মনে করেছিল হয়ত চিকিৎসা বিদ্যাও আমার জানা আছে, তাই ওদের অনুরোধে আমি অসুস্থ লোকটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। সে

দৃশ্য জীবনে ভোলার নয়। আমাদের একজন পুরানো মাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে আমি পরে হোপকে দেখতে যাই—সে তার কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় অনেক রকম অসুখে নাবিকদের ভুগতে দেখেছে, কিন্তু এরকম নিদারুণ দৃশ্য দেখবার দুর্ভাগ্য তার কখনো হয়নি। আমার চোখের সামনে একটি লোক নিদারুণ যন্ত্রণায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে—আমি উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে লাগলাম।

পরদিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে ওঁকে হোপের কথা বললাম এবং ওকে দেখতে যেতে অনুরোধ করলাম।

"কি? একটা কানাকাকে?"

"ও অনেকদিন আমাদের হয়ে কাজ করেছে—চার বছর" আমি বললাম।

"জাহান্নামে যাক" বলে ক্যাপ্টেন সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ক্যাপ্টেন পরে সুমাত্রার উপকূলে অসুখ করে মারা যান—জানি না তাঁর কপালে শেষ সময়ে কতটুকু সেবা-শুশ্রূষা জুটেছিল।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সাহায্যের আশা বৃথা দেখে আমি এক বন্ধুর পরামর্শে মেটের কাছে গেলাম। বন্ধুটির কাছে একটি ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী ছিল, সেটা ও আমাকে দিল। ওষুধের সরঞ্জাম থাকত মেটের কাছে, মেট দয়ালু প্রকৃতির লোক। সব শুনে বললেন হোপকে ঠিক আমাদের অধীনস্থ কর্মচারী বলা যায় না, তবে যখন অসুখ করে তখন ও আমাদের কাজে নিযুক্ত ছিল, সেই হিসেবে ওকে ওষুধপত্র দেওয়া যেতে পারে। আমি সেই ওষুধ নিয়ে কূলে গেলাম। সেই দেখে কানাকাদের কি আনন্দ। খুশীর আতিশয্যে কত রকম কথাই যে ওরা আমাকে বললে, তার বেশীর ভাগই অবশ্য আমার বোধগম্য হল না। ওষুধপত্র আসতে দেখে হোপের অর্ধেক অসুখই সেরে গেল। আমি অবশ্য জানতাম ওর মৃত্যু নিশ্চিত, তবু বিনা চিকিৎসায় মারা যায় নি এতটুকু অন্ততঃ সান্ত্বনা থাকবে। ওকে হাওয়া না লাগাতে এবং শরীরের যত্ন নিতে অনুরোধ করলাম। ঐ চুল্লীর মধ্যে অবশ্য আলো হাওয়া আটকাবার বিশেষ কোন উপায় ছিল না। এরপর যতদিন আমরা ওখানে ছিলাম দুবার হোপকে দেখতে গিয়েছিলাম —ও প্রতিজ্ঞা করেছিল আমার কথামত চলবে ও নিয়মিত ওষুধ খাবে।

১০ তারিখে বেরিয়ে পড়ে আমরা সান পেড্রোর দিকে যেতে লাগলাম। তিন দিন হাওয়ার দৌরাত্মে বেশীদূর পথ অতিক্রম করা গেল না। চতুর্থ

দিনে এল দক্ষিণে ঝড়। পাল গুটিয়ে চললাম। উলটো দিক থেকে আয়াকুচোকে আসতে দেখা গেল—ওরা চলেছে সান ডিয়াগো। সান পেড্রোতে আবার সেই পুরোনো জায়গায় নোঙর ফেলে তিন সপ্তাহ ধরে সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি—পাহাড়ের ঢাল বেয়ে থলে বহন করা, পাথুরে জমির উপর দিয়ে চামড়া মাথায় করে চলা আর ঝড় উঠলে নোঙর তুলে পলায়ন।

একটিমাত্র বাড়ী ছিল কূলে। তার অধিবাসীটিকে ক্যালিফোর্ণিয়ার পশুপালকদের একটি প্রতিনিধি বিশেষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার জীবনের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। সে প্রথমে ফিলাডেলফিয়াতে দরজীগিরি করত, নানা অমিতাচার করে অর্থাভাবে পড়ে তাকে দেশ ছাড়তে হয়। এক শিকারীদের দলে যোগ দিয়ে যায় কলম্বিয়া নদীর কূলে, সেখান থেকে মণ্টারি, তারপর সেখানে সর্বস্বান্ত হয়ে দল ছেড়ে পালিয়ে আসে পুয়েবলো ডি লস এঞ্জেলস। সেখানেও জুয়া খেলে হয় অতি শোচনীয় অবস্থা। শেষে সান পেড্রোতে এসে সুমতি হল—এখানে আবার পুরোনো ব্যবসা, জামা সেলাই-এর কাজে মন দিয়েছে। আর কখনও মদ বা জুয়ার ধার দিয়েও যাবে না বলে শপথ করেছিল, সেকথা আমরাও বহুবার শুনেছি, দিন কয়েক বাদে একদিন দরজী মহাশয় সেজেগুজে শহরের দিকে রওনা হলেন, সঙ্গে তৈরী জামা, সেগুলি বিক্রি করতেই নাকি যাওয়া। পরদিন আরো অর্ডার নিয়ে ফিরে আসবেন। একদিন যায়, দুদিন যায়, পক্ষকাল কেটে গেল, শেষে একদিনঃ একটি লম্বা মত লোককে রেডইণ্ডিয়ানদের গাড়ী থেকে নামতে দেখা গেল। লোকটিকে দেখতে অনেকটা দরজীর মত, তবে কাছে গিয়ে দেখা গেল তার অতি করুণ অবস্থা। খালি পা, পরণে একটি ময়লা জামা ও পুরোনো প্যাণ্ট, সবুজ রঙের চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা, যথাসর্বস্ব খোয়া গেছে। আমাদের কাছে সব স্বীকার করল বেচারা, আবার পুরোনো রোগে ধরেছে। মাসখানেক তার আর কোন কাজ করার ক্ষমতাই ছিল না। ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে এক শ্রেণীর ইংরাজ ও আমেরিকান ভাগ্যান্বেষী এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, এই দরজীকে দেখেই তাদের ধরন অনেকটা বুঝতে পারা যায়। রাসেল নামে সান ডিয়াগোতে আমাদের মাল-গুদামের রক্ষকও অনেকটা এই প্রকৃতির ছিল। আমি চলে আসার পর শুনেছিলাম ওকে অসৎ আচরণের জন্য ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ও নিজের সমস্ত টাকাকড়ি ছাড়াও গুদামের ভাঁড়ারের যাবতীয় জিনিস স্থানীয় বর্ণসঙ্করদের পিছনে খরচ করেছিল। শেষে দুর্গেও যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল। সেখানে কোন অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ায় ওকে ধরবার জন্য লোকজন অশ্বারোহী ও কুকুর নিয়ে ওকে খুঁজে বেড়াতে থাকে। একদিন রাত্রে আচমকা আমাদের গুদামে ঢুকে পড়ল রাসেল, ধূলি ধূসরিত চেহারা, জামা কাপড় ছেঁড়া, ফ্যাকাসে ভীত চেহারা। তিনদিন নাকি আহার নিদ্রা নেই, এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের সেই মহিমময় কর্মচারী শ্রীরাসেল শেষে আহার ও বাসস্থানের জন্য কানাকাদের কাছে অনুনয় বিনয় করছেন। ভাগ্যের কি পরিহাস। শেষকালে ধরা পড়ে রাসেলের জেল হল।

সানফ্রানসিস্কোতে এই ধরনের আর একটি কৌতুকজনক চরিত্রের সংস্পর্শে আসি। ক্যালিফোর্ণিয়া জাহাজটিতে লোকটি প্রথমে মাল্লা ছিল, পরে পালিয়ে গিয়ে আরম্ভ করে ঘোড়াচুরির ব্যবসা। আমরা যখন সানফ্রানসিস্কোতে তখন ও সে অঞ্চলেই বাস করছিল। একদিন সকালে আমরা নৌকা নিয়ে কূলে গেছি, দেখি ঘাটে ও দাঁড়িয়ে, পরনে স্থানীয় লোকেদের মত পোশাক, চওড়া টুপি, ফিকে হয়ে আসা মখমলের প্যাণ্ট ও কাঁধে শাল। আমার নৌকায় জাহাজে গিয়ে ও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমরা শুনে ভাবলাম ক্যাপ্টেন এর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে হয়। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা, সে নিজেকে একটা মস্ত কেউকেটা মনে করে বোঝা গেল। আমরা ওকে জাহাজে তুলে দিয়ে যে যার নিজের কাজে চলে গেলাম, কিন্তু আমাদের নজর উপরের পাটাতনের দিকে, যেখানে ক্যাপ্টেন পদচারণা করেন। ছেলেটি সপ্রতিভ ভাবে উপরে উঠে গেল। তারপর টুপি খুলে ক্যাপ্টেনকে অভিবাদন জানালে। ক্যাপ্টেন টমসন ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে ওর আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "তুমি আবার কে?" বলেই যেমন পায়চারি করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন। এরকম অভ্যর্থনার অর্থ বুঝতে দেরী হওয়ার কথা নয়। মাল্লাদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল—এ ওর দিকে চেয়ে চোখ মটকালাম আমরা। ছেলেটি ক্যাপ্টেনের কাছে সুবিধা হল না দেখে মেটের সঙ্গে গল্প জুড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু মেট কাজের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন, ওর দিকে নজর দেবার সময় নেই। একটু আগেই ক্যাপ্টেনের আচরণ

দেখেছিলেন মেট, কাজেই উনিও সাবধান হয়ে গেছেন। আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে উনি মোটেই প্রস্তুত নন। দ্বিতীয় মেট ছিলেন উপরে, তৃতীয় মেট আমার সঙ্গে একটি নৌকা রং করছিলেন, লোকটি কাছে আসতেই আমরা চোখ চাওয়াচায়ি করলাম। তৃতীয় মেট কোনরকম উচ্চবাচ্য করলেন না। তারপর একে একে সকলের কাছে গিয়ে বেচারাকে বিফল হয়ে ফিরে আসতে হল। ওকে নিয়ে আমরা সকলেই বেশ মজা পেয়ে গিয়েছিলাম। খানিকপরে রেলিঙে ঝুঁকে নীচের তলায় চেয়ে দেখি ও রাঁধুনীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কি শোচনীয় অধঃপতন—একেবারে সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদ। রাত্রে খাবার ডাক পড়ল। বেচারা অপেক্ষা করেছিল ওকে কেউ আমন্ত্রণ করবে এই আশায়, যখন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই একে একে খেতে চলে গেলেন তখন ও ঘোরাঘুরি করতে লাগল, যদি মিস্ত্রীদের সঙ্গে ওর ডাক পড়ে। সে গুড়েও বালি। ওর অবস্থা দেখে আমাদের করুণা হল। ওকে একপাত্র চা দিয়ে আমাদের সঙ্গে খাবারের পাত্রে হাত লাগাতে আমন্ত্রণ জানালাম। তখন রাত হয়েছে, এদিকে ক্ষিদেও পেয়েছে—বেগতিক দেখে বেচারা মাল্লাদের সঙ্গে খেতে বসার মত নীচ কাজেই প্রবৃত্ত হল। ভদ্রবেশী খোলস আর টিকল না। আমাদের সঙ্গে এবার সমানে হাসিঠাট্টা চলতে লাগল। ওর অভিজ্ঞতার কথা শুনে বেশ জ্ঞানলাভ করা গেল। লোকটি খুবই চতুর ও অবিবেকী, নানারকম অসৎ কাজ করেছে জীবনে।

শনিবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী। সান পেড্রোর পোতাশ্রয়ের মত অসুবিধার জায়গা আর দুটি নেই। একটু ঝড় উঠলেই বিপদ। আজ মধ্যরাত্রে ভীষণ ঝড়ের জন্য নোঙর তুলে ক্যাটালিনা দ্বীপের ধারে গিয়ে দাঁড়াতে হল। তিনদিন সেখানে কাটল, তারপর ফিরে এলাম।

মঙ্গলবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। বিকেলে তীর থেকে ইঙ্গিত পেয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়া হল। প্রতিনিধি মশায়ের এক কেরানী হাতে একটি বাণ্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়ে। সান্টা বারবারা থেকে সুসমাচার এসেছে শুনলাম। "কি ব্যাপার, দালাল মশাই পটল তুলেছেন নাকি?" "না, হে না। তার চেয়েও ভাল খবর। ক্যালিফোর্ণিয়া এসে পৌঁছেছে।" তার মানে চিঠিপত্র, কাগজ, বাড়ীর খবর, পুরোনো বন্ধুদের দর্শন—আমাদের বুকের মধ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু বাণ্ডিলটি ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কারো খোলার

অধিকার নেই, অগত্যা আমরা অস্থির মনকে সংযত করে দাঁড় বেয়ে চললাম। জাহাজে রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন মেট—আমরা চিৎকার করে বললাম যে ক্যালিফোর্ণিয়া এসে পৌঁছেছে। মেট সঙ্গেসঙ্গে জাহাজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ঘোষণা করে দিলেন, "ক্যালিফোর্ণিয়া এসেছে—বস্টনের খবর এসেছে।"

জাহাজে তারপর যে কি রকম বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হল সেটা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

রাঁধুনী মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলে, "কি মিঃ ব্রাউন, হাতে ওটা কি? ক্যালিফোর্ণিয়া এসেছে শুনছি।"

"হ্যাঁ হে কালোমানিক। তোমার গলি থেকেও চিঠি আছে একটা।"

চিঠির বাণ্ডিলটি ক্যাপ্টেনের কেবিনে পৌঁছে দেওয়া হল—সকলেই উৎকণ্ঠায় অধীর। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছু হল না। শেষে কর্মচারীরা আবার আগেকার নিয়মশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তৎপর হলেন। কাজ করার সময় কথা বলা বন্ধ। তারপর যখন ষ্টুয়ার্ট এসে প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে গেল আমরা মুখ বন্ধ করে যে যার তোরঙ্গে রেখে এলাম। কাজ শেষ না হওয়া অবধি খুললাম না।

নাবিকদের মধ্যে একটা অহেতুক রুক্ষ ভাব আছে, যেটাকে পৌরুষেরই নামান্তর বলে মনে করা যেতে পারে। এর জন্য অনেক সময় ওদের নিষ্ঠুর বা ভাবলেশহীন বোধ হয়। যদি কেউ অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় তাকে নিয়ে নাবিকরা ঠাট্টা করে, সামান্য আঘাতকে তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হয় না। সমুদ্রের বুকে বিপদ-আপদ নিয়ে যাদের কারবার তাদের কি কোমল অনুভূতি থাকলে চলে? রুগ্ন ও অসুস্থ লোকদের প্রতি নাবিকদের কোন সহানুভূতি নেই। তাদের কাছে সব কিছুই রসিকতার বস্তু, কোন প্রিয়জন বা আত্মীয়স্বজন তার থেকে বাদ যেতে পারে না। সব কিছু সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন নাবিকরা খুবই বাহাদুরি বলে মনে করে। এইজন্য জাহাজে টিঁকে থাকতে গেলে গায়ের চামড়া অত্যন্ত মোটা হওয়া প্রয়োজন। কোমলপ্রবৃত্তির লোকেদের এখানে স্থান নেই। চিঠিপত্র পেয়ে ক্ষণিকের জন্য দেশের কথা, প্রিয়জনদের কথা মনে হল। তারপর আবার যে কে সেই। জাহাজী জীবনের স্থূল প্রবৃত্তিগুলি ফিরে এল—কেউ

সামান্যতম অস্থিরভাব দেখালেই তাকে হাসিঠাট্টায় জর্জরিত করা—এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

খাওয়ার পর চিঠি খোলার পর্ব। চিঠিগুলি যতই ব্যক্তিগত হোক না কেন প্রত্যেককে চেঁচিয়ে পড়তে হবে যাতে অন্যেরাও তার ভাগ পায়। আমি নির্জনে পড়ার জন্য ছুতোরদের ডেকে চলে গেলাম,সেখানে অন্তত কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। আমি দেশ ছাড়ার ঠিক এক বছর পরে লেখা চিঠি, সকলেই ভাল আছে—জেনে অনেকটা স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু চিঠি লেখার পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে—এর মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে কে জানে। দেশের বাইরে থাকলে মনে হয় না জানি কত নতুন নতুন জিনিস ঘটছে কিন্তু যারা সেখানে আছে তাদের কাছে জীবন সেই বৈচিত্র্যহীন ভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে।

আমার ব্যক্তিগত ভাব যাই হোক না কেন মাল্লাদের মহলে একটি ঘটনায় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রী বস্টন ছাড়বার আগে বিয়ে করে এসেছিল। নববিবাহিতের বিরহে এতদিন বেচারা বড়ই কষ্টে ছিল, কিন্তু অন্তত স্ত্রীর একটি চিঠি পাবে এই আশায় বুক বেঁধেছিল। এখন সকলের চিঠি দেওয়া হয়ে গেল কিন্তু মিস্ত্রী বেচারার কোন চিঠি নেই। ক্যাপ্টেন আর একবার দেখলেন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। মিস্ত্রীর তো সেদিন মুখে আহার রুচল না। সকলেই ওকে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। পালের মিস্ত্রী প্রবোধ দিয়ে বললে একটা মেয়ের জন্য খাওয়া ছেড়ে দেবে এ কেমন নির্বোধের মত আচরণ। তোমাকে না হাজারবার বলেছি বৌয়ের কাছ থেকে খোঁজখবর পাবার আশা ছেড়ে দাও!

ছুতোর মিস্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে "স্ত্রী থাকার মর্ম তুমি কি বুঝবে ভাই!"

"আমি বুঝবো না।" পালের মিস্ত্রী তারপর সেই সব পুরোনো গল্প আর একবার ফেঁদে বসল,কি করে চার বছর আগে টাকাকড়ি নিয়ে নিউইয়র্ক ফিরে ও বিয়ে করল, চারতলা একটি বাড়ীতে দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে সুন্দর সুন্দর আসবাব কিনে সাজাল—এর মধ্যে ছিল বারোটি ভালো চেয়ার—আসবাব সম্বন্ধে কোন আলোচনা হলেই ও তার মধ্যে সেই বারোটি চেয়ার না এনে ক্ষান্ত হত না—তারপর কি করে স্ত্রীর হাতে অর্ধেক মাইনে তুলে দিয়ে ও মূর্খের মত আবার সমুদ্রযাত্রা করল—ফিরে এসে কোথায় স্ত্রী, কোথায় টাকা,

কোথায়ই বা সেই চেয়ার ! জামাকাপড় জুতোর পর্যন্ত চিহ্ন নেই। তারপর থেকে ওর স্ত্রী নিখোঁজ—খবর নেবার ওর কোন প্রবৃত্তিও হয়নি। তারপর পোপের বাণী উদ্ধৃত করে ও স্ত্রীজাতির দোষ ব্যাখ্যা করতে বসত। শেষে বলত "না ভাই, মরদের মত হও, ওঠ, হাস, খাও দাও। ঐ ঘাগরাপরা জীবগুলোর জন্যে এমন বোকামি কোরো না। বৌয়ের কথা ছেড়ে দাও, তার মুখ আর এ জন্মে দেখতে হবে না—তুমি কড অন্তরীপ ছাড়ার আগেই সে ভেগেছে। টাকাটা জলে গেল—যাই হোক, ঠেকে শেখে লোকে—তোমারও শিক্ষা হল, আর কি করা যাবে। মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই।"

এই ধরনের সান্ত্বনাবাক্য সকলে মিলে বলতে লাগল, কিন্তু তাতে ছুতোর বেচারার দুঃখের কিছু উপশম হল বলে মনে হয় না। বেশ কদিন সে অত্যন্ত বিরসবদনে ঘুরে বেড়াল, মাল্লাদের ঠাট্টা তামাশা সহ্য করে।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী। সান্টা বারবারার দিকে পাল তুলে যাত্রা, পৌঁছলাম রবিবার। ক্যালিফোর্ণিয়া তার তিন দিন আগে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে—মাল নামাবার ছাড়পত্র নিয়ে যাবে সানফ্রানসিস্কো। ক্যাপ্টেন আর্থার ক্যাপ্টেন টমসনের জন্য বস্টনের কিছু সংবাদপত্র রেখে গিয়েছিলেন। সেগুলি উচ্চ কর্মচারীদের পড়া হয়ে যাবার পর তৃতীয় মেটের সাহায্যে আমি পড়তে পেলাম। ১৮৩৫ সালের আগস্ট মাসের "বস্টন ট্রানস্ক্রিস্ট" তাছাড়া বিভিন্ন তারিখের আরো প্রায় ডজন খানেক অন্য কাগজ। অপরিচিত পরিবেশে দেশের কাগজ পড়তে পারা এক আশ্চর্য অনুভূতি। চিঠিতে ঠিক এই স্বাদ থাকে না। কাগজ পড়তে পড়তে মনে হয় যেন দেশের মাটিতে পৌঁছে গেছি—অনেকটা দিব্যদর্শনের মত। রাস্তার নাম ও বিজ্ঞাপনগুলি যেন পরিষ্কার রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন-গুলি যেন কথা বলে ওঠে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস আরম্ভ হওয়ার খবরও পড়লাম, আমার সহপাঠীদের পরীক্ষার ফলাফল বিস্তারিত ভাবে দেওয়া ছিল। বর্ণানুক্রমিক ভাবে দেওয়া তাদের নামের তালিকাটি পড়তে পড়তে যেন তাদের সেই পরিচিত ভঙ্গীতে দেখতে পেলাম। কল্পনা করলাম তারা মঞ্চে উঠে যে যার নিজের বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। একজনের কথা মনে পড়ল, তার সুদর্শন চেহারা, বাগাড়ম্বর ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। আর একজনকে স্পষ্ট দেখলাম—ধীমান, স্থিরবুদ্ধি ছেলেটি অটল আত্মবিশ্বাস সহকারে বক্তৃতা করছে। আর একজনের কথা মনে

হল—সে বড় কোমল স্বভাব ও অভিমানী। মানসচক্ষে আরো অনেকে উদিত হল কেউ বিতর্ক সভার মধ্যমণি—তাদের কত রকম ভাবোচ্ছ্বাস। ভাবলাম তারা একে একে সভাপতি মশায়ের কাছ থেকে ডিগ্রী নিতে উঠে আসছে আর তাদেরই এক সহপাঠী এখন ক্যালিফোর্ণিয়ার বিজন সমুদ্রতটে হাঁটছে—মাথায় কাঁচা চামড়ার বোঝা।

প্রতিদিন পাহারার পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজগুলি পড়তাম, যাতে কোন খবর বাদ না পড়ে। বেশীদিন রাখতেও লজ্জা হল। ফেরত দিতে হল অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে।

রবিবার, ৫ই মার্চ। এ দিনটি একটি বিশেষ আনন্দের বার্তা বহন করে আনল। আজ আমরা প্রথম ক্যাপ্টেনের মুখে শুনলাম আমাদের যাত্রা এবার সত্যিই সমাপ্তির পথে। এবারে সান পেড্রো অভিমুখে যাওয়া হবে কিন্তু আর উলটোপথে আসা হবে না—এ যাওয়াই শেষবারের মত যাওয়া। ক্যাপ্টেন কূলে লোকেদের কাছে করমর্দন করে বিদায় নিলেন, বললেন, আর সান্টা বারবারাতে আসা হবে না। এই দেখে আমরা আরো আশান্বিত হলাম। আমরা মনের সুখে দাঁড় বেয়ে সান্টা বারবারার তরঙ্গরাজির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম, মনে মনে দক্ষিণে ঝড়কে নমস্কার জানিয়ে। খবরটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হল না। সকলেই শেষবারের মত শহরের দিকে তাকিয়ে নিল। পয়সার লোভেও আর এখানে তারা থাকতে রাজী নয়, এমন কথাও শপথ করে বলতে লাগল সবাই। নোঙর তুলে বাঁধার সময় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সকলে এসে হাত লাগাল—মনে হল যেন দেশের পথে যাত্রা শুরু হল। অথচ তার পরেও আমরা ঐ উপকূলে আরো তিন মাস ছিলাম।

জর্জ মার্শ নামে যে ইংরাজ যুবকটির আগে উল্লেখ করেছি তার কাছ থেকে খুবই আকস্মিক ভাবে আমাদের বিদায় নিতে হল। জাহাজ ছাড়বার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আয়াকুচোতে ওকে দ্বিতীয় মেট পদের জন্য আহ্বান জানায়—এমন লোভনীয় পদের জন্য যদিও ওর দেশে ফিরতে দেরী হবে কিন্তু ও উন্নতির এই সুযোগ হাতছাড়া হতে দিল না। জর্জের যোগ্যতা ছিল ঠিকই, তবে ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। আমার প্রথম থেকে ধারণা ছিল ও আমাদের কাছে ওর অতীত সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছে, কেন না ও যে খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে সেটা ওর চালচলনেই

বোঝা যেত। যাবার সময় ও মাল্লাদের সকলকে টাকা উপহার দিয়ে গেল, কেবল আমাকে ছাড়া। আমার হাত ধরে করমর্দন করার সময় ও একবার মাথা নোয়ালে—যেন বলতে চাইলে আমরা পরস্পরকে বুঝি। তারপরেই লাফিয়ে জাহাজে উঠে পড়ল। আমার মনে হয় সুযোগ পেলে হয়ত শেষ মুহূর্তে আমাকে ওর জীবনের ইতিহাস জানাতে ও কুণ্ঠিত হত না। আমি যে ওর বানানো গল্পে একদিনের জন্যও বিশ্বাস করি নি সেকথা ও ঠিক্ই জানত। ওর সঙ্গে ভবিষ্যতে আর দেখা হবে কিনা জানি না। ওর সেই পেলুদ্বীপের রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত কোনদিন ছাপা হবে কি না কে জানে। যাদের জীবনে গতানুগতিকের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি তাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন যে জর্জের মত কত লোক পৃথিবীতে আছে। মানুষকে যে কত উদ্ভট অবস্থায় কত রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি জানা থাকলে আমাদের অভিজ্ঞতার কেন্দ্র খানিকটা বিস্তৃত হবে সন্দেহ নেই। জীবনের পথ যে বন্ধুর, জটিল ও সর্পিল সেকথা জানারও প্রয়োজন আছে।

দুদিন পরে সান পেড্রো। আরো দুদিন। তারপরে কি আনন্দ! আমরা ক্যালিফোর্ণিয়ার নরক ছেড়ে যাত্রা করলাম। সান পেড্রো যেন নাবিকদের জব্দ করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। শেষবারের মত সেদিকে তাকালাম। মনে এতটুকু আক্ষেপ হল না। দিনের পর দিন খালি পায়ে ঐ পাথুরে জমির উপর দিয়ে মাল টেনেছি, মাথায় করে বোঝা নিয়ে চড়াই ভেঙেছি, ঢেউ-এর ধাক্কায় ভিজে দিনরাত কাটিয়েছি ঐ দ্বীপে, সঙ্গী বলতে রাশি রাশি কাঁচা চামড়া, নির্জনতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কেবল কর্কশ পেঁচা ও বুনো শেয়ালের ডাক।

বিদায় নেবার সময় মনে হল আমার অধীনতা পাশের শিকল একটি একটি করে খুলে পড়ছে। বাতাস কূলের দিক থেকে, সেজন্য উপকূল থেকে দূরে যাইনি। সেদিন রাত্রেই সান জুয়ান ক্যাপিসট্রানো মঠ পার হবার সময় চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল সেই খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল, যেখানে সামান্য কয়েক টুকরো চামড়ার জন্য আমাকে একদিন প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হয়েছিল।

পরদিন সকালে সান ডিয়াগো। জোয়ারের টানে জাহাজ ভিতরে ঢুকে একেবারে মাল গুদামের সামনে নোঙর ফেলল। বেশ কিছুদিনের মত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হবে। এই শেষ বন্দর। এখানে জাহাজ

পরিষ্কার করে, সব কিছু নামিয়ে, চামড়া ভরে, জ্বালানি কাঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করে আমরা বস্টনের দিকে রওনা হব। এই সব কাজের জন্য নিরাপদ স্থান চাই—তাই এই বন্দরে আগমন। আমরা পাল নামিয়ে পালদণ্ডগুলি খুলে ফেললাম, মাস্তুলগুলিও নামিয়ে রাখা হল। যে সব বাড়তি দণ্ড ও পাল ছিল সেগুলি নামিয়ে গুদামজাত করা হল। তারপর চামড়া, শিং প্রভৃতি নামান—জাহাজে কেবল ভার ঠিক রাখার লোহার টুকরোগুলি ছাড়া আর কিছুই রইল না। দিনের কাজ সেরে আমরা রাত্রে গোল হয়ে বসতাম, ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে চলত গল্প। কতদিন ধরে আমরা এই শুভদিনের অপেক্ষা করে এসেছি, যেদিন পালমাস্তুল নামিয়ে আমরা বলব এই শেষ বার। আজ সেই দিন আগত। দু মাস কঠিন পরিশ্রম চলল, কিন্তু দেশে ফেরার আনন্দের কাছে সেসব কিছুই নয়। বিদায় ক্যালিফোর্ণিয়া।

॥ ২৯ ॥ ফেরার প্রস্তুতি ॥

ভোর রাতে তারার আলো মিলিয়ে যাবার আগেই আমাদের ডাক পড়ল। সেটা জেনেই আমরা সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। উঠে জাহাজের খোলের ভারী লোহার টুকরোগুলো প্রথমে সরাতে লাগলাম। বন্দরের নিয়ম অনুযায়ী কোন ভারী জিনিস বাইরে ছুঁড়ে ফেলা যাবে না। সুতরাং আমরা লম্বা নৌকাটা এনে তাতে তক্তাগুলো বোঝাই করতে লাগলাম। কিন্তু একটা নৌকার ভিতরে পড়ে তো কুড়িটা পড়ে বাইরে। সব জাহাজই অবশ্য এই কর্ম করে পরিশ্রম বাঁচায়। নৌকাগুলো বোঝাই করে দাঁড় বেয়ে কূল অবধি নিয়ে গিয়ে ওগুলো খালি করা প্রায় এক সপ্তাহের কাজ। যখন দুর্গের লোকেরা কাছাকাছি থাকে তখন নৌকাটি কাছে এসে সাবধানে লোহার খণ্ডগুলো ভিতরে ফেলা হয়—কিন্তু আশেপাশে কেউ না থাকলেই আবার এলোপাথাড়ি ছোঁড়া। অনুন্নত বিদেশী রাজ্যে গিয়ে প্রায় প্রত্যেক জাহাজই এই ধরনের জোচ্চুরীর আশ্রয় নেয়। আরো যেসব অসৎ কর্ম প্রচলিত আছে তার তুলনায় এ অবশ্য কিছুই নয়। তবে মাল্লারা হুকুমের বান্দা। তারা কোন কুকর্মের ভাগী নয়। কিন্তু এই ধরনের কাজ যে সদাসর্বদা সংঘটিত হচ্ছে সেটা জেনে পরের অধিকারের প্রতি একটা উদাসীন ভাব না এসে পারে না।

শুক্রবার সমস্ত দিন ও শনিবারের কিছুটা এই কাজে গেল। মালের জন্য জায়গা করে কেবল মালের নীচে যতটুকু ওজন রাখা দরকার সেইটুকু রেখে বাকিটা ফেলে দেওয়া হল। তারপর দিন রবিবার। জাহাজের খোলে কয়লা, গাছের ছাল ইত্যাদি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সমস্ত ধোঁয়া বেরোবার পথ বন্ধ করে কেবিন ও মাল্লাদের থাকবার জায়গা থেকে সব জিনিসপত্র সরিয়ে দিলাম আমরা। ক্যাপ্টেন ও অন্য কর্মচারীরা সেদিন খোলা ডেকে ছাউনির নীচে ঘুমোলেন। আমরা একটা পালের নীচে শোবার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন মনে হল আগুন হয়তো বেড়ে উঠতে পারে, তাই হুকুম হল জাহাজ ছেড়ে কেউ যেন এক পা না নড়ে। ডেকে জিনিসপত্র ভর্তি, ধোয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, আমাদের সারাদিন কোন কাজ নেই। বইগুলো এমন জায়গায় ঠাসা যেখান থেকে বার করা অসম্ভব। একজনের মনে পড়ল রান্নাঘরে একটা বই পড়ে আছে, সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে নিয়ে এল। বইটি উডস্টকের লেখা। অপ্রত্যাশিত এই লাভে মহা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, সকলে তো একসঙ্গে পড়তে পারে না তাই সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে সেটি পড়তে দেওয়া হল। আমাকে ঘিরে বসল ছ-সাতজনের একটি দল—অন্যেরা আমাদের পড়াশুনার বাতিককে উপহাস করে অন্যদিকে গিয়ে গাল-গল্পে মন দিল। কিন্তু আমার শ্রোতাদের মনোযোগ অক্ষুণ্ণ, তারা খুবই আগ্রহ করে শুনতে লাগল। পড়তে পড়তে আমার সন্দেহ হচ্ছিল রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি বোধ হয় ওদের বুঝতে অসুবিধা হবে, তাই ওগুলি বাদ দিয়ে কেবল কাহিনীটুকু পড়ছিলাম। শুনে ওরা বেশ আমোদ পাচ্ছিল। নীতিবাগীশদের গোঁড়ামি, রাউণ্ড-হেড সৈন্যদের বাগাড়ম্বর, টমকিনসের শয়তানি, ডাঃ র‍্যাডক্লিফের ষড়যন্ত্র, চার্লস-এর মহানুভবতা ইত্যাদি ওরা অনায়াসে বুঝতে পারছিল দেখে আমি একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

সমস্তদিন পাঠ চলল। রাত্রে খাওয়ার পর রান্নাঘর থেকে বাতি জোগাড় করে বইটা শেষ হল। অপেক্ষাকৃত নীরস ব্যাপারগুলি বাদ দিয়ে একেবারে এভারার্ডের বিবাহ ও দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকে এসে যখন পৌঁছলাম তখন আটটা বাজে।

পরদিন সকালে পাটাতনের দরজা ও খোলা মুখগুলি থেকে ঢাকা খুলে নেওয়া হল। দু-একটা আধমরা ইঁদুর ছাড়া জাহাজের খোলে যত

আরশোলা ও পোকামাকড় ছিল সব ধোঁয়ার দাপটে ইহলীলা সংবরণ করেছে। এবার খোলের তলায় যাতে মালগুলি ঘষা লেগে নষ্ট না হয় সেজন্য ডালাপালা দিয়ে চতুর্দিক সমান করে দেওয়া হল। এবার মাল তোলা যেতে পারে। দু' বছর আগে ক্যালিফোর্ণিয়া জাহাজটি এই কূল ছাড়ার পর থেকে যত চামড়া এখানে এসে জমা ও পরিষ্কৃত হয়েছে তার সংখ্যা এতদিনে চল্লিশ হাজারে পৌঁছেছে। এবার সেগুলি আমাদের জাহাজে করে বস্টনে যাবে।

তারপর ছয় সপ্তাহ ধরে চলল ক্রমাগত মাল তোলা। ভোর রাত থেকে কাজ আরম্ভ হত, কাজ করতে করতে আকাশে তারা ফুটে উঠত। রবিবার ছাড়া কাজের বিরাম নেই। কোনমতে গিয়ে খাবার সময় মুখে দুটি গুঁজে আসা। তাড়াতাড়ি করার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে কাজ ভাগ করে নিয়েছিলাম। দুজন চামড়ার স্তূপের উপর উঠে নীচে চামড়া ফেলত, নীচে আরো দুজন সেগুলো কুড়িয়ে লম্বা লম্বা শোয়ান দণ্ডের উপর ফেলত, আরো দুজন তখন সেগুলো ফসল মাড়াই-এর মত করে পিটত, তারপর সেগুলো একটা তক্তায় ফেলা হত, তারপর দশ-বারোজন মিলে মাথায় করে এই চামড়াগুলো নিয়ে তুলে দিয়ে আসত নৌকায়। উপর থেকে চামড়াগুলো নিয়ে দণ্ডের উপর ঠিক ভাবে ফেলাটাই ছিল সবচেয়ে শক্ত কাজ। আমি চামড়া পরিষ্কার করার কাজে পটু বলে ঐ কাজটি ছিল আমার উপর। সকাল ছটা থেকে আরম্ভ করে সারাদিনে প্রায় আট দশ হাজার চামড়ার টুকরো আমার হাত দিয়ে নীচে যেত—শেষে কবজি এমন ব্যথা হয়ে যেত যে আর হাত চলে না, তখন মাথায় করে চামড়া বওয়ার কাজে যোগ দিতাম। জলে ভিজে যাওয়ার ভয়ে চামড়াগুলো মাথায় করে নিতে হত। মাথার টুপির নীচে এজন্য বিশেষ ভাবে পশম ও ভেড়ার চামড়া দেওয়া থাকত, তাতে ঘর্ষণের আশঙ্কা অনেকটা কমত। তা না হলে বোধহয় আমার মাথার সব চুল উঠে খুলি অবধি ক্ষয়ে যেত। ভোরের দিকে জল থাকত কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু কম বয়সের উত্তেজনায় সে সব কষ্ট গায়ে লাগত না। তাছাড়া চামড়া পিটোনোর কাজে যে ধূলো উড়ত সেখান থেকে দূরে থাকতে পেরেই আমরা সন্তুষ্ট। মাল্লাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ তারা জাহাজে থেকে চামড়া গুছিয়ে রাখার কাজ করত।

এইভাবে কাজ চলল। ক্রমে জাহাজের খোল উপরের ছাদ থেকে চার ফিট নীচে অবধি ভর্তি হয়ে গেল। তখন আর একটি প্রক্রিয়া আরম্ভ হল, সেটার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দরকার। এটি হল মাল ঠাসা।

আগেই বলেছি মাল গাদা করার আগে খোলের ভারী লোহার টুকরো-গুলো সরিয়ে ফেলে শুকনো গাছপালা দিয়ে মেঝেটা সমতল করা হয়। তার উপর চামড়া রাখা হয়। সযত্নে ও বহু পরিশ্রম সহকারে চামড়া রাখা হয়। যত বেশী আঁটানো যায় সেই চেষ্টা। এটা করা খুব সহজ কাজ নয়, এর জন্যে দক্ষতা দরকার। এই কাজে যার যোগ্যতা আছে ক্যালিফোর্ণিয়াতে তার বিশেষ প্রতিপত্তি। এই শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে চামড়া কি করে সাজানো উচিত এই নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক শুনেছি। আমরা সব রকম উপায়ই চেষ্টা করে দেখলাম। এই নিয়ে বেশ মতান্তর হয়ে গেল মাল্লাদের মধ্যে। কেউ বিলের পক্ষ সমর্থন করে কেউ বব নামে ইংরাজটির। আয়াকুচোতে কাজ করত বব, আট বছর সে ক্যালি-ফোর্ণিয়াতে আছে—এই বিষয় নিয়ে প্রাণ অবধি বিসর্জন করতে প্রস্তুত। অবশেষে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে একটা মধ্য পথ অবলম্বন করা হল।

কড়িকাঠ থেকে চার ফিট নীচে অবধি এইভাবে ভর্তি করা হল—তারপর আরম্ভ হল লোহার শলাকা দিয়ে চামড়াগুলো চেপে দেওয়া। হাত দিয়ে যেখানে একটি চামড়াও কোন মতে ঢোকান যায় না এই উপায়ে সেই জায়গায় প্রায় একশটি করে ঠেসে দেওয়া যায়, এমনই চেপে ঢোকান হয়। যে ধরনের স্ক্রু দিয়ে তুলো ঠেসে বোঝাই করা হয় অনেকটা সেই রকম। রোজ সকালে আমরা কূল থেকে চামড়া নিয়ে জাহাজে এসে সেগুলো ঠেসে বোঝাই করতাম, রাত্রি অবধি খোলে কাজ চলত, কেবল খাবার সময় একটু ছুটি। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি খোলের মেঝেটা সমান করে ফেলা হয়েছিল—আমরা পিছন দিকে উঁচু করে চামড়ার থাক সাজাতে আরম্ভ করলাম, একেবারে খোলের দেওয়াল ঘেঁষে কড়ি অবধি তুলে দিলাম। হাত দিয়ে এবং দাঁড় দিয়ে ঠেলে ঠেলে যতটা পারা যায় ঠাসা হল। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশটি চামড়া একটির মধ্যে অন্যটি ঢুকিয়ে একটি বইয়ের আকার দেওয়া হয়—তারপর দুটি চামড়ার পাতার ভিতর বাইরের চামড়াটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বইটি যাতে সহজে টেনে বার করা যায় সেজন্য উপরে ও নীচে তৈলাক্ত কাঠের টুকরো রাখা হয়। তারপর দুটি

লম্বা ধারালো ফলক বইয়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে বিঁধে দেওয়া হয়, অপর দিকে ভারী কাঠের টুকরো আটকে তাকে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে চামড়ার বইগুলি যতক্ষণ চেপে না বসে যাচ্ছে ততক্ষণ টানা হয়। সবশেষে আমরা ঐ উঁচু চামড়ার গাদার উপর বসে দড়ি টেনে টেনে ভাল করে এঁটে দিই—সঙ্গে সঙ্গে চলে গলা ছেড়ে সমবেত সঙ্গীত।

যে যন্ত্রে দড়ি বেঁধে নোঙর প্রভৃতি ভারী জিনিস তোলা হয় সেগুলি ঘোরাবার সময় নাবিকরা সাধারণতঃ গান গেয়ে পরিশ্রম লাঘব করে। গানের স্তবকগুলি গায় একজন, শেষ লাইনে প্রচণ্ড চিৎকার করে সকলে গলা মেলায়। আমাদের সমবেত কণ্ঠরবে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠত, নিশ্চয় কূলেও বহুদূর অবধি শোনা যেত। সৈন্যরা যেমন বাজনার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে, নাবিকদের পক্ষেও গানের প্রয়োজনীয়তা সেই রকম। একসঙ্গে টানতে হলে চাই গান, তা না হলে টানায় জোর আসে না। যখন কোন ভারী জিনিস কিছুতেই টানা যাচ্ছে না তখন বেশ উত্তেজক গান জুড়ে দিলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। "ন্যান্সিও", "জ্যাক ক্রসট্রি" ইত্যাদি এই জাতীয় গান। এক একটি গানে বিশেষ ফল হয় না কিন্তু সময়পোযোগী এক একটি গান যেন আমাদের বাহুতে মত্ত হস্তীর বল এনে দিত। বিশেষ বিশেষ টানের জন্য কয়েকটি বাছা বাছা গান ছিল—সে গানের সঙ্গে আমাদের মনে জাগত প্রচণ্ড উদ্দীপনা।

এটাই ছিল আমাদের সব কাজের মধ্যে চিত্তাকর্ষক। সকালে নৌকা বেয়ে কূলে যাওয়া, চামড়া নিয়ে আসা, তারপর জন কুড়ি লোক জাহাজের খোলে চামড়া থাক করে সাজান—দড়ি, আঁকশি, লম্বা লাঠি নিয়ে গান গাইতে গাইতে দড়ি টানা। দেখতে দেখতে জাহাজের খোল ভরে উঠতে লাগল। সোমবার থেকে শনিবার একটানা কাজের পর রবিবার দিন সকলে স্নান করে, পরিষ্কার হয়ে একটু ঘুমিয়ে বাঁচতাম। খাদ্য বলতে ছিল টাটকা গোমাংস। দিনে তিনবার আমরা ভাজা মাংস খেতাম, সঙ্গে চা ও রুটি থাকত বটে, কিন্তু প্রধান আহার্য ছিল মাংস। ছয় জন লোকের জন্য এক গামলা মাংস হত, মোটা মোটা চর্বিওয়ালা মাংসের টুকরো, আমরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তার উপর পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত গামলা শেষ করে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। দিনে যে আমরা কত সের মাংস খেতাম তার হিসাব করার চেষ্টা করব না। একটা আস্ত ষাঁড় শেষ করতে

আমাদের লাগত চারদিন। এ রকম মাংস খাওয়া সচরাচর দেখা যায় না—আমাদের একদিনের খাওয়ার পরিমাণ শুনলে ইংরাজ চাষারা বোধ হয় মূর্চ্ছা যাবে। যতদিন উপকূলে ছিলাম টাটকা মাংসের অভাব ছিল না, আমরা প্রচুর খেতাম যেমন, পরিশ্রমও করতাম তেমনি। দু-একবার মাংস ঠিক সময়ে এসে পৌঁছয় নি। তখন কেবল রুটি ও জল খেয়ে মনে হত উপবাসী আছি। ঐ ষোলো মাস প্রচণ্ড খাটুনি সত্ত্বেও আমরা ছিলাম নিরোগ ও সুস্থ। নানাবিধ সুখাদ্য খেয়েও অনেকে তা থাকে না।

শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল। হাওয়ার দিক থেকে পিলগ্রীমের আগমন। আমাদের দেশে যাবার প্রস্তুতি দেখে ওদের অবস্থা অবর্ণনীয়। আরো একবছর ওদের এই দূর বিদেশে নির্বাসন ভোগ করতে হবে। একদিন সন্ধ্যাবেলা ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, দুর্ভাগ্যকে হাসিমুখে মেনে নেওয়া ছাড়া ওদের আর অন্য উপায় নেই, সেজন্য ওরা কোন অনুযোগ করল না, কিন্তু স্টিমসন আমার পাহারার সঙ্গী ইংরাজ টম হ্যারিসের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। তিরিশ ডলার ও কিছু জামাকাপড়ের বিনিময়ে হ্যারিস স্টিমসনের জায়গায় ওদের জাহাজে চলে যাবে। ক্যাপ্টেন ফকন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ওর একজন দ্বিতীয় মেট দরকার।

ক্যাপ্টেন ফকনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হতেই আমি ওঁকে আমার কানাকা বন্ধু হোপকে দেখতে যেতে অনুরোধ করলাম। উনি হোপকে ভাল করেই চিনতেন। হোপকে দেখতে গিয়ে উনি দেখেন ওর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল, তবে জাহাজে মজুত ওষুধপত্র তখন বেশ কমে এসেছে —অথচ যাত্রা শেষ হতে বেশ দেরী—তাই ওকে ওষুধ দেওয়া সম্ভব হল না। ক্যাপ্টেন ফকন বললেন ক্যালিফোর্ণিয়া জাহাজটি যখন আসবে তখন ক্যাপ্টেন আর্থার ওর দেখাশোনার ভার নেবেন। এক সপ্তাহ পরে আসবে ক্যালিফোর্ণিয়া। আমি সান ডিয়াগোতে পৌঁছেই হোপকে দেখতে গিয়েছিলাম—তারপর থেকে রোজই সন্ধ্যের দিকে ওকে দেখতে যেতাম। আমি শেষবার ওকে যখন দেখি তারপর ফিরে এসে ওকে আবার দেখতে পাব আশা করিনি। কিন্তু ওষুধের গুণেই হোক বা যে জন্যেই হোক ওকে অনেক ভাল অবস্থায় দেখে মনটা বেশ খুশী হল। বুঝলাম ওষুধে ফল ধরেছে। রোগ এখন নিরাময়ের দিকে। কানাকারা সকলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওদের ধারণা হল আমি নিশ্চয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ও শারীরবিদ্যায়

সুপণ্ডিত। কিন্তু হাতে ওষুধ না থাকায় আমি এখন আর কিছুই করতে পারলাম না। হোপের ভাগ্য নির্ভর করতে লাগল ক্যালিফোর্ণিয়ার আগমনের উপর।

রবিবার, ২৪শে এপ্রিল। সান ডিয়াগোতে এসেছি সাত সপ্তাহ হয়ে গেল, মাল তোলাও প্রায় শেষ। এখন ক্যালিফোর্ণিয়া এসে পৌঁছলেই হয়—আমাদের দালাল মহাশয় আসবেন ঐ জাহাজে। বিকেলের দিকে কয়েক জন কানাকা পাহাড়ে খরগোশ ধরতে গিয়েছিল। ওরা জাহাজ জাহাজ বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এল। আমাদের তৃতীয় মেট মিঃ হ্যাচ ওদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘোষণা করলেন ক্যালিফোর্ণিয়া এসে পৌঁছেছে। মোড় ঘুরতেই যেই জাহাজের মুখ দেখা গেল আমরা তোপধ্বনি করে উঠলাম, পতাকা তুলে দেওয়া হল। ক্যালিফোর্ণিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাল গুটিয়ে আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। রবিবার, আমাদের হাতে কোন কাজ নেই। তাই সকলেই ডেকে দাঁড়িয়ে নবাগতের রূপ সমালোচনা আরম্ভ করলাম। জাহাজটি বেশ বড়, তবে অ্যালার্টের চেয়ে বোধ হয় দৈর্ঘ্যে ছোটই হবে, ধারগুলি উঁচু, নীচের আকার অনেকটা কেতলির মত—তৎকালীন দক্ষিণী বাণিজ্য জাহাজের আকৃতি ঐরকমই হত। দেখে মনে হল বেশ মজবুত, তবে চেহারাব তেমন পারিপাট্য নেই, ঠিক দেখবার মত জাহাজ বলা চলে না। দেখে শুনে আমরা সাব্যস্ত করলাম আমাদের কাজে লাগবার মত নয়।

রাত্রে আমাদের কয়েকজন নৌকা করে ওদের জাহাজে গেলাম। মাল্লাদের থাকবার জায়গাটা বিরাট। চোদ্দ পনেরো জন মাল্লা, বালক ও যুবা যে যার তোরঙ্গের উপর বসেছিল, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। মাত্র সাত মাস আগে ওরা বস্টন ছেড়েছে। আমাদের কাছে মনে হল যেন কালকের কথা। আমরা প্রশ্নবাণে ওদের জর্জরিত করে ফেললাম। বস্টনের খবর কাগজে পড়লেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের স্বাদ আলাদা। একজন ছেলে সদ্য স্কুল থেকে এসেছে—তার কাছে নানা-রকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। আমাদের সহকর্মী বালক দুটিও ওদের পরিচিত। অ্যান স্ট্রীট, থাকার বাড়ী, বন্দরের জাহাজ, মাইনের অবস্থা ইত্যাদি সহস্র রকম জানবার বিষয় ছিল আমাদের।

ওদের মধ্যে ছিল দুজন ইংরাজ মাল্লা। তারা যুদ্ধ জাহাজে কাজ

করেছে। এরা বেশ গান গাইতে পারত। সকলে মিলে গান গাওয়া আরম্ভ হল। ইংরাজ মাল্লা দুটির গলা সুন্দর, ঠিক নাবিকি ঢঙে গাইছিল ওরা। আমাদের কাছে তখনো পৌঁছয় নি এমন সব নতুন গান ওদের মুখে শুনলাম। ওদের জাহাজ আসার পর থেকে সেই যে গানের আসর শুরু হল, দুটো ঘণ্টা পড়ার পরও তার বিরাম নেই। শেষে দ্বিতীয় মেট এসে ঘোষণা করলেন অ্যালার্টের মাল্লাদের এবার যেতে হবে। নৌকা বাওয়ার গান, যুদ্ধের গান, ভালবাসার গান, মাতালের গান—কত রকম গানই যে ওদের জানা তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের পরিচিত পুরোনো জাহাজী গানও ওরা জানে দেখে বেশ আনন্দ হল। এ ছাড়াও ওরা নাবিক জীবনের বাইরের কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত মার্জিত গান শোনাল। সেগুলি সম্ভবতঃ নাটক থেকে শেখা। এক বৃদ্ধ মাল্লার ভাঙা গলার চিৎকার আমার এখনো মনে আছে। আকাশ বাতাস ধ্বনিত হত সেই গানের সুরে—নীচে তলা অবধি গিয়ে পৌঁছত সেই গান "আহা, তাহার কথা আর বোলো না।"

আমারই মতন হৃদয় অনলে
তিলে তিলে জ্বলে যায়
আমারই মতন ভালবেসেছিল
সে কথা কি ভোলা যায়?

শেষের পঙ্‌ক্তিটি বহুক্ষণ ধরে তীব্র সুরে অনুরণিত হতে থাকত। প্রত্যেকটি কথা আলাদা ঝংকার তুলে বেজে উঠত। রোজই এই দুঃখের গানটা শোনাবার জন্য আমরা ওকে অনুরোধ করতাম। এই অদ্ভুত ভাবে গাওয়া অদ্ভুত গান শুনে মাল্লাদের সে কী ফুর্তি।

পরদিন থেকে ক্যালিফোর্নিয়া মাল নামাতে আরম্ভ করল। মাল্লারা নৌকা নিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত, ওদের কাজ শেষ হবার পর ওরা কয়েক জন আমাদের কাজে সাহায্য করতে এল। অনেক নতুন গান জানত ওরা, আমাদের গানগুলি তখন এত একঘেয়ে হয়ে এসেছে যে ওদের এই সময়োচিত নতুন গানের সাহায্যে কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

আমাদের মাল প্রায় সবই তোলা হয়ে গেছে। এবার পিলগ্রীমের যাওয়ার পালা। আমি ওদের সঙ্গে তুলনা করে নিজের সৌভাগ্যের কথা

চিন্তা করছি হঠাৎ ক্যাপ্টেনের কামরায় ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি আমাদের ক্যাপ্টেন, পিলগ্রীমের ক্যাপ্টেন ফকন ও দালাল মিঃ রবিনসন একটা টেবিলের চারপাশে বসে। ক্যাপ্টেন টমসন আমার দিকে ফিরে বললেন,

"ডানা, তুমি বাড়ী যেতে চাও?"

"হ্যাঁ, বাড়ী যেতে চাই বই কি।"

"তাহলে তোমার জায়গায় পিলগ্রীমে যাবার জন্য একজন কাউকে ঠিক কর।"

এই কথার আকস্মিকতায় আমি খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এত তাড়াতাড়ি অন্য মাল্লাদের কাউকেই এই প্রস্তাবে রাজী করাতে পারব না জানতাম। ক্যাপ্টেন টমসনকে যে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করা হয়েছিল তাও আমি ভাল ভাবেই জানতাম। কিন্তু যদি নিয়ে না যাওয়াই উদ্দেশ্য হয় সেকথা এই শেষ মুহূর্তে বলার অর্থ কি। আমি কোনমতে সামলে নিয়ে খুব স্পষ্টভাবে ওঁদের জানালাম যে আমার কাছে লিখিত প্রমাণ আছে যে বস্টন থেকে জাহাজের মালিকরা আমাকে এই জাহাজে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ক্যাপ্টেন ফকন নিজের মুখেও সে কথা আমাকে বলেছিলেন।

অধীনস্থ মাল্লার কাছ থেকে এরকম স্পষ্টভাষণ মহিমময় ক্যাপ্টেন মহাশয় বোধহয় আশা করেন নি। আমার দিকে রক্তচক্ষু নিবদ্ধ করে উনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কিন্তু আমি তাতে ভয় পাওয়ার পাত্র নই, বরং আমার কথায় অন্য দুজনের চোখে ওঁরই মর্যাদা হানি হল। তখন উনি অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন। পিলগ্রীমের কাগজপত্রের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করে বললেন ওখান থেকে আমার নাম কোনদিনই তোলা হয়নি, সুতরাং আমি এখনো পিলগ্রীমের অধীনে কাজ করছি এবং এ বিষয়ে ওঁর মতামতই চরম বলে গ্রাহ্য হবে। আমাকে কাল সকালের মধ্যেই কাগজপত্র নিয়ে ঐ জাহাজে চলে যেতে হবে অথবা আমার বদলে অন্য কাউকে যেতে হবে। এ বিষয়ে উনি আর একটিও কথা বলতে চান না। বিনা অপরাধে এইভাবে আমাকে দণ্ড দেওয়া হল। আরো দু বছর জাহাজে কাটাতে হলেই আমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার, চিরকালের মত এই পেশাতেই জীবন কাটবে। আমি দেখলাম নিজের অধিকার

প্রমাণ করা দরকার এবং প্রতিজ্ঞা করলাম নিজের কথা থেকে এক পাও নড়চড় করব না। অবশ্য আমি যদি নেহাতই সামান্য লোক হতাম তবে এতে বিশেষ ফল হত না। কিন্তু এঁরা জানতেন বস্টনে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। আমার উপর অবিচার করে এঁরা সহজে পার পাবেন না। তখন দেখলাম ক্যাপ্টেনের স্বর একেবারে বদলে গেল। উনি বললেন স্টিমসন হ্যারিসকে যে টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে এই জাহাজে আসছে তুমিও কাউকে অনুরূপ অর্থ দিয়ে পিলগ্রীম জাহাজে পাঠাও। আমি বললাম আমার জন্য যাকে ঐ জাহাজে যেতে হবে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং তাকে সাহায্য করার জন্য যা প্রয়োজন হয় সাধ্যমত দেব কিন্তু তাকে বিনিময় কোনমতেই বলা যায় না।

"ঠিক আছে" বললেন ক্যাপ্টেন। "যাও, তোমার কাজে যাও। আর ইংরাজ বেনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। কিন্তু এত রাগ হচ্ছিল যে বলার নয়। বেন যখন ফিরে এল ওর চেহারা দেখে বোধ হল ওর মৃত্যু দণ্ডাদেশ হয়েছে। ক্যাপ্টেন ওকে বলেছেন জামাকাপড় তৈরী রাখতে, কালই ওকে পিলগ্রীমে যেতে হবে আর পরিবর্তে আমি ওকে তিরিশ ডলার ও কিছু জামাকাপড় দেব। মাল্লাদের তখন খাবার ছুটি, সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। বেনের মুখে সব ইতিবৃত্ত শুনে ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমি দেখলাম ব্যাপারটা বুঝিয়ে না বললে সকলেই আমার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। বেন বেচারা দরিদ্র ইংরাজ। বস্টনে ওর চেনাশোনা কেউ নেই। ওকে ওর স্বভাবের জন্য সকলেই পছন্দ করত। সকলে বলল "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো হবেই, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে কিনা তাই ক্যাপ্টেন তোমায় যেতে দিচ্ছেন—আর বেনের হয়ে বলবার কেউ নেই তাই ওর উপর এই অত্যাচার।" কথাটা এতই সত্যি যে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হল না। কিন্তু আমি ওদের আমার দিকটাও জানিয়ে দিলাম—দোষ আসলে আমার নয়। আমাকে দেশে যেতেই হবে। একবার অনুমতি পেয়ে যাবার পর সেটা অধিকারের প্রশ্ন, সে নিয়ে আমার জোর করা দরকার তাই করেছি। এই শুনে সকলে আমার প্রতি একটু প্রসন্ন হল বটে কিন্তু দুর্বলের উপর অত্যাচার বেশী হয় এই রকম একটা ধারণাও ওদের বদ্ধমূল হল। আমার হল মহা বিপদ। এতদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করে এবং ওদের কখনও

আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বুঝতে না দিয়ে, কর্মচারীদের কাছ থেকেও পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার পেয়ে আমার সঙ্গীরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে আমি অন্য শ্রেণীর লোক। এখন এই ভাবটা আবার নতুন করে জেগে উঠল। কিন্তু নিজের কথার চেয়েও বেশী যে চিন্তা অনুক্ষণ আমাকে পীড়িত করছিল তা হল বেনের দুর্ভাগ্যের কথা। বেচারার উপর বড়ই মায়া হতে লাগল। বস্টন থেকে বেচারা লিভারপুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবে বড় আশা করেছিল। ওর জামাকাপড়ও বিশেষ ছিল না, তাই মাইনের বেশীটাই পোশাক তৈরী করাতে খরচ হয়ে গিয়েছিল, এখন রোজই কেবল দিন গুণছিল কবে যাত্রার শেষ হবে। ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রতি অন্যদের মত ওরও ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ—এখন সেই অসহ্য জায়গাতেই আরো দু বছর মাল টানতে হবে শুনে ওর শরীর থেকে সব রস কে যেন শুষে নিল। আমার থেকে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ক্যাপ্টেন এ বিষয়ে আমাকে আর জোর করবেন না জানতাম, এখন আমার একমাত্র চিন্তা হল এমন কাউকে জোগাড় করা যে স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে। তবেই বেনের মুক্তি। আমি বললাম বস্টনে মালিকদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেব ছয় মাসের বাড়তি মাইনে এবং আমার অব্যবহৃত সব জামাকাপড়, বই ইত্যাদি জিনিসপত্র দিয়ে দেবার জন্য। খবরটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। বেনের কথা ইতোমধ্যে সকলেই জেনে গিয়েছিল। যাদের যাবার কোন ইচ্ছা নেই তারাও মহোৎসাহে এই ব্যবস্থার কথা বলাবলি করতে লাগল এবং অন্যদের যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। শেষে বস্টনেরই একটি বেপরোয়া গোছের ছেলে ঘোষণা করলে যে সে যাবার জন্য প্রস্তুত। ছেলেটির নাম হ্যারি মে, আমরা ডাকতাম হ্যারি ব্লাফ বলে। তার কোন দেশবিদেশ বোধ ছিল না, যে জাহাজে হয় থাকলেই হল কেবল খাওয়া, জামাকাপড় ও মাইনেটি চাই। বেনের উপর ওর বোধহয় মায়া হল, তাছাড়া বেশ দাঁও মারা হচ্ছে মনে করে সে খুব খুশী। পাছে পরে ও পেছিয়ে যায় সেই ভয়ে আমি তৎক্ষণাৎ একটা কাগজে বস্টনের মালিকদের প্রতি ওকে টাকা দিয়ে দেবার নির্দেশ দিলাম এবং আমার বাড়তি সব জামাকাপড়ও দিয়ে দিলাম। তারপর ওকে পাঠালাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে। এত সহজে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হতে দেখে ক্যাপ্টেন খুশীই হলেন এবং ঐ কাগজে লিখিত অর্থ ওকে দিয়ে দিলেন। যাবার সময় পকেটে টাকা বাজাতে

বাজাতে ও সকলের সঙ্গে করমর্দন করে চলে গেল, মনে ভারী ফুর্তি। ঐ একই জাহাজে হ্যারিসও গেল। ওর সঙ্গে স্টিমসন আগেই বদলের ব্যবস্থা করেছিল।

হ্যারিসের সঙ্গে একসঙ্গে ডেকে প্রায় দু শ ঘণ্টা কাটিয়েছি, হিসেব করে দেখেছিলাম। ওর সঙ্গে এমন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা করিনি। ওকে যেতে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। যাবার সময় ও আমার হাত চেপে ধরল। আমি বললাম বস্টনে এসে যেন অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করে। একই নৌকায় করে স্টিমসন আমাদের জাহাজে এল। আমি আর স্টিমসন একই জাহাজে একই সময় বস্টন থেকে যাত্রা আরম্ভ করি, আমারই মত এখন ও দেশে নিজের আত্মীয়বন্ধুদের কাছে ফিরে চলেছে। আমরা দুজনেই খুব খুশী। পিলগ্রীম যাবার জন্য পাল তুলে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে আমাদের মনে যা আনন্দ হল তেমন বোধহয় আর কারো হয়নি। পিলগ্রীম আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, আমরা টুপি উড়িয়ে তিনবার জয়ধ্বনি করে উঠলাম। ওরা দড়ি ধরে লাফিয়ে উঠে অনুরূপ চিৎকার করে উঠল। আমরা এবার যথারীতি একবার চিৎকার করে প্রত্যুত্তর জানালাম। পরিচিত মুখগুলিকে শেষবারের মত একবার দেখে নিলাম, নিগ্রো রাঁধুনী রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল। মাল্লারা এরপর পালের তদারক করতে দৌড়ল—দুই ক্যাপ্টেনে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ হল। দশ মিনিটের মধ্যে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল পিলগ্রীম—তার সাদা পালের আর কোন চিহ্নই রইল না।

আমার মনে হল যেন একটা কঠিন ফাঁদের মধ্য থেকে সদ্য পরিত্রাণ পেলাম। জাহাজটি চলে যেতে দেখে যে কি স্বস্তি অনুভব করলাম তা বলা যায় না। তবুও এক বছরের নানা অভিজ্ঞতা ওর সঙ্গে জড়িত। প্রথম দেশ ছাড়া,- বিষুবরেখা পার হওয়া, হর্ণ অন্তরীপ, জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ, সমুদ্রে মৃত্যু, আরো কত রকমের জিনিস—তার অনেক কিছুই হয়ত তুচ্ছ, তবু একটু বিষাদের ভাব সঞ্চার হল। এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের দিকে যাত্রা করব—এই আনন্দে মনের সব গ্লানি অল্পক্ষণের মধ্যে ধুয়ে মুছে গেল।

শুক্রবার, ৬ই মে। মাল তোলা আজ শেষ। আজকের দিনটি সেজন্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। গত দেড় বছর ধরে আমরা এই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি। কত দিনে সর্বশেষ চামড়ার খণ্ডটি জাহাজে তুলে দেওয়া হবে—

এই ছিল আমাদের চিন্তা। সব মাল লাদাই হল। তার উপর দিয়ে ত্রিপল বিছিয়ে নৌকাগুলো তুলে রেখে সেরাত্রের মত ডেক ধোয়া শেষ করে, প্রধান মেট আমাদের সকলকে ডাকলেন, মাথার উপর টুপি নেড়ে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন উনি। আমরাও প্রাণের উল্লাসে গলা ছেড়ে ডাক দিয়ে উঠলাম। পর্বতে, উপত্যকায় সেই শব্দ ফিরতে লাগল। একটু পরেই শুনলাম ক্যালিফোর্ণিয়ার মাল্লারা উত্তরে হর্ষধ্বনি করছে—ওরা আমাদের নৌকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেই এই উল্লাসের অর্থ বুঝতে পেরেছে।

শেষ সপ্তাহে আমরা প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করতে মন দিয়েছিলাম। যে সব বালতি, ডাণ্ডা, পাল প্রভৃতি নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলিও আবার নিয়ে আসা হল। আমি পানীয় জলের সন্ধানে কূল থেকে তিন মাইল ভিতরে একটা ঝরনায় গেলাম। সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ানদের এক দল। সেখানে গরুর গাড়ীতে করে জলের পিপেগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে তিন দিন গেল। ফিরে এসে আমরা এবার জাহাজের পারিপাট্যের দিকে মন দিলাম—পালগুলি সব খাটান হল, পালদণ্ডগুলিও।

যাত্রা করার আগে ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি অল্পবয়সী মাল্লা আমাদের কারো সঙ্গে জায়গা বদল করে আমাদের জাহাজে চলে আসার চেষ্টা করে। ছেলেটির বয়স পনেরো-ষোলো হবে। আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজে ছিল। এর ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ছেলেটির সুন্দর কোমল চেহারা, নরম হাতের আঙ্গুল, মৃদু কণ্ঠস্বর ও অতি মার্জিত আচার ব্যবহার দেখে মনে হত ও খুবই উচ্চ বংশের ছেলে। কিন্তু ওর মুখভাবে একটু বুদ্ধির অভাব দেখা যেত। সেটা জন্ম থেকে অথবা অন্য কোন কারণে হয়েছে কিনা বলতে পারি না। অনেকে বলত মানসিক দুশ্চিন্তায় ওর ঐরকম অবস্থা হয়েছে। ওর বাবা খুব ধনী বলে শুনেছি, মা ছিলেন ইটালীয়ান। মনে হয় সম্ভবতঃ ও অবৈধ সন্তান, তা না হলে প্রথম জীবনে ও বাবার কাছ থেকে যা দুর্ব্যবহার পেয়েছে তার কোন অর্থ হয় না। ও বলত ওর মাতা পিতা আলাদা থাকেন এবং গোড়া থেকেই ওর শিক্ষা দীক্ষা খুবই অবহেলিত হয়েছে। মাত্র বারো বছর বয়সে ওকে কোম্পানির জাহাজে কাজ করতে পাঠান হয়। ওর বক্তব্য হল বাবার সঙ্গে মতান্তর

হওয়ায় ও বাড়ী থেকে পালিয়ে লিভারপুলে চলে যায়। সেখানে ক্যাপ্টেন হোমসের জাহাজ রিয়ালটোতে করে ও বস্টন যাত্রা করে। ক্যাপ্টেন ওকে ফেরার টাকাও দিয়েছিলেন কিন্তু সেসময় কোন জাহাজ ছাড়ছিল না। ছেলেটি অ্যান স্ট্রীটে একটি নাবিকদের হোটেলে গিয়ে ওঠে। নিজের মূল্যবান জিনিসপত্র বিক্রি করে কিছুদিন চলল। তারপর বাড়ীর জন্য মন কেমন করতে আরম্ভ করে। একটি জাহাজ কোম্পানির অফিসে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে ক্যালিফোর্ণিয়া নামক জাহাজে লোক নেওয়া হচ্ছে। ক্যালিফোর্ণিয়া অভিমুখে যাবে শুনে ও জিজ্ঞাসা করে জায়গাটা ইউরোপে কিনা। কেন না ওর যাবার ইচ্ছা ইউরোপ। উত্তরটা সম্ভবত ও বুঝতে ভুল করেছিল। যাই হোক কাগজে সই করে আগাম টাকা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে ও জামাকাপড় কিনল, অন্যভাবে একটু আধটু খরচ করল। যাত্রা করার দিন সকালে শুনল জাহাজটি দু তিন বছরের জন্য উত্তর পশ্চিম উপকূলে যাচ্ছে। ইউরোপে মোটেই নয়। ছেলেটি ভয় পেয়ে পলায়ন করল। সমস্তদিন শহরে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে হাতের সব টাকা খরচ হল। জামাকাপড় সব জাহাজে—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ও দেখতে এল জাহাজ ছেড়ে গেছে কিনা। রাস্তার মোড়ে ধরা পড়ে গেল। বহু ধস্তাধস্তি, চেঁচামেচি—কিন্তু ওকে আর ছাড়া হল না। ততক্ষণে মাস্তুলের উপর পাল উঠে গেছে, জাহাজ প্রায় ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে—সেই গোলযোগের মধ্যে কে আর একটি বালককে নিয়ে মাথা ঘামায়। দু-একজন কৌতূহলী হল, তারা শুনল একটি মাল্লা সব আগাম টাকা খরচ করে এখন পালাবার চেষ্টায় আছে। কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা পৌঁছলে নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা হত, কিন্তু আসল ঘটনা তাঁরাও জানলেন না। সমুদ্রে পড়ে যখন ছেলেটি দেখল দু-তিন বছরের মধ্যে ছাড়া পাবার সম্ভাবনা নেই তখন সে এমনই ভেঙ্গে পড়ল যে কাজকর্ম ওকে দিয়ে করান প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষে ক্যাপ্টেন আর্থার ওকে কেবিনে নিয়ে গেলেন। স্টুয়ার্টের সঙ্গে কাজ করত ও। আমরা ওকে এই অবস্থায় দেখি। যদিও মাল্লাদের কাজের চেয়ে এই কাজ বহুগুণে কম কষ্টকর কিন্তু একজন নিগ্রোর সহকর্মী হয়ে ওর নিজের চেয়ে বহুগুণে নিকৃষ্ট একটি লোকের সেবা করতে ওর আত্মসম্মানে খুবই বাধত। স্বেচ্ছায় যোগ দিলে অন্য কথা, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে এবং জোর করে ঢোকানো হয়েছে বলে ওর পক্ষে সমস্ত ব্যাপারটা ছিল অসহ্য।

আমাদের জাহাজে দেশে ফেরার জন্য ও অনেক চেষ্টা করল কিন্তু ওদের ক্যাপ্টেন ছাড়লেন না। ওর বদলে যতক্ষণ না একজন জোগাড় হচ্ছে ততক্ষণ ওর মুক্তির কোন আশা নেই। কিন্তু বদলের ব্যবস্থা করার মত অর্থবল ওর ছিল না। এই ঘটনায় আমি বেশ আশ্চর্য হলাম কেন না ক্যাপ্টেন আর্থারের দয়ালু বলে বেশ সুনাম ছিল। তবে বহুদিন ধরে সর্বময় কর্তৃত্ব করে বোধহয় এঁদের মনে একটা অন্যের প্রতি অবজ্ঞার ভাব জন্মায়। ছেলেটিকে মাল গুদামে পাঠান হল। পরে শুনেছি সেখান থেকে ও পালায়। প্রথমে একটি স্পেনীয় জাহাজে করে ক্যালাও, সেখান থেকে ইংলণ্ড।

ক্যালিফোর্ণিয়া এসে পৌঁছবার পরই আমি ক্যাপ্টেন আর্থারকে হোপের কথা জানাই। ক্যাপ্টেন ওকে ভাল করেই চিনতেন। তৎক্ষণাৎ গিয়ে ওর ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যা যা প্রয়োজনীয় করলেন। ওঁর যত্নে হোপ বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ক্যালিফোর্ণিয়া ছাড়ার আগে আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক চুল্লীতে গিয়ে কানাকাদের সঙ্গে কাটালাম। বিদায় নেবার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ওদের কথা ভেবে মন বিষাদে আচ্ছন্ন হল। এই সরল হৃদয় লোকগুলিকে আমি নিকট আত্মীয়ের চেয়েও বেশী ভালবেসে ছিলাম। হোপ আমার হাত ধরে বললে পরের বার আমি যখন ক্যাপ্টেন হয়ে আসব তখন যেন ওর কথা না ভুলি। ও তখন আমার জাহাজে কাজ করবে। আমি যেন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েও দীনদুঃখীর প্রতি সমভাবে করুণা প্রদর্শন করি। মিঃ বিংহ্যাম ও সর্দার মান্নিনি আমাদের সঙ্গে নৌকায় গেল। ফিরবার সময় গম্ভীর সুরে ওদের সেই সব স্বরচিত গান গাইতে গাইতে চলে গেল—সম্ভবতঃ আমাদের সম্বন্ধেই কিছু বলা হচ্ছিল তাতে।

রবিবার, ৮ই মে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় আমাদের শেষ দিন। চল্লিশ হাজার চামড়া, তিরিশ হাজার পশুর শিং তাছাড়া কয়েক বাক্স উদবেড়াল ও বীবরের লোম—সব খোলের মধ্যে পুরে ঢাকা দিয়ে পেরেক মারা হয়ে গেল।*

* মেক্সিকানরা আমাদের কিছু স্বর্ণরেণুও দিয়েছিল। সোনা আবিষ্কারের গুজব প্রায়ই শোনা যেত, কিন্তু সেদিকে কেউ কর্ণপাত করত না।

জল সংগ্রহ করে পিপে ভর্তি করা, বাড়তি সাজসরঞ্জাম নিয়ে আসা, গবাদি পশু, ভেড়া শুওর ও মুরগী আনা, প্রত্যেকটি পশু নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া হল, নৌকা ভর্তি করে রাখা হল পশুদের খড়। তাছাড়া আমাদের পাঁচ মাসের রসদ ও সর্বোপরি চামড়ার ভারে জাহাজ একেবারে কানায় কানায়। খুব আঁটো পোশাক পরে যে অবস্থা হয় আমাদের জাহাজের হয়েছিল তাই।

ক্যালিফোর্ণিয়াও মাল নামিয়ে আমাদের সঙ্গে একই পথে পাড়ি দিল। নিস্তরঙ্গ উজ্জ্বল জলে সকালের আলোতে আমাদের দীর্ঘ দণ্ডগুলির মাথায় পতাকার প্রতিবিম্ব পড়ল। পাশাপাশি দুটি জাহাজই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। এগারোটার মধ্যে রীতিমত উত্তর-পশ্চিমে বাতাস আরম্ভ হল। আমরা সারা দুপুর হাওয়ার প্রতীক্ষায় ডেকে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছি। ক্যাপ্টেনও পায়চারি করছিলেন, আমাদের সকলের চোখ ওঁর দিকে। অবশেষে ক্যাপ্টেন মেটকে ইঙ্গিত করতেই পাল তোলার নির্দেশ হল—কথা শেষ হবার আগেই আমরা কাজে নেমে পড়েছি। এত তাড়াতাড়ি কাজ এর আগে কোনদিন হয়েছে বলে মনে পড়ে না। প্রত্যেকটি পালের কাছে আংটা ধরে এক একজন তৈরী হয়ে দাঁড়াল। ক্যালিফোর্ণিয়ার মাল্লারাও মুহূর্তের মধ্যে পাল তোলার জন্য প্রস্তুত, এখন কেবল ইঙ্গিতের অপেক্ষা। আমাদের কামান দাগা হল—পাল তোলার ইঙ্গিত। সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল চারিদিক। তোপের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল ক্যালিফোর্ণিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে, দুটি জাহাজই উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢেকে গেল। কিছুক্ষণ সকলের ছোটাছুটি, লম্ফ-ঝম্ফ, চিৎকার, শোরগোল, দড়ি ও কাঠের ভারী ভারী টুকরা এদিক ওদিক ছোঁড়াছুঁড়ি—বিরাট এক দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। হাওয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে উপরের পালটি উঠে গেল, সব কটি পাল ফুলে উঠল একসঙ্গে। মেট চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমরাও হেঁইও হেঁইও শব্দে নোঙরটা তুলে ফেললাম। তারপর যাবার সময় হল এই মর্মে গান জুড়ে দিলাম আমরা সমস্বরে। প্রত্যাগমনের পথে আমাদের যাত্রা হল শুরু।

একই সঙ্গে ক্যালিফোর্ণিয়াও বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্কীর্ণ প্রণালী বেয়ে আমরা পাশাপাশি চললাম। এক সময় দেখি ওরা আমাদের ফেলে অনেক

এগিয়ে গেছে। বন্দরের মুখে একটা কাঠ এমন ভাবে জলের তলায় রাখা থাকে যাতে তার উপর দিয়ে হালকা জাহাজ চলে যেতে পারে। কিন্তু ভারী হওয়াতে আমাদের সেখানে আটকে যেতে হল, ক্যালিফোর্ণিয়া ততক্ষণে এগিয়ে গেছে তরতর করে।

আমরা সব পাল তুলে জোর করে এগোবার চেষ্টা করলাম। কোন লাভ হল না। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় বসে থাকা। আবার পিছিয়ে গিয়ে প্রণালীতে পড়তে ক্যাপ্টেনের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। ঠিক এই সময় আমাদের লালচুলো দ্বিতীয় মেট একটা বেফাঁস কথা বলে আরো বিরক্তির কারণ হল। "ঠিক এখানেই রোজা গেঁথে গিয়েছিল" এই অভিমত ব্যক্ত করে বসল সে। শুনে ক্যাপ্টেন তার সম্বন্ধে এবং রোজা সম্বন্ধে কটুবাক্য বর্ষণ করলেন—বেচারা বেগতিক দেখে সেখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ার বেগ বাড়ল, আর জোয়ারও এল। আমরা ফিরে নোঙরের জায়গার দিকে গেলাম। ওখানকার লোকেরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম এ জন্মে আর ক্যালি-ফোর্ণিয়ার কবল থেকে মুক্তি নেই দেখছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার নোঙর তোলার আদেশ হল—এবারে কেউ আর গান গাইলে না, শেষবারের মত ইত্যাদি বিদায়সূচক কথাও বললে না কেউ। আমরা ফিরে এসেছি খবর পেয়ে ক্যালিফোর্ণিয়াও ফিরে উপ-সাগরের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল—এবার আমরা সাবধানে প্রণালী পার হয়ে সমুদ্রে পড়লাম। ক্যালিফোর্ণিয়ার ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা আমাদের সঙ্গে গতির প্রতিযোগিতা করেন। আমাদের ক্যাপ্টেনও এতে সম্মতি জানালেন। অবশ্য ওজনে ভারী হওয়ার জন্য আমাদের পক্ষে বেশী জোরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, শিকল বাঁধা লোক দৌড়ে কত দূর যেতে পারে! অথচ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাজের সাজ জোরে যাবার পক্ষে খুবই উপযোগী। হাওয়া ক্রমে বাড়তে লাগল। দেখলাম মাস্তুল বেঁকে আসছে, কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়ার মাল্লারা যতক্ষণ না পালে হাত দিল আমরা পাল গোটাবার চেষ্টাও করলাম না। আমাদের কর্মীরা মাস্তুলের উপর চড়ে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল। সামনের দিকের মাস্তুলের চতুর্থ অংশে ছিলাম আমি, সেখান থেকে নীচে এক অপূর্ব দৃশ্য। দুটি জাহাজের আর কিছু দেখা যায় না, কেবল পাল আর পাল, থাকে থাকে ছড়িয়ে আছে। সরু পাটাতন দুটি অত ভারী

পালের ওজনে হেলে পড়েছে। ক্যালিফোর্ণিয়া আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল, হাওয়ার দিকে বলে সুবিধাও ছিল ওদের, আমরা কিন্তু জোর বাতাস পেয়ে বেশ তাড়াতাড়িই যাচ্ছিলাম। বাতাস একটু পড়তেই ওরা এগিয়ে গেল—আমাদের তাড়াতাড়ি হুকুম হল উপরের পাল তোল। সঙ্গে সঙ্গে পাল বাঁধার দড়ি খুলে ফেলে পাল উঠে গেল উপরে—ঐ অংশের সব কটি পাল তোলা হল। তাতে আমরা একটু এগিয়ে গেলাম বটে কিন্তু ওরাও হেরে যাবার পাত্র নয়। আমাদের ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে জানালেন যে এত মালপত্র নিয়ে আমরা পেরে উঠছি না, না হলে এতক্ষণে কতদূর চলে যেতাম। ওরা বুঝল, কূলের দিকের বাতাসে এগিয়ে গেল ওরা—আমরা দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম হাওয়ায় চললাম। ওদের সঙ্গে শেষবারের মত বার্তা বিনিময় হল। ওরা চলে দু বছরের নির্বাসন যাপন করতে। আমরা প্রতি ঘন্টায় একটু একটু করে দেশের দিকে এগোতে লাগলাম।

এবার অল্প হাওয়ার অপরিসর পালগুলি তোলা হল, যাতে বাতাসের শক্তির যতটা সম্ভব ব্যবহার করা যায়। এতক্ষণে বোঝা গেল আমাদের কি বিষম ভার টেনে চলতে হচ্ছে, সমস্ত পাল তুলেও আমরা ছয় সামুদ্রিক মাইলের বেশী কিছুতেই এগোতে পারছিলাম না। এরকম শম্বুকগতি যেতে যেতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞ মাল্লারা ধৈর্য ধরতে বলল, "দু-এক সপ্তাহ যেতে দাও, হর্ণ অন্তরীপ পেঁৗছবার আগেই মনে হবে পক্ষীরাজের মত উড়ে চলেছ।"

দূরে দিকচক্রবালে ক্যালিফোর্ণিয়াকে ছোট একটি বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল. কূল উত্তর পূর্ব দিকে সরে গিয়ে ধেঁায়ার মত—সূর্যাস্তের সময় আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা চললাম আকাশ যেখানে এসে সাগরে মিশেছে সেই দিকে।

॥ ৩০ ॥ স্বদেশাভিমুখে ॥

আটটার সময় পাহারার ডাক পড়ল। একটু আধটু রদবদল হওয়া সত্ত্বেও আমি সেই বাঁদিকের দলেই ছিলাম। আমাদের লোকবল এখন একটু কম। দুজন পিলগ্রীমে চলে গেছে, আর একজন আয়াকুচোতে

দ্বিতীয় মেট হয়েছে। হ্যারি বেনেট নামে আর একজন বয়স্ক মাল্লা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে মাল গুদামে রয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আর্থার তার দেখাশোনার ভার নিলেন। বেচারা এই জাহাজে করে বাড়ী ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু কানা গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। অসুস্থ নাবিকের ঝামেলা কে বইবে। সকালবেলা বেচারা ডেকে কাজ করার চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্বল হাত পা নিয়ে কেবল অনর্থই বাধাচ্ছিল, শেষে মেট ওকে একটু কটু বাক্য বলে। তখন সে উত্তর দিল "মিঃ ব্রাউন, যতদিন সুস্থ ছিলাম আমার কোন কর্তব্যেই ত্রুটি হয়নি। আজ যদি আমাকে আপনার দরকার না থাকে সে কথা বলে দিন, তাহলে আমি নেমে যাব।" মিঃ ব্রাউন ওকে তৎক্ষণাৎ জিনিসপত্র সুদ্ধ চলে যেতে হুকুম করলেন। বেনেট যখন গেল ওর চোখে জল। জাহাজকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসত কিন্তু অসম্মান সহ্য করে থাকার মত পাত্র ছিল না বেনেট। আমাদের মেটকে দয়ালু প্রকৃতির বলেই জানতাম, এই প্রথম ওঁকে দেখলাম কারো প্রতি নির্দয় হতে।

লোক কম। এদিকে ঘোর শীতকালে হর্ণ অন্তরীপ পার হওয়ার কথা। আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। স্টিমসন ও আমি ছাড়া আরো পাঁচজন মাল্লা ছিল, হাল চালানোতে চারজন কমবয়সী ছেলে, পালের মিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, স্টুয়ার্ড ও রাঁধুনী—এই ছিল আমাদের জনসমষ্টি। চার দিন কাটবার পর আবার একজন দক্ষ কর্মী অসুখে পড়ল—পালের মিস্ত্রী। সে এমনই অপটু হয়ে পড়ল যে তাকে দিয়ে কোন কাজই হল না। ক্রমাগত জল ঘাঁটা ও মাল বওয়া একটু বেশী বয়সের লোকের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। কমবয়সীদেরও স্বাস্থ্য অত্যুত্তম না হলে এত অত্যাচার শরীরে কুলোয় না। ক্যালিফোর্ণিয়া ও পিলগ্রীমের দুজনও কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একজন শুনেছি সান্টা বারবারাতে মারা যায়। হেনরী মেলাসকে পায়ে বাত হওয়ার জন্য মাল্লার কাজ থেকে ছাড়িয়ে কেরানীর কাজে বহাল করা হল। আমাদের পাহারার দলে এখন সর্বসাকুল্যে পাঁচজন, তার মধ্যে তিনজনের বয়স কম, তারা কেবল আবহাওয়া ভাল থাকলেই হাল ধরতে পারে। অগত্যা আমাদের দুজনকেই দিনের মধ্যে চার ঘণ্টা করে হাল ধরতে হত, কিন্তু দেশে ফেরার আনন্দে আমরা এসব কিছুই গায়ে মাখতাম না। তবে শীতকালে হর্ণ অন্তরীপে পৌঁছব, এই

একটা দুশ্চিন্তা ছিল। আমরা যখন যাত্রা করি তখন সে মাসের প্রথম দিক। দু মাসের মধ্যে হর্ণ অন্তরীপ পৌঁছে যাব। ঐ অঞ্চলে জুলাই মাসের মত বিশ্রী সময় আর নেই—নটায় সূর্যোদয়, তিনটেয় সূর্যাস্ত, আর বরফ, ঝড়, বৃষ্টি তো লেগেই আছে।

আমরা পিলগ্রীমে করে যখন অন্তরীপ পার হয়েছি তখন অক্টোবর, কিন্তু তখনই যথেষ্ট তুষারপাতের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। এলার্ট এসেছিল ফেব্রুয়ারীতে, ওখানে তখন গ্রীষ্ম। এখন লোক কম, জাহাজ ভারে ডুবুডুবু, ঝড় জলে যা অবস্থা হবে ভাবতেই হৃদকম্প উপস্থিত হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন একটি তিমি শিকারী জাহাজে শীতকালে ঐ পথে এসেছিল—তার কাছে বর্ণনা শুনে মোটেই আশা ভরসা পেলাম না। কুড়িদিনব্যাপী অবিশ্রান্ত মানুষ মারা আবহাওয়া—ওদের হালকা জাহাজের উপর দিয়ে দু বার জলোচ্ছ্বাস বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেতে যখন হবেই তখন বৃথা চিন্তা করে লাভ কি, এই ভেবে আমরা নিজেদের প্রবোধ দিলাম।

সময় পেলেই আমরা শীতবস্ত্র তৈরী করার কাজে লেগে যেতাম। ত্রিপলের একপ্রস্থ জামাকাপড় আগেই তৈরী করেছিলাম প্রত্যেকে, এখন সেগুলি বার করে তাতে আলকাতরা ও তেলের পলস্তারা মারা হল, জুতোতেও তাই। প্রশান্ত মহাসাগরের উন্মুক্ত সূর্যালোকে সেগুলি শুখিয়ে নেওয়া হল। পরে এই সমুদ্রই যে রুদ্র রূপ ধারণ করবে তার জন্য প্রস্তুতি। দস্তানা, মোজা, কান-ঢাকা টুপি সবই তৈরী হল। ঝড়ের সময় পরার টুপিতে রং দেওয়া হল। যদিও আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অপ্রচুর, আমরা সব রকম জিনিস কাজে লাগাতে শিখেছিলাম, এমন কি জুতো সেলাই অবধি শিখতে বাকি ছিল না। পুরোনো জুতো দিয়ে আমি একটি ছুরির খাপ তৈরী করে ফেলেছিলাম।

আমাদের থাকবার জায়গায় জল চুইতে আরম্ভ করেছিল, ফলে কেউ আর সেখানে শুতে পারত না। যত মজবুত জাহাজই হোক না কেন আগা গলুই-এর কাছে পালের দড়ি বাঁধার দণ্ডের কাছটা ফুটো হয়ে গিয়ে ভিতরে জল পড়াটা সচরাচর বিচিত্র নয় কেন না এত বিভিন্ন জলবায়ুতে এত রকম ধকল যেত জাহাজের উপর দিয়ে। আবার আর একটি অজ্ঞাত ফুটো থেকে এমনই জল পড়তে আরম্ভ করল যে ঐ দিকটা একেবারে থাকার অযোগ্য

হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সাতটি বিছানার মধ্যে তিনটি কোনমতে শুকনো থাকত—ঐ দিয়েই আমাদের চালাতে হত।*

সান ডিয়াগো ছাড়ার দু দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু পেয়ে আমরা স্বচ্ছন্দ গতি চললাম। তখনো পর্যন্ত পূর্বোল্লিখিত কষ্ট আরম্ভ হয় নি।

রবিবার, ১৫ই মে। এক সপ্তাহ কাটল। আমরা এখন ১৪°৫৬´ উত্তর অক্ষাংশে, ১১৬°১৪´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে চলেছি। সাত দিনে প্রায় তেরো শ মাইল পথ অতিক্রম করা হয়েছে। হাওয়া এখনো অবধি ভাল। হালকা পালে জাহাজ বেশ ভালই চলছে। ক্যাপ্টেন গোড়া থেকেই বলে দিয়েছিলেন যে কোনরকম ছেলেখেলা করে জাহাজ চালান নয়, যতদূর সাধ্য তত জোরে চালাতে হবে। ফলে আমরা প্রায় একদিনে তিন ডিগ্রী করে অক্ষাংশ পার হচ্ছিলাম। নিত্যকার কাজ চলেছিল একই ভাবে। এতদিন বন্দরে থাকার জন্য দড়াদড়িগুলো ঢিলে হয়ে এসেছিল, সেগুলো আঁট করে বাঁধা, মাস্তুলের দড়ি টেনে দেওয়া, হালকা বাণিজ্য-বায়ু উঠলে যে পাল টাঙ্গান হবে তার দড়ি ও দণ্ড ঠিক করে রাখা, হর্ণ অন্তরীপের জন্য বিশেষ পাল প্রস্তুত করা। জাহাজের নিয়মই তাই। যতক্ষণ সুসময় থাকে তার মধ্যে দুঃসময়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলা। রাত্রের পাহারায়ও একটা বাঁধা গত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একবার চাকাটা ধরে বসা, এদিক ওদিক নজর বুলিয়ে নেওয়া, কুণ্ডলীকৃত দড়ির উপর এক ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া, গল্পসল্প, কখনো বা একা পায়চারি করা। আমি প্রায়ই ডেকের এদিক থেকে ওদিক হেঁটে বেড়াতাম। প্রত্যেকটি তরঙ্গ আমাদের একটু করে বস্টনের দিকে নিয়ে চলেছে। এইভাবে চললে আর পাঁচমাসের মধ্যে দেশের মুখ দেখতে পাব। আবহাওয়া সুন্দর, হাওয়া অনুকূল—দেশের পথে চলেছি—এর চেয়ে প্রার্থিত বস্তু আর কি হতে পারে! সকলেরই কাজে মহা উৎসাহ, সকলের মেজাজ প্রসন্ন, সবাই একসঙ্গে জড় হয়ে যত সামুদ্রিক গাথা ও কাহিনী আছে সব গাওয়া হত। বাড়ী ফিরে কি করা হবে সেই

* বস্টনে ফেরার পর নোঙর বাঁধার কাঠের খণ্ডটি তুলে দেখা গেল তার নীচে দুটি গর্ত করা হয়েছিল কিন্তু পরে সেগুলি বন্ধ করার কথা কারো মনে ছিল না। এই অসাবধানতার জন্য আমাদের সমস্ত পথ এত দুর্ভোগ।

নিয়েও আলোচনা চলত নিরন্তর। রাত্রের খাওয়ার পর বাসনপত্র সরানো হয়ে গেলে রোজই নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর হত—

"আচ্ছা ডানা, আজ কত অক্ষাংশে এলাম ?"

"উত্তরে চোদ্দ। সাত মাইল করে চলেছি।"

"তাহলে পাঁচ দিনের মধ্যে বিষুবরেখায় পড়ব।"

"যদি এই হাওয়া থাকে। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাওয়ার গতি বদলাবে—" একজন অভিজ্ঞ মাল্লা মন্তব্য করলে।

তারপর সকলে মিলে গবেষণা চলল, হাওয়ার প্রকৃতি, দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য-বায়ু, বিষুবরেখায় আবহাওয়া কেমন পাওয়া যাবে, কবে জাহাজ হর্ণ অন্তরীপে পৌঁছবে ইত্যাদি। অনেকে তো সাহস করে গুণতে বসল, বস্টনে পৌঁছতে আর কতদিন।

"দাঁড়াও আগে হর্ণ পার হও" বললে এক পুরোনো লোক।

"বস্টনের আলো তো দেখবে, তার আগে চোখে অন্ধকার না দেখতে হয়।" আর একজন টিপ্পনী কাটলে।

কেবিনে ক্যাপ্টেন কি বলেছেন সে সম্বন্ধে নানারকম গুজব শোনা যেতে লাগল। "যাত্রীটিকে" উনি নাকি ম্যাগেলান প্রণালী সম্বন্ধে কি বলছিলেন। গতিক ভাল না দেখলে উনি সোজা নিউ হল্যাণ্ড হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ফিরবেন এমন কথাও শোনা গেল।

এতদিন আমাদের জাহাজে কোন যাত্রী ছিল না। পশ্চিম উপকূলে এক বন্দর থেকে আরেক বন্দর যাবার জন্য অনেকে এসেছিলেন বটে কিন্তু এবার আমাদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় এক যাত্রী এসে যোগ দিলেন। ভদ্রলোক আমার পূর্বপরিচিত। তিনি কেমব্রিজে শিক্ষকতা করেন, নাম অধ্যাপক নাটাল, ক্যালিফোর্ণিয়ার এই বিজন অঞ্চলে তাঁর দেখা পাওয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত। আমি দেশ ছাড়ার সময় উনি হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও পক্ষীবিদ্যায় অধ্যাপনা করছিলেন। তারপর দেখি নাবিকের জামা পরে প্যাণ্টের পা গোটানো অবস্থায় সান ডিয়াগোর বালিয়াড়িতে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। উনি উত্তর পশ্চিম উপকূল অবধি স্থলপথে এসে মণ্টারি থেকে নৌকায় এখানে এসে পৌঁছেছেন। মণ্টারি থেকে পিলগ্রীম ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন না দেশের দিকে একটি জাহাজ ছাড়ছে

শুনেছিলেন উনি। পথে সব জায়গায় নেমে উনি নানারকম নুড়ি, পাথর, গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে করতে অবশেষে পৌঁছেছেন সান ডিয়াগো। পিলগ্রীমের দ্বিতীয় মেট আমাকে বলেছিল ওদের জাহাজে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আছেন তিনি নাকি আমাকে চেনেন। তাঁর নামটা ও কিছুতেই মনে করে বলতে পারেনি। তবে চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললে চুল পাকা, বুড়োমত লোকটি, কেবল ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে ঘুরে ফুলপাতা কুড়িয়ে বাক্স ভর্তি করেন। আমি অনেক ভেবেও স্থির করতে পারলাম না ইনি কে। এমন সময় একদিন ওঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমি নৌকা নিয়ে কূলে গেছি উনি জুতো হাতে এসে উপস্থিত, পকেট ভর্তি নানারকম গাছপাথরের নমুনা। ওঁকে দেখে আমি এত আশ্চর্য হলাম যে মালগুদামের মধ্যে একটা গির্জার চুড়ো উঠতে দেখলেও বোধকরি অতটা অবাক হতাম না। ওঁর খুব সম্ভব আমাকে চিনতে বেশী দেরী হয়নি। আমরা প্রায় একই সময়ে দেশ ছেড়েছি, কাজেই কেউ কাউকে কোন নতুন খবর দিতে পারলাম না। আমাদের বর্তমান অবস্থার বৈগুণ্যে খুব একটা কথাবার্তা বলার সুযোগ হত না। অনেক সময় রাত্রের পাহারায় যখন আমার কোন কাজ থাকত না উনি ধারে কাছে কেউ না থাকলে এসে আমার সঙ্গে গল্প করতেন। তবে মাল্লাদের সঙ্গে যাত্রীদের কথা বলা জাহাজের নিয়ম বিরুদ্ধ। মাল্লারা ওঁকে ঠিক বুঝতে পারত না। ওঁর সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা হত, শুনে আমার বেশ মজা লাগত। ছুতোর মিস্ত্রী যেমন ক্যাপ্টেনের কেবিনের যন্ত্রপাতি দেখে কিছুই বুঝত না, এদের অবস্থাও হয়েছিল অনেকটা তাই। মাল্লারা ওকে বলত "পাগলা বুড়ো"। ওঁর অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করার বাতিক থেকে এই নাম হয়েছিল। মাথা খারাপ না হলে কোন পয়সাওয়ালা লোক (মাল্লাদের কাছে যারাই লম্বা কোট ও টাই পরে এবং হাত দিয়ে কাজ করে না তারাই পয়সাওয়ালা লোক) সাধ করে সভ্য জগৎ ছেড়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার মত জায়গায় পাথর কুড়োতে আসে? ওদের মধ্যে একজনের অভিজ্ঞতা অন্যদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। তার কাছে ব্যাপারটার অর্থ ছিল অন্য রকম। "ঐসব লোকেদের তোমরা কি বোঝ? আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি। কলেজ টলেজ আমি অনেক দেখেছি, ওসব কলেজী চালও আমার কাছে নতুন নয়। এই বুড়োকে তোমরা যতটা সাদাসিধে ভাব ও তত বোকা নয়। ও এইসব জিনিস জমাচ্ছে যাতে লোকেরা দেখতে আসে। কলেজে

অন্য লোকেদের জিনিসের চেয়ে যদি ওর জিনিসগুলো ভাল হয় তবে ওকেই কলেজের কর্তা বানিয়ে দেবে। তারপর আবার অন্যেরা আসবে এই সব জিনিস খুঁজতে। তাদের কাছে হেরে যাবার ভয়ে এই বুড়োকে আবার আসতে হবে, যদি জেতে তো ভাল, হেরে গেলে গদী ছাড়তে হবে। এই হচ্ছে মামলা। এই পাগলা বুড়ো বেশ ভাল করেই জানে এখানে আর কেউ কোনদিন আসেনি, তাই ও এসেছে—এতো জলের মত সোজা।" এই শুনে মাল্লারা সন্তুষ্ট হল। মিঃ নাটাল সম্বন্ধে ওদের ধারণা একটু উঁচু হয়ে গেল বোধহয়—ব্যাখ্যাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমি কোন উচ্চবাচ্য করলাম না।

মিঃ নাটাল ছাড়া জাহাজে আর অন্য কোন যাত্রী ছিল না। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে অবশ্য পশুগুলোকে ধরা যায়। তবে তাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল। প্রতি চারদিনে একটি করে ষাঁড় মারা হচ্ছিল। বিষুবরেখা পৌঁছবার আগেই আর একটিও ষাঁড় অবশিষ্ট রইল না। কেবিনের অধিবাসীরা হাঁস মুরগীর সদ্ব্যবহার করতেন, আমাদের ভাগ্যে সেগুলি জুটত না।* শুয়োরদের সব রকম আবহাওয়া সহ্য করার

* মাংসের ভাগের হিসাব প্রায় প্রত্যেক জাহাজেই একরকম। শুয়োর মারা হলে মাল্লাদের জন্যে এক ভাগ, বাকিটা যায় কেবিনে। মুরগী ইত্যাদি সুখাদ্য মাল্লারা কোনদিন চোখেও দেখতে পায় না—অবশ্য মাল্লাদের মুরগী খেতে হলে যে সংখ্যক পশু দরকার তা জাহাজে রাখাও সম্ভব নয়। তাছাড়া তার সঙ্গে অন্যান্য আনুসঙ্গিক না হলে পেটও ভরবে না। তবে গোমাংসেরও চর্বিওয়ালা ভাল টুকরাগুলি চলে যেত উচ্চকর্মচারীদের জন্য, অবশিষ্ট যা থাকত সেটাই মাল্লারা ভাগাভাগি করে খেত। মাল্লাদের ভাষায় তার নাম বুড়ো ঘোড়া।

খাবার সময় মাল্লাদের মধ্যে একটা ছড়া বলার রীতি আছে, সেটি আগে কোথাও ছাপা হয়েছে কিনা জানিনা। মাংসের কোন খারাপ টুকরো চোখে পড়লে সেটাকে তুলে ধরে মাল্লারা বলে,

"বুড়ো ঘোড়া, বুড়ো ঘোড়া, কোথায় ছিলে বাপ?
পোর্টল্যাণ্ড পিয়ার কি সাক্রারাপ।
পাথর টেনেছি আমি বছর বছর
প্রহারেতে তবু অঙ্গ হল জরজর।
মরে গিয়ে বাঁচি এবে নুন মাখি গায়
গালি দিয়ে মোর মাংস নাবিকেরা খায়।"

ক্ষমতা আছে। তাই ওদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছিল। একটি বৃদ্ধা শুয়োর ছিল আমাদের জাহাজে—এই তৃতীয়বার সে হর্ণ অন্তরীপ পার হতে চলেছে। এবার শীতে ও বরফে সে প্রায় মরতে বসেছিল কিন্তু আমরা ওর গায়ে ভাল করে গরম খড় জড়িয়ে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

বুধবার, ১৮ই মে। ৯°৫৪´ অক্ষাংশ, ১১৩°১৭´ দ্রাঘিমাংশ। উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু শেষ হয়ে নির্বাত মণ্ডলের এলোমেলো হাওয়ার রাজ্যে পৌঁছলাম। অল্পসল্প বৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে পড়তে লাগল। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে জলবায়ু ঐ রকমই। আমাদের সর্বক্ষণ ডেকে তটস্থ হয়ে থাকতে হত। যখন হাওয়া যে দিকে মোড় নেয় সেই অনুযায়ী পাল সাজান, দড়ি টানা। বাঁ দিয়ে হঠাৎ এল দমকা হাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে দড়ি টান, দড়ি টান, পাল ছড়াবার দণ্ডে দড়ি লাগাও, হালকা পাল নীচে লাগাও, ডাণ্ডা খাটাও—আবার পরক্ষণেই সব চুপচাপ, জল একেবারে পুকুরের মত স্থির, হালের লোকটি হাত তুলে হাওয়া বুঝবার চেষ্টা করল। সামনের দিক থেকে একজন হাঁক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার দড়ি ছাড়ো, হুড়মুড় করে পাল নামল, হালকা পাল নীচে থেকে খুলে এবার উপরে লাগাতে হবে। সব আঁটসাঁট করে বাঁধা হল, হয়ত একটু ঘুমের আয়োজন করছি এমন সময় আবার হাওয়া ঘুরল, সঙ্গে সঙ্গে পাল খুলে ডান দিকে লাগাও। এইভাবে আটটার ঘণ্টা অবধি চলল। তারপর ছুটি।

রবিবার, ২২শে মে। ৫°১৪´ উত্তর অক্ষাংশ, ১১৬°৪৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। যাত্রা করার পর এক পক্ষকাল কেটেছে। বিষুবরেখার পাঁচ ডিগ্রীর মধ্যে এসে পৌঁছেছি, হাওয়া পেলে দুদিনে পৌঁছে যাব কিন্তু এমন এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া যে তার বড় ভরসা ছিল না। রবিবার দিন বৃষ্টি হল, আমরা জল বেরোবার রাস্তা বন্ধ করে ডেকে পুকুর তৈরী করে ফেললাম। তার মধ্যে চলল জামা কাপড় কাচা, চান করা ইত্যাদি। সমুদ্রের নোনা জলে শুধু নামে মাত্রই স্নান হয়। গা থেকে মোটেই ময়লা কাটে না। ক্যাপ্টেন ছিলেন নীচে। মেটও এসে আমাদের এই হোলিখেলায় যোগ দিলেন। আমরা দুজন মিলে ওঁকে কষে রগড়ালাম। তারপর জলের মধ্যে ওঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ জুড়ে দিলাম। ডেকের জল বেরোবার রাস্তা খুলে আমরা সাবান গোলা জল ফেলে আবার নতুন করে জল ভরলাম। তারপর সেই

জলে আরম্ভ হল মহোৎসাহে গা ধোয়া। রোদে পুড়ে ও ক্যালিফোর্ণিয়ার জল হাওয়ায় আমাদের কালচে হয়ে আসা গায়ের রং আবার বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল দেখে আমরা বেশ অবাক হলাম। পরদিন উজ্জ্বল রোদে আমাদের ভিজে কাপড়গুলো জাহাজের এদিক থেকে ওদিক দড়ি টাঙ্গিয়ে শুখোতে দেওয়া হল।

বিষুবরেখার যত কাছে আসতে লাগলাম হাওয়ার গতি ক্রমেই পূর্বমুখী হতে লাগল, আবহাওয়া সুন্দর। সান ডিয়াগো থেকে কুড়ি দিন পরে—

শনিবার ২৮শে মে। বিকেল তিনটে। পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে হাওয়া আসতে লাগল। আমরা বিষুবরেখা পার হলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু পেয়ে গেলাম—সেটা বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। এই হাওয়া সাধারণতঃ দক্ষিণ-পূর্বের একটু পূব দিক থেকে আসে কিন্তু আমরা পেলাম একেবারে পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে, কাজেই এতে আমাদের সুবিধাই হল। এমন ভাবে দণ্ডগুলি সাজান হল যাতে ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটি পালে হাওয়া লাগে। বারো দিন এক নাগাড়ে হাওয়া চলল, আমাদের এতটুকু দড়িটানার প্রয়োজন হল না—বহুদূর পথ অল্পসময়ে অতিক্রম করে আমরা সাতদিনে বারোশ মাইল পথ পার হলাম।

রবিবার, ৫ই জুন। ১৯°২৯´ দক্ষিণ অক্ষাংশ, ১১২°০১´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। এতদিনে মনে হল আমাদের জাহাজে পুরানো গতিবেগ ফিরে এসেছে। সান ডিয়াগো ছাড়ার সময় যেভাবে চলছিল তার তিন গুণ গতি এখন। আমাদের আর অনুযোগের কোন কারণ নেই। প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর গতিবেগ মাপা হয়। সব মিলিয়ে অতি চমৎকার। প্রশান্ত মহাসাগরের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া, মাথার উপরে পরিষ্কার আকাশে সূর্য ডুবছে, তারা ফুটছে—মেরুর দিকে স্থির লক্ষ্য। ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষি-মণ্ডল ফেলে এসেছি এখন সকলেই অপেক্ষা করছে দক্ষিণ দিকে ম্যাগেলান নক্ষত্রপুঞ্জের জন্য। একজন বললে যখন ধ্রুবতারার দর্শন পাব তখন আমরা অন্তরীপ পার হয়ে উত্তর মুখে চলেছি। সেই শুভদিনের কথা ভেবে আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মাল্লাদের মধ্যে ধ্রুবতারাকে প্রায় প্রথম ডাঙা দেখার সমান মনে করা হয়, বিশেষত উত্তমাশা কিংবা হর্ণ অন্তরীপ পার হয়ে ফেরার সময়।

পিলগ্রীমে আসার সময় জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ থেকে বিষুবরেখা অবধি সমানে বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হয়েছিল, পালের দড়িতে হাত অবধি দিতে হয়নি। আমরা এখন সেই অক্ষাংশে চলেছি, তবে পিলগ্রীমের গমন পথের চেয়ে বারো শ মাইল পশ্চিমে। কেন না আমাদের ক্যাপ্টেন বাণিজ্য বায়ুর সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার চেষ্টা করছিলেন—আমরা ডিউসি দ্বীপের প্রায় দু শ মাইলের মধ্য দিয়ে গেলাম।

মনে পড়ে গেল ঠিক এইখানেই পিলগ্রীমে একটি ঘটনা ঘটে। একদিন গভীর রাত্রি, দুদিকে ছোট পাল তুলে আমরা বেশ জোরে চলেছি। কেবল জলের ছলাৎছল ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। পাহারার দলের মধ্যে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আমি ও হালের লোকটি জেগে। দ্বিতীয় মেটের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল—আমরা দুজনে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার পর মেট চলে গেছেন, আমিও আবার পায়চারি করতে আরম্ভ করেছি। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে এক বিকট চিৎকার। মনে হল যেন শব্দটা গলুই-এর নীচে থেকে আসছে। সমুদ্রের অন্তহীন নীরবতার মধ্যে গভীর অন্ধকারে সেই চিৎকার যেন অলৌকিক রহস্যজড়িত বলে বোধ হল। আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্যদেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তারা হতভম্ব হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। দ্বিতীয় মেট ধীরপদে এগিয়ে এসে বললে "এ কিসের আওয়াজ?" আমার মনে হল হয়ত কোথাও জাহাজ ডুবি হয়েছে, নৌকায় করে আসতে গিয়ে জলমগ্ন হয়েছে হয়ত কেউ। কিংবা অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে আমরা কি কোন তিমি শিকারী নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেললাম? আরেকবার সেই চিৎকার, এবারে তীব্রতা যেন একটু কম। আমরা সচকিত হয়ে দৌড়ে রেলিঙে ঝুঁকে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না। এখন কি কর্তব্য? জাহাজ থামিয়ে ক্যাপ্টেনকে খবর দেওয়া হবে? এমন সময় নীচে আলো দেখতে পেয়ে আমরা উঁকি মেরে দেখি মাল্লারা সকলে ঘুম থেকে উঠে একজনকে বিষম ঝাঁকুনি দিচ্ছে। যে বেচারা দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওদেরও আমাদেরই মত প্রথম চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গেছে, উপরে আসবে কি আসবে না ভাবতে ভাবতেই দ্বিতীয় চিৎকার, তখন ব্যাপারটা ওদের কাছে স্পষ্ট হল। এতক্ষণে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুব একচোট হেসে নিলাম।

এরকম ভাবে সকলকে বিব্রত করার জন্য লোকটিকে খুব কষে ঝাঁকুনি দেওয়া হল।

দক্ষিণের ক্রান্তিবৃত্তরেখার খুব কাছে এসে পড়েছি আমরা। অনুকূল বাতাসে সূর্যকে ক্রমেই পিছনে ফেলে অগ্রসর হচ্ছি হর্ণ অন্তরীপের পথে। শীতলতার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য জাহাজের সব সরঞ্জাম পালটে নতুন করে চামড়ার শক্ত দড়ি ইত্যাদি খাটান হয়েছিল। যাতে শীত গ্রীষ্মে কমে বেড়ে হর্ণ অন্তরীপে পৌঁছবার আগেই দড়িগুলি শক্ত হয়ে যায়।

রবিবার, ১২ই জুন। ২৬°০৪´ দক্ষিণ অক্ষাংশ। ১১৬°৩১´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। বাণিজ্য বায়ুর এলাকা ছেড়ে এলোমেলো হাওয়ার রাজ্যে প্রবেশ করলাম। এখন মাঝে মাঝে পশ্চিম থেকে হাওয়া আসছিল। আমরা প্রায় একটি মধ্যরেখা বরাবর দক্ষিণের দিকে চললাম। সপ্তাহ এইভাবে কাটল।

রবিবার, ১৯শে জুন। ৩৪°১৫´ দক্ষিণ অক্ষাংশ, ১১৬°৩৮´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে উপস্থিত হলাম।

॥ ৩১ ॥ দুঃসময় ॥

ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। দিন ছোট হয়ে এল, ক্রমশঃ সূর্য নীচে নামতে লাগল, কাজেই রোদের তেজ কম। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে, আর খোলা ডেকে ঘুমোনো অসম্ভব। রাত্রের আকাশ যেন ক্ষুধার্ত চোখ নিয়ে জলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে—মাথার উপর ম্যাগেলান নক্ষত্রপুঞ্জ। সমুদ্রের প্রকৃতিও থেকে থেকে অসংযত হয়ে ওঠে—ভবিষ্যতের নমুনা এখন থেকে ভাল ভাবেই পাওয়া যেতে লাগল। সপ্তাহের মাঝামাঝি হাওয়া দক্ষিণমুখী হয়ে গেল। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আঘাত করল আমাদের। গতিক খুব সুবিধার মনে হল না। ভারী হওয়ার জন্যে সহজে ভেসে ওঠার বদলে জাহাজ প্রত্যেক তরঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে চলল। একটু বড় ঢেউ এলেই গলুই-এর উপর দিয়ে আছড়ে পড়ে ডেকে যা কিছু ছিল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সকালে পাহারায় ছিলাম না। কিন্তু নীচে থেকে শুয়ে শুয়েই অনুভব করছিলাম মাথার উপর জলের শব্দ। আটটা ঘণ্টায় উপরে এসে আমি সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। যতদূর চোখ যায় ঢেউএর

মাথায় শুভ্র ফেনার মুকুট পরে সমুদ্র আন্দোলিত হচ্ছে, ঢেউএর রং গভীর নীল, তাতে সূর্যকিরণ পড়ে ঠিকরে উঠছে। আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে ঢেউএর উপর দিয়ে যেতে লাগল, শেষে একটি বিরাট তরঙ্গ ধেয়ে এল, দেখে মনে হল গ্রাস করতে আসছে আমাদের, বুঝলাম এ যাত্রা জাহাজ আর ভেসে উঠবে না। আমি দড়ি ধরে লাফিয়ে উঠেছি। পাটা খুঁটি অবধি পৌঁছবার আগেই গলুই গিয়ে পড়েছে জলের মধ্যে, জাহাজের আগা থেকে শেষ অবধি স্রোত বয়ে গেল, জল থেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে দেখি ডেকের উপর মুরগী, শুয়োরের খাঁচা ইত্যাদি যা কিছু ছিল সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। কেবল বড় নৌকাটি শক্ত করে আঁটা ছিল, তাই সেটি ভেসে যায় নি। জল বেরোবার নালির কাছে গোটাকত কাঠের টুকরো ভাসছে, একটা নৌকা উলটে পড়ে আছে। আর শুয়োরগুলো ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে সাঁতরাচ্ছে। সকলে তখন নীচে থেকে দৌড়ে এসেছে—কি হচ্ছে দেখবার জন্য। বিল ও রাঁধুনী নৌকা চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতক্ষণ বাদে গুঁড়ি মেরে জলের তলা থেকে বেরোল ওরা, প্রায় দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওদের। ভাগ্যিস রেলিঙে আটকে গিয়েছিল তা না হলে আর দেখতে হত না। জল সরে যেতেই আমরা শুয়োরগুলো তুলে বড় নৌকাটার মধ্যে রাখলাম। অন্য নৌকাটিও উঠিয়ে সোজা করা হল। জাহাজের রেলিং আর একটু ছোট হলেই যে এগুলিও ভেসে যেত সেকথা নিঃসন্দেহ। রাঁধুনী ও বিলেরও সলিলসমাধি হত ততক্ষণে। বিল বেচারা মাংসের গামলা হাতে দাঁড়িয়েছিল, জলের তোড়েও ও কিন্তু গামলা ছাড়েনি। মাংস ভেসে যে কোথায় চলে গেল কেউ দেখতে পেল না কিন্তু জল সরতে দেখা গেল গামলাটি ঠিক ডেকের উপরেই পড়ে আছে। মাংস নষ্ট হওয়ার ব্যাপারটা আমরা খুব হালকা ভাবে নিলাম। ক্যাপ্টেন ও তাঁর অনুচরদের খাবারও জলে ভাসছে দেখে আমাদের কী আনন্দ। "এমন হলে তো চলবে না" একজন মাল্লা মন্তব্য করলে। আমরা সকলেই এতে মনে মনে সায় না দিয়ে পারলাম না। এখনও হর্ণ অন্তরীপে পৌঁছতে হাজার মাইল, সমুদ্রের তাণ্ডব তার তুলনায় কিছুই নয়—কিন্তু এত অল্পে আমাদের ডেক ভেসে গেলে কি করে চলবে। অনেকে বললে জাহাজে এত বেশী ভারী জিনিস বোঝাই করা ক্যাপ্টেনের অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আমরা নীচে নেমে দেখি বুড়ো বিল বলছে এই যদি ভবিষ্যতের নমুনা হয় তাহলে আমাদের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির

দানপত্র লিখে প্রস্তুত হয়ে থাকলেই পারি। বিল অনেক দুর্ঘটনা দেখেছে, বহু অভিজ্ঞতা আছে। অশুভ কথা ওর মুখে আটকাত না। "চুপ করে থাক। নাকানি চোবানি খেয়ে ভয় ঢুকেছে, তাই এই সব কথা। ঠাট্টাও বোঝ না!" বললে একজন। দুটি ঘণ্টায় সকলের ডাক পড়ল উপরে—সব কিছু বেঁধে ছেঁদে আঁট করা হল। ক্যাপ্টেন একবার বড় মাস্তুলটি নামিয়ে ফেলার কথা বললেন, কিন্তু রাত্রের দিকে সমুদ্র শান্ত হয়ে এল, তাই দরকার হল না।

যত আবহাওয়া খারাপের দিকে যায়, জাহাজের সাজসজ্জার বাহার তত বাড়ে। আমরা এবার পুরোনো পাল খুলে নতুন পাল খাটালাম। তিনটে নতুন পাল আগেই তৈরী করা হয়েছিল। দড়ি, আংটা ও কপিকল জুড়ে সেগুলি সবচেয়ে নীচের পাটাতন থেকে তুলে দেওয়া হল। সামনে পিছনে নতুন টানা দড়িও লাগান হল।

পশ্চিমে হাওয়া একনাগাড়ে চলল, আমরা হালকা পালে মন্দ যাচ্ছিলাম না। ক্যাপ্টেন জাহাজটা এত পশ্চিমে নিয়ে এসেছিলেন যে হর্ণ অন্তরীপের অক্ষরেখার পাঁচ মাইলের মধ্যে এসে গেলেও আমরা ছিলাম অন্তরীপের সতেরো শ মাইল পশ্চিমে। এই সপ্তাহটা ভালই কাটল। যত দক্ষিণে গেলাম ক্রমশঃ জাহাজের মুখ পূব দিকে ফেরান হতে লাগল। হাওয়া বাঁ দিক থেকে এসে লাগল জাহাজে। অবশেষে—

রবিবার, ২৬শে জুন। আকাশ পরিষ্কার দেখে ক্যাপ্টেন আজ অবস্থান ও মধ্যরেখা নির্ণয় করলেন, দেখা গেল আমরা ৪৭°৫০´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১১৩°৪৯´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে আছি। আমার গণনা অনুযায়ী হর্ণ অন্তরীপ পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে আঠারো শ মাইল।

সোমবার, ২৭শে জুন। সকালের দিকটা তেমন ঠাণ্ডা ছিল না। আমরা সাধারণ সুতী পোশাক পরে ডেকে কাজকর্ম করলাম। দুপুরে ছুটি। সান ডিয়াগো ছাড়ার পর এই প্রথম দুপুরে একটু ঘুমোবার সুযোগ পাওয়া গেল। শোবার আগে আমরা অক্ষাংশ জেনে নিয়ে মনে মনে হিসাব করলাম অন্তরীপ পৌঁছতে আরো কতক্ষণ লাগতে পারে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এমন সময় সিঁড়ির মুখে তিনবার ধাক্কা আর "সকলে উঠে পড়" চিৎকার। কি ব্যাপার? চোখ তুলে উপরের আকাশ যতটুকু চোখে পড়ল তাতে তো মেঘের কোন চিহ্নই দেখা গেল না, অথচ উপরে মাল্লারা

পাল খুলে নিচ্ছে। আমাদের মনে হল বোধ হয় আর একটি জাহাজ দেখা গেছে, তাই জাহাজ থামিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলার উদ্যোগ করা হচ্ছে—যাক তাহলে এতদিনে আর একটি জাহাজের মুখ দেখা গেল, এই ভেবে আমরা মনে মনে খুশী হচ্ছি এমন সময় মেটের গলা পাওয়া গেল উপরে, অন্য পাহারার দল গেল কোথায়, খোঁজ করছেন মেট। আমরা আর অপেক্ষা না করে হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। ডান দিকের গলুই-এর দিকে দেখা গেল আকাশ থেকে সমুদ্র অবধি বিস্তৃত এক কুয়াশার জাল আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আমি পিলগ্রীমে থাকার সময় এরকম কুয়াশা দেখেছি, এর অর্থ বুঝতে বিলম্ব হল না, যে যেমন অবস্থায় ছিলাম আমরা কাজে লাফিয়ে পড়লাম।

অন্য পাহারার দলটি ততক্ষণে উপরের ছোট পালগুলি খুলতে উঠে গেছে, এক এক করে পাল নেমে আসছিল। সব খোলো খোলো রব পড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। পিছনের মাস্তুলের পাল, উপরের পাল, ছোট হালকা পাল সব গুটিয়ে ফেলে জাহাজ ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল, তবে দু-একটি পাল রাখা হল। প্রকাশ্য দিবালোকে আমরা তেমন ভয় পাবার পাত্র নই। পাল না নামিয়ে যতক্ষণ চলে ততক্ষণ চালানো হবে। ঝড়ের প্রথম বেগটা এসে পড়ল, এক ধাক্কাতেই আমরা বুঝলাম এ বড় সহজ ব্যাপার নয়। বৃষ্টি, শিলা আর তুষারপাত আরম্ভ হল, এত জোরে পড়ছিল যে আমাদের প্রায় দমবন্ধ হবার উপক্রম। অতি বড় সাহসীকেও ঝড়ের ঝাপটা বাঁচাবার জন্য পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতে হল। মাস্তুল আর দড়াদড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে লাগল, জাহাজ একপাশে এত হেলে গেল যে উলটে যায় যায়। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "উপরের বড় পালের কোণের দড়ি ধরে টেনে আনো", সঙ্গে সঙ্গে পালের দড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলে। জাহাজের গলুই ফেনার মধ্যে অদৃশ্য, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে জাহাজ তীরবেগে ছুটে চলেছে। পাল নামাবার দড়ি ছেড়ে দেওয়া হল, ডাণ্ডাগুলি নামিয়ে বাঁধা হল। পালগুলি নামানো হবার পর নীচে পড়ে রইল। গুটিয়ে ফেলা হবে কি না প্রশ্ন করলেন মেট। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বললেন দু দিকের বড় পালের দড়ি ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে উপরের পালের দণ্ডগুলি নেমে এল, দড়িতে কপিকল লাগিয়ে আমরা টানতে লাগলাম। চাবুকের মত শিলার আঘাত আর হাওয়া। আমরা প্রাণপণে দড়ি ধরে আছি—অত

বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ করতে যে কি পরিশ্রম হচ্ছিল তা অবর্ণনীয়। একে পালগুলি তখনো নতুন, তাই শক্ত, তার উপর দড়াদড়িও বরফে শক্ত হয়ে গাঁঠ পাকিয়ে যেতে লাগল। আমরা সুতী জামা পরে ভিজে নেয়ে গেছি, তার উপর ঠাণ্ডায় আঙ্গুল চলে না। পালের গায়ে ঘষে ঘষে আমরা আঙ্গুল গরম করলাম। নীচে থেকে আদেশ এল বাঁদিকে বাঁধো। আমরাও পালের দড়ি টেনে নিয়ে বাঁ দিকের আংটার কাছে এসেছি এমন সময় মেট আবার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন "দুটো দড়ি, দুটো দড়ি।" অগত্যা আরেকটি দড়ি ঐভাবে বাঁধা হল। তারপর ডেকে নেমে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বড় পালটা ঠিক করলাম। পাল গোটাতে দস্তুরমত বেগ পেতে হচ্ছিল কেন না আমাদের লোকবল বড়ই কম। মাত্র দুদিন আগে ছুতোর মিস্ত্রী কুঠার দিয়ে নিজের পা কেটে ফেলেছিল সুতরাং ওর পক্ষে দড়ি বেয়ে উপরে ওঠার প্রশ্ন অবান্তর, তার উপর এই ঝড়ঝঞ্ঝা। আমরা প্রত্যেকে সাধ্যের দ্বিগুণ খাটতে লাগলাম। একসঙ্গে একটির বেশী পাল কিছুতেই নামান যাচ্ছিল না। মধ্যের বড় পালটি নামানো হতে না হতে আদেশ হল যাও পিছনের পালে ওঠ। এবার মেট করুণাপরবশ হয়ে রাঁধুনী আর ষ্টুয়ার্টকেও পাঠালেন। আংটার মধ্য দিয়ে দড়ি পরাতে যেন এক একযুগ লাগছিল। যাই হোক এক এক করে সব কটি দড়ি আয়ত্তের মধ্যে আনা হল। পালটি গুটিয়ে আমরা পালদণ্ডে জড়িয়ে রাখলাম। ইতোমধ্যে ত্রিকোণ পালটিও গোটান হয়েছে, জাহাজ এতক্ষণে পালের বিস্তার কমার পর একটু সোজা ভাবে চলেছে। কিন্তু তখনো দুটি বড় পাল ঝোলার দড়িতে এমন আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে যেন মাস্তুল ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে। আমরা সেদিকে তাকিয়েই মনে মনে প্রমাদ গণলাম। আমাদের ডেকে দেখেই মেট হুকুম করলেন "যাও তোমরা চারজন উপরের পাল গোটাও।" আবার উপরে উঠলাম। সব রশারশির উপর একটা বরফের আস্তরণ পড়ে আছে, এমনকি মাস্তুল ও দণ্ডগুলিরও এক দিক সাদা হয়ে আছে বরফে। উঠতে উঠতে আমার হাত এমন জমে গেল যে একটি গাঁঠ খোলাও তখন অসম্ভব। খানিকক্ষণ দণ্ডের উপর আমরা চুপ করে রইলাম। প্রাণপণে পালের উপর হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে হাত গরম হল, আবার রক্ত চলাচল আরম্ভ হল। আমার সঙ্গে জর্জ সোমারবি নামে একটি কমবয়সী ছেলে ছিল। ছেলেটি বস্টনের স্কুল থেকে যখন এসেছিল তখন বড়ই রোগা, দুর্বল ও অপটু। কিন্তু

এখন লোহার মত সবল শরীর, একটি বৃষ একাই খেয়ে হজম করতে পারে। আমরা দুজনে মিলে হাত গরম করে ছয় সাত মিনিট টানাটানি ও ধাক্কাধাক্কির পর শক্ত ইস্পাতের চাদরের মত পালটা নামিয়ে ফেলতে সক্ষম হলাম। তারপর সাবধানে গুটিয়ে রাখা হল পালটা, কেন না আমাদের মেটকে কোনো বিশ্বাস নেই। হয়ত মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে পাল গোটাবার হুকুম হবে।

ভাবছি কতক্ষণে নীচে গিয়ে একটা গরম জামা গায়ে দেব কিন্তু সে আশা বৃথা। ডেকে নামবার আগেই পাহারার ঘন্টা পড়ে গেছে, আরো দুঘন্টা আমাদের উপরে কাজে লেগে থাকতে হল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঝড় বইছিল সেটা আমাদের পক্ষে মোটেই সুবিধার কথা নয়, কেন না টেরাডেল ফুয়েগো আমাদের অনেক দূর থেকে অতিক্রম করার কথা। ডেকে তুষারের সাদা চাদর বিছিয়ে আছে, আর তীরের মত বরফ পড়ে চলেছে অবিরল ধারে, একেবারে খাঁটি হর্ণ অন্তরীপের আবহাওয়া। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের সব পাল, দণ্ড, দড়ি দড়া গুটিয়ে তুলে রাখতে হল—এসব কাজ যে খুব সহজে হবার নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। সব কাজ শেষ হবার পর ছুটির ঘন্টা পড়তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীচে গেলাম। গরম চা আর রুটিমাংস খেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। আর সর্বোপরি শুকনো গরম জামা পরে যেন বাঁচলাম। গায়ের সুতী জামা ভিজে, সেঁটে, জমে একেবারে কড়কড়ে হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ এমন একটা অবস্থার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার কদিন ধরে সামান্য দাঁত ব্যথা আরম্ভ হয়েছিল, এই বর্ষাবাদলা ও ঠাণ্ডায় সেটা বেশ জাঁকিয়ে বসল। পাহারা শেষ হতেই আমি ওষুধের জন্য মেটের কাছে ছুটলাম কিন্তু দীর্ঘ যাত্রার শেষে ওষুধপত্রের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অগত্যা বিনা ওষুধেই সন্তুষ্ট থাকতে হল—কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

আটটা ঘন্টায় উপরে উঠে দেখি বরফপড়া থেমেছে, দু-একটি তারাও উঁকি মারছে, কিন্তু তখনো ভীষণ দর্শন কালো কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে আছে, ঝড়ের তেজও সেই এক রকম। আমি একবার উপরে উঠে পিছনের মাস্তুলের পালদণ্ড নামালাম, মেট দেখে বেশ প্রশংসা করলেন। তার পরের চার ঘন্টা সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। আমি দুটি চোখের পাতা একবারও এক করতে

পারলাম না, জেগে জেগে প্রত্যেকটা ঘণ্টা শুনলাম। চারটের সময় যখন উঠলাম সমস্ত শরীর অবসাদে আচ্ছন্ন, কাজ করার একেবারেই অনুপযুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সমুদ্রের কঠিন পরিশ্রমও অনায়াসে সহ্য করা যায় কিন্তু অনিদ্রা ও শারীরিক কষ্টে এই অবস্থায় মানুষকে একেবারে কাহিল করে ফেলে। যাই হোক এই সব চিন্তার তখন সময় নয়, কেন না কালকের ঝড়ে ক্যাপ্টেনের যা শিক্ষা হয়েছে তাতে তিনি আগামী দিনের জন্য ভাল রকম প্রস্তুতি চান। উপরের বড় লম্বা মাস্তুলগুলি নামাবার নির্দেশ দেওয়া হল। যথারীতি কাজও হল। মাস্তুল ও দণ্ডগুলি নৌকার পাশে শোয়ানো দেখে সকলেরই মন বেশ হৃষ্ট হল কেন না এতটুকু আবহাওয়ার পরিবর্তন হলেই আমাদের ঐ মাস্তুলে চড়ে পাল ওঠানো নামানো লেগেই থাকত। আমাদের সুন্দর জাহাজের সব সাজসজ্জা খুলে এক বিচিত্র রূপ হল। যেসব মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ পালে কাল পর্যন্ত জাহাজ শোভা পাচ্ছিল সেগুলি অদৃশ্য, যেন কুস্তিগীরের মত সমস্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জাহাজের এই নতুন রূপ চারিদিকের রুক্ষ অসুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেল। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে বিজন সমুদ্রে একাকী তরঙ্গ, ঝড় ও তুষারের সঙ্গে সংগ্রাম করার উপযুক্ত বেশভূষাই বটে।

শুক্রবার, ১লা জুলাই। আমার মুখ ফুলে দ্বিগুণ, দুদিন যাবৎ চোখে ঘুম নেই। মুখ হাঁ করতে এত কষ্ট যে ভাল করে খেতেও পারি না। স্টুয়ার্ট আমার জন্য সেদ্ধ ভাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিনা ক্যাপ্টেনের কাছে অনুমতি নিতে গিয়ে ভয়ানক ধমক খেল। "যাও, যাও, ওকে মাংস চিবোতে বল," বললেন ক্যাপ্টেন। অবশ্য এ রকমটাই আশা করা গিয়েছিল। যাই হোক মিঃ ব্রাউনের দয়ার শরীর, গোপনে আমাকে ভাত সরবরাহ করাবার ব্যবস্থা করলেন। অন্য সময় হলে আমি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতাম কিন্তু এখন লোক কম, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই—এই অবস্থায় আমি রণে ভঙ্গ দিতে পারলাম না।

শনিবার, ২রা জুলাই। আজ বহুদিন বাদে সূর্যের মুখ দেখে সকলেই প্রসন্ন। তবে সূর্য খুবই নীচে ছিল। সে রোদে এমন তাপ ছিল না যে আমাদের পালের বরফ গলে। এতদিন হাওয়া ছিল শুকনো ঠাণ্ডা, এবার ক্রমশঃ আর্দ্র হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে শীত। ক্যাপ্টেন নাকি যাত্রী ভদ্রলোককে বলছিলেন আজ তাপমান যন্ত্রের পারা সহসা বেশ নীচে নেমে গেছে, তার

অন্য কোন কারণ হতে পারে না ধারে কাছে বরফ থাকা ছাড়া। কিন্তু এই সময় এই অক্ষাংশে বরফ থাকা মোটেই সম্ভব নয়। বারোটার সময় আমরা নীচে গেলাম, খাওয়া তখনও শেষ হয়নি এমন সময় রাঁধুনী মুখ বাড়িয়ে বললে একটা চমৎকার দৃশ্য যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা যেন যত শীঘ্র সম্ভব উপরে আসি। যে লোকটি প্রথমে উঠল সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়, কোথায় হে ডাক্তার?" * "ঐ তো বাঁদিকের গলুই-এর দিকে"। সত্যিই কয়েক মাইল দূরে একটি ভাসমান বিরাট তুষারস্তূপ দেখা গেল, চূড়োগুলি সাদা, ভিতরের রঙ গভীর নীল। উত্তরের সমুদ্রে ঘুরেছে এমন একজন মাল্লা বললে সে জীবনে কখনো এতবড় বরফের চাঁই দেখেনি। কাছাকাছি সমুদ্রের জলও নীল, বড় বড় ঢেউ উঠছে পড়ছে, চকমক করে উঠছে, তার মাঝখানে এই বিরাট দ্বীপের মত বরফের স্তূপ। কোণে কোণে গুহাকন্দরে আলো ছায়া কিন্তু উঁচু অংশগুলি সূর্যকিরণে ঝলসে উঠছে। আমরা সকলেই ডেকে এসে মুগ্ধ নেত্রে এই বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই বিরাট সৌন্দর্যের ভাষায় বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। দ্বীপটির পরিধি প্রায় মাইল তিনেক, উচ্চতা কয়েক শত ফিট, ভিতরে বরফে বরফে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে পড়ার শব্দ, সব মিলিয়ে মনে কেমন একটা ভয়ের ভাব জাগাল। দ্বীপটির তলায় পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা জমে আছে, উপরের দিকে যত সরু হয়ে উঠেছে তত নীল রং ফিকে হতে হতে সাদা ও স্বচ্ছতর হয়ে গেছে। তুষার স্তূপটা ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে সরে যাচ্ছিল। আমরা ওটার থেকে বেশ দূরত্ব রেখে যেতে লাগলাম। সারা বিকেল স্তূপটি আমাদের দৃষ্টিপথে ছিল, ওটার বাঁ দিকে চলে যাবার পর হঠাৎ বাতাস থেমে গেল। আমরা রাত্রের অনেকটা সময় ঐ তুষার স্তূপের খুব কাছাকাছি ছিলাম। চাঁদ ছিল না, তবে আকাশ পরিষ্কার, স্তূপটির ওঠানামা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। একটা বিরাট বস্তু তারাগুলি আড়াল করে দাঁড়িয়ে, কখনো কখনো সরে যাচ্ছে। কয়েক বার প্রচণ্ড চিড় খাওয়ার মত শব্দ শোনা গেল, যেন বরফের স্তূপটি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, কয়েকটি টুকরো বজ্রনির্ঘোষে সমুদ্রে পড়ল। সকালের দিকে জোর হাওয়া বইতে লাগল, আমরা দূরে চলে গেলাম। ক্রমে তুষারস্তূপটি আর দেখা গেল না। পরদিন ছিল—

* প্রত্যেক জাহাজের রাঁধুনীর উপাধি ডাক্তার

রবিবার, ৩রা জুলাই। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। তাপমান যন্ত্রের পারা ক্রমেই নীচের দিকে যেতে লাগল। আরো কয়েকটি তুষারস্তূপ চোখে পড়ল, কিন্তু প্রথমটির মত এত কাছ থেকে নয়। দূর থেকে দেখে স্তূপগুলি আকারে বেশ বড়ই মনে হল, প্রথম দিনেরটির মতই অথবা তার চেয়ে বড়। দুপুরের দিকে আমরা ৫৫°১২´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও অনুমান ৮৯°৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পৌঁছলাম। রাত্রিবেলা বাতাসের গতি দক্ষিণমুখী হল, বেশ ঝ'ড়ো হাওয়া বইতে লাগল, কিন্তু বৃষ্টি বা শিলাপাত না হওয়াতে আমরা ততটা বিব্রত হইনি।

সোমবার, ৪ঠা জুলাই। আজ বস্টনে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সারা দেশে কত না উৎসবের ধুম। মেয়েরা রঙিন ছাতা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন, সুবেশ যুবকেরা রেশমী মোজা ও সাদা প্যাণ্ট পরে ইতস্তত ভ্রমণ করছেন। শহরে চাঁই চাঁই বরফের চালান আসছে, লোকে আইসক্রীম খাচ্ছে। আমরা যে সব তুষার স্তূপ দেখছি তার মধ্যে যে কোন একটি বস্টনে নিয়ে পৌঁছতে পারলে কত লাভ হত মনে মনে তার হিসাব করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে সকলেই বোধহয় বস্টনে যাবার এমন একটা সুবিধা পেলে বর্তে যাই। এই বিজন সমুদ্র কি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করার প্রশস্ত স্থান? নিজেদের গরম রাখা আর জাহাজকে বরফ বাঁচিয়ে চালানো—এই নিয়েই আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তবু আজকের তারিখটি ক্ষণে ক্ষণে মনে উদয় হতে লাগল, আর কত রকম হাস্যকর চিন্তাই না ভিড় করল মাথায়। পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু একটি কালো মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে। আমরা পূর্ব দিকে চলেছি। দুপুরের মধ্যে—৫০°২৭´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ৮৫°৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পৌঁছলাম। সূর্যাস্তের পর থেকে সমস্ত রাত্রির ভিতর অর্থাৎ তিনটা থেকে নটা পর্যন্ত—আমরা নানা আকারের চৌত্রিশটি বরফস্তূপ দেখলাম। কোনটি জাহাজের খোলের 'চেয়ে বড় নয়, কোনটি বা প্রথম দেখা বরফস্তূপটির মত বিশাল। যত অগ্রসর হওয়া যায় দেখি অগণিত ছোট ছোট তুষারস্তূপে চারিদিক ছেয়ে আছে—শেষে সন্ধ্যার সময় আমাদের মধ্যে একজন দেখতে পেল জলের উপর ভাসমান বিরাট বরফের আবরণ। মাইলের পর মাইল জুড়ে জলের উপর এই বরফের আস্তরণ পড়ে আছে, মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গা, কোথাও খাড়া বরফের চাঁই উঠে গেছে। এগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

তুষারস্তূপগুলি তবুও দূর থেকে দেখা যায়, এগুলি একেবারে কাছে না আসা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। এর কোনো টুকরো ঢেউয়ের সঙ্গে জোরে এসে লাগলে জাহাজের খোলে ফুটো হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তাই অতি সতর্ক হয়ে ছিলাম আমরা। এই সমুদ্রে একবার জাহাজডুবি হলে আর কাউকে বাঁচতে হবে না, কেন না এখানে নৌকা একেবারে অচল। সন্ধ্যার পর আমাদের দুর্দশা চরমে উঠল। পূবদিক ভীষণ ঝ'ড়ো হাওয়া আর কুয়াশায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে জাহাজের এদিক থেকে ওদিক দৃষ্টি চলে না। এতদিন আমরা যে পশ্চিমে হাওয়ার উপর নির্ভর করেছিলাম তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা অন্তরীপের প্রায় সাত শ মাইল পশ্চিমে, চারিদিকে বরফের চাঁই, একেবারে গলুই-এর কাছে আসা অবধি কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চারটের সময় অন্ধকার থাকতে সকলের ডাক পড়ল, প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পাল নামাতে হবে। আমরা কান ঢাকা টুপি, মোটা জুতো, মোটা জামা ও উপরে ত্রিপলের ঢাকা পরে প্রস্তুত ছিলাম। হাতে দস্তানাও পরলে হত কিন্তু মাস্তুলের উপরে উঠতে গেলে দস্তানা চলবে না। ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে হাত ফস্কে জলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা—সুতরাং খালি হাতেই দড়ি বেয়ে উঠতে হল। ছুরির ফলার মত বরফের টুকরো এসে লাগছে মুখে, জাহাজের সমস্ত দড়াদড়ি এমন শক্ত হয়ে গেছে যে গাঁঠ বাঁধা বা টেনে নামানো বিষম দুরূহ। পালগুলো জমে পাথর। একটি একটি করে আমরা পাল গোটালাম, কোণের দড়ি দিয়ে আটকান রইল, প্রয়োজন হলেই যাতে তুলে ফেলা যায়, কেন না বরফের চাঁইয়ের পাশ কাটিয়ে যেতে হলে পাল তোলা দরকার। তারপর সকাল অবধি অনবরত পাহারা রইল। অপরিসীম উৎকণ্ঠা আর বিরক্তিতে রাতটা কাটল। অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত আর চতুর্দিকে ভাসমান বরফের টুকরোর মধ্যে চলেছি। ক্যাপ্টেন সমস্ত রাত ডেকে রইলেন, রাঁধুনীকে উনুন জ্বালিয়ে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হল, ঘন্টায় ঘন্টায় কফি চাই। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা দু-একবার প্রসাদ পেলেন কিন্তু হতভাগ্য মাল্লাদের কপালে একটি ফোঁটাও জুটল না। ক্যাপ্টেনের দিনের বেলায় দিবানিদ্রা ছাড়া অন্য কাজ নেই, কেবিনে উনি জলমিশ্রিত ব্র্যাণ্ডি পান করেন, গরম কফিও ওঁর জন্য মজুত থাকে। কিন্তু যারা শীতে গ্রীষ্মে সমান ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে সেই মাল্লাদের ঠোঁট ভেজাবার জন্য ঠাণ্ডা গরম কিছুই জোটে না। এই

জাহাজে আবার মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু নিষেধাজ্ঞাটা কেবল মাল্লাদের জন্য বলবৎ। পাছে মাল্লারা সুরাপান করে বেসামাল হয়ে পড়ে এই ভয়ে তাদের এক গ্লাসের বেশী মদ দেওয়া হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তির বিচার বিবেচনার উপর এতগুলি প্রাণীর জীবন-মরণ নির্ভর করছে সেই ক্যাপ্টেনের যত ইচ্ছা যখন ইচ্ছা মদ্যপান করতে কোন বাধা নেই। উচ্চ কর্মচারীরা অবাধে মদ্যপান করেন, কাজেই মদ্যপানের ফল যে অতি বিষময় একথা মাল্লাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন—এই ভাবে ওদের বঞ্চিত করায় ওরা যে কর্মচারীদের উপর অপ্রসন্ন এ কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত। অনেক মাল্লা মনে করে এটা কেবল ওদের জব্দ করার ফন্দি। মাল্লারা যে মদ বিশেষ পছন্দ করে তাও নয়। অনেক নাবিককে দেখেছি শীতের রাত্রে গরম কফি বা গরম চকোলেট পেলে আর কিছু চায় না। ওদের ধারণা মদ্যপান করলে শরীর সাময়িক ভাবে উত্তেজিত হয় কিন্তু তারপরে কেমন অবসাদ আসে। পাহারার মধ্যে যদি একবার করে জলমিশ্রিত সুরা দেওয়া যায় তাহলে কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং পাহারার একঘেঁয়েমীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং কিছুক্ষণ অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়—এর মূল্যও বড় কম নয়। যারা ঐ অবস্থায় পড়েনি তাদের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়। পিলগ্রীমে মদ্যপান নিষেধ ছিল না। প্রত্যেক রাত্রে ও সকালের পাহারায় একবার করে মদ্য সরবরাহ করা হত। বড় পাল গোটাবার পরেও পুরস্কার স্বরূপ সুরা পাওয়া যেত। আমার মদ্যপানে তেমন আসক্তি কোনদিনই ছিল না, কিন্তু সাময়িকভাবে শরীর গরম করত বলে অন্যদের মত খেতাম। খেয়ে যে মনে একটু উদ্দীপনার সঞ্চার হত এ কথা অনস্বীকার্য। তবু চা অথবা কফি পেলে সেই সুরার মায়া সকলেই বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করতে পারত।* মদ্যপান করা নিষিদ্ধ করে হয়ত নাবিকদের পক্ষে মঙ্গলই হয়েছে কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য কোন পানীয়ের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। তা না করে জাহাজের কর্তৃপক্ষেরা কেবল খরচ কমাবার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। হঠাৎ প্রায়

* সব মার্কিন বাণিজ্য-পোতেই মাল্লাদের জন্য চা তৈরী করার প্রণালী এক রকম। তিন গ্যালন জলে এক পাইণ্ট চা ও দেড় পাইণ্ট গুড় একসঙ্গে ফুটিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে প্রত্যেককে দেওয়া হয়। কেবিনে অবশ্য যথারীতি চায়ের পাত্রে চা তৈরী করা হয়।

অধিকাংশ বাণিজ্যপোতে মাদক নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়াতে লোকে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আসল কারণ এই। যদি মদের পরিবর্তে সমান ওজনের কফি বা চকোলেট কিনতে হত তবে আর দেখতে হত না।*

তখনো হর্ণ অন্তরীপ দূরে। রাত্রে আট ঘণ্টা আমরা ডেকে পাহারায়। সমস্তক্ষণ গলুই-এর উপর থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। সকলেই এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে, প্রধান মেট তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন। ক্যাপ্টেনও নীচে উপস্থিত। বড় বরফের চাঁই দেখলেই মুখে মুখে সাবধান বাণী চলে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। কেবল সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকা ছাড়া অন্য কাজ নেই। থেকে থেকে একঘেয়ে সুরে চিৎকার—"আবার বরফ।" "বাঁ দিকে বরফের চাঁই।" "সামলে চল"। "ঘুরিয়ে নাও"। "সিধে"।

শীতে ও জলে ভিজে আমার মুখের তখন এমন অবস্থা হয়েছে যে খাওয়া শোয়া সব একরকম বন্ধ। সমস্ত রাত ঐ নিয়েই পাহারায় ছিলাম, কিন্তু সকাল হতেই সকলে জোর করে আমাকে নীচে পাঠিয়ে দিল। এখন দু-একদিন বিশ্রাম না নিলে পরে বিলক্ষণ ভুগতে হবে। আমি নীচে গিয়ে টুপি ও গলাবন্ধ খুলে মেটকে আমার চেহারা দেখালাম, মুখের ফোলা দেখেই মেট তৎক্ষণাৎ আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন। রাঁধুনীকে আমার জন্য পুলটিস তৈরী করতে আদেশ দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেনকে আমার কথা জানাবেন।

কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্নের মত কাটল। ব্যথায় সর্বাঙ্গ অসাড়। উপরে পদশব্দ, মাঝে মাঝে চিৎকার, ঐ বরফ দেখা যায় কিন্তু কিছুই আমার চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছিল না। একদিন পরে ব্যথা অনেকটা কমল, লম্বা ঘুম দিয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম, কিন্তু তখনও মুখে এত যন্ত্রণা যে বিছানা ছেড়ে ওঠার সাধ্য নেই। এই দুই দিন আবহাওয়ার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ঘন কুয়াশা, ঝড় বৃষ্টি শিলাপাত সমানেই চলেছে। বরফ ভেদ করে চলা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে। তৃতীয় দিনে কুয়াশা এমনই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল যে সমস্ত জাহাজ ভরে গেল, বরফও তেমনি ঘন। সেই সঙ্গে

---

* একথা অবশ্য আমাদের জাহাজের প্রতি প্রযোজ্য নয়। শুনেছি এলার্টে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসম্ভার মজুদ করা ছিল, কেবল ক্যাপ্টেনের কুবুদ্ধির জন্য সেগুলি ভালভাবে বণ্টন করা হয়নি।

পূব দিক থেকে তুমুল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। সে রাতটা সহজে কাটবে না বোঝা গেল। রাত হতে ক্যাপ্টেন সকলকে ডাকলেন, বললেন সে রাত্রে যেন একজনও ডেক ছেড়ে না যায়, যে কোন মুহূর্তে বরফের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারি। সকলে যে যার পাহারায় চলে গেল। আমি এই শুনে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময় মেট এসে আবার আমাকে শুইয়ে দিলেন। বললেন মরি তো মরি সকলেই একসঙ্গে মরব, কিন্তু এই অবস্থায় এখন উপরে গেলে তোমার মৃত্যু অবধারিত। এই প্রথম মেটই কেবল এসে আমার খোঁজ-খবর নিলেন, ক্যাপ্টেন একদিনও এসে আমার সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি।

মেটের আদেশ মত আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু অস্বস্তিতে ছটফট করে কাটল সমস্ত রাত। অসুস্থ হওয়ার একি বিড়ম্বনা। সকলের সঙ্গে খোলা ডেকে বিপদের সম্মুখীন হওয়া এক, আর এই অন্ধকূপে একা বন্ধ হয়ে বিপদেব নিকটবর্তী হওয়া এক। কয়েকবার আমি উপরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হল কিছুই ঘটছে না। তাছাড়া উপরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে আমার কি দুরবস্থা হবে ভেবে প্রত্যেকবারই উঠতে গিয়ে নিরস্ত হলাম। কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে। গলুই-এর কাছে মাথা রেখে শুয়ে আছি—যে কোন মুহূর্তে বরফের চাঙড়ের সঙ্গে গলুই-এর সংঘর্ষ বাধতে পারে। বস্টন ছাড়ার পর এই প্রথম আমি অসুস্থ হলাম, কিন্তু এমনই অসময়ে যে মনে হতে লাগল অন্তত এই রাত্রিটা যদি আরোগ্যলাভ করতে পারি তাহলে তার পরিবর্তে সমস্ত যাত্রাপথ আমি রোগ শয্যায় থাকতে রাজী। ডেকে সে রাত্রি যারা পাহারায় ছিল তাদের অমানুষিক কষ্ট গেছে। এক নাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা পাহারা—উৎকণ্ঠা, শীতে আর বৃষ্টিতে তাদের যা অবস্থা হয়েছিল দেখে দুঃখ হয়। ন'টার সময় যখন ওরা নীচে নামল তখন কারোই হাত-পা চলছে না, অনেকে বাক্সর উপর পড়ে ঐ অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ কেউ কোমর থেকে পা নোয়াতে পারে না, বসার তো প্রশ্নই ওঠে না। ঐ দীর্ঘ রাত ওদের এক ফোঁটা পানীয়ও দেওয়া হয় নি। ক্যাপ্টেন অবশ্য প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর কফি খেয়েছেন। মেট একবার লুকিয়ে দু জনকে একপাত্র কফি খাইয়েছিল, কিন্তু জায়গা ছেড়ে কেউ এতটুকু নড়তে পারে নি। সমস্ত রাত্রের মধ্যে কেবল একবার বাঁ দিকের একটি

বরফস্তূপ এড়িয়ে যাবার জন্য পাল তোলা হয়েছিল, তাছাড়া আর কোন ঘটনাই ঘটে নি। কয়েকজন তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিল। তৃতীয় মেট মিঃ হ্যাচের বয়স কম। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর সর্বশরীর এমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে নীচে নামার সময় সিঁড়ি দিয়ে আর পা নামে না। ক্রমাগত দিক বদল করে করে জাহাজ বরফের দ্বীপগুলির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছিল। ভোর হতে বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। সূর্য ওঠার পর কুয়াশা একটু কাটল বটে কিন্তু তারপরেই উঠল দক্ষিণে ঝ'ড়ো হাওয়া। জাহাজ কিন্তু নড়ে না। আমরা সকলেই অবাক হলাম। আবহাওয়া মন্দ নয়, দিনের আলোও আছে—এই অবস্থায় জাহাজ থেমে আছে কেন? কি হল, ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য কি—সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন। ক্রমে জাহাজময় এই অনুযোগ গুঞ্জরন করে ফিরতে লাগল। এখন দিনের আলো এত কম সময় থাকে যে সেই সুবিধাটা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন নয়, তাছাড়া বাতাসও উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, ক্যাপ্টেন কিন্তু নড়বার নাম গন্ধও করেন না। মাল্লারা পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায় সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল, তার উপর এই অহেতুক দেরী। কেউ কেউ বললে ক্যাপ্টেন নিশ্চয় ভয় পেয়েছেন, তাই পাল তুলতে দিচ্ছেন না। আবার কেউ কেউ বললে উৎকণ্ঠা দূর করতে মদ্য আর অহিফেনের মাত্রাটা বড় বেশী হয়ে গেছে। এখন ওঁর জাহাজ চালাবার মত অবস্থা নেই। ছুতোর মিস্ত্রী লোকটি বড়ই চতুর ও অভিজ্ঞ, ওর সঙ্গে মাল্লাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল, ওকে আমরা সকলে মিলে ধরে বসলাম ক্যাপ্টেনের কাছে সকলের হয়ে অনুরোধ জানাতে। কথাটা কারো কাছেই অযৌক্তিক মনে হল না। ঠিক হল দুপুরের মধ্যে পাল তোলা না হলে ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়া হবে। দুপুর এল। কিন্তু কোথায় পাল। আবার পরামর্শ চলল। একজনের মাথায় এক বুদ্ধির উদয় হল—ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ভার কেড়ে নিয়ে মেটের হাতে দেওয়া হোক না। মেটকে আমরা সকলেই বলতে শুনেছি যে ওঁর ইচ্ছায় চললে বরফ ভেদ করে এতক্ষণে আমরা অন্তরীপের অর্ধেক পথে চলে যেতাম। তখন এমনই অসহ্য পরিস্থিতি যে বিদ্রোহের এই চিন্তাকেও সকলে প্রশ্রয় দিল। আর বেশীক্ষণ এভাবে চললে যে শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে একথা সকলেই বুঝল। ছুতোর মিস্ত্রী চলে যেতেই আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম, বললাম এ কাজ করা কোন

মতেই উচিত নয়—আর একজন মাল্লার অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিদ্রোহের বিষময় ফলের কথা সেও জানত সুতরাং সেও আমাদের নিরস্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। ষ্টিমসনও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। তখনকার মত কিছু করা হল না বটে কিন্তু আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা হবে না—এ কথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করলে।

চারটের সময় হঠাৎ সকলের উপরের ডেকে যাবার জন্য ডাক পড়ল। আমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে! আমাদের অগোচরে ছুতোর মিস্ত্রী গিয়ে মেটকে জিজ্ঞাসা করেছে ক্যাপ্টেনের পরিবর্তে তিনি অধ্যক্ষপদ গ্রহণে সম্মত আছেন কি না—এই কথা শুনে কর্তব্যপরায়ণ মেট সব কথা ক্যাপ্টেনের গোচরে এনেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তিরস্কার গালাগালি বা তর্জনগর্জন, যা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আশা করা গিয়েছিল তার কিছুই ঘটল না—বিপদের সামনে একটা সমব্যথীর ভাব বোধহয় ক্যাপ্টেনের রুক্ষ প্রকৃতিকে একটু নরম করে এনেছিল। কেন না ওঁর ব্যবহারে বেশ দয়ার পরিচয় পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন বললেন যে কথা ওঁর কানে এসেছে উনি আশা করেন সেটা সত্য নয়—ওঁর মাল্লাদের উনি ভাল করেই চেনেন, তারা যে এমন কথা ভাবতেও পারে তা উনি বিশ্বাস করেন না—ওদের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনের কোন অভিযোগ নেই এবং ক্যাপ্টেনের সম্বন্ধে ওদের কোন অভিযোগ থাকলে ওরা সেকথা জানাতে যেন কোন কুণ্ঠা না করে। পাল তুলতে অযথা দেরী করা ওঁর স্বভাব নয় (এ কথা সত্য) এবং সময় অনুকূল বুঝলে উনি এক মুহূর্তও দেরী না করে পাল তোলার আদেশ দেবেন। এই অবধি বলে ক্যাপ্টেন আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে আমাদের ছেড়ে দিলেন। যাবার সময় ছুতোর মিস্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বললেন আবার এমন কথা কানে এলে এমন শাস্তি দেবেন যে চিরকাল মনে থাকবে।

ক্যাপ্টেনের বক্তৃতায় সুফল ফলল। আমরা শান্ত ভাবে যে যার কাজে চলে গেলাম।

তারপর দু দিন দক্ষিণ আর পূব দিক থেকে হাওয়া বইল। মধ্যে মধ্যে আবহাওয়া ভাল হয় বটে কিন্তু এমনই ঘন হয়ে বরফ জমেছিল যে এগোনো অসম্ভব। আমি ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগলাম, কিন্তু তখনো কাজে যোগ দেবার পক্ষে দুর্বল। প্রায় এক সপ্তাহ কিছু না খেয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ

হয়ে পড়েছিলাম। শেষের দুদিন সামান্য ভাত মুখে জোর করে ঢুকিয়েছিলাম। মাল্লাদের পক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়ার মত অভিশাপ আর কিছু নেই। তার উপর এরকম দুঃসময়ে। জল ও ঠাণ্ডা বাতাস রোধ করার জন্য আমাদের থাকবার জায়গাটা চাপা, তার উপর অন্ধকার। বাক্স প্যাঁটরা বোঝাই। বরগা থেকে জল চুয়ে পড়ছে। একটি ঝোলানো বাতির মিটমিটে আলোয় না কিছু দেখা যায়, বই পড়া তো দূরের কথা। কথা বলারও লোক নেই। এ যে কি বিষম শাস্তি ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। সৌভাগ্যক্রমে আমার ওষুধপত্র বা চিকিৎসার কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন হলে কি করতাম জানি না। নাবিকরা সেবা করতে খুব তৎপর নয়। কিন্তু সব জাহাজে সাধারণতঃ কম মাল্লা থাকে। তার মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখাশোনা করার জন্য আর একজনকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথাই ওঠে না। নাবিকদের অসুখ করবে না— তারা সব সময় শক্ত সমর্থ থাকবে। অসুখ করলে যত শীঘ্র সেরে উঠে আবার ডেকে কাজে লেগে যায় ততই ভাল।

উঠে পড়ার সামর্থ হতেই আমি শীতবস্ত্র পরে কানঢাকা টুপি এঁটে উপরে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এই কদিনের মধ্যেই দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেছে। মাস্তুল, দণ্ড, পাল, দড়ি দড়া সুদ্ধ সমস্ত জাহাজটি বরফে ঢাকা, চতুর্দিকে ভাসমান বড় বড় বরফের চাঁই আর বিস্তীর্ণ তুষারের আস্তরণ। দুটি গোটানো পাল মাস্তুলে লাগানো, এ ছাড়া আর কোন পাল নেই—কেমন যেন শীর্ণ চেহারা হয়েছে জাহাজের। পালগুলিও এমন জমে আছে যে বোধ হল আর নড়ান শক্ত হবে। সূর্য উঠতেই ডেকের উপর ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হল। বরফ কাঁচের মত পিছল হয়ে ছিল। চারটে ঘণ্টার সময় শোনা গেল ক্যাপ্টেন জাহাজটা উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে নিয়ে চলেছেন। এর অর্থ কি? নানা রকম অসম্ভব গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বললে উত্তরে ভালপারাইসোতে গিয়ে শীতকালটা কাটানো হবে বোধহয়। কেউ বললে বরফ ফুঁড়ে আমরা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে দেশে ফিরব। শীঘ্রই জানা গেল ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য কি। আমরা ম্যাগেলান প্রণালীর দিকে চলেছি। শুনে অবধি নানা জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হল। ঐ পথে আগে কেউই যায়নি। তবে আমার বাক্সে এ. জে. ডোনেলসন নামক জাহাজের একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত

ছিল। তাতে কয়েক বছর আগে ঐ প্রণালী অতিক্রম করার বিবরণ ছিল। বিবরণটি মোটের উপর আশাপ্রদ। সকলে ঐটি পড়ে নানা রকম অভিমত ব্যক্ত করতে লাগল। তবে অন্তত একটি সুফল হল। একঘেয়ে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা অন্য কিছু কথা বলার বিষয় খুঁজে পেলাম। শীঘ্রই আমরা পিছনের বরফস্তূপ ছেড়ে উত্তর দিকে চললাম, সেটাই বা কম কি।

এতদিনের অনভ্যস্ততার পর হাত দিয়ে দড়ি ধরতে প্রথমটা বেশ বেগ পেলাম। তবে কয়েক দিনের মধ্যেই আবার আগের মত হয়ে গেল। মুখ খুলে যেদিন থেকে মাংস খেতে আরম্ভ করলাম সেদিন থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

রবিবার, ১০ই জুলাই। মধ্যাহ্নে আমাদের অবস্থান ৫৪°১০´ অক্ষাংশে, ৭৯°০৭´ দ্রাঘিমাংশে। রোদ বেশ কড়া। বরফ পিছনে ফেলে চলে এসেছি, বেশ আশাপ্রদ পরিস্থিতি। আমরা ভিজে জামা কাপড়গুলো ডেকে মেলে দিলাম। রাঁধুনীর অনুমতিক্রমে মোজা আর দস্তানা টাঙ্গান হল রান্নাঘরে। জুতোগুলোতে আর একপ্রস্থ আলকাতরার প্রলেপ মাখানো হল। রাত্রে খাওয়ার পর সকলের ডাক পড়ল ডেকে। নোঙর-গুলো গলুই-এর কাছে আনা, শিকল নামানো, নোঙর তোলার জন্য কপিকলবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড, কপিকল সব প্রস্তুত করে রাখা হল। কাজ করতে পেরে আমাদের শরীর ও মন চাঙ্গা হয়ে উঠল—নোঙর তোলার জন্য কপিকলে টান আরম্ভ হতেই আমরা সমস্বরে গান জুড়লাম। হেঁইও জোয়ান হেঁইও। মেট এই শুনে হাত ঘষতে ঘষতে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সাবাস, ভাই সব সাবাস। এই তো মরদের মত কথা। গানের শব্দ শুনে ক্যাপ্টেনও বাইরে বেরিয়ে এলেন। উনি যাত্রীটিকে বললেন "মাল্লাদের বেশ ফুর্তি দেখা যাচ্ছে। এরা এই রকমই। যতক্ষণ গান গাইবার মত লোক অবশিষ্ট থাকবে এরা গান গেয়ে যাবে, কিছুতেই দমবে না।" কথাটা যে হালে ছিল তার কানে যায়।

এই সব কাছি ও নোঙর তৈরী রাখার কারণ আর কিছুই নয়, ম্যাগেলান প্রণালীটি বড়ই আঁকাবাঁকা। নানা রকমের ভিন্নমুখী স্রোত, কাজেই ক্ষণে ক্ষণে নোঙর ফেলতে হচ্ছিল। শীতের দিনে নোঙর ফেলার মত খারাপ কাজ আর কিছু নেই। খালি হাতে ভিজে কাছি, ভারী দড়াদড়ি

নিয়ে কাজ করা, জল টপ টপ করে হাত অবধি ভিজিয়ে দিচ্ছে—ঠাণ্ডায় সর্বশরীর জমে যাচ্ছে—সাধারণ অবস্থায় বন্দর থেকে বন্দরে এসব কিছুই করতে হয় না মাল্লাদের। যে কোন অবস্থাতেই এই কাজগুলি অপ্রীতিকর। ঠিক এই সময়ই একটি পুরোনো খবরের কাগজ একজন মাল্লার হাতে পড়ে, তাতে এই প্রণালী দিয়ে পার হবার সময় বস্টনের পেরুভিয়ান নামক জাহাজ কি রকম দুর্দশায় পড়ে তার বর্ণনা ছিল। জাহাজটি দু বার আটকে যায়, সমস্ত কাছি ও নোঙর নষ্ট হয়ে বহু কষ্টে ভ্যালপারাইসো পৌঁছয়। এটা আগেকার বর্ণনার একেবারে বিপরীত। যাই হোক সকলেই বেশ সন্দেহাকুল হয়ে উঠল তবে এই অনিশ্চিত অবস্থার নিষ্পত্তি হতে বেশী দিন লাগল না। পরদিন আমরা স্তম্ভ অন্তরীপে পৌঁছবার আগেই এমন পূবে ঝড় আরম্ভ হল, সেই সঙ্গে ঘোর কুয়াশা যে আমাদের ঐ পথে যাওয়ার আর কোন প্রশ্নই উঠল না। একে বিপদসঙ্কুল পথ, তার উপর প্রতিকূল আবহাওয়া। মনে হল এই রকম ঝড়জল কিছুদিন চলবে। সুসময়ের অপেক্ষায় এখানে বৃথা সময় নষ্ট না করে আমরা আবার জাহাজের মুখ দক্ষিণে ফিরিয়ে হর্ণ অন্তরীপের দিকে চললাম।

॥ ৩২ ॥ হর্ণ অন্তরীপ পরিক্রমা ॥

প্রথমবার অন্তরীপ পার হবার যখন প্রচেষ্টা হয় আমরা ঐ অক্ষাংশে এসে প্রায় সতেরো শ মাইল পশ্চিমে ছিলাম, কিন্তু ম্যাগেলান প্রণালীর দিকে যাবার ফলে আমরা অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এবার অন্তরীপ থেকে দূরত্ব চার পাঁচ শ মাইলের বেশী নয়। আশা হল এইভাবে হয়ত তুষারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কেন না পূবে ঝড়ে বরফ নিশ্চয় সরে গেছে। গোটান পাল নিয়ে আমরা দক্ষিণের দিকে চললাম, শীতের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে লাগল, সেই সঙ্গে বাড়ল সমুদ্রের নর্তন। কিন্তু বরফের চিহ্নও দেখা গেল না, ভরসা হল এবার পরিষ্কার সমুদ্রে পার হওয়া যাবে। একদিন দুপুর বেলায় আমরা নীচে একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করছি এমন সময় ক্যাপ্টেনের গলায় ভীষণ জোরে হাঁক শোনা গেল, "শীঘ্র এসো, জামা পরার

জন্য দেরী কোরো না, জীবন মরণের প্রশ্ন, তাড়াতাড়ি কর” —আমরা লাফিয়ে উঠে উপরে ছুটলাম। ক্যাপ্টেন আদেশ দিচ্ছেন, মহা তৎপরতা —আমরা তৎক্ষণাৎ দড়ি ধরতে ছুটলাম। এদিক ওদিক দেখে নষ্ট করার মত সময় নেই। হাল বসে গেছে, পিছনের পালদণ্ডগুলো কাঁপছে—জাহাজ ভেঙ্গে পড়ার পূর্বলক্ষণ। শক্ত বরফে জমা তক্তা যেমন শব্দ করে উঠে আসে তেমনি কড় কড় শব্দ হতে লাগল দড়াদড়ি থেকে—সব বরফে জমে আঁট হয়ে গেছে। আমরা ঐগুলি টেনে টেনে জাহাজ ঘোরালাম—বাঁ দিকে দেখা গেল কুয়াশার মধ্যে থেকে এক বিরাট বরফের দ্বীপ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, দ্বীপের দুই পাশে জলের উপর বহুদূর ব্যাপী বরফের আস্তরণ। জলের সঙ্গে উঠছে পড়ছে সেগুলি। সময়ে সাবধান না হলে আমরা এতক্ষণে ঐ বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খেতাম, আর দক্ষিণ সমুদ্রে আমাদের জাহাজের ধ্বংসাবশেষটুকু পড়ে থাকত। সমস্ত রাত পাহারার লোকেরা সজাগ হয়ে রইল, বরফ দেখলেই হাল ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একঘেয়ে স্বরে “ঐ আগে বরফ” “বাঁ দিকে হুঁশিয়ার” “আবার দ্বীপ” ডাক আর সেই সঙ্গে একই রকম আদেশ শুনে শুনে এক সপ্তাহ আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। আমরা বারোটা থেকে চারটে অবধি পাহারায় ছিলাম, তখন এমন বরফের ঝড় আরম্ভ হল যে আমরা পাল গুটিয়ে নেমে রইলাম। পাহারার পরের পালায় সব স্তব্ধ, আর মুষলধারে বৃষ্টি—ভোর অবধি একটানা বৃষ্টি চলল। সকালের আলোয় সমুদ্রের দিকে তাকালাম। যে পথে আমাদের যাবার কথা ছিল কিন্তু ঝড়ের জন্য যাওয়া গেল না, সেদিকে সমস্ত সমুদ্রবক্ষ বরফে জমে আছে—কোথাও একচুল ফাঁক নেই। আবার আমরা জাহাজ ঘুরিয়ে উত্তরে চললাম। এবারে আর ম্যাগেলান প্রণালীর দিকে নয়, আরো পূবে গিয়ে অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করার চেষ্টা। ক্যাপ্টেনের ধৈর্য অতুল, উনি বললেন বার বার তিন বার, তিন বারের বার পার হবই।

হাওয়ায় হাওয়ায় বরফের আস্তরণ কেটে আমরা অনেক দূর চলে গেলাম। দুপুরবেলা কেবল দূরে দূরে তুষারস্তূপ চোখে পড়ল। সুন্দর রোদ, সমুদ্রের জল গভীর নীল, কেবল ঢেউয়ের উপর সাদা ফেনার মুকুট—

তার মধ্যে দিয়ে তীরবেগে চলেছে আমাদের জাহাজ, মুক্তির ছোঁয়া লেগে কত আনন্দ। বরফের দ্বীপগুলি সূর্যকিরণে ঝকমক করতে করতে আস্তে আস্তে উত্তরে ভেসে যাচ্ছিল। দক্ষিণের ঘন কঠিন তুষার আস্তরণ থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এই দ্বীপগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উষ্ণ মণ্ডলের দিকে ছুটে চলেছে—দৃশ্যটি বড়ই নয়নাভিরাম। দক্ষিণের হিমশীতল বরফের রাজ্যে মৃত্যুর স্পর্শ—এখানে প্রাণের প্রাচুর্য। তুষার স্তূপের আসল সৌন্দর্য ছবিতে বোঝা যায় না। ছবিতে মনে হয় বিরাট এক একটি পিণ্ড সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আছে। কিন্তু খালি চোখে এই বিশাল বরফ স্তূপগুলির উপরের ঘূর্ণ্যমান তুষারপুঞ্জ, ভিতরে অনবরত চাংড় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ, আর সব মিলিয়ে অতি ধীর মন্থর গতি সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া—না দেখলে এই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। আর ছোট ছোট বরফের দ্বীপগুলিকে দিনের আলোয় মনে হয় যেন জ্বলন্ত নীলার টুকরো দিয়ে তৈরী কুহকের দেশ।

উত্তর-পূর্ব দিক ছেড়ে এবার আমরা পূব দিকের পথ ধরলাম। প্রায় দু শ মাইল যাবার পর টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর পশ্চিম উপকূলের নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পড়লাম। বরফের চিহ্নমাত্রও নেই। আর একবার জাহাজ দক্ষিণমুখী করে অন্তরীপ পার হবার চেষ্টায় যাত্রা করা গেল। প্রবল হাওয়ায় আমরা খুব শীঘ্রই অন্তরীপের অক্ষাংশে পৌঁছে গেলাম—আশা হল এবার ঘুরে অপর পারে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে। একদিন বিকেলে মাল্লাদের মধ্যে একজন উপরে কাজ করতে করতে হঠাৎ হর্ষধ্বনি করে উঠল, "পাল দেখা যাচ্ছে, পাল।" সান ডিয়াগো ছাড়ার পর আমরা ডাঙা বা অন্য জাহাজের দর্শন পাইনি। বহুদিন যাদের সমুদ্রে থাকতে হয়েছে তারাই বুঝবে এই ঘোষণা শুনে আমাদের মধ্যে কি রকম ফুর্তির হিল্লোল বয়ে গেল। রাঁধুনী এক লাফে রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে চীৎকার করে উঠল "পাল, পাল" —নীচে যেসব মাল্লারা শুয়ে ছিল তারা হুড়মুড় করে ডেকে উঠে এল। ক্যাপ্টেনও যাত্রীটিকে অবহিত করার জন্য সিঁড়ি থেকে ঘোষণা করলেন, "পাল দেখা গেছে, পাল!"

জনহীন মহাসমুদ্রে এতদিন পরে মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া ও তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ছাড়াও আমাদের আর একটি সংবাদ নেবার ছিল।

পূবদিকে বরফ আছে কিনা জানা প্রয়োজন। কত দ্রাঘিমাংশ তাও জানতে হবে। আমাদের ঘড়ি নেই। তাছাড়া এই অঞ্চলে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করতে করতে সমস্ত হিসাবও গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দক্ষিণের ঐ অঞ্চলে আকাশের তারা দেখে দ্রাঘিমাংশ ঠিক করাও অসম্ভব। এই সব কারণে অন্য জাহাজ দেখা গেছে শুনে আমরা খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। এই নিয়ে আলোচনা চলছে এমন সময় উপর থেকে আর একবার হাঁক শোনা গেল "আরেকটি পাল। ডানদিকে বেশ কাছে।" এরকম ঘটনা একটু আশ্চর্য বটে—তবু আমরা আশা হারালাম না। মনে মনে ভাবছি দুটোই জাহাজ নিশ্চয়। শেষে উপরের লোকটি চেঁচিয়ে বললে জাহাজ নয় ওটা ডাঙা। মেট ততক্ষণে দূরবীণে চোখ দিয়েছেন। তাকে বললেন "ডাঙা না তোমার মাথা। স্পষ্ট দেখছি ওগুলো "বরফের দ্বীপ"। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মেটের কথাই ঠিক। জাহাজ তো দূরের কথা, যে ভয়ে আমরা ভীত সেই অশুভ বরফের দ্বীপের কাছেই এসে পড়েছি আমরা। ওগুলোর দু মাইল দূর থেকে আমরা চলে গেলাম। সন্ধ্যা নাগাদ দিকচক্রবাল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

হাওয়ার সাহায্যে আমরা অন্তরীপের অক্ষাংশ পেরিয়ে অনায়াসে আরো দক্ষিণে চলে গেলাম। বেশ কিছুদূর গিয়ে পূব দিকে মোড় নেওয়া হল। যখন উত্তর দিকে বাঁক নেবার জল্পনাকল্পনা হচ্ছে আবার এক বিপদের উৎপত্তি। ঘণ্টা চারেকও কাটেনি, হঠাৎ হাওয়া একেবারে থেমে চারিদিকে ভীষণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। আরো আধঘণ্টা যেতে না যেতেই মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে দমকা হাওয়া আর টিপ টিপ তুষারপাত আরম্ভ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা পাল গুটিয়ে জাহাজ থামিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের দাপট খেতে লাগলাম—পূব দিক থেকে এমন ঝড় আরম্ভ হল যে আমরা আগে কখনো দেখিনি। মনে হল অন্তরীপের উপদেবতার রোষবহ্নি জাগ্রত হয়েছে, আমরা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পালাচ্ছি দেখে জেগে উঠে হুঙ্কার করে উঠছেন। পালের দড়াদড়ির মধ্যে দিয়ে হাওয়ার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের সোঁ সোঁ শব্দ—যেন আমাদের শাসিয়ে বলছে "না, না, কিছুতেই যেতে দেব না, কিছুতেই না।" নাবিকরা হাওয়ার মধ্যে এই সব কথা শুনতে পায়।

আট দিন ধরে অবস্থার কোন উন্নতি হল না। দুপুরের দিকে একটু শান্ত হয়, তখন কি ক্ষণের জন্য আকাশে একটা তামার গোলা দেখা যায়,

পশ্চিম থেকে দু-একটা বাতাসের দমক, মনে হয় অনুকূল পবন এল বুঝি। প্রথম দু দিন আমরা পশ্চিমে হাওয়া আরম্ভ হবে মনে করে পালের কোণ বাঁধা দড়ি খুলে ভেসে পড়ার উদ্যোগ করলাম, কিন্তু আবার শুরু হল ঝড়ের তাণ্ডব। মাঝখান থেকে আমাদের কাজ কেবল বাড়ে। দু-এক দিনের শিক্ষার পর আমরা এই চেষ্টায় বিরত হলাম। গোটানো পালের নীচে নেমে দাঁড়িয়ে রইল জাহাজ। যদিও তুষারপাত আগের চেয়ে কমই হচ্ছিল কিন্তু মাল্লাদের বিভীষিকারূপ এল প্রবল বৃষ্টি। শীতের সময় বরফ পড়া অসুবিধাজনক সন্দেহ নেই কিন্তু অসুবিধা সৃষ্টি করার পক্ষে বোধহয় ঠাণ্ডার সঙ্গে বৃষ্টির কোন তুলনা হয় না। বরফের ঝড়ে অন্তত জামা কাপড় ভেজে না, কিন্তু বৃষ্টি এসে শরীর পর্যন্ত বেঁধে, তার হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। আমাদের সব জামাকাপড়ই ভিজে সপসপে, রোদ না উঠলে শুখোনো সম্ভব নয়, কাজেই আমরা ওর মধ্যে সবচেয়ে কম ভিজেগুলো বেছে নিয়ে পরতাম। পাহারার শেষে নীচে গিয়ে জামাকাপড় নিঙড়ে ঝেড়ে নেওয়া হত, মোজা ও দস্তানাও নিঙড়ে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হত। তারপর তার মধ্য থেকে সবচেয়ে কম ভিজেটা বার করে পরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম—আটটার ঘণ্টায় দরজায় তিন বার ধাক্কা পড়ত, তখন ঘুমচোখে কোন মতে ছুটতাম উপরে।

ডেকের উপর অন্ধকার স্তব্ধ হয়ে জমে আছে, হয়ত সেই সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি বা ভীষণ ঝ'ড়ো হাওয়া। অনেক সময় একসঙ্গে বৃষ্টি আর তুষার, জলের ঝাপটায় ডেকের এদিক থেকে ওদিক ভেসে যাচ্ছে, পায়ের জুতো ভিজে জবজবে, কিন্তু জুতো তো আর নিঙড়ানো যায় না! ক্রমাগত জলে ভিজে কোন চামড়াই বেশীদিন টিকতে পারে না। পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া তো এই অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। শীতকালে হর্ণ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করার যত রকম দুর্ভোগ আছে তার কাছে এটা অবশ্য নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। পাহারার পালা নিঃশব্দে বদল হয়, যে যার জায়গায় চলে যায়, মেট উপরের ডেকে, হালে ও গলুই-এ অন্যেরা—অপরিসর ডেকে পায়চারি করে আমরা সময় কাটাই। ডেক জলে ও বরফে এত পিছল যে হাঁটা দুঃসাধ্য। বালি ছড়ালে তবু দু-এক পা চলা যায়। বৃষ্টি না পড়লে আমরা উপরের ডেক, সামনে ও মাঝখানে নিয়মিত বালি ছড়াতাম, তার উপর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরক্তিকর পাহারার কাল কাটত। আধঘণ্টা পরে পরে ঘণ্টা পড়ত,

মনে হত যেন কতক্ষণ কেটে যাচ্ছে—আটটা ঘণ্টা পড়ার আগে তো যেন এক যুগ। কোনমতে সময় কাটান। পাহারার একঘেয়েমির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যে কোন পরিবর্তনই আমাদের ভাল লাগত। এমন কি দু ঘণ্টা করে যে হাল ধরার পালা পড়ত তার জন্যেও আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। গালগল্প করাও ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা কেন না এতদিন ধরে প্রত্যেকের গল্প শুনে শুনে আর কারো জীবন সম্বন্ধে আমাদের অজানা কিছু ছিল না—সব ইতিবৃত্তই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। গান গাওয়া বা হাসি তামাশা করার কোন প্রশ্নই ছিল না বরং কেউ সে চেষ্টা করলে আমরা ভয়ানক বিরক্ত হতাম। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন রচনাও ক্রমে অলীক মায়ার মত মিলিয়ে আসছিল। যেরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম তাতে মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসন্ন বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। "যখন দেশে ফিরব" কথাটা আমাদের অজান্তেই কখন "যদি দেশে ফিরি" তে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। শেষে আমরা দেশে ফেরার কথাও আর কেউ বলতাম না।

এই রকম অবস্থায় পাহারার দলে একটু রদবদল হওয়াতে আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আমাদের দলের একজনের হাতে আঘাত লেগেছিল, ক্ষতস্থান বিষিয়ে যাওয়ায় (ঠাণ্ডায় সামান্য কাটাও একটুতে বিষিয়ে যায়) তাকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল। তার জায়গায় ছুতোর মিস্ত্রী আমাদের পাহারার দলে যোগ দিল। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে আমরা দিশাহারা হয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে কে পায়চারি করবে সেই নিয়ে মহা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। মিস্ত্রী সামান্য লেখাপড়া করেছিল, আমার সঙ্গে ওর নানা বিষয়ে আলোচনা হত। লোকটি ফিনল্যাণ্ডবাসী, আমাকে ওর দেশের কথা, সেখানকার আচার ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্য, ওদের সরকার ও শাসনপদ্ধতি (রাশিয়াকে ও মোটেই পছন্দ করত না) সম্বন্ধে ওর যতটুকু জ্ঞান, ওর আমেরিকা যাত্রা, প্রণয় ও বিবাহ, ওর স্বদেশীয়া স্ত্রী যিনি বস্টনে দরজীর কাজ করতেন—ইত্যাদি, যাবতীয় তথ্য জানাত। আমার বৈচিত্র্যহীন জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। যাই হোক আমরা প্রায় পাঁচ ছ বার পাহারায় একসঙ্গে গল্প করে করে শেষে গল্পের ঝুলি যখন একেবারে ফাঁক হয়ে গেল তখন ওকে আর একজনের হাতে সমর্পণ করে দিলাম।

সময় কাটাবার জন্য আমি একটি উপায় অবলম্বন করেছিলাম। তাতে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের উন্নতিও হত। ডেকে এসে পায়চারি করার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নামতা আওড়াতে আরম্ভ করতাম, তারপর ওজন পদ্ধতি, কানাকাদের সংখ্যাগুলি, আমেরিকার প্রত্যেকটি রাজ্যের নাম, তাদের রাজধানী, ইংলণ্ডের কাউন্টিগুলি, তাদের প্রধান প্রধান শহর, ইংলণ্ডের সব রাজাদের বংশানুক্রমিক তালিকা ইত্যাদি একের পর এক আবৃত্তি করে যেতাম। এই করে প্রথম ঘণ্টা দুটি কাটত। তারপর বাইবেলের দশটি আজ্ঞা, জবের সমাচার থেকে ঊনচল্লিশতম অধ্যায়। এর পরে আসত আমার প্রিয় কবি কাউপারের 'কাস্টাওয়ে'। কবিতাটির ধীর গম্ভীর ছন্দ ও ভাব এই নির্জন সমুদ্রে একা পাহারায় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে যেত। তারপর কাউপারের মেরীর প্রতি উক্তি, কথোপকথনের কিছু অংশ (আমার বাক্সে একখণ্ড কাউপারের কবিতাবলী ছিল) তারপর হোরেস এবং গ্যেটের শরণাপন্ন হতাম।

এইগুলি আবৃত্তি করা হয়ে গেলে আর গদ্য পদ্য যা মনে আসত আউড়ে যেতাম। এইভাবে দীর্ঘ পাহারার কাল অতিবাহিত হত—এর মধ্যে হয়ত বা একবার জল খেতে যেতাম। আমি এত নিয়মিত ভাবে এগুলি আবৃত্তি করতাম যে ঠিক কোনটির পর ঘণ্টা পড়বে সব আমার জানা ছিল।

নীচে এসেও একঘেয়েমির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। সেলাই, বইপড়া ও কাপড় কাচা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন কেবল খাওয়া, ঘুম আর পাহারা, এইভাবে জীবনযাত্রা চলছিল। বসার স্থানাভাব, তাই নীচে গেলেই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ত। বৃষ্টির জল আসার ভয়ে আমরা উপরের খোলা পথটি বন্ধ করে দিতাম, ফলে আলো হাওয়া আসারও উপায় থাকত না। এই অন্ধকার, বদ্ধ, ভিজে অন্ধকূপে আমরা সবাই বাস করতাম। এখানকার বাতাস এমন বিষাক্ত যে আলোটি নীল হয়ে জলত। অথচ আমাদের স্বাস্থ্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল, খেতামও প্রচণ্ড। ডেক থেকে নেমে একপাত্র গরম চা, ঠাণ্ডা মাংস ও রুটি আমাদের কাছে যেন অমৃতের মত মনে হত। আমরা পশুদের মত জীবনযাপন করছিলাম বললে অত্যুক্তি হবে না। স্নান করা নেই, দাড়ি কামানো নেই, চুল আঁচড়ানো নেই—কে ঐ বরফ জমা শূন্য ডিগ্রার শীতে স্নান করতে সাহস পাবে ?

আট দিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত ঝড়ের পর হাওয়ার গতি একটু দক্ষিণমুখী হল, তখন আমরা পাল ওঠালাম, কিন্তু সে কতক্ষণ? হাওয়া ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করতে লাগল, তবু আমরা এরই মধ্যে একটু একটু করে পূব দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। একদিন রাত্রের ঘটনা। হাওয়ার খাম-খেয়ালীপনায় আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলাম। তখন আমাদের দল পাহারায় আছে। কেবল একটি বড় পাল গোটান অবস্থায় ঝুলছে, যাতে প্রয়োজন হলেই খাটান যেতে পারে। ক্রমশই ঝড় বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত, যেন তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হল, আর তেমনি নিকষ কালো অন্ধকার। পালটা বজ্রগর্জনের মত ঝাঁকানি খাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন এসে আদেশ করলেন বড় পালটি খুলে গুটিয়ে রাখা হোক। মেট মাল্লাদের ডাক দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ক্যাপ্টেন বাধা দিয়ে বললেন এত বার করে উঠলে ওদের শরীর ভেঙ্গে পড়বে। তার চেয়ে যারা এখন ডেকে আছে তারাই এই কাজটা করুক না কেন। অগত্যা আমরাই পালদণ্ড বেয়ে উঠলাম। সে যে কী কষ্টসাধ্য কাজ জীবনেও কখনো ভুলব না। আমাদের জনবল কম, আমি ও তৃতীয় মেট ছাড়া আর তিনজন। সুতরাং এক একটি পালদণ্ডে একবারে একজন করে গোটানর কাজ করছিল। দণ্ডের চারিদিকে বরফের আস্তরণ; দড়ি, কাছি, আংটা সব চামড়ার মত শক্ত হয়ে আছে, পালটি যেন কঠিন তামার পাত। খোলা হাতে সেই প্রচণ্ড বাত্যার মধ্যে আমরা পাল গোটাতে লাগলাম। দস্তানা পরলে হাত ফসকে যেতে পারে—আর হাত ফসকালেই নিশ্চিত মৃত্যু। প্রত্যেকটি আঙ্গুলের সর্বশক্তি দিয়ে আমরা কাজ করছি—কতবার যে হাওয়ায় দণ্ড ছেড়ে পাল উড়ে গেল তার ঠিক নেই। আমাদের দণ্ডের উপর শুয়ে পড়ে পালের কোণা চেপে রাখতে হচ্ছিল, আবার দু হাত ঘষে গরম না করলেও চলছিল না। মনে হচ্ছিল ইহজীবনে আর পাল গোটান শেষ হয়ে উঠবে না। যাই হোক কোনমতে একটা দিক শেষ করে আমরা বাঁ দিকে হাত লাগালাম। সেখানে দেড় ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর পালদণ্ডে পাল গোটান গেল। আমরা যখন উপরে উঠেছি তখন পাঁচটা ঘণ্টা পড়ছে—কাজ শেষ করে নীচে নামতে নামতে আটটা বাজল। আমরা যে আস্তে কাজ করেছি সেকথা কিন্তু ঠিক নয়। এই রকম আবহাওয়াতে আমরা মাত্র পাঁচজন আর আমাদের বিপরীতে যে পরিমাণ পালের কাপড় সেই তুলনায় আমাদের

কাজ বরং তাড়াতাড়িই সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। ‘স্বাধীনতা’ নামে ষাটটি কামান বিশিষ্ট জাহাজে যত বর্গগজ পালের কাপড়, আমাদের পালের পরিমাণ তার ঠিক অর্ধেক। কিন্তু স্বাধীনতার নাবিক সংখ্যা সাত শ। আমরা প্রায় অসাধ্য সাধন করে যখন নীচে নামলাম তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ মাল্লাটি মন্তব্য করলে “বড় ডাণ্ডাটা যা ভুগিয়েছে ভোলার নয়। মজা বার করে দিয়েছে। এক একটা করে ডাণ্ডায় পাল গোটান—আর এই হর্ণ অন্তরীপে—মরবার জোগাড় আর কি।”

তারপর দুদিন হাওয়া বেশ নিয়মিত দক্ষিণ থেকে এল। ভরসা হল হয়ত এ যাত্রা আমরা অন্তরীপ পার হতে পারব। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কিছুতেই নির্ণয় করা যাচ্ছিল না।

শুক্রবার, ২২শে জুলাই। আজ মেঘ কেটে একটু পরিষ্কার আকাশ দেখা দিল, দক্ষিণে হাওয়ায় বেশ জোর—আমরা পাল তুলে এগোতে লাগলাম। বিকেলবেলা আমি অন্য কয়েক জনের সঙ্গে রুটির পিপে ভর্তি করছি হঠাৎ এক ঝলক রোদ এসে সিঁড়ি দিয়ে নীচে পড়ল—দেখে সকলের মনে আনন্দের চমক লাগল। এমন দৃশ্য অনেক সপ্তাহ পরে দেখা গেল —নিশ্চয় সুলক্ষণ। ঠিক সেই সময় জাহাজ কাঁপিয়ে মেটের চিৎকার শোনা গেল—ক্যাপ্টেনও কেবিন থেকে এক লম্ফে ডেকে এসে উপস্থিত। উনি কি বললেন আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না, জানতে অত্যন্ত কৌতূহল, অথচ জায়গা ছেড়ে নড়বার উপায় নেই, তবে আমাদের যখন ডাক পড়ল না বুঝলাম অন্তত কোন বিপদ ঘটে নি। আমরা তাড়াহুড়ো করে কাজ সারছি এমন সময় ভাঁড়ার ঘর থেকে কালো মুখখানি বার করে ষ্টুয়ার্ট বললে “ডাঙা দেখা গেছে, ডাঙা। শুনছো না? ডাঙা ওরা বলছে। ক্যাপ্টেন বলছেন হর্ণ অন্তরীপ।

এই শুনে উৎসাহের আবেগে আমরা চটপট কাজ সেরে উপরে দৌড়লাম। সত্যিই বাঁ দিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। সকলেই এই নয়ন মনোহর দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত—উপরের ডেকে ক্যাপ্টেন ও মেটরা, রান্নাঘর থেকে রাঁধুনী, মাল্লারা সামনের দিক থেকে—এমন কি মিঃ নাটাল নামে যে যাত্রীটি এতদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনিও বাইরে এসে খুশীতে নাচতে আরম্ভ করলেন।

ডাঙাটা হর্ণ অন্তরীপের পূর্বে অবস্থিত স্টেটেন ভূমির অংশ—পরিত্যক্ত নির্জন জায়গা, কেবল পাথর আর বরফে সমাকীর্ণ, অতি সামান্য লতাগুল্ম ছাড়া উদ্ভিজ্জের চিহ্নমাত্র নেই। সভ্যতার নাগালের বাইরে এই চিরতুষারময় জগৎ দুটি মহাসাগরের মিলন স্থান—ঝড় ঝঞ্ঝা মাথা পেতে নেবার উপযুক্ত স্থানই বটে। অথচ এই জনহীন বিজন স্থান দেখেও আমাদের ভাল লাগল—এই প্রথম ডাঙা দেখা গেল বলে নয়, ঐটি দেখে বুঝলাম আমরা হর্ণ অন্তরীপ ছাড়িয়ে অতলান্তিক মহাসাগরে চলে এসেছি—আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ সমুদ্রকে চিরবিদায়। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতেও সুবিধা হল।

সমবেত আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মিঃ নাটাল প্রস্তাব করলেন এই দ্বীপে নেমে উনি কিছু পরীক্ষা করতে চান—কেন না এখানে আগে কখনো মানুষের পদক্ষেপ ঘটেনি। কিন্তু ক্যাপ্টেন আর এক মুহূর্তও দেরী করতে প্রস্তুত হলেন না—বললেন অন্য সময় হবে।

ধীরে ধীরে ভূমি অদৃশ্য হল, সন্ধ্যার সময় দেখা গেল অতলান্তিক মহাসাগরের বিস্তার আমাদের সামনে।

॥ ৩৩ ॥ উত্তরে পাড়ি ॥

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে অন্তরীপ ঘুরে যেতে হলে সাধারণতঃ ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের পূব দিকে থাকা হয় কিন্তু আমরা প্রবল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাতাস পেলাম বলে ক্যাপ্টেন সোজা উত্তরে যাওয়া মনস্থ করলেন, একেবারে ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে সোজা বস্টনের দিকে মুখ করে। এই সংবাদ শুনে আমরা সকলেই যারপরনাই পুলকিত হলাম। সকলেই তৎপর হয়ে উঠল, এমনকি অসুস্থ মাল্লা জনও উঠে এসে পালের দড়িতে হাত লাগাল। হাওয়ার বেগ এত বেশী যে একটি গোটান পালেই যথেষ্ট কিন্তু আমরা হাওয়ার আগেই চলেছি। উপরে উঠে একটি গোটান পালের দড়ি খোলা হল। সামনের পালটিও গুটিয়ে খাড়া করা হল। উপরের পালের দড়ি মাস্তুলের আগায় বাঁধার সময় আমরা সমস্বরে হেঁইয়ো জোয়ান বলে গান জুড়ে দিলাম—সে গানের সুর বোধহয় স্টেটেন দ্বীপের অর্ধেক পথ অবধি শোনা গেল। পালে হাওয়া লেগে জাহাজ চলল হু হু করে—কিন্তু ক্যাপ্টেন

তাতেও সন্তুষ্ট নন, হুকুম হল আরো পাল চড়াও। গতি আরো বাড়ল, দুপাশের গলুই থেকে উছলে পড়া ফেনা কেটে জাহাজ এগোতে লাগল। সকলে ডেকে দাঁড়িয়ে, দড়িতে কপিকল লাগান ইত্যাদি সব রকম সরঞ্জাম সম্পূর্ণ, ক্যাপ্টেন হনহন করে পায়চারি করছেন আর থেকে থেকে একবার পালের দিকে একবার হাওয়ার দিকে তাকাচ্ছেন। মেট মহা উৎসাহে হাত রগড়াতে আরম্ভ করলেন "সাবাস ভাই সাবাস। আরো জোরে ভাই। বস্টনের মেয়েরা দড়িতে হাত লাগিয়েছে" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা সামনের দিক থেকে গতিবেগ কত হিসাব করার চেষ্টা করছি এমন সময় ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বললেন "মিঃ ব্রাউন, এবার উপরের হালকা পালটা তুলে দিন।" মেট একবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন। কিন্তু সাহসে যে উনিও কম যান না সেটা দেখাবার জন্য লাফ দিয়ে এগিয়ে এলেন। "পাল ছড়াবার ডাণ্ডাটা লাগাও, আমি দড়াদড়ি এগিয়ে দিচ্ছি।" বললেন আমাদের। আমরা দড়াদড়ি টেনে তুললাম উপরে, ডাণ্ডাগুলি এঁটে বাঁধলাম, সাবধান থাকার জন্য নীচেও আরো ডাণ্ডা লাগিয়ে দিলাম। পরিষ্কার আকাশে তারা জ্বলজ্বল করছে, বেশ হাওয়া, সকলের কাজে মন। কেউ কেউ এমন ভাবে তাকাচ্ছিল যেন বলতে চায় ক্যাপ্টেনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের নতুন একটি হালকা পালে মাঝখানে গোটাবার ব্যবস্থা ছিল—এরকম অভিনব পাল বড় একটা দেখা যায় না। এই নিয়ে মাল্লারা খুব হাসি তামাশা করত—বলত হালকা পাল আধা গোটান যা খুলে ফেলাও তাই। যাই হোক এখন আধা গোটানো উপরের পালের সঙ্গে আধা গোটানো ছোট হালকা পাল বেশ খাপ খেয়ে গেল।

এবার পাল লাগাবার পর মনে হল প্রত্যেকটি দড়ি পাল ও মাস্তুল সমেত সমস্ত জাহাজটি যেন আর্তনাদ করে উঠল। প্রত্যেকটি দড়িতে প্রচণ্ড টান, পাল যতদূর সম্ভব ফুলে উঠেছে, জাহাজ তীরবেগে ছুটতে লাগল—যেন নেশায় পেয়েছে। অতগুলি পালের টানে জাহাজ যেন জলের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে এগোতে লাগল। আর বাড়তি একটি পালও বহন করার সাধ্য ছিল না জাহাজের।

যখন দেখা গেল এতগুলি পালে জাহাজ ঠিকই চলছে তখন একদল মাল্লাকে ছুটি দেওয়া হল। আমাদের তখন পাহারার পালা, আমরা ডেকেই রইলাম। যারা দুজন হালে ছিল তারা দিক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে

যাচ্ছিল। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটেছে জাহাজ। মেট ডেকে পায়চারি করতে করতে একবার তাকাল ফেনার পুঞ্জের দিকে আর একবার পালের দিকে, পরক্ষণেই উরুতে চাপড় দিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে জাহাজকে বাহবা দিয়ে বলছেন "বাঃ রে বেটা বাঃ, ঠিক চলেছিস, ঠিক।" জলের উপরে লাফিয়ে ওঠাতে এক একবার তলকাঠ অবধি কেঁপে উঠছে। মাস্তুল ও দণ্ড মড়মড় করে উঠছে। তখন মেটের সে কি উল্লাস। "বাঃ এই তো তোফা যাচ্ছে। যতক্ষণ মটকাচ্ছে ততক্ষণ ঠিক আছে।" আমরা দড়ির কাছে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—দরকার হলে পাল নামিয়ে ফেলব। চারটে ঘণ্টায় গতি মেপে দেখা গেল এগারো নট (ষোলো সামুদ্রিক মাইল) বেগে চলেছি। জাহাজ কেবল গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল, তা না হলে এতক্ষণে আরো জোরে যাবার কথা। জ্যাক স্টুয়ার্ট নামে ক্যানিবেকের একটি লোক ও আমি হালে গেলাম। দু ঘণ্টা আমরা আর নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পেলাম না। এমন ঘাম হতে লাগল যে উপরের গরম জামা খুলে ফেলতে হল। আটটা ঘণ্টা পড়তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীচে গেলাম। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল।

চারটের সময় আবার ডাক পড়ল। ঝড় তো কমেই নি বরং আরো বেড়েছে। এখন পালে হাত দিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সব ছিঁড়ে যাবে—সুতরাং পাল যা আছে তাই রেখে দেওয়া হল। ঝড় কমে তো অতি উত্তম, আর যদি না কমে তবে প্রথমে একটা কিছু ছিঁড়বেই, হয়ত সবচেয়ে কম দামী দড়িটা—তার পরে যা হয় করা যাবে। ঘণ্টাখানেক ধরে জাহাজ এমন জোরে চলল যে বাঁধের উপর যেমন জলস্রোত স্ফীত হয়ে ওঠে তলায় সমুদ্র তেমনি পালদণ্ড ফুলে ফেঁপে পালদণ্ড ছাপিয়ে পড়তে লাগল। ভোরের দিকে ঝড় যদিও বা কমল মিঃ-ব্রাউন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে নীচের হালকা পালটা বার করার আদেশ দিলেন। পালটি প্রকাণ্ড বড়। এক ঘণ্টা লেগে গেল আমাদের পালটি খাটাবার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে। সাজসরঞ্জাম লাগাতে লাগাতে হাওয়ার দাপটে ডাণ্ডাটি প্রায় ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যাচ্ছিল। পালটি লাগান হতেই জাহাজ আবার উন্মাদের মত ছুটতে লাগল। আমাদের দুরবস্থা চরমে তোলার জন্য ঝড় আরো বাড়তে লাগল। সূর্যোদয় হল ঘন মেঘের আড়ালে। যে লোকটি চাকা ধরেছিল সে হঠাৎ এক ধাক্কায় ডেকের উপর

উলটে পড়ে গেল। মেট তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে গিয়ে চাকা ধরলেন—জাহাজটি ওঁর তৎপরতায় রক্ষা পেল, কিন্তু উঠল এমন তেরছা হয়ে যে হালকা পাল-দণ্ডটি একেবারে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে রইল। সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানর ফলেই এই দুর্দশা। এমন সময় ভার ঠিক রাখার দড়িতে এক হেঁচকা টান—সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে দড়িটি ছিঁড়ে পড়ল আর পাল দণ্ডটি এমন বেঁকে গেল যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পালের নীচের দড়ি দুটো সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ল, পাল তোলার দড়িটা গেল তারপর—আর পালটা ডাণ্ডার চতুর্দিকে পাকিয়ে গেল। সেটি খুলতে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

সেদিন সমস্তক্ষণ ও তার পরের রাত আমরা ঐ পালে চললাম। অবিশ্রাম ঝড়। হালে সতর্ক চোখ দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে চলেছি। পরদিন দুপুর অবধি এইভাবে চলল।

রবিবার, ২৪ শে জুলাই। আমরা ৫০°২৭´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ৬২°১৩´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পৌঁছলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টায় চার ডিগ্রী অক্ষাংশ পার হয়েছি। ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ পার হয়ে উত্তরে চলে এসেছি এখন, জাহাজের মুখ বিষুবরেখার দিকে। হর্ণ অন্তরীপ পড়ে রইল পিছনে, প্রত্যেকটি তরঙ্গের আঘাতে আমরা একটু করে দেশের দিকে, উষ্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছি। আগে যতবার বরফে পরিবেষ্টিত হয়েছি বা অন্য বিপদ এসেছে তখন আমাদের বাঁধা বুলি ছিল এখন যদি জাহাজের মুখ হত উত্তরমুখী তাহলে আমরা সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতাম। যাত্রার শেষের দিকটা সত্যিই কত আনন্দের—সকলেরই মুখে হাসি, কারো কোন অনুযোগ নেই, জাহাজেও যেন আমাদের আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে—বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। পাহারার পালা বদলের সময় উপরের দল নীচের দলকে প্রশ্ন করে "কেমন চলেছে জাহাজ?" "খাসা যাচ্ছে, খাসা। বস্টনের রূপসীদের হাওয়া লেগেছে যে।" প্রতিদিন একটু করে রাত্রি ছোট হয়ে আসতে লাগল, সূর্য ক্রমে আকাশে উঁচুতে উঠল, সকালে ডেকে এলে আবহাওয়ার প্রভেদ বেশ অনুভব করা যায়। দড়িদড়া ও ডাণ্ডা থেকে বরফ গলতে আরম্ভ করল। মাস্তুলের উপরের একটু অংশ ছাড়া সব বরফই গলে গেল আস্তে আস্তে। ঝড় পিছনে ফেলে আসার পর পালের গোটান অংশ আবার খুলে দেওয়া হল—পরিপূর্ণ ভার

নিয়ে পাল উড়তে লাগল। যখনই পালের দণ্ডে উঠতে হয় আমার গলায় গানের সুর জেগে ওঠে।

সুন্দর আবহাওয়ায় একের পর এক পাল তুলে আমরা মহাসুখে এগিয়ে চললাম।

ম্যাগেলান নক্ষত্রপুঞ্জ ও দক্ষিণের যোগতারা দিকচক্রবালের নীচের দিকে নামতে লাগল—যত উত্তরে যাই দক্ষিণের তারাগুলি অদৃশ্য হয়ে উত্তরের আকাশে নতুন নতুন তারার আবির্ভাব হতে লাগল।

রবিবার, ৩১শে জুলাই। আটটা বাজার পর দেখা গেল দিনটি উজ্জ্বল পরিষ্কার। এমন রবিবার বহুকাল আসে নি। ছুটির দিন। আমরা নিজেদের জিনিসপত্র, ঘরদোর পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। গত কয় মাসে যে সব ময়লা জামা কাপড় জমেছিল সেগুলি কাচবার জন্য উপরে আনা হল। সেই সঙ্গে ঝাঁটা, বালতি করে জল, ও যাবতীয় পরিষ্কার করার সরঞ্জাম। ঘরের মেঝে ঘষে মেজে চকচকে করে তোলা হল। বিছানা বার করে রোদে দেওয়া হল। তারপর বিরাট টবে জল ভর্তি করে আরম্ভ হল জামা কাপড় কাচা। জামা, পাজামা, ভিতরের অঙ্গবস্ত্র, মোজা, কোট, এতদিনে ভিজে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেমূর্তি ধারণ করেছিল—সেগুলির যথাযথ সংস্কার সাধনের পর শুখোতে দেওয়া হল। ভিজে জুতো ডেকের উপর রোদে দিলাম আমরা। ডেকের যা চেহারা হল যেন কোন গৃহস্থ বাড়ীর উঠোনে সারি সারি কাপড় ঝুলছে। এবার আমরা লাগলাম নিজেদের অঙ্গমার্জনার কাজে। বরাদ্দ পরিষ্কার জল আমরা একটু করে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, বালতি করে সেই জল এনে সাবান ও তোয়ালে সহকারে আমরা বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্নান করলাম। একটি বালতি হাত বদল হয়ে সকলের কাছে গেল। পাঁচ সপ্তাহের জমা ময়লা গা থেকে প্রথমে পরিষ্কার জলে রগড়ে তারপর আবার সমুদ্রের লোনা জলে চান—কাজেই ঐ বালতির জল সকলের ব্যবহার করতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। পরস্পরের গা রগড়ে, মাথায় জল ঢেলে স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে পরিষ্কার কাপড় পরে আমরা অনেকটা ঝরঝরে বোধ করলাম। বিকেলবেলা যখন পরিচ্ছন্ন দেহে পরিষ্কার পোশাক পরে গল্পগুজব ও সেলাই করতে লাগলাম মনে হল নাবিক জীবনের এই-ই সর্বোচ্চ সুখ। মাথার উপরে নির্মল আকাশে মিঠে রোদ, হালকা হাওয়ায় পাল ফুলে উঠেছে। সূর্যাস্তের পর শুকনো কাপড়গুলো উঠিয়ে

পাট করে বাক্সজাত করা হল। ঝড় জল শীতে পরবার জুতা ও বস্ত্রাদিও তুলে রাখা হল। আশা করি ওগুলোর আর প্রয়োজন হবে না, আমরা মনে মনে বললাম।

সমস্ত পাল তোলা হলে জাহাজের যে রূপ দেখা যায় তার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয় বটে কিন্তু একসঙ্গে সব পাল তোলা জাহাজ বড় একটা চোখে পড়ে না। দু-একটি বড় ও ছোট পালগুলি তোলা জাহাজ বন্দরে বেরোবার ও ঢুকবার পথে দেখা যায়—সাধারণভাবে সেগুলিকেই সব পাল তোলা বলা হয় বটে কিন্তু সচরাচর একভাবে টানা অথচ হালকা হাওয়া না থাকলে কোন জাহাজ সব পাল তোলে না। হাওয়া এমন হওয়া চাই যাতে সহসা দিক পরিবর্তন না করে। সবদিকে সব রকম পাল তোলা হলে জাহাজের যে অপূর্ব শোভা হয় তার সঙ্গে কোন পার্থিব বস্তুর তুলনা চলে না। সমুদ্রে যারা যায় তাদেরও এমন দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য খুব কমই হয় কেননা ডেকে থেকে জাহাজটি পূর্ণরূপে দেখা সম্ভব নয়।

অয়নান্ত বৃত্তের মধ্যে আমরা যখন রয়েছি সেই সময় আমি একদিন কি যেন কাজে ত্রিকোণ পালের দণ্ডের উপর গিয়েছি। কাজ করে আমি বহুক্ষণ ধরে সেখান থেকে চেয়ে রইলাম—কী অপূর্ব সুষমা আমার চোখের সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। ডেক থেকে বেশ দূরে থাকার জন্য মনে হল যেন অন্য কোথাও থেকে জাহাজটি দেখতে পাচ্ছি—কাল খোলটির উপর থাকে থাকে পালের রাশ চূড়ার মত আকারে উপরের দিকে উঠে যেন মেঘ স্পর্শ করছে। রাত্রের আলো-আঁধারিতে দৃশ্যটি অপূর্ব মোহের সঞ্চার করল। গাঢ় নীল আকাশে তারা জ্বলছে, বাণিজ্য বায়ুর মৃদু নরম ছোঁয়া, সমুদ্র শান্ত। কেবল গলুই থেকে জল আছড়াবার শব্দ সেই নীরবতা ভঙ্গ করছে। ডেকের দু পাশে জলের উপর বিস্তৃত হয়ে দুটি হালকা পাল, উপরে ডানার মত প্রসারিত থাকে থাকে পাল উঠে গেছে—আরো উপরে যেন একই সুতায় বাঁধা ঘুড়ির মত আরো পালের থাক, চূড়োর একেবারে মাথার পালগুলি মনে হল তারাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, যেখানে মানুষের স্পর্শ পৌঁছবে না। হাওয়া একটানা বয়ে চলেছে। সমুদ্রও এত নীরব যে মনে হচ্ছিল পালগুলি যেন পাথর কুঁদে তৈরী করা। পালের কাপড়ে এতটুকু ঢেউ উঠছে না। মসৃণ হয়ে ফুলে আছে। আমি সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছি—হঠাৎ চমক ভাঙল।

আমার সঙ্গে আর একজন মাল্লা কাজ করতে এসেছিল, সেও এই অপূর্ব সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলে উঠল "কি নিঃশব্দে চলেছে।"

আবহাওয়া ভাল দেখে আমাদের কাজের চাপও কিছু পরিমাণে বাড়ল। বন্দরে প্রবেশ করার আগে জাহাজের সরঞ্জাম একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। স্থলবাসীদের জ্ঞাতার্থে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে যাত্রার প্রথম অংশ কাটে জাহাজকে সমুদ্রের উপযোগী সজ্জায় ভূষিত করতে—আর পরের অংশ কাটে বন্দরের জন্য প্রস্তুত হতে। মেয়েদের হাতঘড়ি যেমন ক্ষণে ক্ষণে বিগড়ে যায়—জাহাজের প্রকৃতিও অনেকটা তাই। হর্ণ অন্তরীপের কাছে যে শক্ত পাল তোলা হয়েছিল সেগুলি নামিয়ে এবার পুরোনো পাল তোলা হল, এই আবহাওয়ায় সেগুলি বেশ কিছুকাল চলবে। দড়াদড়ি ঠিক করা, মাস্তুলের রশি বাঁধা, জাহাজটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে রং দেওয়া, ডেক পালিশ করা, নতুন দড়াদড়ি প্রস্তুত রাখা, যাতে বস্টনে পৌঁছবার পর অন্যের চোখে একটিও ত্রুটি না দৃষ্টিগোচর হয়। এই সব কাজই খুব সময়সাপেক্ষ। কাজেই দিনের সমস্ত সময়টাই কাটত ডেকে। আমাদের পরিশ্রম হত খুবই, কিন্তু উপায় নেই। জাহাজের সাজসজ্জা একেবারে নিখুঁত না হলে চলবে না। তবে ফেরার আনন্দে আমরা এই সব কষ্ট মোটেই গায়ে মাখতাম না।

এইভাবে দিন চলল, তেমন কিছু নতুন ঘটনা আর ঘটে না। সপ্তাহের শেষ ভাগে প্রবল দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্যবায়ুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এই অক্ষাংশও আমরা নির্বিঘ্নে পার হলাম। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি খুবই তুচ্ছ কিন্তু আমাদের গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে ওতেই একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনাও চলেছিল বেশ কিছুদিন। জাহাজে সকলের মানসিক অবস্থা কেমন থাকে সেটাও এই জাতীয় ছোটখাটো ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়।

বাণিজ্য পোতে সাধারণতঃ ক্যাপ্টেন কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে মেটকে আদেশ দেন। মেট তারপর সেইগুলি পরিচালনা করেন। মেটের কাজে ক্যাপ্টেন বিশেষ মাথা গলাতে আসেন না। এটাই বহুদিন ধরে প্রচলিত—এক রকম আইনও বলা চলে। অবশ্য মেট যদি তেমন দক্ষ নাবিক না হন তাহলে ক্যাপ্টেনকে খবরদারি না করে উপায় থাকে না। কিন্তু আমাদের মেট ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপও সহ্য করতে পারতেন না।

সোমবার সকালে ক্যাপ্টেন মেটকে আদেশ দিলেন সামনের দিকের মাস্তুলের দ্বিতীয়াংশে ওলন দণ্ড লাগিয়ে ঠিক করতে। সেই শুনে মেট মাস্তুল দড়ি কাঠে জড়িয়ে, টেনে, দড়িতে কপিকল জুড়ে আদেশ পালনে তৎপর হলেন। ইতোমধ্যে ক্যাপ্টেনও সেখানে এসে উপস্থিত—এসে উনিও মাল্লাদের আদেশ করতে লাগলেন। ফলে মহা গোলযোগ বেধে গেল, মেট স্থান ত্যাগ করে পিছনের দিকে চলে যেতে যেতে ক্যাপ্টেনকে বললেন—

"আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে আমার পিছনে যাওয়াই ভাল। সামনের দিকে একজনই যথেষ্ট।"

এই শুনে ক্যাপ্টেন চটেমটে উত্তর দিলেন। মেটও পালটা জবাব দিতে ছাড়লেন না। দুজনে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে রণং দেহি মূর্তি ধারণ করলেন।

"জাহাজের মালিক আমি।"

"আজ্ঞে হুঁ, আমিও জাহাজের মেট। আমি ডেকের সামনের দিকে কাজ করি, আপনার জায়গা পিছনে।"

"আমার জায়গা সমস্ত জাহাজ, আমি যেখানে খুশী কাজ করবো। আর তোমার মেট থাকা না থাকাও আমার খুশী।"

"তা হলে সেকথা বলেই দিন না ক্যাপ্টেন টমসন। মেট না হলেও মাল্লার কাজ তো করতে পারি। তাছাড়া চুরি চামারি করে তো আর মেট হইনি—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা দুই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মধ্যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেশ উপভোগ করছিলাম। পরস্পরের দিকে চেয়ে চোখ মটকাচ্ছিলাম আমরা। খানিকক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন মেটকে ডেকে নিয়ে গেলেন। দুজনে বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল, তারপর মেট ফিরে এসে আবার কাজে হাত লাগলেন। ক্যাপ্টেন মেটের কাজে হস্তক্ষেপ করে জাহাজের অলিখিত আইন ভঙ্গ করেছেন। তাছাড়া মেট যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি—ক্যাপ্টেনের ওঁর কাজে কর্তৃত্ব করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং মেট চটে গিয়ে কিছু অন্যায় করেননি। অথচ ক্যাপ্টেনের কথা জাহাজে নির্বিবাদে পালন করার কথা—তিনি যা করেন সেটাই ঠিক। সুতরাং এদিক দিয়ে মেটকে দোষী বলা যায়, কেন না প্রত্যেক উচ্চকর্মচারী জাহাজে কাজ নেওয়ার সময় ক্যাপ্টেনের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব মেনে নিতে অঙ্গীকার করেন। মেটও করেছিলেন।

অথচ বাণিজ্য-পোতগুলিতে এমন কতকগুলি প্রচলিত প্রথা আছে যেগুলি আইন না হলেও প্রায় আইনের মতই ক্ষমতাসম্পন্ন। জাহাজের সর্বময় কর্তৃত্ব ক্যাপ্টেনের হলেও এই সব প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচরণ করায় অনেক সময় বেশ অনর্থের সৃষ্টি হয়—সেগুলির তাৎপর্য স্থলবাসী নাগরিক বা বিচারকরা বুঝতে অক্ষম।

এর পরের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা হল মেট ও স্টুয়ার্ডের মধ্যে যুদ্ধ। এদের গোড়া থেকেই পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব ছিল, কয়েকবার সেটা প্রকাশ্যে ফেটে পড়ার উপক্রমও হয়েছে। একবার উপকূলে থাকার সময় মেট স্টুয়ার্ডকে পাকড়াও করেন, কিন্তু স্টুয়ার্ড আচমকা মাথা নীচু করে মেটের পেটে গোঁত্তা মেরে তাঁকে বেশ কাবু করে ফেলে—স্টুয়ার্ড এক একবার গোঁত্তা মারে আর বলে 'কিরে ব্রাউন, কেমন?' মিঃ ব্রাউনের মুখ একেবারে রক্তশূন্য, উনি প্রাণপণ শক্তিতে স্টুয়ার্ডের মাথায় কীল চড় বর্ষণ করতে লাগলেন কিন্তু নিগ্রো স্টুয়ার্ডের শক্ত খুলিতে ঠেকে সেগুলি বৃথাই অপচয় হতে লাগল। দ্বিতীয় মেট তাড়াতাড়ি স্টুয়ার্ডকে সরিয়ে দিলেন। মিঃ ব্রাউন আর একবার আক্রমণোদ্যত হতেই ক্যাপ্টেন এসে দুজনকে ছাড়িয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেনকে মিঃ ব্রাউন তাঁর দুঃখের কাহিনী জানালেন, স্টুয়ার্ড যে ওঁকে অসম্মানজনক সম্বোধন করেছে একথাও বলতে ভুললেন না। "ও আমাকে ব্রাউন বলেছে।" একথাটা এরপর আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যায়—ও আমাকে ব্রাউন বলেছে। মেট শাসিয়ে বললেন "কেমন হয়েছে! উচিত শাস্তি!" কিন্তু শাস্তিটা যে কার হল সেটা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, মনে হল মেটের মনেও সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি না করে মেট ছাড়বেন না—এও আমরা জানতাম। একদিন তার সুযোগ এসে গেল। বিকেলবেলা মেট স্টুয়ার্ডের কাছে এক গ্লাস জল চাইলেন। স্টুয়ার্ড উত্তর দিলে যে ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কারো চাকর নয়—কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু কথা বলার সময় সে মেটের নাম উচ্চারণ করেছিল—মিঃ টুকু বাদ দিয়ে, সেটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। আর যায় কোথায়! মেট ওকে "কেলে ভূত" বলে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন—দুজনে মারামারি, ঘুঁষোঘুঁষি, ডেকে গড়াগড়ি। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলাম। স্টুয়ার্ড আবার গুঁতো মারবার চেষ্টা করতেই এবার মিঃ ব্রাউন ওকে চেপে ধরলেন, তখন স্টুয়ার্ড চিৎকার

করে বললে সাবধান, রক্ত বার করে দেব বলছি। ক্যাপ্টেন ইতোমধ্যে ডেকে এসে ওদের ছাড়িয়ে দিলেন, তারপর স্টুয়ার্ডকে বার ছয়েক দড়ি দিয়ে পেটা হল। স্টুয়ার্ড অবশ্য নিজের পক্ষ সমর্থন করে বলতে চেষ্টা করল কিন্তু ওর রক্ত বার করে দেবার কথাটা ক্যাপ্টেন শুনে ফেলেছিলেন। মার খাবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। এর পর মেট আর স্টুয়ার্ডকে কখনো কিছু বলেন নি। মাল্লাদের চোখে যে ওঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল এতেই উনি খুশী।

॥ ৩৪ ॥ গৃহ সন্নিকট ॥

সেদিনই আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই। নাবিকদের জীবনে অবশ্য এরূপ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি বিকেলে প্রায় ঘণ্টাখানেক উপরের বড় পালদণ্ডটির উপরে কাজ করছিলাম। দণ্ডটি উপরে তুলে শিকল দিয়ে আটকান ছিল। আমি কাজ শেষ করে দড়ি গুটিয়ে একটা পা পালদণ্ড থেকে উঠিয়ে দড়াদড়িটি ধরেছি মাত্র এমন সময় শিকলটি ভেঙ্গে পালদণ্ডটি নীচে পড়ে গেল। আমি দড়াদড়ি ধরেছিলাম বলে বেঁচে গেলাম বটে কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এক মুহূর্ত আগে শিকলটি খুলে গেলে আর দেখতে হত না—সোজা প্রায় একশো ফুট উচ্চতা থেকে সমুদ্রগর্ভে পতন। কিংবা ডেকের উপর আছাড়, সেটা হত আরো ভয়াবহ। যাই হোক প্রাণে বেঁচে যাওয়াটা নাবিকদের কাছে মহা ঠাট্টার বিষয়। এই নিয়ে কেউ বিচলিত হয়ে পড়লে তার আর দুর্দশার অন্ত থাকে না। মাল্লাদের জীবন যে প্রতি পদক্ষেপেই বিপন্ন হতে পারে সে কথা তারা ভাল ভাবে জানে বলেই এই নিয়ে চিন্তা করা পছন্দ করে না। কেউ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলে সেকথা হয় গোপন করে অথবা হাসি তামাশা করে উড়িয়ে দেয়। আমি অনেকবার মাল্লাদের সাক্ষাৎ মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসতে দেখেছি—কিন্তু সে নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্যও করেনি। হর্ন অন্তরীপের কাছে আমাদের একটি কম বয়সী মাল্লা একবার মাস্তুলের দ্বিতীয় অংশে পাল গোটাবার জন্য উঠেছিল—তখন অন্ধকার রাত্রি, প্রয়োজন হলে জলে নৌকা নামানও অসম্ভব—এমন সময় হঠাৎ তার হাত ফসকে যায়। আর একটু হলেই সে জলে পড়ে যেত কিন্তু পালদণ্ডের উপর তার সঙ্গে কাজ করছিল

ফরাসী মাল্লা জন—সে তার কলার ধরে টেনে রাখে। "হতভাগা, ফের যদি হাত ছেড়েছ তো নিকুচি করেছে" এই মধুর সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারের ইতি। এ নিয়ে পরে আর কাউকে কথা বলতে শোনা যায়নি।

রবিবার, ৭ই আগস্ট। ২৫°৫৯´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ২৭°০´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। ইংরাজ পোত মেরী ক্যাথরীনের সঙ্গে বার্তা বিনিময় হল। বাহিয়া থেকে যাত্রা করেছে তারা, গন্তব্যস্থল কলিকাতা। প্রায় এক শ দিন পরে এই আমরা প্রথম অন্য জাহাজ দেখলাম। আমাদের ছাড়া অন্য মনুষ্য-কণ্ঠস্বর কানে এল। ওদের মাল্লাদের দড়ি টানার চিৎকার যেন আমাদের কানে সুধাবর্ষণ করল। জাহাজটি পুরানো, যথেষ্ট পোড় খাওয়া, পিছনের অংশ বেশ উঁচু, প্রকৃত ইংরাজ চা-ব্যাপারী জাহাজের মত চৌকা গলুই—তলার যে অংশ পাছা গলুই-এর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে এসেছে সেটি চিনির বাক্সের আকারের। হালকা হাওয়ার অপরিসর পাল তোলা ছিল, কিন্তু ওদের ক্যাপ্টেন বললেন তবুও চার সামুদ্রিক মাইলের চেয়ে বেগে যাওয়া সম্ভব নয়। তখনও ওদের দীর্ঘ পথ বাকি। আমরা সহজেই ছয় সামুদ্রিক মাইল বেগে যাচ্ছিলাম।

পরদিন বেলা তিনটার সময় আরেকটি ইংরাজ পতাকা সমন্বিত জাহাজকে অতিক্রম করলাম। তাদের সামনে পিছনে হালকা পাল, মাস্তুলের চতুর্থ অংশের উপরেও পাল খাটান। এটি বিরাট আকারের যুদ্ধ জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, প্রত্যেক মাস্তুলের আগায় লোক মোতায়েন করা। পিছনের মাস্তুল থেকে রক্তবর্ণ পতাকায় সেন্ট জর্জের ক্রসচিহ্ন। সুন্দর সামন্ততন্ত্রী চালে দর্পভরে জাহাজটি এগিয়ে গেল—দৃশ্যটি বড় চমৎকার। অবশ্য আমাদের জাহাজটিও নিশ্চয় কম মনোহারী দেখাচ্ছিল না। খোল থেকে বাইরে দু পাশে প্রক্ষিপ্ত ছোট পাল থেকে আরম্ভ করে থাকে থাকে পাল উপরে উঠে গেছে—সেই পালের চূড়ার আড়ালে জাহাজের খোল ঢাকা পড়ে আছে। তিমিশিকারী নাবিকরা এই দৃশ্য দেখে বলে 'মেঘের মত পাল উড়িয়ে জাহাজটা হর্ণ অন্তরীপ জয় করে ফিরছে।'

শুক্রবার, ১২ই আগস্ট। দিনের বেলা ২০°২৮´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ২৯°০৮´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ট্রিনিদাদ পার হলাম। দুপুর বারোটার সময় দ্বীপ থেকে দূরত্ব সাতাশ মাইল। সুন্দর দিন, প্রশান্ত সমুদ্রের উপর মৃদু ভাবে হালকা বাণিজ্য বায়ুর ছোঁয়া। দ্বীপটি দূর থেকে মনে হল যেন নীল বর্ণের

গোলা কাঁচের সমুদ্র থেকে জেগে উঠছে। এই শান্ত সমাহিত দ্বীপটি শুনলাম বহুদিন অবধি জলদস্যুদের আস্তানা ছিল।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই আগস্ট। বিকেল তিনটেয় ফার্ণাণ্ডো নরোনহা দ্বীপ অতিক্রম করলাম, অক্ষাংশ দক্ষিণে ৩°৫৫´, ৩২°৫৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ, শুক্রবার রাত বারোটার পর আবার চতুর্থবার বিষুব রেখা অতিক্রম করলাম। স্টেটেন ভূমির পর এই সাতাশ দিনে আমরা চার হাজার মাইল পথ পার হলাম।

বিষুবরেখার উত্তরে চলে এলাম আমরা। প্রতিদিন একটু করে অক্ষাংশ বাড়তে লাগল। দক্ষিণ অক্ষরেখার শেষ চিহ্ন ম্যাগেলান মেঘপুঞ্জ বহুদিন অস্তমিত, এখন উত্তরের আকাশের ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি পরিচিত নক্ষত্রগুলি একে একে উদয় হতে লাগল। ডাঙা দেখার মতই প্রায় এই অনুভূতি—পরিচিত গগনমণ্ডলের নীচে পৌঁছে যাওয়া। আবহাওয়া অত্যন্ত গরম, প্রখর রোদ ও প্রচণ্ড বৃষ্টি পালা করে সহ্য করতে হচ্ছিল, কিন্তু কারো মুখে এতটুকু অনুযোগের ভাষা নেই। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেকার অবস্থা তখনো সকলের মনে জ্বল জ্বল করছে। বৃষ্টির জল থেকে আমরা প্রচুর বিশুদ্ধ জল আহরণ করেছিলাম। অয়নান্ত মণ্ডলের প্রখর রোদ, পরিষ্কার মধ্য আকাশে সূর্য—আচম্বিতে প্রবল বর্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। এই অঞ্চলের পক্ষে এরকম আবহাওয়া পরিবর্তন মোটেই আকস্মিক নয়। হয়ত আমরা সুতী পোশাক পরে ডেকে যে যার কাজ করছি, জাহাজ অলস ছন্দে জল কেটে চলেছে, হালের লোকটি মুখে টুপি ঢাকা দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন, ক্যাপ্টেন দিবানিদ্রায় মগ্ন, যাত্রীটি রেলিঙে ঝুঁকে ডলফিন দেখতে ব্যস্ত, পালের মিস্ত্রী একটা পুরোনো পাল মেরামত করছে, ছুতোর মিস্ত্রী মাঝখানে বসে নিজের কাজে নিযুক্ত, সুতো কেটে দড়ি তৈরীর কাজ চলেছে সশব্দে, এমন সময় হাওয়ার দিকে দেখা গেল কালো মেঘ। ক্যাপ্টেন সিঁড়িতে গলা বার করে আকাশের অবস্থা নিরীক্ষণ করলেন, পরক্ষণেই নেমে এসে ডেকে পায়চারি আরম্ভ করলেন। মেঘ ক্রমশ আকাশ ঢেকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি পাল, কাটা দড়ির বাক্স ইত্যাদি তুলে ফেলে জানলা ইত্যাদির মুখ বন্ধ করা হল, হালের লোকটি তৎপর হয়ে উঠল। তুমুল বৃষ্টি এসে আছড়ে পড়ল আমাদের উপর। বৃষ্টির বেগ কম থাকলে মাস্তুলের চতুর্থ অংশের পালের প্রান্ত দুটি টেনে এনে জাহাজ যেমন চলছিল তেমনই যেতে

থাকে। কিন্তু যদি ঝড়বৃষ্টির মাত্রা বেশী থাকে তাহলে সামনে পিছনে উপরের পাল গুটিয়ে ফেলা হয়, ত্রিকোণ পাল দণ্ড সরিয়ে ফেলা হয়, হালের লোকটি যথাশক্তি নিয়োগ করে হাওয়ার দিকে জাহাজের মুখ রাখে। বৃষ্টির প্রবল ধারায় আমাদের চামড়া অবধি ভিজে যায় কিন্তু আমরা সেজন্য বিরক্ত হই না, কেন না গরম কালে ধারাজলে স্নান মন্দ কি। তাছাড়া এসব বৃষ্টি অল্পক্ষণস্থায়ী। বৃষ্টির বেগ কেটে গেলেই আদেশ হয় জাহাজকে আবার গতিপথে চালিত কর। অনভিজ্ঞ চোখে মনে হবে তখনও আবহাওয়া অনুকূল নয়, কিন্তু পরক্ষণেই মেঘবৃষ্টি কেটে আবার সূর্যের উদয়, গরম যেন আগের চেয়েও বেশী, আবার ডেকের উপর যথারীতি কাজকর্মের ঘর্ঘর, ক্যাপ্টেনের কেবিনে প্রস্থান—যেন ঝড়বৃষ্টি কিছুই হয়নি।

অতলান্তিক মহাসমুদ্রের অয়নান্ত অঞ্চলের জলবায়ু এইরকমই, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। কখনো কয়েক ঘণ্টার পরিবর্তে কয়েক দিন ধরে বাতাস থেমে গিয়ে নেমে আসে ভীষণ স্তব্ধতা। রাত্রে আকাশ পরিষ্কার। আমরা পাহারার সময় ঘুমোতে পারতাম, কেবল একজনকে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত, তাছাড়া হালের লোকটিকে জেগে থাকতে হত। ঠিক ঘুমোবার অনুমতি না পেলেও এই নিয়ে কড়াকড়ি ছিল না। কাউকে পাহারার সময় ঘুমোতে দেখলেও না দেখার ভান করা হত। আমরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়িনি। আমরা কুণ্ডলীকৃত দড়াদড়ির উপর, ভারোত্তলন যন্ত্রের নীচে, যেখানে অপেক্ষাকৃত নির্জন কোণ পেতাম সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে নিতাম। সারাদিন সকলকে ডেকে উপস্থিত থাকতে হত, আমাদের ছুটি হত মাত্র চার ঘণ্টা, সেজন্য এভাবে ঘুমিয়ে শক্তি সঞ্চয় করাটা ছিল আমাদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। অনেক সময় মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও আমরা ডেকে দড়ির কুণ্ডলীর উপর কোট চাপা দিয়ে নির্বিবাদে ঘুমোতাম। না দেখলে সেটা বিশ্বাস করা দুরূহ।

বিষুবরেখা পার হবার দশ দিনের মধ্যে যে আমাদের কত রকম আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হতে হল—ঝ'ড়ো হাওয়া, ঝড়, বাতাসহীন স্তব্ধতা, তুমুল বর্ষণ, কখনো প্রবল হাওয়ায় পালের দড়ি টেনে যাওয়া, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই হালকা হাওয়ার অপরিসর গাল দু পাশে তুলে তরতর করে যাওয়া। তারপর আমরা উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু পেলাম।

রবিবার, ২৮শে আগস্ট। ১২° উত্তর অক্ষাংশে পৌঁছে আমরা বাণিজ্য

বায়ু পেলাম। গত কয়েক দিন থেকেই বাণিজ্য বায়ুর মেঘ চোখে পড়েছে। সকালের দিকে মৃদু দক্ষিণে হাওয়া বইছিল, এখন তার বদলে উত্তর পূর্ব দিক থেকে দমকা হাওয়া এসে আমাদের পালে লাগল। আমরা উপরের পাল তুলে, পালের দড়ি টেনে চললাম—বাতাস বেশ প্রবল। আমাদের যাত্রাপথ উত্তর উত্তর-পশ্চিম, মাঝে মাঝে বাতাস পূবমুখী হওয়াতে আমরা পাশের হালকা পাল তুলে উত্তরের দিকে যেতে লাগলাম।

রবিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর। ২২° উত্তর অক্ষাংশ ও ৫১° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে ঠিক কর্কট ক্রান্তির কাছে এসে বাণিজ্য বায়ু বন্ধ হল।

তারপরের কয়েক দিন আমরা বিভিন্ন জলবায়ুর পরিচয় পেলাম। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অক্ষাংশে এসে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ও পাওয়া গেল। ঐ সময়টা ছিল ঝড়বৃষ্টির সময়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বাত্যায় উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরে প্রচণ্ড ধ্বংস সাধন করে।

আমরা তখন কিউবা দ্বীপের অক্ষাংশে, আগের দিন রাত্রে বাণিজ্যবায়ুর অঞ্চল ছেড়ে এসেছি—এমন সময় সত্যকার ঝঞ্ঝা কাকে বলে তার পরিচয় পাওয়া গেল। পিছন দিক থেকে অল্প অল্প বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সেটা বিষম স্তব্ধতা, তার সঙ্গে কালো মেঘ এসে আকাশ গ্রাস করল। আমরা যখন বারোটার সময় ডেকে এলাম দেখি চতুর্দিকে যমালয়ের মত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। গোটান পালগুলি দণ্ড থেকে স্থির হয়ে ঝুলছে, এমন স্তব্ধতা যে ভয় ভয় করতে লাগল। কেউ কোন কথা বলে না, কিছু একটা ভয়ঙ্করের অপেক্ষায় সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে। মেট এসে নীচু গলায় তিনকোণা পালের দণ্ড ও পিছনের মাস্তুলের পাল খুলে নিতে বললেন—আমরা নীরবে আদেশ পালন করলাম। জাহাজ জলের উপর স্থির, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, কেবল ক্যাপ্টেনের পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকার এমন গাঢ় যে নিজের হাত অবধি দেখা যায় না। খানিক পরে মেট আর একবার এগিয়ে এলেন। নীচু গলায় আদেশ হল প্রধান মাস্তুলের দ্বিতীয়াংশে খাটান পালের প্রান্ত দুটি গুটিয়ে ফেলতে। একটা ভয়ানক স্তব্ধতা আমাদের মন গ্রাস করেছিল। আমরা নিঃশব্দে পালের দড়ি, ঝোলা প্রভৃতি গুটিয়ে ফেললাম, গান গাইবার জন্য কেউই মুখ খুললে না। আমি ও ইংরাজ মাল্লাটি পাল গোটাতে

উপরে উঠলাম। ঝোলার দড়ি টেনে তুলেছি মাত্র: এমন সময় মেট আমাদের কি যেন নির্দেশ দিলেন ঠিক শোনা গেল না। আমরা তাড়াতাড়ি হাতড়ে হাতড়ে নেমে এলাম। নীচে এসে দেখি সকলে উপরে কি মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক তার উপরে মাস্তুলের মাথায় একটি বিদ্যুতের আলোকপিণ্ড, সচরাচর ঝড়ের রাতে এগুলি মাস্তুলের আগায় দেখা যায়। নাবিকদের ধারণা আলোকপিণ্ডটি যদি উঁচুতে ওঠে তবে মেঘ কেটে যেতে বাধ্য কিন্তু ওটি নীচের দিকে দেখা গেলেই বুঝতে হবে ঝড় আসন্ন। এজন্য সকলেই সতর্ক হয়ে আলোটি লক্ষ্য করছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, আলোটি নীচে নেমে পালদণ্ড অবধি পেঁাছল। আমরা ঠিক সময়েই নেমে এসেছিলাম কেন না ঐ আলো কারো মুখে পড়াটা অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করা হয়। এতেই ইংরাজ মাল্লাটি যথেষ্ট ভীত বোধ করছিল। আলোটি এর পর অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর সামনের মাস্তুলের পালদণ্ডের কাছে দেখা দিল, খানিকক্ষণ লুকোচুরির পর আর একবার অদৃশ্য হল। শেষবার আলোটি দেখা গেল ত্রিকোণ পাল দণ্ডের কাছে। ইতোমধ্যে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে দেখে আমাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হল। অন্ধকার যেন আরো এক পেঁাচ কালি মেখে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাজের গুর গুর শব্দ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বিদ্যুতের হলকা—সেই দেখে আমরা মাস্তুলের দ্বিতীয়াংশের পাল ছাড়া সব পাল খুলে নিলাম। তখনো বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। দমকা হাওয়ায় পাল ফুলে উঠল একবার, আবার নেতিয়ে পড়ল মাস্তুলের গায়ে। আবার সব নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ চারিদিক প্রকম্পিত করে আরম্ভ হল একসঙ্গে বাজ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, মনে হল আমাদের ঠিক মাথার উপরের মেঘ- তার সমস্ত জল হুড়হুড় করে ঢেলে দিচ্ছে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, বাজের শব্দে কানে তালা ধরার উপক্রম, জলের তোড়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোতে মহাসমুদ্র আলোকিত হয়ে উঠছে। বৃষ্টির তোড় হঠাৎ থেমে গেল, তারপর এক এক পশলা করে হতে থাকল। বিদ্যুতের চমক কিন্তু রাতের অন্ধকার চিরে আরো কয়েক ঘণ্টা ধরে সমানে চলল। আমরা কিন্তু এতটুকু নড়িনি। আমাদের উপর প্রকৃতির রোষ সগর্জনে

ভেঙ্গে পড়তে লাগল—বহুদূর ব্যাপী সমুদ্রের মধ্যে এক আমাদের জাহাজটি ছাড়া আর কোন আক্রমণ করার মত বস্তু নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পাহারার পালা শেষ হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীচে গেলাম। তখন চারটে। এতক্ষণ একবারও ঘণ্টা পড়েনি, কেউ কোন সাড়াশব্দও করেনি—সব নিস্তব্ধ। থেকে থেকে বৃষ্টির ধারায় মাল্লাদের সর্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে যেতে লাগল। কুটিল অন্ধকার থেকে থেকে ডাকিনীর মত বিদ্যুতের আলোকে হেসে উঠতে লাগল। বিদ্যুতে সাধারণতঃ জাহাজের কোন ক্ষতি হয় না—কেননা জাহাজের চারিদিকে লোহার অংশ ছড়ান থাকে। বিদ্যুতের তরল স্রোত আমাদের নোঙর, দড়ি, শিকলের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল, কিন্তু জাহাজের কোন অনিষ্ট হয়নি। আমরা চারটের সময় শুতে গেলাম তখন উপরে ঝড়বৃষ্টির নর্তন চলেছে। যে কোন অবস্থায় জাহাজে আগুন লাগতে বা জাহাজ ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যেতে পারে—এরকম অবস্থায় ঘুম আসা সহজ নয়। কিন্তু মাল্লাদের যে কোন অবস্থায় ঘুম আসে, যে কোন সময় ডাকলেই তারা উঠে পড়তে পারে। সাতটা ঘণ্টায় ঘুম ভেঙ্গে উপরে এসে দেখি নির্মল আকাশে সূর্য উঠেছে, জাহাজ হালকা হাওয়ায় পাল তুলে এগিয়ে চলেছে।

॥ ৩৫ ॥ আরও উত্তেজনা ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অক্ষাংশ থেকে বারমুডা অবধি আসতে আসতে আমরা সব রকম জলহাওয়া প্রত্যক্ষ করলাম, সেই সঙ্গে সামান্য দুর্যোগ, যাতে মাস্তুলের দ্বিতীয় অংশের পাল গুটিয়ে নিতে হয়। বারমুডায় এসে আমরা দক্ষিণে হাওয়া পেলাম। শরৎকালে এই উপকূলে দক্ষিণে হাওয়া বেশ নিয়মিত পাওয়া যায়। একদিন দুপুরে আমরা ডেকে যে যার কাজে ব্যস্ত আছি—সুন্দর দিন, হাওয়া বেশ জোর। বিকেলের দিকে হাওয়া বাড়তে লাগল। মেঘের গতিক ভাল নয়। ডেকের উপর দিয়ে জলের ছিটে এসে মাল্লাদের দড়ি পাকাবার গুলি ভিজিয়ে দিল। মেট তাড়াতাড়ি ডেক খালি করে ফেলার আদেশ দিলেন, মাস্তুলের উপরে কর্মরত মাল্লাটিকে পাল ওঠাবার দড়ি হাওয়ার দিকে

উঠিয়ে নিতে বললেন। ত্রিকোণ পালের দড়িতে কপিকল পড়ল। পিছনের মাস্তুলের চতুর্থ অংশের পাল গুটিয়ে ফেলল একজন। গতিক ভাল নয় দেখে রাঁধুনী তাড়াতাড়ি খাবার প্রস্তুত করে রাখলে। মেট বললেন সকলে একসঙ্গে খেতে না গিয়ে পাহারার পালা হিসাবে খাবার ছুটি হোক। খেতে খেতে শুনি উপরে মাস্তুলের চতুর্থ অংশের পাল খোলা হচ্ছে। ডেকে এসে দেখি সমুদ্রের রুক্ষ চেহারা, হাওয়াও ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলে গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট না করে একদল নীচে একটু ঘুমিয়ে নিতে গেল। রাত্রে উঠতে হতে পারে, সুতরাং দু ঘণ্টার ঘুমের মূল্যও বড় কম নয়। কালো কালো রুদ্রমূর্তি মেঘ, দুরন্ত সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাসে ডেকের জল বেরোবার ছিদ্র অবধি ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর পাল নামানো হল না। ক্যাপ্টেন দক্ষ নাবিক—সহজে মাঝখানের পালে হাত দিতে চান না। মাস্তুলের দ্বিতীয়াংশে যদি পাল খাটান থাকে তবে বুঝতে হবে সেটা ঝ'ড়ো হাওয়া, কিন্তু ঝড় নয়। আমি অবশ্য আমাদের জাহাজের আগা থেকে পালের দড়ি বাঁধার দণ্ড জলের তলায় চলে গেছে—এমন সময়ও উল্লিখিত পাল খাটান থাকতে দেখেছি। আটটার ঘণ্টা পড়ল। তখনো পাল গোটান সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নেই। বলা হল আমরা যেন প্রস্তুত থাকি। যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়তে পারে। আমরা ক্যাপ্টেনের উপর রাগে গজগজ করতে করতে নীচে গেলাম। যখন ঝড় আসছে তখন পাল গোটাতে আর দেরী করার কি অর্থ। আমাদের কেবল অযথা পরিশ্রম বাড়ান। আমরা শুয়ে পড়লাম কিন্তু উঠতে হবেই জেনে কেউ ঘুমোবার চেষ্টাও করলাম না। ডেকে হাওয়ার সোঁ সোঁ, জাহাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর্তনাদ করে উঠছে, সমুদ্রের জল শব্দ করে আছড়ে পড়ছে গলুই-এ। আমাদের ঘরের মিটমিটে বাতি প্রচণ্ড জোরে জ্বলছে, জিনিসপত্র এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। "দ্বিতীয় মেট করছে কি? মাস্তুলের দ্বিতীয় পালটা খুলে না নিলে যে এবার মাস্তুল উপড়ে যাবে?" বিল পুরানো অভ্যাস বশে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। অবশেষে আদেশ হল। আমরা মাল্লাদের সাড়া শুনতে পেলাম। ডেকে দড়িদড়া ছোঁড়ার শব্দ, পালের পত পত শব্দ, পালের কোণ বাঁধা দড়ি টানতে টানতে মাল্লাদের চিৎকার। "এই এসে গেল পালটা"—শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আমরা বোধহয় ডেকে কাজ করছি। তারপর

পরিচিত কণ্ঠে পালের টানা দড়ি ধরে থাকতে বলার অনুরোধ। আমরা বললাম "ঐ বেন স্টিমসন পাল গোটাতে উপরে উঠেছে"—পরমুহূর্তেই আমাদের উপরের ছাদে দড়িদড়া ফেলার আওয়াজ—ঐ ত্রিকোণ পাল নামল। দ্বিতীয় মেট মাঝখানের পালে, মনে হল সমস্ত সমুদ্র ডেকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, শেষে ঐ পালটিও নেমে এল। তারপর কিছুক্ষণ জাহাজের গতি স্বচ্ছন্দ, দুটি ঘণ্টা পড়ল, আমরা ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ দরজায় তিনটে ধাক্কা, "ওঠ, ওঠ, সকলে শীঘ্র উঠে পড়"—আমরা ত্বরিতে ঝড়ের টুপি ও মোটা জামা চাপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। মেট দেখি খ্যাপা ষাঁড়ের মত গর্জন করছেন, ক্যাপ্টেন উপরের ডেকে তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছেন, ডেকের মাঝখানে দ্বিতীয় মেট হায়নার মত তীক্ষ্ণরবে হাঁক ছাড়ছেন। জাহাজ একদিকে এত হেলে গেছে যে বাঁদিকের জলের নালি সমুদ্রের ভিতর, ডেকের সামনের দিক ফেনায় ভর্তি। পালগুলো মাস্তুলের সঙ্গে ঘষা লাগছে, দড়িদড়া সব এলোমেলো ঝুলছে, ডান দিকের পাহারার দল পালের দড়িতে কপিকল লাগাচ্ছে। আমরা সামনের মাস্তুল বেয়ে উঠে পাল গোটালাম। সবাই মিলে পালের কোণ বাঁধা দড়িতে হাত লাগিয়ে কেউ ত্রিকোণ পাল, কেউ মাঝের পাল, কেউ মাস্তুলের দড়ির উপর টাঙ্গান পাল চটপট গুটিয়ে রেখে দিলাম। কাজ শেষ হতে আবার নীচে যাবার ছুটি। দেড় ঘণ্টার মত ঘুমোবার সময় পাওয়া গেল। ভোরের দিকে হাওয়ার বেগ অনেকটা কমে এল। আমরাও মাস্তুলের দ্বিতীয়াংশে খাটান প্রত্যেকটি পালের গোটান অংশ খুলে দিলাম, তার উপরের পাল খাটান হল। সাতটা ঘণ্টায় যখন সকলে প্রাতরাশের জন্য একত্র হল আমরা অন্য গোটান পালগুলিও ছড়িয়ে দিলাম, পালের দড়িতে কপিকল বেঁধে ত্রিকোণ পালটিও টাঙ্গালাম।

বস্টন ছাড়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ক্যাপ্টেন বিবাহ করেছিলেন, সুতরাং এই দীর্ঘ দু বছর অদর্শনের পর তিনি যে পাল খাটাবার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন এতে আর আশ্চর্য কি। মেটও সাহসে পশ্চাৎপদ হবার পাত্র নন। দ্বিতীয় মেট একটু ভীতু প্রকৃতির, বেশী পাল টাঙ্গাতে ইতস্তত ভাব, আবার এদিকে ক্যাপ্টেনের ভয়েও ভীত। দোটানায় পড়ে ওঁরই হত সবচেয়ে দেরী। আমরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি ত্রিকোণ পালের দণ্ড খাটিয়ে ফেললাম। আমাদের সকলের মনেই দেশে ফেরার তাড়া,

সকলেরই ইচ্ছা জাহাজের গতি অব্যাহত থাকুক। এ রকম ইচ্ছার আরো একটি কারণ ছিল। জাহাজে স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। একজন মাল্লা এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে তার আর কাজ করার অবস্থা ছিল না। ইংরাজ মাল্লা বেনের পা ও মুখ অসম্ভব ফুলে উঠেছিল, বেচারার হাঁটা চলা এমন কি খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ—তাছাড়া ওর সমস্ত শরীরের মাংসের নমনীয়তা একেবারে নষ্ট হয়ে আসছিল, কোথাও হাত দিয়ে টিপলে সেখানটায় গর্ত হয়ে যেত। দিন দিন তার অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠছিল যে উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে সে যে এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাবে এ একেবারে নিঃসন্দেহ। ওষুধপত্র সব শেষ, কিন্তু থাকলেও যে বিশেষ উপকার হত তা নয়, কেননা এ রোগের একমাত্র ঔষধ সরেস সতেজ উদ্ভিজ্জ ও বিশুদ্ধ জল-বাতাস। আজকাল এই রোগের প্রকোপ তত নেই, এর কারণ বেশীদিন বাসি ও নোনতা খাবার খাওয়া, অপরিচ্ছন্নতা, অধিক তৈলাক্ত জিনিস ব্যবহার এবং কুঁড়েমি। শেষোক্ত কারণটির জন্য যে মাল্লাদের এই রোগ হতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। আমরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতাম, অনেক ভদ্রব্যক্তির চেয়ে আমরা পোশাক পরিবর্তনের ব্যাপারে ছিলাম বিশেষভাবে সচেতন। খুব সম্ভব বাসি ও লবণাক্ত খাবার খাওয়ার জন্যই এই রোগের উৎপত্তি। খুব তাড়াতাড়ি জলবায়ুর পরিবর্তনও এর একটা কারণ হতে পারে।

অন্য মাল্লাদের মধ্যে স্কার্ভি সংক্রামিত হবার আশঙ্কা ছিল। অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হলে টাটকা সবজি পাওয়া যেতে পারে এই আশায় ক্যাপ্টেন বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে চললেন—শরৎকালের পশ্চিমে হাওয়ায় আমাদের ঠেলে নিয়ে চলল।

রবিবার ১১ই সেপ্টেম্বর। ৩০°০৪´ উত্তর অক্ষাংশ, ৬৩°২৩´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। বারমুডা উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে এক শ পঞ্চাশ মাইল। পরদিন সকাল দশটায় একটি জাহাজ দেখতে পাওয়া গেল। আমরা সকলে এই আগন্তুককে দেখতে ছুটে এলাম। কাছে আসতে দেখা গেল একটি সাধারণ পাঁচ-মিশালী আকৃতির জাহাজ দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছে, সম্ভবতঃ উত্তরের রাজ্য থেকে আসছে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গন্তব্যস্থান। আমরা ঠিক এই রকমটিই চেয়েছিলাম। আমরা কথা বলতে ইচ্ছুক দেখে ওরা দাঁড়াল—আমরা মাঝের পাল পিছিয়ে দিলাম। ওদের সঙ্গে নিম্নলিখিত বাক্য বিনিময় হল।

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" "নিউ ইয়র্ক, চলেছি কিউরাসোয়া।" "বাড়তি খাবার হবে নাকি?" "নিশ্চয়, নিশ্চয়, প্রচুর আছে।" তৎক্ষণাৎ আমাদের নৌকা নেমে গেল। ক্যাপ্টেন চার জন লোক নিয়ে তাতে আরোহণ করলেন। নৌকা যখন ফিরল তাতে টাটকা আলু ও পেঁয়াজ বোঝাই। তারপর দুই জাহাজ যে যার পথে চলে গেল। জাহাজটির নাম সোলোন, প্লিমাউথের জাহাজ—খাদ্যদ্রব্য, খচ্চর ইত্যাদি নিয়ে চলেছে স্পেনিশ মেন। পেঁয়াজগুলি খুবই সতেজ, আমাদের যে মাল্লারা নৌকা নিয়ে গিয়েছিল তাদের বলা হয়েছে মেয়েরা বিশেষভাবে নাকি আমাদের কথা স্মরণ করেই এই পেঁয়াজের মালা গেঁথেছে। আমরা গত বছর শীতকালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবরটা জানবার জন্য উৎসুক ছিলাম। আমাদের ক্যাপ্টেন সেকথা জানতে চাওয়ায় ওরা উত্তর দেয় অ্যান্ড্রু জ্যাকসন আবার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। বৃদ্ধ সেনাপতি কি বার বার তিনবার নির্বাচিত হবেন? কথাটা আমাদের বিশ্বাস হল না। ওদের আবার প্রশ্ন করায় ওরা রসিকতা করে উত্তর দেয় জ্যাক ডাউনিং নূতন প্রেসিডেন্ট। আমাদের এ ভুল ভাঙ্গতে দেরী হয়েছিল।

আমাদের এক জো নামে সহকর্মী ছিল, তার খুব হামবড়াই করা স্বভাব। তাকে নিয়ে একবার বেশ মজা হয়। যে জাহাজ অথবা নাবিক যত বেশী দিন ধরে সমুদ্রযাত্রা করে দূরে দূরান্তরে গেছে তাদের খাতির তত বেশী।

জলপথে চীন বা ভারতবর্ষ যাওয়াটা সকলের ঈর্ষার বস্তু। উত্তর পশ্চিম উপকূলে, রুশ আমেরিকার কলম্বিয়া নদীতে মূল্যবান চামড়া ও লোম সংগ্রহ করতে যাওয়াটাও কিছু কম লোভনীয় নয়। কিন্তু সমুদ্রপথে চীন অতিক্রম করে পৃথিবী পর্যটনের কাছে আর কিছু লাগে না। অন্য জাহাজটির চ্যাপটা মুখো গম্ভীর চেহারার মেট রেলিঙে ঝুঁকে আমাদের নৌকার মাল্লাদের জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কোথা থেকে আসছ সব?" জো তৎক্ষণাৎ বলে উঠল "উত্তর-পশ্চিম উপকূল।" "কি মাল আনলে?" জটিল প্রশ্ন। জো দেরী না করে হেঁয়ালীতে জবাব দিলে, "এই চামড়া, টামড়া।" এই শুনে মেট খুব নীরস কণ্ঠে বলে উঠল "আর দু-চারটে শিং—কি বল হে?" নৌকায় অন্য মাল্লারা হেসে উঠল। জো'র মহিমা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, স্যাম নামে পিলগ্রীমের এক মাল্লা এক ক্যাপ্টেনের গল্প করত—তাঁর জাহাজটি যেমন

ছোট, মনও তেমনি ক্ষুদ্র। তিনি জাহাজ নিয়ে লিভারপুল থেকে নিউইয়র্ক আসছেন, পথে এক বিরাট ভারতগামী জাহাজের সঙ্গে দেখা—তারা দেশের পথে ফিরছিল। দু দিকে প্রসারিত হালকা হাওয়ার পাল, রোদে পোড়া তামাটে বর্ণ মাল্লাদের দল, দড়িতে একটা বাঁদর ও টিয়াপাখী। এদের সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেই বৃথাগর্বী ক্যাপ্টেন তবু এদের খবরাখবর নিতে গেলেন, "জাহাজের নাম কি ?" সরু অস্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন। গমগমে গলা শিঙার মধ্য দিয়ে ভেসে এল—"ক্যান্টন থেকে আসছি, বস্টনের দিকে, নাম 'ব্যাশো'। এক শ দশ দিন সমুদ্রে। তোমরা কোথাকার ?" "শুধুই লিভারপুল থেকে, মহাশয়" ক্যাপ্টেন ক্ষমাপ্রার্থীর মত দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন। সমুদ্রে দুই জাহাজের মধ্যে বাক্য বিনিময়ের নিয়ম যাদের জানা আছে তারাই এর রসিকতাটা বুঝবে। সমুদ্রে কোন জাহাজ অন্যকে মহাশয় বলে সম্বোধন করে না। 'শুধুই লিভারপুল' বললেই যথেষ্ট বলা হয়েছিল।

ইতোমধ্যে আমাদের নৈশ আহারের সময় হয়ে গিয়েছিল। ষ্টুয়ার্ড কেবিনের জন্য কিছু পেঁয়াজ তুলে নিয়ে বাকিটা আমাদের রাখতে দিল, সঙ্গে এক বোতল সিরকা। আমরা সেগুলি জমা করে রেখে দিলাম। পেঁয়াজগুলি আমরা রুটি মাংসের সঙ্গে কাঁচাই খেলাম। বহুদিন বাদে সতেজ খাদ্যের স্বাদ পেয়ে আমরা যেন নবজীবন লাভ করলাম। এতদিন ধরে কেবল নোনতা বাসি খাবার খেয়ে খেয়ে আমাদের বিস্বাদ রসনায় কাঁচা পেঁয়াজের মাটির স্পর্শ বড়ই উপভোগ্য লাগল। আমরা যেন পেঁয়াজের লোভে পাগল হয়ে উঠলাম। রক্তের স্বাদ পাওয়া বন্য জন্তুর মত আমরা রাশি রাশি পেঁয়াজ খেতে লাগলাম। খাবার সময় ছাড়াও পকেটে করে পেঁয়াজ নিয়ে ঘুরতাম—যখন তখন চিবোতাম। পেঁয়াজের পাহাড়টি খুব তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। তাজা খাবার অবশ্য মুখ্যতঃ রোগী দুজনের জন্য আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বেশ কাঁচা আলু ও কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারছিল কিন্তু অন্য জনের চিবোবার মত অবস্থা ছিল না। রাঁধুনী আলুগুলি কাঁচা থেঁতো করে তার রস খেতে দিল। একটু একটু করে চামচে করে তার মুখে রস দেওয়া হতে লাগল। প্রথম ঢোক খেয়েই তার সমস্ত শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল কিন্তু কেবলমাত্র মনের জোরে লোকটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই রস এক চামচ করে খেয়ে অনেকটা নষ্ট শক্তি

পুনরুদ্ধার করতে পারল। মুখ খোলার মত অবস্থা হতেই ওকে আলু ও পেঁয়াজ ছেঁচে দেওয়া হতে লাগল। ক্রমে ওর খিদে বাড়তে লাগল—স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা দিল—সালোন জাহাজের সঙ্গে দেখা হওয়ার দশ দিনের মধ্যেই সে আবার ভাল হয়ে উঠে মাস্তুলে চড়ার উপযোগী হয়ে গেল।

আমরা নির্বিবাদে দক্ষিণ পশ্চিম হাওয়ায় হাওয়ায় বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলাম। নাবিকদের মধ্যে প্রচলিত একটি ছড়ায় বলে বারমুডা অবধি যদি ঝড়ের সাক্ষাৎ না পেয়ে থাক তবে হ্যাটেরাস পোঁছতে পোঁছতে আর রক্ষা নেই। কিন্তু আমরা হ্যাটেরাসও পার হলাম নির্বিঘ্নে। এবার আমরা গুণতে লাগলাম বস্টনে পোঁছতে আর কত ঘণ্টা বাকি।

অন্তরীপ পার হবার পর থেকেই আমরা মহোৎসাহে জাহাজের সাজসজ্জা ঠিক করতে মন দিয়েছিলাম। রবিবার ছাড়া অন্য সব দিন একনাগাড়ে কাজ চলত।

স্থলবাসী অনেকের ধারণা জাহাজ যাত্রা করার সময় যেমন সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে ফেরার সময় আবহাওয়ার অত্যাচারে বুঝি সে সব একেবারে নষ্ট হয়, পাল ছিঁড়ে ঝুলে পড়ে। কিন্তু একথা একেবারেই ঠিক নয়। পথে বিপদ আপদ না ঘটলে অথবা বন্দরে শীতকালে না পোঁছলে জাহাজের সাজসরঞ্জামের কোনই বিকৃতি ঘটে না—বরং উন্নতিই দেখা যায়। শীতকাল হলে ডেকে কাজ করার অসুবিধা, কিন্তু সাধারণতঃ উষ্ণ মণ্ডল অতিক্রম করার সময় সুন্দর নির্মল দিনগুলি মাল্লারা জাহাজের কাজ করে কাটায়। বন্দর ছাড়ার সময় ডেকে মাল টানাটানি জনিত ময়লা, দড়াদড়িতে যত্রতত্র গেরো বাঁধা, কাছিগুলি ঢিলেঢালা—নাবিকের চোখে এর কোনটাই জাহাজের গুণবাচক নয়। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার শেষে—ভারতবর্ষ থেকে অথবা হর্ণ অন্তরীপের অপরপার থেকে ফেরার সময়—জাহাজের সজ্জা থাকে একেবারে নিখুঁত। বন্দরে ভিড়বার সময় জাহাজের আকৃতির উপর ক্যাপ্টেনের সুনাম দুর্নাম অনেকাংশে নির্ভর করে। আমরা সামনে পিছনে যাবতীয় দড়াদড়ি টান করে বেঁধে, রং করে, মাস্তুল ঠিকমত খাড়া করে, জাহাজের আদ্যোপান্ত ধুয়ে মুছে, ঘষে মেজে, জলের কাছ অবধি রং করে, শিকল থেকে মরচে তুলে, গলুই-এর উপর ত্রিশূলধারী অশ্বচালিত রথে উপবিষ্ট বরুণদেবকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করলাম। জাহাজের ধাতুনির্মিত অংশে যে শৃঙ্গাকার পাত্র খচিত ছিল সেটি আবার সোনালী রং করা হল।

মাস্তুলের আগা থেকে নীচে অবধি যেখানে যেমন রঙ দেওয়া প্রয়োজন, মাস্তুলের উপরে সাদা, পালদণ্ডে কালো, জাহাজের পাশের দিকে সবুজ; নোঙর ও অন্যান্য লোহাতে আলকাতরা দেওয়া হল। পিতলের অংশগুলি স্টুয়ার্ড ঘষে চকচকে করে তুলল। কেবিন পরিষ্কার করে রং ও বার্নিশ করা হল, আমাদের বাসস্থানটি পরিষ্কৃত হল বটে তবে মাল্লাদের জন্য বার্নিশের ও রং করার প্রয়োজন কি? ডেক পরিষ্কার করে যাবতীয় অদরকারী জিনিসে আগুন লাগিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল—সেগুলি সমুদ্রের জল আলোকিত করে জ্বলতে থাকল, এর উপর থাকে দড়িদড়ার উপর বিভিন্ন কাজ—একসঙ্গে দড়ি গোছা করে বাঁধা, পাকিয়ে জোড়া দেওয়া, গেরো বাঁধা। বন্দরে পৌঁছবার ঠিক আগে সর্বশেষ কাজ শিকল নোয়ানো, নোঙর উঠিয়ে গলুই-এর কাছে আনা, কাছিগুলো মাঝের ডেক থেকে সরিয়ে এনে তৈরী রাখা।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর। আবহাওয়ার গতিক, জলের চেহারার পরিবর্তন ও সমুদ্রে ভাসমান উদ্ভিজ্জ দেখে বোঝা গেল আমরা উপসাগরীয় স্রোতে এসে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল অদূরে মেঘের প্রাকার। এই স্রোত উত্তর-পূব দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রায় অতলান্তিকের এপার থেকে ওপার অবধি বিস্তৃত। এই অঞ্চল সর্বদাই মেঘাবৃত, এখানে ঝড় জল লেগেই থাকে। পাল তোলা জাহাজদের এখানে এসে হঠাৎ প্রবল হাওয়ায় পড়ে পাল গুটিয়ে ফেলতে হয়। একজন নাবিকের মুখে শুনি তারা একবার জিব্রাল্টার থেকে বস্টন যাবার পথে উপসাগরীয় স্রোতে পৌঁছেছে—সুন্দর হাওয়া, মেঘশূন্য আকাশ, জাহাজে হালকা হাওয়ার পাল তোলা। এমন সময় সামনে দেখা গেল জলের উপর বহুদূর বিস্তৃত এক কালো মেঘের শ্রেণী—তার পিছন থেকে একটি পাল গোটান জাহাজ এগিয়ে আসছে। এদের জাহাজ যতই সেই মেঘের মালার দিকে অগ্রসর হতে লাগল ততই একটির পর একটি ক'রে পাল গুটিয়ে ফেলতে হল। প্রায় বারো চোদ্দ ঘণ্টা উত্তাল সমুদ্র আছাড়ি পিছাড়ি খাবার পর যখন ওরা মেঘের জাল থেকে বেরিয়ে পড়ল তখন আবার আবহাওয়া আগেকার মত নির্মল। আমাদের জাহাজও ক্রমশ দুর্যোগের সম্মুখীন হতে লাগল। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। স্রোতের বিপরীত দিক থেকে বাতাস, ফলে জলে ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি হল। দোলানির জন্য মাস্তুলের চতুর্থ

অংশের পালদণ্ড খুলে দিলাম আমরা। দুপুরের দিকে তাপমান যন্ত্রে দেখা গেল জলের উত্তাপ সত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইট—হাওয়ার চেয়ে উত্তাপ অনেক বেশী। উপসাগরীয় স্রোতের মধ্যভাগের জল বেশ উষ্ণ। মাস্তুলের উপরে যে ছেলেটি কাজ করছিল সে অসুস্থ বোধ করে নীচে নেমে বড় নৌকাটির চারপাশে একবার পায়চারি করল, কিন্তু সেকথা উচ্চ কর্মচারীকে বলতেও লজ্জা হচ্ছিল। আবার উপরে উঠল বেচারা কিন্তু পরক্ষণেই নেমে এসে রেলিং ধরে আনাড়ী মহিলা যাত্রীদের মত বমন করতে লাগল। ছেলেটি কয়েক বছর সমুদ্রে আছে, কখনো সমুদ্রপীড়া হয়নি। এখন একে সমুদ্রের প্রচণ্ড দোলানি তার উপর মাস্তুলের একেবারে ডগায় দোলানি আরো বেশী করে অনুভূত হয়। এক অভিজ্ঞ নাবিকও মাঝের পালদণ্ডে কাজ করতে করতে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল স্বীকার করল আমাদের কাছে। একজনকে উপরের পালদণ্ডে পাঠান হল, কিন্তু সেও নেমে আসতে বাধ্য হল। তখন আমাকে পাঠান হল। খানিকক্ষণ বেশ কাজ করার পর আমারও আরম্ভ হল সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি। বস্টন ছাড়ার পর প্রথম দুদিন ছাড়া আমি সমুদ্র পীড়ায় আর আক্রান্ত হইনি, কত রকম অবস্থায় পড়েছি কিন্তু কখনো অসুস্থ হয়ে পড়িনি। দু ঘণ্টা লাগল কাজ শেষ করতে, তারপর নামতে পারলাম। জাহাজ এমন অসহায় ভাবে দুলছিল, পালগুলি দিয়ে কোন মতেই স্থির রাখা যাচ্ছিল না। মাস্তুলের সরু হয়ে আসা ডগা দিয়ে আকাশে অর্ধচন্দ্রাকার বৃত্ত অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করেই পরক্ষণেই সোজা হয়ে ওঠা যে কি অস্বস্তিকর ব্যাপার—দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে মাস্তুল চেপে ধরতে হচ্ছিল। পরক্ষণেই আবার হেলতে আরম্ভ করল। ডেকে ফিরে মনে হল যেন মাটির বুকে পা দিলাম। তবে ঠিক অসুস্থ হইনি আমি। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা উপসাগরীয় স্রোত অতিক্রম করলাম। বাঁ দিকে উত্তর আমেরিকার কূলের দিকে সূর্য অস্ত গেল—আমরা সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে মেঘের রাজ্য পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম।

॥ ৩৬ ॥ ইয়াঙ্কি ভূমির জয় ॥

শুক্রবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর। ৩৮° উত্তর অক্ষাংশ, ৬৯° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। ফুরফুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে হাওয়া। প্রতি মুহূর্তে আমরা দেশের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি, কেবল প্রত্যাগমনের ক্ষণটি নিয়ে আলোচনা চলছে। সন্ধ্যার পাহারায় দুই দলই জড় হয়, জল্পনা কল্পনা চলে, আমরা ঠিক কোনখানে ভূমি স্পর্শ করব, রবিবারের আগে পৌঁছতে পারব কি না, বস্টন শহর কেমন দেখাবে, গির্জায় যাব, বন্ধুবান্ধব, মাইনে পাওয়া ইত্যাদি কত কি। সকলেরই মনে আনন্দ, জাহাজের লৌহশাসন অনেকটা শিথিল, কেন না স্বেচ্ছায় যেখানে কাজ হয় সেখানে কটুবাক্যের প্রয়োজন হয় না। বহুদিন একসঙ্গে থেকে যে সব বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল সেসব কোথায় অদৃশ্য হল—এখন সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণ সখ্যভাব বিরাজ করছে। যে দুজনের মধ্যে প্রায় হাতাহাতির সম্পর্ক ছিল তারাও একত্রে বসে আগামী দিনগুলির কথা বলাবলি করে। মেট ঘোষণা করলেন কাল দুপুরের আগেই আমরা জর্জের কূলে পড়ব। মাল্লাদের সঙ্গে হাসি তামাশায় যোগ দিয়ে মেট বললেন আমাদের সঙ্গে পরে দেখা করবেন উনি, এমন কি ঘোড়ার গাড়ী করে মার্বলহেডও নিয়ে যেতে পারেন।

শনিবার, ১৭ই। হাওয়া এত মন্দগতি যে আমরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর হাওয়া উঠল, আমরাও দ্রুতবেগে কূল অভিমুখে যেতে লাগলাম। আমরা আশা করছিলাম ছটা নাগাদ জাহাজ দাঁড় করিয়ে জলের গভীরতা মাপা হবে, কুয়াশার একটা জাল আসতে দেখে বোঝা গেল মহাদেশীয় ভূভাগ আর বেশী দূরে নেই, কিন্তু তখনো থামাবার আদেশ হল না। অগত্যা আটটার সময় পাহারার দল নীচে গেল। পরের এক ঘণ্টা কালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দু পাশের হালকা পাল মেলে জাহাজ ক্রমাগত ধেয়ে চলল। ক্যাপ্টেন ডেকে এলেন দুটো ঘণ্টার সময়, মেটকে কি যেন বলতেই পাল গুটিয়ে জলমাপা দড়ি ফেলার জন্য প্রস্তুত করা হল। মাস্তুল থেকে কোনাকুনি ভাবে লাগান পালদণ্ডে একজন চড়ল, হাতে দড়ির ভারযুক্ত আগা, আরেক জন নোঙর বাঁধা দণ্ডে গোটান দড়ি নিয়ে—এইভাবে

জলমাপা দড়ির বিভিন্ন অংশ গুটিয়ে সকলেই তৈরী। "সব প্রস্তুত", "হ্যাঁ।" "তবে ফেলে দাও" "সামাল, সামাল, হোশিয়ার।" উপরের দণ্ডের লোকটি চিৎকার করেই দড়ি ছুঁড়ল জলে। প্রত্যেকে হাতের দড়ি ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একবার করে চেঁচিয়ে উঠল "সামাল, সামাল, হোশিয়ার।" দড়ির শেষ প্রান্ত থাকে মেটের হাতে। আশী ফ্যাদম অবধি দড়ি নেমে গেল, কিন্তু কোথায় তল? সেণ্ট পীটার গির্জার সমান উচ্চতা! দড়িটি আবার তুলে ফেলা হল, তিন চার জনে মিলে সেটি গুটিয়ে রাখল। আবার সব পাল খুলে জাহাজ চলতে আরম্ভ করল। চারটের ঘণ্টায় আর একবার আগের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। এবার ষাট ফ্যাদমে জমি পাওয়া গেল। কি আনন্দ! কি আনন্দ! জয় হোক ইয়াঙ্কিদের দেশের। আমরা হাতে হাতে দড়ি তুলে ফেললাম। ক্যাপ্টেন আলোর কাছে পরীক্ষা করে দেখলেন তলায় কালো কাদা লেগে। সমস্ত রাত অল্প পালে জাহাজ চলল। হাওয়া আস্তে আস্তে কমে এল।

আমেরিকার উপকূলের মহাসাগরীয় ঢাল সর্বত্র এত সমান যে কোন নাবিকের পক্ষে দড়ির নীচের মাটি পরীক্ষা করে যথাযথ ভাবে স্থান নির্ণয় করা কিছুই কঠিন নয়। কালো মাটি থাকলে ব্লক দ্বীপ, ন্যানটুকেটের দিকে যেতে যেতে গাঢ় রঙের বালি, তারও পরে বালি ও তার সঙ্গে সাদা ঝিনুক। জর্জের কূলে পাওয়া যায় সাদা বালি। আমরা মাটি পরীক্ষা করে দেখলাম ব্লক দ্বীপের কাছে আছি, সুতরাং এবার গতি হবে পূর্বমুখী—ন্যানটুকেট শোল হয়ে দক্ষিণ চ্যানেল। কিন্তু হাওয়া বন্ধ হয়ে আমরা এক কুয়াশার বিস্তারের মধ্যে বন্দী হয়ে গেলাম। সমস্ত শনিবার কাটল এইভাবে।

রবিবার, ১৮ই। যদিও কুয়াশায় দৃষ্টি চলে না তবু গণনা করে দেখা গেল ব্লক দ্বীপ থেকে উত্তর-পশ্চিম $\frac{1}{4}$ পশ্চিম পনেরো মাইল।

জাহাজের কাজকর্ম সারা হতে আমরা স্নান করে নীচে এলাম। যে যার বাক্স খুলে পুরোনো, ছেঁড়া ও অদরকারী জামাকাপড় জলে ছুঁড়ে ফেলে কি পোশাক পরে কূলে নামা হবে তাই নিয়ে গবেষণা হতে লাগল। দীর্ঘ ষোলো মাস যে পশমী টুপি মাথায় পরে কাঁচা চামড়া বহন করেছি সেগুলি সবচেয়ে আগে পরিত্যক্ত হল, অন্তরীপের দুর্যোগে যে মোটা প্যাণ্ট, তালি মারা দস্তানা ও মোটা জামা কাজ দিয়েছিল সব সমুদ্রগর্ভে মহানন্দে বিসর্জন দেওয়া হল। দুঃসময়ের সাক্ষী এই সব সামগ্রী রেখে দেওয়ার মত বিড়ম্বনা

আর নেই। কূলে নামবার জন্য বাক্স গুছিয়ে আমরা প্রস্তুত। এবার শেষ-বারের মত রবিবারের বিশেষ মিষ্টান্ন আহার করে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে কথাবার্তা কইতে লাগলাম যেন নোঙর ইতোমধ্যে ফেলা হয়ে গেছে।

"আজ থেকে এক হপ্তা পরে কে আমার সঙ্গে গির্জা যেতে চাও ?"

"আমি যাব" জ্যাক বলে উঠল। সব কিছুতেই ওর হ্যাঁ বলা অভ্যাস।

"দূর হ, নোনাজল" বললে টম" ডাঙায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ কান বন্ধ করে ছুট লাগাব—নোনা জলের ত্রিসীমানায় আর নয়।"

"আরে রাখ, রাখ। তুমি ছাড়া পেলেই সোজা গিয়ে ঢুকবে বার্ণের শুঁড়িখানায়, তারপর তিন দিন আর চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখতে হবে না।"

"না হে না। আমি নেশার দিকে আর যাচ্ছি না, একেবারে বাড়ী, শেষে আমাকে সাধু ভেবে কোথাও পাঠিয়ে না দেয়।"

হ্যারি হোয়াইট দিব্যি দিয়ে বললে মাইনের টাকায় যে কটা দিন চলে ও ট্রেমণ্ট হাউসে ভদ্রলোক হয়ে কাটাবে।

কুয়াশা পরিষ্কার হবার অপেক্ষায় সকলে দাঁড়িয়ে। তখন এই জাতীয় আলোচনা হচ্ছিল।

রাত্রের দিকে একটু হাওয়া দেখা দিল, কুয়াশা কিন্তু এতটুকু ফিকে হল না, আমরা পূব দিক লক্ষ্য করে যেতে থাকলাম। প্রথম বারের পাহারার পালা চলেছে, হঠাৎ সামনের দিক থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল "হাল ঘোরাও, হাল ঘোরাও"—মনে হল কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। সত্যিই তাই। কুয়াশার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক বিশাল জাহাজ, আমরা পরস্পরের গা ঘেঁষে চলে গেলাম। আমাদের পাল ছড়াবার বড় দণ্ডটি ওদের পিছন দিকের উঁচু পাটাতন ছুঁয়ে গেল। আমাদের ডেক থেকে কোনমতে একবার হাঁক দিয়ে ওদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হল। ওরা ব্রিস্টল সম্বন্ধে কি যেন বলতে বলতে আবার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। সম্ভবতঃ রোড আইল্যাণ্ডের তিমি-শিকারী জাহাজ। সমস্ত রাত আমরা কুয়াশা ভেদ করে আন্দাজে এগোতে লাগলাম। প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর জল মাপা হতে লাগল। মাটি কালো থেকে ক্রমে বালি হয়ে গেল, অর্থাৎ ন্যানটুকেট দক্ষিণ শোলে পৌঁছেছি। সোমবার সকালে জলের গাঢ় নীল রং আর ঝিনুক মেশানো বালি দেখে বুঝলাম প্রণালীতে প্রবেশ করে আমরা জর্জের কূলের কাছাকাছি এসেছি। আমরা পরম নিশ্চিন্তে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে

উত্তর দিকে চললাম। গত দুদিন যাবৎ অবস্থান নির্ণয় না করে আমরা শুধু সমুদ্রতলের মাটি দেখে চলেছি। সারা দিন হাওয়া এত ঢিমে যে বিরক্তিকর মনে হয়, আটটার সময় একটা জেলে জাহাজ বল্লে গেল আমরা এখন প্রায় চ্যাথামের কাছে। মাঝরাতের ঠিক আগে স্থলবায়ু আরম্ভ হল, আমরাও জোরে জোরে এগোলাম। চারটের সময় আমরা রেশ অন্তরীপের সমীপবর্তী হয়েছি মনে করে নিশানার জন্য কামান দাগতে আরম্ভ করলাম। আমাদের পাহারার দল ছুটি পেয়ে নীচে গেল, কিন্তু উপরে মুহুর্মুহুঃ কামানের শব্দ—আমাদের ঘুম কিছুতেই এল না। ঘুমের জন্য আমরা কেউই ব্যস্ত হইনি, কেন না যদি বস্টন উপসাগরে প্রবেশ করে থাকি আর কপাল ভাল থাকে তবে কাল পরম নিশ্চিন্তে সমস্ত রাত ঘুমোনো যাবে, প্রত্যেক চার ঘণ্টায় আর পাহারার হাঁক পড়বে না।

ভোর হতেই আমরা নিজে থেকে উপরে উঠে গেলাম ডাঙার দর্শন পাবার আশায়। সকালের কুয়াশা ভেদ করে একটি দুটি ছোট মাছ-ধরা জাহাজ দেখা যাচ্ছিল। রোদ উঠতে দেখি আমাদের বাঁ দিকে কড অন্তরীপের বালির পাহাড়, সামনে বিস্তৃত ম্যাসাচুসেটস উপসাগর। এখানে ওখানে পাল ঝিকমিক করে উঠছে। যত বন্দরের মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম জাহাজের সংখ্যাও বাড়তে লাগল, কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, বন্দরে অবিরাম কর্মব্যস্ততা। বিজন উপকূলে অল্প জাহাজ দেখা আমাদের অভ্যাস, আমাদের চোখে এই দৃশ্য যেন অপূর্ব লাগল। যা দেখি তাই ভাল লাগে। উপকূলে চলাচলকারী ছোট জাহাজ, সমুদ্রগামী বড় জাহাজ, বহু দূরে অ্যান অন্তরীপের কাছাকাছি একটি বাষ্পচালিত পোতের ধোঁয়া জলের উপর কালো দাগের সৃষ্টি করেছে। নির্বাসন থেকে আবার সভ্যদেশে, স্বগৃহে ফিরে আসছি, আমাদের চারিদিকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য; ঐশ্বর্যের চিহ্ন—কোহাসেটের পাথুরে জমি, সাদা পোশাক পরা শান্ত্রীদের মত আলোকস্তম্ভ, হিংহ্যামের সমতলে চিমনির ধোঁয়া আস্তে আস্তে সকালবেলার আকাশে উঠছে। এই অঞ্চলের একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে ছিল। পরিচিত পাহাড়ে জমি দেখে তার মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দশটার সময় একটি নৌকায় করে পথ প্রদর্শক আমাদের জাহাজে এলেন—নৌকাটি তারপর বন্দরে প্রবেশকারী অন্য জাহাজগুলির দিকে চলে গেল। আমরা টেলিগ্রাফে সঙ্কেত পাঠালাম। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আগমন বার্তা ঘোষিত হয়ে

গেল। জাহাজের মালিক, ব্যবসায়ী ও অ্যান স্ট্রীটের দালালরা জেনে গেল যে হর্ণ অন্তরীপ ঘুরে মূল্যবান মাল নিয়ে একটি জাহাজ দেশে ফিরছে। জাহাজের মাল্লারাও নেমেই দু বছরের মাইনে পাবে।

হাওয়া অত্যন্ত মৃদু। আমরা দড়াদড়ির ঘষা বন্ধ করার জন্য যেসব কাঠের টুকরো প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় সেগুলি খুলে ফেললাম। শেষ কালে আমাকে সাদা রঙের বালতি নিয়ে উপরে উঠতে হল হালকা পালের দণ্ড রং করতে। আমি মাঝের দড়াদড়ি অবধি সব রং করে ফেললাম। দুপুর বেলা আমরা তরঙ্গহীন জলে নীচের আলোকস্তম্ভটির কাছে থেমে গেলাম। এমন সময় হিংহ্যামের দিক থেকে বন্দুকের শব্দ পাওয়া গেল। পথপ্রদর্শকের কাছে জানা গেল ওখানে সৈন্য পরিদর্শন হচ্ছে। হিংহ্যামের ছেলেটি খেদ করে বললে জাহাজ আর বারো ঘণ্টা আগে নোঙর ফেললে ও এতক্ষণ ওখানে বেশ ফূর্তি করতে পারত। এখন অবস্থার যা গতিক, রাত্রের আগে কোনমতেই পৌঁছতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। দুটোর সময় পশ্চিমে হাওয়া উঠল, আমরাও এই সুযোগে এগোতে লাগলাম। আমার দুটো থেকে চারটে হালে থাকার পালা, এই নিয়ে আমার সবসুদ্ধ প্রায় এক হাজার ঘণ্টা হালে থাকা হল। আবার জোয়ারের উলটো টানে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে আরো অনেকগুলি জাহাজ বন্দরের দিক থেকে সমুদ্রের দিকে আসতে দেখলাম। তাদের মধ্যে একটি পাল তুলে যেন মত্ত ঘোড়ার মত ছুটে চলে গেল। মাল্লারা সব ছুটোছুটি করে পাশের পালদণ্ড ঠিক করছে। সন্ধ্যার সময় এলোমেলো হাওয়া, একবার মাস্তুলের চতুর্থ অংশের পাল গোটান আর একবার খোলা হল। আমাদের কেবল মাস্তুলের মাথায় ওঠানামা করতে হচ্ছিল, যখন যেমন আদেশ হচ্ছে পাল গোটাচ্ছি, আবার খুলছি। রেনসফোর্ড দ্বীপ ও দুর্গের মধ্যে পাঁচবার উপরের পালটি খোলা বন্ধ করা হল। এখানে প্রণালীটি এত সঙ্কীর্ণ যে মাস্তুলের সঙ্গে লাগাও পালদণ্ড থেকে রেনসফোর্ড দ্বীপের বাড়ী, পথ ঘাট, হাসপাতাল প্রভৃতি আমার খুব কাছে মনে হচ্ছিল। জর্জ দ্বীপের দুর্গপ্রাকারের এত কাছে আমরা ছিলাম যে ইচ্ছা করলে একটি কামানের গোলায় আমরা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেতে পারতাম। দুর্গটির অবস্থান সুন্দর, সন্দেহ নেই।

আমরা সন্ধ্যাবেলা শহরে নামব ঠিক করে আছি, কিন্তু জোয়ার বিরূপ। পথপ্রদর্শক মহাশয় পালের কোণ বেঁধে ফেলে নোঙর নামাতে

আদেশ দিলেন, সান ডিয়াগো ছাড়ার এক শ পঁয়ত্রিশ দিন পরে আমরা আবার ভূমি স্পর্শ করলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সমাপ্তি, পাল গুটিয়ে আমাদের জাহাজ বস্টন বন্দরে স্থির, চারিদিকে পরিচিত দৃশ্য, স্টেট হাউসের গম্বুজ পশ্চিম আকাশে ধূসর হয়ে এল, অন্ধকার নেমে আসতেই আলো জ্বলে উঠল নগরের পথে ঘাটে, নটার সময় ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। বস্টনের মাল্লারা তার মধ্যে কোনটি কোথাকার শব্দ চেনবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমাদের পাল গোটান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছোট্ট প্রমোদতরী এসে জাহাজের গায়ে লাগল। জাহাজ কোম্পানির একজন অংশীদার মিঃ হুপার লাফিয়ে উঠে এলেন। আমি পিছনের মাস্তুলের মাঝখানের পালদণ্ড থেকে ওঁকে দেখেই চিনলাম। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দন করে মিঃ হুপার কেবিনে গেলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি মেটের কাছে আমার খোঁজ করতে লাগলেন। ওঁর সঙ্গে আমার যখন শেষ দেখা হয় তখন আমার পরনে হারভার্ডের ছাত্রের পোশাক, আর এখন ওঁর সামনে যে ব্যক্তি উপস্থিত হল তার রোদে পোড়া তামাটে রেড ইণ্ডিয়ানদের মত চেহারা, লম্বা চুল, পরনে মাল্লাদের প্যাণ্ট ও লাল জামা। আমরা করমর্দন করলাম। উনি আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কুশল সংবাদ। সেকথা শুনে আমি ওঁকে অন্তরের থেকে ধন্যবাদ জানালাম। পরিচিত প্রিয়জনেরা কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। প্রথম দেখা হতেই যে সুসংবাদ দিলেন সেজন্য এঁকে আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে।

ক্যাপ্টেন নৌকা করে শহরে গেলেন, আমাদের আর এক রাত্রি কাটল জাহাজে। সকালে জোয়ারের টানে ভিতরে যাওয়া হবে।

উৎসাহে, উত্তেজনায় সেদিন আমরা খাবার স্পর্শই করলাম না। যারা এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা করে ফিরছে তারা সারা রাত জেগে কাটাল। আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। এক বছর আগে যদি বস্টনে পেঁছিবার কথা হত আমি আশায় উন্মাদ হয়ে উঠতাম, কিন্তু এতদিনের আকাঙ্ক্ষার অবসানে, দেশে ফিরে কেমন যেন অবসাদ অনুভব করলাম। সমস্ত উত্তেজনা যেন হঠাৎ লোপ পেয়ে গেল।

আর একজন নাবিকের কাছে অনুরূপ কাহিনী শুনেছিলাম। অল্পবয়সে সে দেশ ছাড়ে। পাঁচ বছর সমুদ্রে কাটে, সেই দীর্ঘ সময় সে কেবল দেশে ফেরার কথা ভেবে কাটিয়েছে—কিন্তু সত্যই যখন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন এল সে জাহাজ থেকে এক লাফে নেমে পড়া ইত্যাদি এতদিন যা ভেবেছিল তার কিছুই করল না। সকলে জাহাজ থেকে নেমে চলে গেল। সে কেমন যেন নিস্পৃহ ভাবে জামা কাপড় বদলে মাল্লাদের ঘরে নিজের বাক্সের উপর বসে চুপচাপ ধূমপান করতে লাগল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল এই ঘরে কতদিন কাটিয়েছে। এখন সঙ্গীরা কেউ নেই। এতদিন বাদে তার হঠাৎ মন কেমন করতে লাগল। বাড়ীর চিন্তা স্বপ্নের মত মনে হল। শেষে ওর ভাই এসে ওকে টেনে তুলে যখন বললে সকলে ওর জন্য প্রতীক্ষা করছে, তখন ওর চমক ভাঙ্গল। অনেক দিন ধরে প্রতীক্ষা করার মধ্যে একটা উন্মাদনা আছে। সেটা শেষ হলেই একটা ক্ষণিক অবসাদের ভাব আসে, আমারও হয়েছিল তাই। দৌড়াদৌড়ি করে কাজ, জাহাজে কর্মতৎপরতা, বন্দরে প্রবেশ করা, চারিদিকের দৃশ্য ক্রমে দেখতে পাওয়া ইত্যাদির পরে হঠাৎ যেন সব বড় বেশী চুপচাপ, বড় বেশী স্থির। একটা নতুন কিছু ঘটনা না ঘটলে বোধহয় আমার এই জড়ত্ববোধ ঘুচবে না। পরদিন সকালে যখন ডেক ধোয়া, কামান ভর্তি করা, পাল ঢিলে করা, কপিকল লাগানো ইত্যাদি সব কাজ মহা উৎসাহে আরম্ভ হল আমিও আবার প্রাণ ফিরে পেলাম।

দশটার সময় সমুদ্রের হাওয়া বইল। পথপ্রদর্শক আদেশ দিলেন, জাহাজ খোলো। সেই শেষবার সান ডিয়াগো থেকে নোঙর তোলার সময় যে উল্লাসধ্বনি শোনা গিয়েছিল আবার তার পুনরাবৃত্তি। নিশান উড়িয়ে, কামানের গর্জন তুলে আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। জাহাজ ঘাটে নোঙর ফেলা মাত্র ডেকে লোকে লোকারণ্য। শুল্ক বিভাগের কর্মচারী, তেলের কারবারী, মাল্লাদের বন্ধুবান্ধব, হোটেলের দালাল—যে যার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। নাবিকদের হাতে এই সময় প্রচুর টাকা, কাজেই কুপরামর্শ দেবার জন্য অসৎ সঙ্গীর অভাব হয় না। দুজন লোক আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, তারা নাকি আমার পূর্বপরিচিত, তারা আমার জিনিসপত্র

অবিলম্বে ঠেলাগাড়ীতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর, যদি নামতে দেরী থাকে তাহলে তারা আমার সঙ্গে একত্র মদ্যপানে ইচ্ছুক। কোন মতে এদের হাত এড়িয়ে আমরা পাল গোটাতে লেগে গেলাম। কত ঝড়, জল, দুর্যোগে, সুসময়ে, দুঃসময়ে পাল গুটিয়েছি—আজ শেষ বারের মত হাত পড়ল পালে। আমাদের সমবেত চিৎকারে নর্থ এণ্ড কেঁপে উঠল। নোঙর তুলে কাঠের যন্ত্রে দড়ি পাকান হল, আমরা ডকে নেমে টানতে টানতে জাহাজটা ঘাটে আনলাম। শেষ বার যখন দড়ি বাঁধা হচ্ছে তখন শহরের ঘণ্টাধ্বনি কানে এল। মাল্লাদের ছুটি দেওয়া হল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যালার্ট জনশূন্য, কেবল কোম্পানির কার্যালয় থেকে একজন রক্ষী এসে জাহাজের ভার গ্রহণ করল।

॥ পরিশিষ্ট ॥

আমার কাহিনী যাঁরা শেষ অবধি ধৈর্য ধরে পড়লেন আশা করি উপসংহারে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্যটুকুও তাঁদের মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না।

সমুদ্র যাত্রা শেষ করার বহুদিন পরে এই অধ্যায়টি আমি লিখছি, আমার পূর্বের জীবিকায় ফিরে আসার পর এবং আমার সমুদ্রবক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে মাল্লাদের সম্বন্ধে করণীয় কি কি আছে সে বিষয়ে আমার মতামতগুলি এই অবসরে নিবেদন করতে চাই।

সমুদ্রের রোমাঞ্চ সম্বন্ধে বহু লোকই কৌতূহলী, তবে আমার কাহিনীতে আমি আগাগোড়া এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছি যে একজন সাধারণ মাল্লার দৈনন্দিন জীবনে রোমাঞ্চের কোনই অবকাশ নেই। স্থলবাসীদের মতই গতানুগতিকতায় ভরা তাদের দিনগুলি। একই রকম পরিশ্রম, একই রকম একঘেয়েমি। আমার বর্ণনা পড়ে যদি কারো এই ধারণা না হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারিনি।

সমুদ্র নিয়ে রচিত গল্প, গাথায় সমুদ্রের রহস্যময় দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়। তরুণ মনের কাছে একটি নাবিকের পোশাক বা জাহাজের দৃশ্য অপূর্ব মোহের জাল রচনা করে। এই মোহের বশবর্তী হয়েই দলে দলে তরুণ নাবিক রূপে যোগদান করে, বাণিজ্যপোতগুলিতে কর্মীর অভাব হয় না। আমি এমন একটি সমুদ্র পাগল ছেলেকে চিনি যার জাহাজের কাঠের টুকরোর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনলেই মন চঞ্চল হয়ে উঠত, তার আর ডাঙায় থাকতে মন চাইত না। স্কুল পালিয়ে ছোট ছোট ছেলেদের কত সময়ই দেখা যায় ডেকে ঘুরে বেড়াতে। তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে অনুমান করা কঠিন নয় তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কোন পথে যাবে। নবীন মাল্লা কাজে যোগদান করার পর আরম্ভ হয় মোহভঙ্গের পালা। তখন মায়া কাজল সরে যায়, দেখা যায় শেষ পর্যন্ত এ-ও সেই খাটুনি আর পরিশ্রম, রহস্য বা রোমাঞ্চের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই। মাল্লাদের জীবনের সত্যকার ছবিটি আমাদের খুলে

ধরা উচিত। বইয়ে বা সভা সমিতিতে "নীল সমুদ্রের ডাক", "নাবিকের সুনীল পোশাক" "মহাসমুদ্রে ঈশ্বরের স্পর্শ" ইত্যাদি আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ না করে যদি বিষয়টার সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয় তবে আমার মনে হয় তরুণ নাবিকদের যথার্থ উপকার করা হবে। এখন প্রশ্ন হল, মাল্লাদেরও ভরণ-পোষণ প্রয়োজন, জ্ঞানদান করা প্রয়োজন, ধর্মশিক্ষার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই সবগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার মতামত নিচে লিপিবদ্ধ করা গেল।

প্রথমতঃ জাহাজে সমতার কোন কথাই উঠতে পারে না। মানুষের বর্তমান চরিত্র যেমন তাতে সর্বজনে অভেদভাব একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। মাল্লারা কখনও এজন্য অনুযোগ করে না। আমাকে যদি সারা জীবন নাবিকবৃত্তি করতে হত আমিও চাইতাম না ক্যাপ্টেনের শক্তি বিন্দুমাত্রও খর্ব হোক। জাহাজে একজন লোকের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আপদ বিপদের সময় মুহূর্তের মধ্যে মন স্থির করে কাজ করতে হবে, তখন পরামর্শ করে নষ্ট করার মত সময় কোথায়? যাঁরা ক্যাপ্টেনের পরামর্শদাতা ক্যাপ্টেন আবার তাঁদের প্রভুও বটে। পৃথিবীর সর্বত্র, এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও প্রয়োজনের সময় ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে। সেটা আপাতদৃষ্টিতে ভয়ানক মনে হলেও রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। জাহাজের ব্যাপারটাও অনেকটা তাই। ক্যাপ্টেন এটা করবেন না সেটা করবেন না বলা চলে না, এবং বলা উচিতও নয়। ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব প্রচণ্ড, ক্ষমতাও প্রচণ্ড, বোধহয় সভ্য দেশে আর কোন ব্যক্তিকে এতটা কর্তৃত্বক্ষমতা দেওয়া হয় না। তবে ক্যাপ্টেন যেন প্রয়োজন বুঝে তার প্রয়োগ করেন এবং নিজের কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। অন্যথায় অবিচার হওয়া অনিবার্য।

অধীনস্থ কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য যে কোন সাধারণ নাগরিকের মত ক্যাপ্টেনও দণ্ডনীয় হতে পারেন। হত্যা, পীড়ন, শাসন, অনাহারে রাখা প্রভৃতি অপরাধের জন্য ক্যাপ্টেন পাঁচ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা এক হাজার ডলার পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। এ বিষয়ে বর্তমানে যা আইন আছে তাই যথেষ্ট, কিন্তু আইনগুলি

যথাস্থানে প্রয়োগ করাটাই প্রকৃত প্রশ্ন। অস্বস্তিকর হলেও বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

যেহেতু বহুজনের ধনপ্রাণ-রক্ষার গুরুভার ক্যাপ্টেনের উপর অর্পিত সেহেতু তাঁর ক্ষমতা লাঘব করা অনুচিত। কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাও থাকা উচিত এরূপ মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ মাল্লারা তাদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে নানা রকম অতি ভাষণ করে একথা যেমন সত্য তেমনি এটাও মনে রাখা উচিত যে দরিদ্র মাল্লাদের পক্ষে হয়ে কখনো কেউ সাক্ষী পর্যন্ত দেয় না। তাছাড়া তাদের অনুযোগ বহুলাংশে সত্য।

সাক্ষ্য প্রমাণ প্রসঙ্গে বলা চলে ক্যাপ্টেনের যে অবস্থা, মাল্লাদেরও তাই। জাহাজে যাত্রী থাকলে ক্যাপ্টেন মাল্লাদের সঙ্গে সাধারণতঃ সদয় ব্যবহার করেন। এর দুটি কারণ। প্রথম, যাত্রীদের চোখে নিজেকে বড় করা। দ্বিতীয়, যাত্রীরা যাতে তাঁর নিষ্ঠুরতার সাক্ষী না হতে পারে। যদিও যাত্রীদের সামনে উচ্চ কর্মচারীরা নানা ভাবে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা করেন কিন্তু নিম্ন কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করতে বড় একটা সাহস করেন না। কিন্তু দীর্ঘকালের সমুদ্র যাত্রায়, যখন জাহাজে যাত্রী থাকে না তখনই মাল্লারা সম্পূর্ণরূপে ক্যাপ্টেনের কবলগত, এবং আইন ছাড়া আর কেই বা তখন তাদের রক্ষক হতে পারে। এইসব যাত্রায় এমনও নিষ্ঠুরাচরণ হয়েছে যে শুনলে বুক কেঁপে ওঠে, মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে ইচ্ছা করে না। এই সব বহু কাহিনী চিরকাল মানুষের অগোচরেই থেকে যাবে। যদি না প্রলয়ের দিন সমুদ্রতল থেকে মৃতদেহগুলি উঠে প্রমাণ দেয়। নায্য কারণেই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কত যে বিদ্রোহ, যুদ্ধ, রক্তপাত জাহাজে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যদি এই সব ঘটনা আদালতে উপস্থিত হলে মাল্লাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য না দেওয়া হয় তবে ক্যাপ্টেনের স্বেচ্ছাচারিতা সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

তাছাড়া একথাও বিবেচনা করা উচিত যে ডাঙায় ফেরার পর মাল্লাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের যে সামাজিক বৈষম্য শুধু তাতেই সুবিচার অনেক সময় ব্যাহত হয়। মাল্লাদের বিভিন্ন দোকানী, ব্যবসাদার, দালাল ও জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে নৈতিক অবনতি ঘটে এবং তারা সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হলে তাদের বেশ সন্দেহের চোখেই দেখা হয়। অপর পক্ষে, ক্যাপ্টেনের

প্রতিপত্তিশালী বন্ধুবান্ধব, তাঁর চালচলন অভিজাত, যদিও তাঁর বিদ্যার দৌড় মাল্লাদের থেকে সামান্যই বেশী এবং বিবেক বলে কোন বস্তু নেই।

মাল্লাদের সাক্ষ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে লাভ নেই, এটা বিচারক ও জুরীদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। মাল্লাকে দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে উপস্থিত সকলের কি মনে হতে পারে সেটাই এখানে গুরুতর প্রশ্নরূপে দেখা দিচ্ছে। সমস্ত জল্পনা কল্পনা কিন্তু শেষ অবধি একই জায়গায় এসে থেমে যাচ্ছে—মাল্লাদের নৈতিক মান উন্নত করতে হবে, তার ধর্মবোধ ও মেধা জাগ্রত করার সুযোগ দিতে হবে। মানুষ হিসাবে সে যখন সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে তখন তার কথারও মূল্য বাড়বে। অন্যায় অত্যাচার দেখলে অনেকে তৎক্ষণাৎ যেন তেন প্রকারেণ তার প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই ব্যাপারে হঠাৎ জনসাধারণের পক্ষ. থেকে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হলে অন্য দোষগুলি আপনা থেকেই কেটে যাবে।

জাহাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করাও কোনক্রমেই সমীচীন নয়। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, ঘুমের সময় ইত্যাদির পরিবর্তন প্রয়োজন বটে, কিন্তু সেগুলি ক্রমে ক্রমে ভিতর থেকেই পরিবর্তিত হওয়া ভাল। আমি আশা করি এই সকল ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি হতে বিশেষ বিলম্ব নেই। জাহাজে যে অপরিসর, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে গর্তের মধ্যে দশ বারোজন মানুষকে বছরের পর বছর কাটাতে হয় তা দেখলে স্থলবাসীরা শিউরে উঠবেন। খাদ্যদ্রব্যও কোনমতে শরীর রক্ষা করার মত, তার অধিক কিছু নয়।* ঘুমের

---

* আমার এই কাহিনীতে কোথাও নাবিকদের ভোজন পদ্ধতি বর্ণনা করেছি বলে মনে হয় না। নাবিকরা টেবিল, চেয়ার, ছুরি, কাঁটা, থালা প্রভৃতি ব্যবহার করে না। দুই দিকে আংটাযুক্ত একটি কাঠের গামলা ঘিরে সকলে বসে যে যার নিজের ছুরি দিয়ে মাংস কেটে নেয়। এক কোয়ার্ট পরিমাণ টিনের পাত্র থেকে তারা চা পান করে।

এই ব্যবস্থায় মাল্লাদের পক্ষে সুবিধাই হয়, সেজন্য এটাকে ঠিক কষ্ট বলে মনে করা হয় না। প্রথমতঃ টেবিলের জন্য জায়গার অকুলান, দ্বিতীয়তঃ কাঁটা চামচ, থালা, বাটি প্রভৃতি সাজাতে ও পরে তুলে ফেলতে প্রচুর সময় যায়, তৃতীয়তঃ মাল্লাদের আহার বলতে শুধু বড় এক খণ্ড মাংস। সেজন্য কাঠের গামলাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। গামলাটি বেশ পরিষ্কার থাকে। আমার ধারণা ছিল মাল্লাদের জীবনের এই দিকটা

অভাবে তাদের শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে পড়ে। অনেক সময় প্রয়োজন বশেই অসময়ে মাল্লাদের ঘুম থেকে উঠতে হয়। কিন্তু বাণিজ্যপোতে মাল্লাদের দুর্যোগ না থাকলেও সারা দিন ডেকে কাজ করাতে বাধ্য করা হয়। রাত্রে একনাগাড়ে আট ঘণ্টা করে পাহারা। কখনো একসঙ্গে চার ঘণ্টার বেশী এদের ঘুম হয় কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষ করে যখন কোন জাহাজ দেশে ফিরে আসে, পথে বিপদ আপদ না থাকা সত্ত্বেও মাল্লাদের চেহারা থাকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত। মাল্লাদের কাছে পরিপূর্ণ রাত্রির নিদ্রার মত বিলাস আর কিছু নয়। স্থলে থাকার এই একটি প্রধান মোহ। যাই হোক অন্যায় উৎপীড়ন হলে তৎক্ষণাৎ সেটা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা প্রয়োজন, এবং ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের সহানুভূতি মাল্লাদের প্রতি জাগ্রত হলে আশা করা যায় এই সব ব্যাপারের মীমাংসাও সহজ হবে। জাহাজে উচ্চ কর্মচারী ও মাল্লাদের বাসস্থান আলাদা হওয়াই সঙ্গত। মাল্লারা নিজেদের জায়গায় ইচ্ছামত গল্পগুজব করাই পছন্দ করে, কিন্তু তাদের থাকবার স্থানটি আরো একটু বড় ও ভাল হলে তাদের আর অনুযোগ করার থাকে না।

মাল্লাদের আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধেও আইন আছে। সেই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জাহাজের নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখার কথা এবং মাল্লাদের অকারণে আহার ও নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করলে ক্যাপ্টেন আইনের চোখে অপরাধী বলে গণ্য হবেন। এর বেশী আর কিছু বলা এখানে অনুচিত। কখন মাল্লাদের শাস্তি দেবার জন্য খাবার কমিয়ে দেওয়া হবে বা রবিবারের মিষ্টান্নটুকু বাদ দেওয়া হবে সে সব ক্যাপ্টেন বিবেচনা করবেন। তবে আমার মনে হয় এরকম করা খুবই অন্যায়।

জাহাজের আইন ও শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—সেটি হল শারীরিক দণ্ড দেওয়ার নিয়ম। এই নিয়ে আজকাল আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে, অনেকে শারীরিক দণ্ডের ঘোর বিরোধী। আমার কাহিনীর পাঠকের মনে থাকতে পারে আমি একটি

সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু কয়েক মাস আগে একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীকে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম ঘটনাটি যখন ঘটে তখন মাল্লারা কি টেবিল পরিত্যাগ করেছিল? ভদ্রলোক নাবিকদের বহু মোকর্দমা করেন বলে প্রসিদ্ধ।

নিষ্ঠুর অত্যাচারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি—তারপর থেকেই প্রহার কথাটি শুনলেই আমার সর্বশরীর গরম হয়ে উঠে। কিন্তু যদি কেউ শারীরিক দণ্ড বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেন তাহলে আমিও দ্বিধায় পড়ব এবং এই প্রস্তাব কাজে পরিণত হলে তার পরিণাম সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করব না। যাঁরা এই সম্বন্ধে বলছেন বা লিখছেন তাঁদের উদ্দেশ্য যদি হয় জনসাধারণকে শারীরিক দণ্ডের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া তবে তাঁদের কিছু বলার নেই, কিন্তু কাল যদি আমাকে একটি জাহাজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে হয় তবে আমি কোন মতেই চাইব না যে আমার অধীনস্থ মাল্লারা জানুক আমি তাদের কোন অবস্থাতেই শারীরিক দণ্ড দিতে অক্ষম। আমার এই সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন মাল্লাদের নিয়ে কাজ করা খুবই দুরূহ হবে। আশা করি আমাকে কখনো কাউকে শারীরিক দণ্ড দিতে হবে না এবং আমি যৎপরোনাস্তি সেটা না দেওয়ারই চেষ্টা করব। কিন্তু তাই বলে আমার স্বার্থ রক্ষা অথবা আত্মরক্ষার জন্য এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার থাকবে না এটা খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি। তেমন অবস্থায় পড়লে আমার কি উপায় হবে? এজন্য অনুরূপ অবস্থায় আমি নিজেও যেমন পড়তে চাই না তেমনি চাই না অন্য কেউ পড়ুক।

ক্যাপ্টেন ও উচ্চ কর্মচারীদের অসুবিধা সম্বন্ধে সচরাচর জনসাধারণ চিন্তা করেন না, মাল্লাদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী শুনেই তাঁরা সহানুভূতিতে গলে যান। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের বাণিজ্যপোতের মাল্লাদের তিন চতুর্থাংশই বিদেশী। ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ইতালীয় ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়াও উত্তর ইউরোপ থেকে বহু লোক মাল্লার কাজে নাম লেখায়। এছাড়া আছে নিগ্রো ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী। ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজ থেকে বিতাড়িত মাল্লারাও আমাদের এখানে আশ্রয় নেয়। আমাদের স্বদেশীয় মাল্লাদের অধিকাংশেরই এ পথ অবলম্বন করার কারণ কোন না কোন অপরাধে তারা স্বদেশভূমি থেকে নির্বাসিত।

মাল্লাদের অতীত সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ কিছুই জানেন না। এরূপ অপরিচিত একদল কর্মী নিয়ে ক্যাপ্টেন সমুদ্রে ভেসে পড়েন। তাদের মধ্যে বোম্বেটে বা অসৎ প্রকৃতির লোক থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। একজন দুষ্ট ব্যক্তির অন্য সকলকে প্রভাবান্বিত করতে বেশীক্ষণ লাগে না। আর

বিদেশী মাল্লারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ভাষা একবর্ণও বোঝে না। তাদের সারাজীবন জোর যার মুলুক তার এই নিয়মে কেটেছে, তারা আশৈশব ছুরির ব্যবহারে অভ্যস্ত। যতই শান্তিপ্রিয় হোন না কেন, কোন বিচক্ষণ ক্যাপ্টেনই পিস্তল ও হাতকড়া ছাড়া যাত্রা করার কথা ভাবেন না। মিশ্র প্রকৃতির মাল্লাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়, এবং দৈহিক দণ্ড দেওয়া এসব ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। এখন এসব ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেনের কর্তব্য কি সেটার পরিবর্তে ক্যাপ্টেনের লঘু দণ্ড দেওয়ার অধিকারও একেবারে কেড়ে নেওয়া উচিত কিনা সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয়। বর্তমান আইন অনুসারে পিতামাতা সন্তানকে এবং মালিক শিক্ষার্থীকে অল্প দণ্ড দিতে পারেন, অনুরূপভাবে জাহাজের কর্তার হাতেও অল্প দণ্ড দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত কারণ ঘটলে ক্যাপ্টেন সামান্য শারীরিক দণ্ড দিতে পারেন একথা আইনপুস্তকে বলা হয়েছে। বিচারকদের মতামত এবং বিধিবদ্ধ আইন—এ বিষয়ে সকলেই একমত। যদি লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে থাকে তবে ক্যাপ্টেন যথারীতি আদালতে আনীত হবেন, অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিচার হবে এবং বিচারকরা স্থির করবেন অপরাধের তুলনায় শাস্তির পরিমাণটা বেশী হয়েছিল কি না।

আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। আগে যেমন বলেছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা ক্রমে পরিবর্তিত হবে এবং যা হবে সেটা মঙ্গলের জন্যই। হঠাৎ আইন করে এ বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনা সমীচীন হবে না। মাল্লাদের চারিত্রিক এবং নৈতিক উন্নতি হলে তাদের উপর অত্যাচারও কমবে এবং উচ্চ কর্মচারীদের মান উন্নত হলে তাঁরাও অকারণে উৎপীড়ন করবেন না। তাছাড়া বুদ্ধিমান এবং সভ্য লোকেদের উপর অত্যাচারও জনসাধারণের দ্বারা কিছুতেই সমর্থিত হতে পারে না। বিচারক ও জুরীরা জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। যদিও শারীরিক দণ্ড সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত বিরূপ অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতি আমার অনুরোধ, দণ্ড দেওয়ার প্রথা আইন করে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা যেন এই প্রথাটি ধীরে ধীরে নিজে হতেই যাতে লোপ পায় সেদিকে সচেস্ট হন। এমন দিন আসবে যখন মাল্লাদের শারীরিক দণ্ড দেওয়াটা অত্যন্ত বর্বর প্রথা বলে মনে করা হবে। কিন্তু আইন করে সেই দিনের আগমন ত্বরান্বিত করা চলে না। বরং এখন

যেমন চলছে, তেমনই চলুক—শাস্তির কারণ বিবেচনা করে দেখা হোক, প্রয়োজনের চেয়ে অধিক দণ্ড হচ্ছে কিনা সে দিকেও দৃষ্টি রাখা হোক।

মাল্লাদের প্রতি সুবিচার প্রসঙ্গে আমি এখানে একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে বিচারকের বা জুরীর রায় প্রকাশ হবার পর পুনর্বার আবেদনের একটা প্রথা আছে। আবেদনে বলা হয় অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবার তার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, তাছাড়া তার পূর্বেকার জীবনে সে সর্বদাই সৎপথে থেকেছে ইত্যাদি। সুতরাং এই সব বিবেচনা করে যেন তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। এই আবেদনগুলিকে আমি এত গুরুত্ব পেতে দেখেছি যে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধহয় এবং মাল্লাদের উপর এটা গুরুতর অবিচার। ক্যাপ্টেনের পরিচিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমনকি বাল্যবয়সের সঙ্গীরা অবধি এসে শপথ করে বলেন ইনি পিতা হিসাবে, পুত্র হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, স্বামী হিসাবে, প্রতিবেশী হিসাবে একজন আদর্শ ব্যক্তি। তারপর জাহাজের মালিক, বীমা কোম্পানির অধ্যক্ষ ইত্যাদি সকলেই ক্যাপ্টেনের চরিত্রের মহৎ গুণগুলি সম্বন্ধে বলেন। এই সব সাক্ষীরা প্রত্যেকেই ভদ্রবংশীয়, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদের সাক্ষ্যের মূল্য সহজেই অনুমেয়। এদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে জন কয়েক অপরিচিত দরিদ্র মাল্লার সাক্ষ্যকে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জন বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। জুরীরা মনে করেন ক্যাপ্টেনের হাতে দণ্ডিত হয়ে এরা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

তার পরে ক্যাপ্টেনকে আদালতের সামনে এক অতি দীন ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করা হয়। তাঁর সমস্ত পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাঁর উপর। তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা, অবলা অসহায়া স্ত্রী ও নাবালক বালক বালিকাদের ভরণপোষণের ভার কে নেবে। ভাল করে উপস্থাপিত করা হলে বিচারকদের হৃদয় দ্রব না হয়ে পারে না।

আমার মনে হয় এই প্রথার বিপক্ষেও কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ ক্যাপ্টেনের চরিত্র। প্রায় সকল ক্যাপ্টেনকেই মাল্লা রূপে জীবন আরম্ভ করতে হয়েছে। নীচ বংশোদ্ভূত লোকেরা হাতে হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষমতা পেলে যে কি রকম আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় সে কথা অনেকে জানেন। অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর বহু ক্যাপ্টেনকে স্বগৃহে স্নেহময় স্বামী ও পিতা রূপে আমি জানি। তবে ক্যাপ্টেন বাড়ীতে বিশেষ থাকেন না। যে অল্প কদিন

থাকেন আত্মীয় বন্ধুদের মধুর সাহচর্যে দিন কাটে—সুতরাং তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হবেন এ আর বেশী কি। তাঁর কোম্পানির মালিকদের কাছেও তিনি অন্য ব্যক্তি—কেন না এদের দয়ার উপর তাঁর অন্ন নির্ভর করছে। সুতরাং এদের সাক্ষ্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়াও ঠিক নয়।

ক্যাপ্টেনের দারিদ্র সম্বন্ধে প্রধান আপত্তির বিষয় এই যে প্রত্যেক কর্মচারীরই ঘরে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় পরিজন, বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন—যাঁরা একমাত্র তাঁদের উপার্জনের উপর নির্ভর করে থাকেন। তাঁদের সমুদ্রে কাজ নেওয়ার কারণই তাই—স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে যখন সমস্ত দিক বিবেচনা করে গুরুদণ্ডাদেশ দেওয়া গেছে তখনই এই অর্থাভাবের অজুহাত দেখান হয়। কিন্তু কই, স্থলে সংঘটিত কোন অপরাধের সময় তো একথা বিবেচনা করা হয় না? কেবলমাত্র জাহাজের উচ্চ কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই কেন এই পক্ষপাত? আর তা ছাড়া যদি অর্থাভাবের প্রশ্নই ওঠে তবে মাল্লারা নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেনের চেয়েও দরিদ্র—কিন্তু তাদের দণ্ড দেবার সময় একথা কখনও বিবেচনা করা হয় না। আইনগত প্রশ্ন থাকলে সেগুলির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কিন্তু উপরোক্ত দুটি অজুহাতের জন্য মাল্লাদের সুবিচার পাবার আশা প্রায় সুদূর পরাহত।

মাল্লারা প্রভুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে সেটা অনেক সময় অবিশ্বাস করা হয় বা খানিকটা সন্দেহের সঙ্গে গ্রাহ্য হয়। এ সম্বন্ধে আমি কোন অভিযোগ করছি না। আমার বক্তব্য, যখন সকলকে চুলচেরা জেরা ইত্যাদি করে আদালত কোন বিষয়ের মীমাংসা নিশ্চিতরূপে করে ফেলেছেন তারপরেও কি করে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র ও বহু পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে তাঁর দণ্ড মকুব করা হয়?

জাহাজে মাল্লা নেওয়া, তাদের প্রতি আচরণ, তাদের আহার্য বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে আমার ইতিবৃত্তে নানা মন্তব্য করেছি, সে বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল নতুন মাল্লা ভর্তির ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই। ভর্তি করা সম্পূর্ণ ভাবে জাহাজ কোম্পানির গোমস্তার হাতে। এতে ক্যাপ্টেনের হাত থাকলে বহু অযথা বিড়ম্বনা কমে। আমাদের সংস্কার মিঃ স্টার্গিস, যিনি নিজেও একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন, সর্বদা মাল্লা

নেওয়ার সময় নিজে বেছে নিতেন। ফলে তিনি সব সময়ই স্বাস্থ্যবান ও সচ্চরিত্র প্রকৃতির লোক পেয়েছেন। মাল্লাদের স্বভাব চরিত্র কেমন, পরে তাদের নিয়ে গোলযোগ হতে পারে কিনা তাদের চেহারা ও বেশভূষা দেখেই বলা যায়। তা ছাড়া জাহাজ ছাড়ার আগের দিন—মিঃ স্টার্গিস তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস, জামা কাপড় ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা বলে আসতেন। এই পন্থা যদি সব ক্যাপ্টেন অবলম্বন করেন তবে মাল্লাদের অনর্থক হয়রানি বাঁচে এবং যাত্রাও সুন্দর ভাবে সকলের সদিচ্ছা নিয়ে শুরু হতে পারে।

দোষ ত্রুটি বার করা ছেড়ে এবার প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক। নাবিকদের উপকারের জন্য আজকাল জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় যে সব সংস্থা গড়ে উঠেছে তাঁদের কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। এঁদের মধ্যে আমেরিকান নাবিক-বান্ধব সমিতির কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে নাবিকদের পরিস্থিতির বহু উন্নতি হবে আশা করা যায়। এই সব সমিতির উদ্দেশ্য মাল্লাদের সুবিধা বর্ধন এবং তাদের ধর্মবোধ জাগ্রত করা। মদ্য পান নিবারণের জন্যও সমিতি আছে, তা ছাড়া পুস্তকাদি বিলি করে, সুলভে থাকবার মত হোটেল খুলে, এমন কি নাবিকদের জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করে এঁরা বহু হিত সাধন করেছেন। বাইবেল বিতরণ করাও এঁদের অন্যতম প্রধান কাজ। ধর্মশিক্ষা দেওয়াই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে অন্যান্য আনুসঙ্গিক উন্নতি ঘটতে বিশেষ দেরী হবার কথা নয়। ধর্মের প্রতি আসক্ত হলেই নাবিকরা লেখাপড়া, সৎপথে চলা এবং পাপকার্য বর্জন করতে শিখবে। ধর্মের প্রভাব এদের নৈতিক জীবনে অনস্বীকার্য। আমার নিজস্ব ধারণা মাল্লাদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত হতে না দিয়ে শুধুমাত্র তাদের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে অত্যন্ত অপকার সাধন করা হয়।

আমাদের বন্দরগুলি ছাড়াও বিদেশের বহু বন্দরে উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয়েছে, সেখানে নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয়। তবে নাবিকের জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটে সমুদ্রে, এজন্য তাদের বাইবেল ও সহজ ধর্মপুস্তক দিলে খুবই উপকার করা হবে। শুষ্ক, নীরস নীতিকথার চেয়ে গল্পের মত সহজ ধর্মপুস্তক, যাতে স্নেহময়ী জননী, ভাই বোন ও ঘরের কথা আছে—সেগুলি পড়ে অতি পাষাণচিত্ত নাবিকেরও মন নরম হয়। মাল্লারা বাইবেল

পুস্তকটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তোরঙ্গের সবচেয়ে নীচে রাখা থাকলেও ঐ বইটি সম্বন্ধে কখনো কেউ অবমাননাকর কথা বলে না। আমাদের জাহাজের একটি অতি অধার্মিক মাল্লা একবার একজনের কাছ থেকে বাইবেল গ্রন্থটি ধার চায়। সে দিতে অস্বীকার করে, বলে তুমি বাইবেল নিয়ে হাসি তামাশা করবে। সেই শুনে অপর ব্যক্তি বললে "কখনো না। ভগবানকে নিয়ে আমি হাসি তামাশা করি না।" নাবিকদের সকলের মধ্যেই এই ভাবটা আছে। সে জন্য ধর্মশিক্ষা এদের মধ্যে সহজেই প্রভাব বিস্তার করবে মনে হয়।

যদি ক্যাপ্টেন স্বয়ং মধ্যে মধ্যে উপাসনার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে নাবিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেরও প্রভূত উন্নতি হতে পারে। বিপদের আশঙ্কা অথবা আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে যদি সকলে একত্রে মিলিত হয়ে উপাসনা করেন তবে সকলেরই অন্তর ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে। গুডউইন নিজে যদিও নাস্তিক ছিলেন কিন্তু তাঁর একটি পুস্তকে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের সুন্দর বর্ণনা আছে। শিক্ষকের স্বভাব ছিল অত্যন্ত নিরানন্দ ও বিষণ্ণ। কিন্তু তিনি তাঁর ছাত্রের সঙ্গে একসঙ্গে ঈশ্বরের মহিমময় লোকে প্রবেশ করছেন এবং একই সঙ্গে তাঁর বিচারের আসনের সামনে উপস্থিত হবেন এই চিন্তায় তাঁকে ছাত্রের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। আর কিছুতে তাঁর হৃদয়ের এই পরিবর্তন হত কি না সন্দেহ। প্রভু ও অধীনস্থ মাল্লাদের সম্পর্ক সম্বন্ধেও একই কথা।

অনেক জাহাজে যাত্রা আরম্ভ হবার সময় উপাসনা হয় আজকাল। কিন্তু আমার দুই বছরের নাবিক জীবনে একদিনের জন্যও ঈশ্বরের নাম গান হতে শুনিনি। অনেক সময় আমাদের চিত্ত কোন কারণে গভীর ভাবে আলোড়িত হয়েছে। সে সময়ে উপাসনার প্রয়োজন ছিল, করলে হয়ত আমাদের সুকুমার অনুভূতিগুলি শুখিয়ে মরে যেত না, কিন্তু তাও কোন রকম প্রার্থনা করা হয় নি।

একজন ধর্মভীরু ক্যাপ্টেনের পক্ষে সমস্ত জাহাজের প্রকৃতি বদলে দেওয়া কিছুই কঠিন নয়। জাহাজে কেউ কাউকে খারাপ নামে ডাকতে পারে না। জাহাজে রবিবার দিন ছুটি। ক্যাপ্টেনের যদি এদিকে লক্ষ্য থাকে তবে প্রতি রবিবার তিনি মাল্লাদের বাইবেল পড়তে বাধ্য করতে পারেন।

যারা লেখাপড়া জানে না তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। ক্যাপ্টেনের ক্ষমতার জোরে জাহাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি বাণিজ্য পোতের ক্যাপ্টেন তাঁর নিজের সাম্রাজ্যের সর্বময় অধীশ্বর, তাঁর নামে জাহাজের নাম। বিদেশের বন্দরে ক্যাপ্টেনের নামেই জাহাজগুলি পরিচিত। জাহাজে যে সব অল্পবয়সী মাল্লারা থাকে তাদের মন এখনো সম্পূর্ণ গঠিত হয় নি—এটাই তাদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। যে সব বৃদ্ধ মাল্লারা জাহাজে থাকে তারা মৃত্যু আসন্ন জেনে ঈশ্বরের চিন্তা করতে চায়। সমুদ্রে ধর্মযাজক পাওয়া যায় না, সুতরাং তাদের এ বিষয়ে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। ধর্মভীরু এবং সদাশয় ক্যাপ্টেনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে মাল্লাদের উন্নতির পথ ততই সুগম হবে আশা করা যায়।

নাবিকদের জীবনের অন্যান্য যে সব কুকর্ম ও অবিচার অত্যাচারের কথা শোনা যায় সে সমস্তই ধর্মশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যাবে। এর ফলে জনসাধারণের চোখে মাল্লাদের সম্মান বৃদ্ধি হবে, আদালতেও তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হবে এবং জাহাজে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা হবে। অবশ্য এদের প্রবৃত্তি দমনের জন্য হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন সম্ভব, কিন্তু একমাত্র ধর্মশিক্ষার বিস্তারই সকল অন্যায় দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

যদিও বইটি আমি নাবিকদের প্রতি উৎসর্গ করিনি কিন্তু রচনার সময় অনুক্ষণ তাদের চিন্তা আমার মনে জাগ্রত ছিল। যদি মাল্লাদের কারো এই বইটি পড়ার সুযোগ হয় তবে তারা বুঝবে আমার বিশেষ ভাবে তাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। পাঠকের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের আগে আমার শুধু এইটুকু অনুরোধ তাঁরা যেন আমার সঙ্গের সাথী মাল্লাদের কথা প্রীতিভরে মনে স্থান দেন। এই বইটি যদি পাঠকের কিছুমাত্র মনোযোগ আকৃষ্ট করে থাকে তবে তার কারণ আর কিছু নয়, সমুদ্রের প্রতি আমাদের সাধারণ কৌতূহল, যা অতি সহজেই জাগ্রত হয়।

॥ চব্বিশ বছর পরে ॥

অ্যালার্ট নামে জাহাজটি কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন ক্যালিফোর্নিয়ার অজানা উপকূলে যাত্রা করে সানফ্রানসিস্কো উপসাগরের বিস্তীর্ণ বিজনতার মধ্যে প্রবেশ করে তখন ১৮৩৫-৩৬ সালের শীতকাল।

জনহীন, নিস্তব্ধ পরিবেশ। কেবল একটি রুশ জাহাজ নোঙর ফেলা ছিল। যতদিন আমরা ওখানে ছিলাম আর একটি জাহাজও দৃষ্টিপথে আসেনি। দূর দূরান্তের মঠগুলির সঙ্গে আমাদের ব্যবসা চলত, তারা রেড ইণ্ডিয়ান চালিত নৌকায় করে কাঁচা চামড়া পাঠাত। ইয়ার্বা বুয়েনা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ও ঐ নামেরই একটি ক্ষুদ্র উপসাগরের বাঁকের মধ্যে আমরা স্থান নিয়েছিলাম। উপসাগরের কূল কঙ্করময়। পশ্চিমে যতদূর চোখ যায় অনুর্বর বালিয়াড়ি, কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। আরও দূরে দীর্ঘ, খাড়া, তরুহীন গিরিশ্রেণী, বৃষ্টির জল পাথরের বুকে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। নোঙর স্থানের পাঁচ-ছয় মাইল দূরে ডানদিকে একটি ভগ্নপ্রায় দুর্গ, বাম দিকে তিন-চার মাইলের মধ্যে ডলোরাসের মঠ, তার অবস্থাও তথৈবচ। জন কয়েক রেড ইণ্ডিয়ান ছাড়া মঠে আর কেউ নেই, গৃহপালিত পশুও সংখ্যায় নগণ্য। বহু দূর অবধি জন বসতির লেশমাত্র ছিল না, কেবল একজন উৎসাহী আমেরিকাবাসী একটি কাঠের কুটির নির্মাণ করে নোঙরের জায়গার কাছেই ছোটখাটো ব্যবসা ফেঁদেছিল, জাহাজগুলি ও রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে খুচরা জিনিসের কারবার চালাত লোকটি। তার অন্য স্বদেশবাসীদের আগমনের বহু পূর্বেই তার এখানে পদার্পণ ঘটে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মাঝে মাঝে কুয়াশা এসে সমস্ত উপসাগর ঢেকে ফেলত, কুয়াশা কেটে গেলে দেখতাম পশ্চিমের অরণ্যাচ্ছাদিত দ্বীপ, বালির পাহাড়, পূর্বদিকের ঘাসে ঢাকা ঢালু জমি আর উপসাগরের দক্ষিণ দিকে বিস্তার। শুনতাম ঐ দিকে নাকি সাণ্টা ক্লারা ও সান জোসে মঠ অবস্থিত। আরো উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে উপসাগর ছোট ছোট শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, সেদিকে বহু বেগবতী নদী এসে সমুদ্রে পড়ছে। এই সব নদীতীর ও উপসাগর কূল প্রায় জনশূন্য বললেই চলে, অল্প কয়েকটি মঠ ও খামার ছিল, কিন্তু তারা পরস্পরের থেকে অত্যন্ত দূরে দূরে অবস্থিত। কেবল আমরা যেখানে নোঙর ফেলেছিলাম সে জায়গাটি নয়, উপসাগরের তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চলেই বিরাজ করত জনহীন স্তব্ধতা। ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে কোথাও কোন আলোকস্তম্ভ বা জাহাজদের নিশানা দেখাবার মত কোন চিহ্ন ছিল না। ইংরাজ, রুশ ও মেক্সিকোবাসীদের তৈরী পুরানো খাপছাড়া নকশা থেকে তৈরী হয়েছিল এ অঞ্চলের মানচিত্র। ভ্রাম্যমাণ পাখীর ঝাঁক আমাদের

চারিদিকে নেমে আসত, ওক গাছের অরণ্যে বিচরণ করত হিংস্র শ্বাপদ, আমরা যখন জোয়ারের সঙ্গে যাত্রা করলাম দলে দলে বন্য হরিণ কূলে এসে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে ভিড় করল।

শনিবার, ১৩ই আগস্ট, ১৮৫৯। বিরাট বাষ্পীয়পোত "গোল্ডেন গেট" সন্ধ্যাবেলা সানফ্রানসিস্কোর প্রবেশ পথে দেখা গেল—জাহাজে কত শত প্রাণোচ্ছল নর নারী, জাহাজের লাল, সাদা, সবুজ নিশানার আলোতে সমুদ্রবক্ষ মাইলের পর মাইল জুড়ে আলোকিত হয়ে আছে, যাত্রীদের থাকবার কামরাগুলি আলোয় ঝলমল করছে। সানফ্রানসিস্কো এখন এক পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য কেন্দ্র। বন্দর থেকে দূরে সমুদ্রবক্ষে অনুর্বর ফারালোনেস পাহাড়ের আলোকস্তম্ভ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহা শক্তিশালী রশ্মি, পৃথিবীতে তার তুলনা বিরল। স্বর্ণদ্বারের মধ্য দিয়ে আমাদের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে আরেকটি আলোকস্তম্ভ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত গ্রীষ্মের রাত, ক্যালিফোর্ণিয়ার আকাশ মেঘশূন্য। ডান দিকে দেখলাম প্রবেশ পথ ঘিরে উচ্চ প্রাকার, আর ক্ষুদ্র আলকাট্রস দ্বীপে একটি দুর্গ। আমরা সেই পুরানো চামড়া তোলার স্থানের দিকে গেলাম। উপকূল থেকে পিছনের গিরিশ্রেণী পর্যন্ত, মধ্যের বালিয়াড়ি ও উপত্যকা জুড়ে যেখানে চোখ যায় এক বিরাট শহরের আলোকিত পথঘাট, ঘর বাড়ী ঝলমল করছে। এই শহরে এক লক্ষ নর নারীর বাস। উঁচু ঘড়িঘর থেকে রাত বারোটার ঘণ্টা শোনা গেল, কিন্তু কামানে আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে সানফ্রানসিস্কো নগরী জেগে উঠেছে। এক পক্ষ পরে আবার অতলান্তিকের সংবাদ ও যাত্রী নিয়ে আর একটি জাহাজের আগমন হচ্ছে এই সমাচার শীঘ্রই নগরে ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় দ্রুতগামী পোত নদীতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে, জাহাজ-ঘাট ঘিরে আছে কত জাহাজ, শক্তিশালী বাষ্পচালিত পোতও দেখলাম, হাডসন ও মিসিসিপি নদীতে যেসব বৃহদাকার জাহাজ চলে আকারে ও চমৎকারিত্বে তাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। আমাদের কাছ থেকে চিঠিপত্র প্রভৃতি নিয়ে ঐসব জাহাজ সাক্রামেন্টো, সান জোকুইন ও ফেদার নদী বেয়ে অভ্যন্তরে চলে যাবে। সাক্রামেন্টো, স্টকসন ও মেরিসভিল শহর অবধি।

আমরা যে ডকে থামলাম সেখানে চারদিকের রাস্তায় ব্যস্ত লোকের আনাগোনা। মাল নেবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলা গাড়ী, যাত্রী বহন

করার জন্য গাড়ী এবং বন্ধুবান্ধবদের দর্শনাভিলাষে অগণিত লোকের ভিড়। সংবাদপত্রের মুখপাত্রেরা এবং আরো বহু লোক সমবেত হয়েছেন ইউরোপ ও পূর্ব উপকূলের সমাচার শোনার আশায়। ভিড় সরিয়ে আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম। সুন্দর সুগঠিত পথঘাট, মধ্যরাত্রেও যেন দিনের মত কর্মব্যস্ততা, ছোট ছেলেরা তীক্ষ্ণ সুরে হাঁক দিয়ে নিউইয়র্কের সংবাদপত্র বিক্রি করছে। রাত একটার পর ওরিয়েন্টাল হোটেলের প্রশস্ত কক্ষে শুতে গেলাম। পরে জেনেছিলাম আমরা এ্যালার্ট থেকে নৌকা করে কূলের যে অংশে এসে নামতাম হোটেলটি সেখানকার ঢালু জমির উপর নির্মিত।

রবিবার, ১৪ই আগস্ট। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে শহরের দিকে তাকালাম। সানফ্রানসিস্কো নগরীর অসংখ্য গৃহচূড়া, দোকান, আদালত, হাসপাতাল, নাট্যালয়—সংবাদপত্র, বিভিন্ন পেশায় কর্মরত নাগরিকমণ্ডলী, দুর্গ, আলোকস্তম্ভ, জাহাজ-ঘাট, বন্দর যেখানে আগত জাহাজের সংখ্যা লণ্ডন বা লিভারপুল বন্দরের চেয়ে বেশী, মার্কিন গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান নগরী এই সানফ্রানসিস্কো নবজাগ্রত প্রশান্ত মহাসাগরের মুখ্য বাণিজ্য বিপণী—আমি উপসাগরের উপর দিয়ে দৃষ্টিপাত করলাম, পূব দিকে কণ্ট্রা কস্টার অরণ্যময় উপকূলে সুন্দর শহর গড়ে উঠেছে, নানা আকারের জাহাজ, মালবাহী ও যাত্রীবাহী পোত, খেয়া নৌকা, দিকচক্রবালে তাদের ধোঁয়া ইত্যাদি দেখে আমার সেই আগেকার দিনগুলি স্মরণ পথে এল, দুইয়ের মধ্যে পরিবর্তন এতই বিস্ময়কর যে আমার মনে হল হয়ত এসব কিছুই সত্য নয়, আমি বোধহয় এক অসম্ভবের রাজ্যে এসে পড়েছি।

উপাসনা করার জন্য বহু স্থান, আমি ইচ্ছা করলেই স্বনির্বাচিত গির্জায় যেতে পারি। রোমান ক্যাথলিকদের একজন প্রধান আচার্য আছেন। একটি ধর্ম মন্দির ছাড়াও তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী, যথা ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ প্রভৃতিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গির্জা আছে। এপিস-কোপেলিয়ানদেরও ধর্মযাজক আছেন, ধর্মমন্দির ও তিনটি গির্জা আছে। মেথডিস্ট ও প্রেসবিটেরিয়ানদের গির্জার সংখ্যাও তিন চার—এছাড়াও আছে ব্যাপটিস্ট, ইউনিটেরিয়ান কংগ্রিগেশনালিস্ট ও অন্য ধর্ম সম্প্রদায়। গির্জায় যাবার পথে এক গৃহদ্বারে আমার দুই পুরাতন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা, তাঁরা

হারভার্ডে ছিলেন, এখন একজন শিক্ষকতা করেন ও অন্যজন ব্যবহারজীবী। খানিকদূর যাবার পর আর একজন পূর্ব পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তিনিও আমার হারভার্ডের সহপাঠী। লোকটি বড়ই আমুদে ও সদালাপী। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ খাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি অবিবাহিত এবং রবিবার দিন বেলায় ওঠা অভ্যাস। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম বিশপ কিপের গির্জা কোন দিকে? এই শুনে ভদ্রলোক কেমন থতমত খেয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন এই সব বিষয়ে তাঁর ধারণার একটু অভাব, তবে হয়ত রাস্তার শেষে ঐ কাঠের বাড়ীটি হতে পারে। সোনে পৌঁছে দেখি সেটি আফ্রিকাবাসী ব্যাপটিস্টদের মিলিত হবার স্থান। আমার বন্ধু অবশ্য অন্য দিকে লোক খুবই ভাল, তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

বিশপের গির্জায় উপাসনার জন্য যে সমাজ একত্র হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া বা বস্টনের অনুরূপ সমাজের কোন ভেদ দেখলাম না। এমন কি উপাসনার ভঙ্গীও দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজ্যের সমস্ত অংশ থেকে ইংরাজ জাতি এখানে সমবেত হয়েছে। প্রথম সারিতে ভদ্রমহিলাদের মাথায় অতি আধুনিক ফরাসী টুপি শোভা পাচ্ছে। গানগুলি তেমন ভাল না হলেও বক্তৃতাটি বেশ সারগর্ভ ছিল। গির্জায় তিল ধারণের স্থান ছিল না।

খবর নিয়ে জানলাম প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলিতে বিকেলে উপাসনা হয় না। রবিবার দিন সকাল এগারোটায় ও সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়। বিকেলে লোকে বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া, ধর্মশিক্ষার স্কুলে পড়িয়ে বা অন্য সামাজিকতা করে সময় কাটায়।

অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম কম। ক্যালিফোর্ণিয়ার জলহাওয়ায় লোকদের মধ্যে এমনকি সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে লক্ষ্য করলাম। একদিন বিকেলে আমার পূর্বপরিচিত কংগ্রিগেশনাল সম্প্রদায়ভুক্ত এক সাধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে আমি পনেরো বছর আগে চিনতাম। তিনি চলতেন অতি সাবধানে, কথা বলতেন চোখ নীচু করে, অতি ধীর গলায়, যেন সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধারের ভার তাঁরই উপর দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যক্তির এ কী পরিবর্তন! তাঁর দাড়ি গোঁফ মণ্ডিত মুখমণ্ডল, হাঁটা চলার দৃপ্ত ভঙ্গী। উচ্চ

কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল তিনি এতদিনে নিউ ইংলণ্ডের সাধুবেশ পরিত্যাগ করে সত্যিকার মানুষ হয়েছেন। ঘণ্টা খানেক তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এখানকার বিভিন্ন ধর্ম সমিতি, মদ্যপান নিরোধক সভা এবং অন্যান্য নানা নীতিগত উন্নয়নের কথা শুনলাম।

হোটেলের বসবার ঘরে এক ব্যক্তিকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখি, পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বয়স প্রায় ষাট। তাঁকে একজন লীগ বলে সম্বোধন করলেন। আমার মনে হল খুব সম্ভব এই ভদ্রলোকই কেণ্টাকি থেকে মণ্টারি আসেন। ১৮৩৫ সালে আমরা যখন পিলগ্রীমে করে মণ্টারি এসেছিলাম উনি সেইসময় অ্যালার্টে যাত্রী হয়েছিলেন। মাঝের মাস্তুলের পালদণ্ড থেকে ঝোলান বোতলে গুলী ছুঁড়তেন উনি। ইনি ডন গুয়াডেলোপের ভগ্নী ডনা রোসালি ভ্যালেজোকে বিবাহ করেন। ঠিক এই রকম উন্নত নাক চোখ ও ফিকে রঙের চুল ছিল এঁর। আমি পাশে চেয়ার নিয়ে বসে এঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম—ক্যালিফোর্ণিয়াতে এ রকম আচরণে কোন দোষ নেই। আমার অনুমানই ঠিক। ইনিই সেই মিঃ লীগ। আমার পরিচয় ব্যক্ত করা মাত্র ইনি বললেন আমাকে এঁর বিলক্ষণ মনে আছে। আমার বইয়ের কথাও বললেন। শুনলাম প্রত্যেক ক্যালিফোর্ণিয়াবাসী বইটি পড়েছে। ১৮৪৮ সালে যখন ক্যালিফোর্ণিয়া মুক্ত হয় এবং দলে দলে অ্যাংলো স্যাক্সন নরনারী ওখানে বসবাস করার জন্য আসতে আরম্ভ করে তখন ক্যালিফোর্ণিয়া সম্বন্ধে আমার বইটি ছাড়া আর কোন বিবরণ ছিল না। সেই সময় যারা উপকূলে ছিল বইটি পড়ে তাদের জাহাজগুলির কথা মনে পড়ে যায়, অনেকের নাকি আমার কথাও মনে আছে। শুনে প্রথমটা আমার একটু আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু কলেজের ছাত্রের মাল্লার কাজ করাটা এতই অভিনব ব্যাপার যে সেই সময় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমি সেটা বুঝতে পারিনি।

বিকেলের দিকে রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে সান্ধ্য উপাসনা হচ্ছিল, আমি নতরদামে উপস্থিত। সুন্দর সঙ্গীত ধ্বনি, ফরাসী উপাসনা পাঠ ও সমবেত ফরাসী নরনারীদের দেখে বোধ হচ্ছিল প্যারিসের কোন ধর্মমন্দিরে গিয়ে পড়েছি। আইরিশদের গির্জা সেণ্ট মেরীর ক্যাথিড্রালেও পরে গেলাম, এখানকার আবহাওয়া অনেকটা বস্টন ও নিউইয়র্কের আইরিশ গির্জাগুলির মত, উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখে স্পষ্ট বুদ্ধিহীনতার ছাপ। আমি সান

ফ্রানসিস্কোতে ছিলাম তিনটি রবিবার। এর মধ্যে তিনটি এপিসকোপাল গির্জা, কংগ্রিগ্রেসনাল, চীনা মিশন মন্দির ও ইহুদীদের মন্দির দর্শন করি। এখানকার ইহুদীরা বিত্তশালী সম্প্রদায়। চীনাদের সংখ্যাও কম নয়। তারা শারীরিক পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ ও দোকানপত্র দেখে। কয়েকটি বড় বড় ব্যবসা চীনাদের দ্বারা পরিচালিত।

আহারাদির ব্যাপারে ইউরোপীয় রুচি অনুসৃত হতে দেখা যায়, যথা ফরাসী রান্না ত্বপুরের আহার, সন্ধ্যাকালে নৈশ ভোজন, আহারের পর বিনা ত্বধে কফি। আমার এই ব্যাপারে তেমন তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি না থাকলেও ফরাসী রেস্টুরেন্টের খাবার অতি উত্তম বলেই বোধ হল। কিন্তু এখানকার খাওয়ার সঙ্গে আমার চব্বিশ বছর আগেকার মাল্লা জীবনের খাওয়ার স্মৃতি জড়িত, সেজন্য আমার মত উপভোগ আর কেউ করতে পারছিল কি না সন্দেহ।

১৭ই আগস্ট। ক্যালিফোর্ণিয়ায় সকলেই অকুণ্ঠভাবে আলাপ করেন এবং যাঁরাই আমার বই পড়েছেন তাঁরাই নিজে হতে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করছিলেন। সংবাদপত্রে এক বহু পুরাতন ক্যালিফোর্ণিয়া অভি-যাত্রীর আগমন কাহিনী প্রকাশিত হয়। আমি যখনই রাস্তায় বার হই লোকে আমার কাছে এগিয়ে আসে। সানফ্রানসিস্কোয় উপনিবেশ স্থাপনের বার্ষিকী উপলক্ষে আমি বক্তৃতা দিতেও অনুরুদ্ধ হলাম। এখানকার নিয়মাবলী বড় আধুনিক ও সংস্কারশূন্য। ১৮৫৩ সালের আগে এখানে যিনি এসেছেন তিনিই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন। আমি এদের সেই পুরাতন মঠ ও ত্বর্গের মাঝখানে রিচার্ডসনের কুটিরের কথা বললাম—সানফ্রানসিস্কো নগরীর প্রথম বাসস্থান। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই আমি কি আশ্চর্য পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি। এরা আমাকে রিচার্ডসনের তৈরী পাকা বাড়ীটি যেখানে ছিল সেই স্থানটি দেখালে। সেখানে নাকি শহরের প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, নাগরিক কাউন্সিল বসে এবং প্রথম বিচারসভা ও আদালত বসে ঐখানেই। জাহাজঘাটে গিয়ে ইয়ার্বা বুয়েনার বাঁক দেখলাম, এখন সেটা ভরাট হয়ে গেছে, তার ত্বই প্রান্ত ত্বটির নাম হয়েছে ক্লার্ক ও রিংকন। এখানে আমরা নৌকা বাঁধতাম। যে দ্বীপে কাঠ আনতে গিয়ে আমাদের ডিসেম্বরের শীতে ছোট ডিঙিতে রাত কাটাতে হয়েছিল সেই দ্বীপ এখন একেবারে তরুহীন। অ্যালকাট্রস দ্বীপের পাথুরে

জমিতে তৈরী হয়েছে এক বিরাট দুর্গ। আমি উপসাগর থেকে শহরের দিকে এবং শহর থেকে তীরবর্তী দ্বীপগুলির দিকে চেয়ে রইলাম কিন্তু কোথাও আর আগেকার কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই। কেবল ভাঙ্গা দুর্গ, মঠ, শহরের পিছনে উঁচু পর্বতশ্রেণী আর বিস্তৃত উপসাগরের জলরাশি।

আজ আমি একটি ঘোড়ায় চড়ে, সেই সেকালের মত ক্যালিফোর্ণিয়া ভ্রমণে বার হলাম। প্রথমে গেলাম দুর্গে। প্রাকারের আকৃতি আগের মতই আছে, কেবল আমেরিকান সৈন্যদলের জন্য নতুন বাসস্থান তৈরী করা ছাড়া। এখান থেকে একটি অপূর্ব দ্রুতগামী পোত বন্দরে প্রবেশ করতে দেখলাম। নতুন দুর্গটির নির্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—স্থপতি কার্স্টিস লী মেক্সিকো যুদ্ধের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক কর্ণেল বরার্ট লীর পুত্র। দুর্গের নির্মাণ কৌশল অতি আধুনিক ও খুবই খরচসাপেক্ষ বোধ হল।

আরেকদিন সকালে অশ্বপৃষ্ঠে ডলোরাসের মঠে যাত্রা করলাম। চারিদিকের আধুনিক ঘরবাড়ীর মধ্যে মঠটি কেমন যেন বিসদৃশ ও বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে। ভিতরে এখনো উপাসনা হয়, ঘণ্টাঘর থেকে এখনো আগের মত বেসুরো ঘণ্টা বাজে। শহরের দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এখানে এখনো উপাসনা করতে আসে।

জাহাজঘাটে বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়ল একটি জাহাজের পাশে কাঁচা চামড়া গাদা করে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবন্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, যে অতীতের কোন নামগন্ধই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। চব্বিশ বছর আগেকার আমার কাছে এই কাঁচা চামড়ার কি মূল্যই না ছিল। এগুলিই ছিল আমাদের অষ্টপ্রহরের পরিশ্রম, দিবারাত্রের ধ্যান জ্ঞান। এই চামড়ার টুকরোর জন্যই এই উপকূলে আসা, এগুলি তোলা যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে তত আমাদের দেশে ফেরার সময় ত্বরান্বিত হবে। ইচ্ছা হল চামড়ার টুকরো মাথায় তুলে আগেকার মত ভঙ্গীতে ছুঁড়ে ফেলি। বহুদিনের অনভ্যাসেও সেই চামড়া তোলার কৌশল হয়ত এখনও ভুলিনি—কিন্তু পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই হাত দিতে সাহস হল না। মনে পড়ল মাসের পর মাস সান ডিয়াগোতে চামড়া শুখোনো, বছর খানেক ধরে কূলে জল ভেঙ্গে আসা আর যাওয়া, তারপর জাহাজে ঠেসে মাল তোলা। স্বপ্নের মত দেখলাম সান ডিয়াগো, সান পেড্রোর কঠিন পাথুরে পথ আর পাহাড় আর সান জুয়ানের খাড়া পাথরের দেওয়াল। কোথায় গেল সেই সব দিন?

ক্যালিফোর্ণিয়ার সেই চামড়ার ব্যবসা আজ নিশ্চিহ্ন, ইতিহাসের গর্ভে বিলুপ্ত। সোনা আবিষ্কারের হিড়িকে সকলে চামড়ার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ঐ দিকে চলে যায়, লোক সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পশুপালগুলিও কমতে থাকে। এখন আর কোন জাহাজ চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসে না। বহুদিন পরে মনে হল যেন চামড়া জোগাড় করার কাজে কি মাধুর্যই ছিল। যদিও তখন আমরা মনেপ্রাণে এই কাজটি ঘৃণা করতাম। সান ডিয়াগোর চামড়ার গুদামগুলির আর একটিও অবশিষ্ট নেই। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জাহাজঘাটে দেখা হল। তাঁকে প্রশ্ন করতে জানলাম এখানে চামড়ার চালানি বলতে কিছুই হয় না, যে কটি টুকরো আসে এখানে জমা করা হয়, অন্য মালের সঙ্গে সেগুলিও চালান যায়। লোকটিকে আমার এই ব্যাপারে কৌতূহলের কারণ জানাবার মত অবস্থা ছিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম "তাহলে এই উপকূলে আগেকার চামড়া শুখোনোর কাজ একেবারেই বন্ধ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই অ্যালার্ট আর পিলগ্রীম আর ক্যালিফোর্ণিয়ার যুগ আর নেই, সে সব কেবল বইয়েই পড়া যায়।"

শনিবার, ২০ শে আগস্ট। সানফ্রানসিস্কো ও সান ডিয়াগোর মধ্যবর্তী বন্দরগুলিতে সিনেটর নামক বাষ্পচালিত জাহাজটি যাতায়াত করে। আমি পুরোনো দৃশ্যাবলী দেখবার এই সুযোগ হেলায় নষ্ট হতে দিলাম না। বন্দরে নোঙর ফেলা বিরাট জাহাজগুলির মধ্য দিয়ে আজ আমরা ভেসে পড়লাম, অ্যালকাট্রস দ্বীপ, আলোকস্তম্ভ ও গোল্ডেন গেট পার হয়ে দক্ষিণে চলে আসতে দু-তিন ঘন্টার বেশী লাগল না। হাওয়ার বেগ, জোয়ারের ধাক্কা ও প্রবল তরঙ্গ সামলে অ্যালার্টে আসতে এই পথ অন্তত পুরো দু-দিন লাগত।

যাত্রীদের মধ্যে একজন শীর্ণদেহ বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন, মাথার চুল ফিকে রঙের। তাঁর মুখ দেখে পরিচিত মনে হল। দস্তানা খুলে তিনি বিশীর্ণ হাত বার করলেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম "আপনাকে ক্যাপ্টেন উইলসন মনে হচ্ছে।" উনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। "১৮৩৫-৩৬ সালের চামড়া বওয়ার সময় আপনি আয়াকুচোর ক্যাপ্টেন ছিলেন, আমার মনে আছে"— আমার এই উক্তিতে উনি সচকিত হয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আরম্ভ হল পারস্পরিক কুশল সংবাদ। পিলগ্রাম, অ্যালার্ট, লরিয়েট, ক্যালিফোর্ণিয়া, ল্যাগোডা প্রভৃতি আমাদের পরিচিত জাহাজগুলি

সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল। আমার বইয়ে ক্যাপ্টেন উইলসনের নৌচালন নৈপুণ্য সম্বন্ধে পড়ে উনি খুবই খুশী হয়েছিলেন। পিলগ্রীমকে সান ডিয়াগো বন্দরে আনার সময় তাঁর যে দক্ষতার বিবরণ আমি দিয়েছিলাম এবং তাঁর জাহাজ আয়াকুচোর প্রশংসা করাতেও উনি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হয়েছেন। ১৮৩৬ সালে সান্টা বারবারায় তাঁর বিবাহের বর্ণনাও তাঁকে অতীব প্রীত করেছে। উইলসন বললেন ডনা রামোনা এখন বহু সন্তানের জননী, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য ঠিক আগের মতই আছে। ক্যাপ্টেন উইলসন এখন সান লুই অবিসপোর কাছে খেত খামার করেন। সেখানে আমাকে যাবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তাঁর স্ত্রীও আমাকে দেখে খুশী হবেন, উইলসন আশ্বাস দিয়ে বললেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমরা পায়চারি করে সব পুরোনো স্মৃতির মন্থন করতে লাগলাম—জাহাজ, জাহাজের ক্যাপ্টেনরা, মাল্লারা, উপকূলের ব্যবসায়ীরা, ভদ্রমহিলারা, মঠ, দুর্গ ও দক্ষিণে ঝড়—আমাদের গল্প আর শেষ হয় না। উইলসন চিলিতে তাঁর জাহাজ বিক্রি করে দিয়ে এখন চাষবাসের কাজে মন দিয়েছেন। আমি অন্য বহু লোকের কাছে শুনলাম তাঁর খামার এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ এবং উইলসন চাষ আবাদ করে যথেষ্ট বিত্ত অর্জনও করেছেন। ক্যাপ্টেন টমসনের সান ডিয়াগোর অকৃতকার্যতার কথা মনে করে উইলসন খুব হাসলেন—ওঁর মতে টমসন ভাল নাবিক ছিল না। তবে ফকন ছিলেন সত্যিকার নাবিক, জাহাজ চালাতেও জানতেন। জর্জ মার্শের (চতুর্বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কি হয়েছে উনি বলতে পারলেন না, উনি ওকে শেষ দেখেছেন ক্যালো-ওতে; সুদর্শন মাল্লা বিল জাকসন (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অথবা লরিয়োটের ক্যাপ্টেন নাঈ কারো সম্বন্ধেই তিনি খবর দিতে পারলেন না। আমি এদের সম্বন্ধে যতটুকু জানতাম বললাম। সান্টা বারবারার সিনোর নরিয়েগা মারা গেছেন শুনলাম। ডন কার্লোস ও ডন স্যানটিয়েগোও আর ইহজগতে নেই। তাঁদের পুত্রকন্যারা এখন প্রাপ্তবয়স্ক। আমার বইয়ে ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়ার রূপ ও নৃত্যের প্রশংসা করে আমি নাকি তাঁকে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ করে তুলেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাদের রাজোচিত সমাদর করবেন নিঃসন্দেহ। তিনি বিধবা হবার পর পুনর্বার বিবাহ করেছেন। তাঁর কন্যা এখন তাঁরই মত সুন্দরী হয়ে উঠেছে। নরিয়েগার বংশধরেরা এখন ডি লা গুয়েরা নাম ধারণ করেছে, তাঁরা নাকি স্পেনের

প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুল। পাবলো নামে যে বালকটি এ্যালার্টে চিঠিপত্র দিয়ে যেত সে এখন ডন পাবলো ডি লা গুয়েরা—সান্টা বারবারা কাউন্টির বিধান সভার সদস্য।

পথে সান্টা ক্রুস, সান লুই ওবিসপো, পয়েন্ট এ্যানো নুয়েভো প্রভৃতি পড়ল। কিন্তু আমরা মন্টারিতে না থামায় আমি একটু নিরাশ হলাম। আগে যে মন্টারি এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ শহর, রাজধানী ও শুল্ক বিভাগের কেন্দ্র ছিল সেখানে তেমন পরিবর্তনের হাওয়া লাগেনি। বাণিজ্যের আওতা থেকে দূরে থাকার জন্য মন্টারিতে থেমে সময় নষ্ট করতে কেউই চাইল না। আমরা রাত্রিবেলা পয়েন্ট কনসেপশনের আলোকস্তম্ভ পার হলাম। মনে পড়ল শীতকালে এখানে ঝড়ে জলে আমাদের মাস্তুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন উইলসন বললেন আজকাল এ অঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব হাওয়ার প্রকোপ আর আগের মত নেই। সামুদ্রিক শৈবাল পার হয়ে জাহাজ এখন সান্টা বারবারা ও সান পেড্রোতে সারা বছর নোঙর ফেলে। আমি ভাবলাম এখন তো আয়াকুচোর খোলা ডেকে আর ক্যাপ্টেনকে থাকতে হয় না। কাজেই এঁর কাছে দক্ষিণে ঝড় আগের চেয়ে কম। কিন্তু অন্য অনেকের কাছে এই কথাই পরে শুনেছি।

কনসেপশন অন্তরীপ পেরিয়ে পূব দিকে আমাদের জাহাজ চলল। সান্টা বারবারা প্রণালীতে পড়লাম, দু পাশে দ্বীপ—সান্টা ক্রুস, রোসা, সান্টা বুয়েনাভেন্টুরা। সামনে সান্টা বারবারার সমতলভূমি, দূরে পর্বতশ্রেণী ঘিরে আছে। সেই পুরাতন সাদা মঠ, ঘণ্টাঘর, শহরের একতলা বাড়ীগুলির মধ্যে দু-একটি দোতলা কাঠের বাড়ী দেখলাম, মনে হল পরে তৈরী, কিন্তু শহরের দৃশ্য এমন কিছু বদলায় নি—সেই সোনালী সূর্যস্নাত শান্ত দৃশ্যপট, সেই পাহাড়ে ঘেরা রমণীয় স্থান আর প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গভঙ্গ। পাঁচ মাস সমুদ্র যাত্রার পর পিলগ্রীম যেদিন এখানে প্রথম নোঙর ফেলেছিল, সেদিনও সান্টা বারবারা ঠিক এমনই ছিল—সেই উজ্জ্বল নীল সমুদ্র, তটে ঢেউয়ের অবিরাম একঘেয়ে গর্জন, সুপ্ত নগরী। মনে পড়ল আমরা প্রথম নৌকা বেয়ে তীরে এলাম, কানাকাদের চীৎকার, অদূরে তিনটি জাহাজ নোঙর ফেলা। আর এখন ? পাল তোলা সেদিনের সেই সুন্দর জাহাজের পরিবর্তে পাল মাস্তুল শূন্য যন্ত্রচালিত কদাকার একটি জাহাজের খোল !

তটের জলকল্লোলে নৌকা করে নামলাম, কিন্তু জলের উচ্ছ্বাস তেমন

ছিল না। আমাকে এক লাফে নৌকা থেকে নেমে পালটি ধরে দৌড়ে বালির উপর যেতে হল না। আমি এখন ভদ্রলোক, যাত্রী।

প্রথম দর্শনে সাণ্টা বারবারার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ল না। এ যেন সেই পুরাতন মেক্সিকো অধিকৃত শহর, নবজাগ্রত আমেরিকা মহাদেশের অংশ নয়। যে বাড়ীতে সিনোর নরিয়েগা থাকতেন সেখানে ডন পাবলো ডি লা গুয়েরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। এই বাড়ীর প্রাঙ্গণেই মিঃ রবিনসনের বিবাহ উপলক্ষে ডন জুয়ান ব্যানডিনি ও ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়া নাচ করেছিলেন। আমি ডি লা গুয়েরা পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটালাম, স্থানীয় সুরা সহকারে অলিভ, আঙ্গুর, বরবটি ইত্যাদি আহার করলাম। কিছুক্ষণ পরে ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়ার সমীপে উপনীত হলাম। চব্বিশ বছর পরেও তাঁর মোহময়ী রূপ এতটুকু কমেনি দেখলাম। আমার অতিশয়োক্তির জন্য ডনা অ্যাঙ্গাসটিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁর কন্যার কাছে শুনলাম এ অঞ্চলে আগত প্রত্যেক বিদেশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর কন্যা বললেন "আমি এত প্রসিদ্ধি লাভ করব বলে মনে হয় না।"

মিঃ অ্যালফ্রেড রবিনসন যিনি ১৮৩৫-৩৬ সালে আমাদের দালাল ছিলেন এখানে সপরিবারে বাস করছেন শুনলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার বইয়ে অনেক অপ্রীতিকর মন্তব্য ছিল, তখন কি আর ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলাম পৃথিবী সুদ্ধ লোক আমার বই পড়বে! এজন্য একটু ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মিঃ রবিনসন কিন্তু যথেষ্ট হৃদ্যতা সহকারে আমাকে আপ্যায়ন করলেন।

এখানকার লোকেরা জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না। ভেড়া পালন, মদ চোলাই, অলিভ উৎপাদন প্রভৃতি এদের প্রধান পেশা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাদের নৌকা ছাড়ার সময় হয়ে এল। আমি ঘোড়ার গাড়ীতে না গিয়ে পদব্রজেই উপকূলে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। তরঙ্গমালার অশান্ত উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে মানসলোকে পৌঁছে গেলাম চব্বিশ বছর আগেকার জগতে। সময়ের স্রোত আমাদের স্মৃতিতে স্নেহের জাল বিছিয়ে দেয়। আগে যা মনে হত কঠিন, কুশ্রী, আগে যে কঠোর কায়িক পরিশ্রম অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সম্পাদন করতে হয়েছে আজ তা

সম্পূর্ণ অন্যরূপে আমার কাছে দেখা দিল। সেই পুরোনো নৌকাগুলি, কানাকারা, মাল্লা সঙ্গীরা, চামড়ার রাশের জন্য বেদনা অনুভব না করে পারলাম না। মৃত্যু এদের দিয়েছে মহিমা, পরিবর্তন ও কালস্রোত এদের আকৃতি করেছে অভিনব।

আবার সমুদ্রে পড়লাম। হাওয়া বইতে লাগল। বড় বড় ঢেউ রক্তবর্ণ সূর্য ঢেকে দিগন্তে লাফালাফি করতে লাগল। গ্রীষ্মকাল। ক্যালিফোর্ণিয়ার সবচেয়ে রমণীয় কাল। বৃষ্টি নেই, হাওয়া মৃদু মন্দ।

পরদিন সকালে আমরা সান পেড্রো উপসাগরে নোঙর ফেললাম। এই জায়গাটি আমরা কি অপছন্দই না করতাম। এই পাহাড় বেয়ে আমাদের চামড়া নিয়ে উঠতে হত, তারপর উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা, এই পাথুরে জমির উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে নৌকা বোঝাই করা। জায়গাটি কিন্তু দেখে চেনা যায় না। এখানে আর নৌকা ভিড়ানো হয় না। অপেক্ষাকৃত শান্ত একটি নোঙর স্থানে মাল ওঠান-নামান হয়। একটি জাহাজ-টানা জাহাজ যাত্রীদের ঘাটে নিয়ে যায়। আমি ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলাম আমাকে যেন একটি ছোট নৌকায় করে আলাদা নামান হয়। পাহাড়ের গায়ে সেই পূর্বপরিচিত জায়গাটিতে নেমে আমি একা উপরে উঠতে লাগলাম। চামড়ার কারবারী জাহাজের লোকেরা যে পথ নির্মাণ করেছিল অযত্নে তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে খাড়াই থেকে আমরা চামড়া ছুঁড়তাম সেই জায়গাটি সহজেই চিনতে পারলাম। পাহাড়ে একটির পরিবর্তে দুটি বাড়ী। দূরে সান্টা ক্যাটালিনা ও মৃতব্যক্তির দ্বীপের দিকে তাকালাম। ভ্রম হল পিলগ্রীম বোধহয় ওখানে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। পিলগ্রীমে সেই প্রহারের ঘটনাটা মনে পড়ল। কিন্তু যাত্রীবাহী জাহাজটি ফিরে আসছে, সুতরাং আমাকেও ফিরতে হবে। নতুন জাহাজঘাটে গিয়ে দেখি দু-তিনটে গুদাম ও অন্যান্য বাড়ী আছে। এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ী নিয়মিতভাবে পুয়েবলো যাওয়া-আসা করে। গাড়ীর উপরে আমিও স্থান করে নিলাম। ছয় ঘোড়ার গাড়ী, চালকের ইঙ্গিত পাবামাত্র ঘোড়াগুলি তীরবেগে ছুটতে লাগল। তিরিশ মাইল পথ। মধ্যে দু বার ঘোড়া বদল করা হল। পথ তরুহীন, রুক্ষ, কাঠ বিড়ালিরা চতুর্দিকে গর্ত করেছে।

পুয়েবলো ডি লস এঞ্জেলস বিরাট শহর, লোকসংখ্যা কুড়ি হাজার। শহরের পথঘাট বাঁধানো, বাড়ীগুলি পাথর অথবা ইঁটে তৈরী। আমাদের

সময়ে যে তিনজন চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁরা এখনো বেশ প্রতিপত্তিশালী—স্টিয়ার্ণস, টেম্পল ও ওয়ার্ণার। আমি মিঃ স্টিয়ার্ণসের সঙ্গে আহারে নিমন্ত্রিত হলাম। সেখানে ডন জুয়ান ব্যানডিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনিও আমাকে সাদর সম্ভাষণ করলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার বইয়ে অনেক প্রশংসাসূচক কথা আছে। শহরের সকলেই আমাকে খুব যত্ন করলেন। ডন জুয়ানের তরুণী স্ত্রী এখনো আগের মতই আছেন—আমি লক্ষ্য করলাম এখানকার জলবায়ুতে লোকের বহুদিন তারুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। হেনরী মেলাস, যে আমার সঙ্গে মাল্লার কাজে যোগদান করে ও পরে পিলগ্রীম ছেড়ে উপকূলে কেরানীর কাজ করতে চলে যায়—তার সঙ্গেও দেখা হল। নানা রকম অভিজ্ঞতার পর সে এখন এক মেক্সিকোবাসিনীর পাণিগ্রহণ করে এখানেই বসবাস করছে। এর কাছেও নিমন্ত্রণ পেলাম। পরে মেলাস আমাকে এখানকার প্রসিদ্ধ আঙ্গুর বাগানগুলি দেখাতে নিয়ে গেল। গত বছর পাঁচ লক্ষ গ্যালন রস উৎপাদিত হয়েছিল। প্রতি বছর নতুন নতুন চাষের জমি যুক্ত হয়ে পুয়েবলো শীঘ্রই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গুরক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। এখানকার আবহাওয়ায় আঙ্গুর ছাড়াও অলিভ, পীচ, পিয়ার, আঞ্জীর প্রভৃতি ফল প্রচুর হয়, তবে গম চাষের পক্ষে এইস্থান বড় শুষ্ক ও উষ্ণ।

সন্ধ্যার সময় আবার সেই ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরে গেলাম। অন্ধকার ঘন হবার আগেই বন্দরে পৌঁছলাম। মধ্যরাত্রে জাহাজ যাত্রা করল সান ডিয়াগো।

পথে স্পষ্ট চাঁদের আলোয় উইলসন ও আমি সান জুয়ান ক্যাপিস্ট্রানোর সেই খাড়া পাহাড় দেখে চিনলাম। কয়েক টুকরো চামড়ার জন্য এখানেই আমি দড়ি ধরে নেমেছিলাম। অল্প বয়সে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য কি না করেছি!

সান ডিয়াগোর পথে পয়েন্ট লোমাতে একটি আলোকস্তম্ভ দেখলাম। ভোরের আলোয় প্রবেশ করলাম সান ডিয়াগোর পোতাশ্রয়ে। সেই তরুশূন্য পাহাড়ের সারি, অল্প অপরিসর বালি জমি, কিন্তু এখানকার চামড়ার গুদামগুলি কোথায় গেল? তাদের কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই।

অন্য সকলে শহরে গেল। আমি একা থাকবার ইচ্ছায় নৌকা করে কূলে এলাম। স্মৃতিতে শুধুই বেদনা জড়ান। অতীত যেন অ্যালার্ট,

ক্যালিফোর্ণিয়া, রোজা ও মাল্লাদের নিয়ে মূর্ত হয়ে দাঁড়াল—বর্তমানকে মনে হল অবাস্তব, অসুন্দর, মিথ্যা। আমার প্রিয় জাহাজ আয়াকুচো, কত দুঃখের সাক্ষী পিলগ্রীম, নোঙর তোলাপাড়ার সঙ্গে মাল্লাদের সমবেত গান, কর্মব্যস্ত উপকূল, চামড়ার গুদাম, আর চতুর্দিকে কানাকাদের দল। কিন্তু হায়! এদের অস্তিত্বের এতটুকু প্রমাণ অবধি কোথাও নেই। অনেক খুঁজে পুরানো চুল্লীটির জায়গায় গোটা কয়েক ভাঙ্গা ইঁট চোখে পড়ল। আমি কেবল আছি? কেন? এখানে আমি কি করছি? তাদের কি হল? মৃত্যু কি তাদের গ্রাস করেছে? কি ভাবে, অসুখে, দুর্ঘটনায়, পাপের পঙ্কে, মাস্তুল থেকে পদস্খলন হয়ে? এদের জন্য কেন আমার প্রাণে এত হাহাকার? ওরা কে? কানাকা আর সভ্যজাতির উদ্‌বৃত্ত অপদার্থের দল বই ত নয়? কিন্তু কালের চক্র আর পরিবর্তনে এরা সম্পূর্ণ অন্য রূপে দেখা দিল আমার চোখে। কেউ সমুদ্রতলে নিশ্চিহ্ন, যদি বা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে কেউ তারা এখন মধ্যবয়সী অভিজ্ঞ লোক—আর সেই তরুণ হাসিখুশী মাল্লার দল নয়।

তখনকার ঘোড়া, মুরগী, কুকুর সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেবল থেকে থেকে বনে শেয়ালের হাঁক শোনা যেতে লাগল। সভ্যতার বিবর্তন তাদের স্পর্শ করেনি।

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে পাহাড়ে উঠলাম। কাঠ কেটে এনে আমরা এইখানে বসে বিশ্রাম করতাম আর তাকিয়ে দেখতাম কোন জাহাজ আসছে কিনা।

তখন সূর্য মধ্যগগনে—আমি সেই রৌদ্রে চার মাইল পথ হেঁটে দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আগে এই পথে কতবার এসেছি। মনে এক অদ্ভুত বিষাদের ভার। নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা, সৌভাগ্য ও সাফল্যের কথা ভেবে মনকে প্রবোধ দেবার প্রয়াস করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এই তো সেই গুহাপথ, সেই পর্বত, সেই অরণ্য যেখানে কাঠ কাটতে গিয়ে আমরা সাপের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি আর আমাদের কুকুরগুলি বন্য কোয়োট ধরতে দৌড়ত।

সান ডিয়াগো আগের মতই যেন মেক্সিকোর শহর হয়ে আছে, আমার চোখে এর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। প্রধান অট্টালিকাগুলি যেগুলিতে আগে চারটি অভিজাত পরিবারের বাস ছিল, ব্যানডিনি,

এসটুডিলো, আরগুয়েলো ও পিকো—এখনও রয়েছে দেখলাম কিন্তু অধিবাসীরা কেউই নেই। ফিল্চ নামে যে ব্যবসায়ী ছিল বহুদিন হল মারা গেছে শুনলাম। এর প্রতিযোগী দোকানদার টম রাইটিংটন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যায়। তার মৃতদেহ বন্য কোয়োটে ভক্ষণ করেছে। আমার পরিচিত একজনকেও দেখলাম না। মুচাডো নামে এক পরিবারের একতলা বাড়ীতে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক আমাকে চিনতে পারল। আমার জাহাজের সঙ্গী জাক স্টুয়ার্টের সঙ্গে এর বিবাহ হয়েছে। জাক এখানেই বিবাহ করে বসবাস করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাক এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে তার আন্তরিক আনন্দের উচ্ছ্বাস আমার বড় ভাল লাগল। আমরা সেকালের কথা আলোচনা করতে লাগলাম। তবে আমার হাতে সময় বেশী ছিল না। পূর্ব পরিচিতদের মধ্যে—ডনা টমাসা পিকোর সঙ্গে দেখা হল—পূর্বেকার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র উনিও এখানে আছেন। ডয়েল নামে এক আমেরিকান দম্পতির সঙ্গেও পরিচয় হল, অল্প বয়স। ডয়েল পুরাতন প্রদেশগামী ঘোড়ার গাড়ীতে দালালের কাজ করে।

স্মৃতিজড়িত সব কিছু একবার দেখে নেবার অভিপ্রায়ে আমি একটি ঘোড়া নিয়ে পুরাতন মঠটির দিকে গেলাম। বস্টন ছাড়ার পর প্রথম ছুটির দিন বেন স্টিমসন ও আমি এখানেই এসেছিলাম। মঠের বাড়ী ও বাগানগুলি অযত্নে ভগ্নপ্রায় অবস্থা। গোটাকতক বুনো ক্যাকটাস, উইলো ও অলিভ ছাড়া বাগানে আর কিছুই নেই। আবার দ্রুত প্রত্যাগমন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে ফিরলাম। শেষ বারের মত তাকালাম পাহাড়, সমুদ্রতট ও দূরের শহরটির দিকে। তারপর সূর্যাস্তের দিকে অগ্রসর হলাম, পয়েন্ট লোমার আলোকস্তম্ভ অভিমুখে।

বুধবার ২৪শে আগস্ট। দিনের বেলা সান পেড্রোতে নোঙর পড়ল। কিন্তু নৌকা বেয়ে কূল থেকে চামড়া আনতে যাওয়ার পরিবর্তে ঘরে বসে প্রাতরাশ, তারপর পুয়েবলো যাত্রা, একই লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অন্ধকারের আগেই ফিরে আসা। আমাদের বাষ্পীয় পোত এবার সান্টা বারবারা অভিমুখে চলল, সেখানে এক ঘণ্টা। তারপর প্রণালী পেরিয়ে কনসেপশন অন্তরীপ ঘুরে সান লুই অবিসপো। এখানে আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন

উইলসন নেমে গেলেন—একসঙ্গে এতটা পথ অতিক্রম করার পর ওঁকে আমার বন্ধু বলতে কোন দ্বিধা নেই। উনি বারবার আমাকে নামতে আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও আমাকে সে নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হল।

শুক্রবার, ২৬শে আগস্ট, সন্ধ্যা। গোল্ডেন গেটের মধ্যে প্রবেশ করলাম, আলোকস্তম্ভ ও দুর্গের প্রাকার পেরিয়ে নোঙরবদ্ধ জাহাজগুলির পাশ দিয়ে ডকে উপস্থিত হলাম। সামনে প্রাণোচ্ছল সানফ্রানসিস্কো নগরী।

এখান থেকে আমি এই প্রদেশের নানাস্থান ভ্রমণ করতে লাগলাম। সান্টা ক্লারা, যেখানে জেসুইটদের বিদ্যায়তন আর সাইকামোর এবং ওক গাছের প্রাচুর্য—সান জোসে যেখানে নোতরদাম সিস্টারদের বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়—সেখান থেকে আলমাডেনের পারা খনি, তারপর কাস্ট্রো এবং সোটো পরিবারের বিরাট খামার হয়ে কন্ট্রা কস্টা। সানফ্রানসিস্কো থেকে এক শ মাইল দূরে স্টকটন, সেখানেও গেলাম। এই শহরের লোক সংখ্যা দশ হাজার। তুয়োলুম, স্ট্যানিস লস ও মার্সেড পার হয়ে এলাম মার্সেডের ঘাটে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ। ম্যারিপোসা কাউন্টিতে গিয়ে কর্ণেল ফ্রিমন্টের খনিগুলি দেখলাম। কর্ণেলের সঙ্গেও পরিচয় হল। তাঁর স্ত্রী সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজ ও এই বিজন মারিপোসার খনি অঞ্চলে সমানভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমেয়েদেরও দেখলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর ক্লার্কের ক্যাম্পে বিরাট গাছগুলি দেখতে গেলাম। ছাল বাদ দিয়ে একটি গাছের গুঁড়ির বেড় সাতানব্বই ফিট। ছাল সাধারণতঃ আঠারো ইঞ্চি পুরু হয়। আরেকটি এই রকম প্রকাণ্ড গুঁড়ি মাটিতে পড়েছিল। সেটি অশ্বপৃষ্ঠে পার হলাম। তারপর গেলাম প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়াল ইয়োসেমাইট উপত্যকায়। তিন হাজার ফুটের খাড়া দেওয়াল। অজস্র ছোট বড় জলপ্রপাত। কোনটি স্রোতস্বতী কোনটি ঝরনার মত সরু, নীচে ধোঁয়ায় কিছু দেখা যায় না। উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে মার্সেডের নীল জল। ফিরলাম কুলটারভিলের গুঁড়িপথ ধরে, দূরে দেখা গেল সিয়েরা নেভাডা, আবার স্টকটন হয়ে সানফ্রানসিস্কো। তখন আগস্ট মাস। চার মাস ধরে বৃষ্টি হয় নি, চারিদিক শুষ্ক। আমরা ধুলোর মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছি, কিন্তু শীত ও বসন্তে এই পথ নাকি ফুলে ভরা থাকে। এখানে মাটির অল্প নীচেই খুঁড়ে সোনা পাওয়া দুষ্কর নয়। আমাদের ঘোড়ার গাড়ী একবার পথের

ধারে থামল। সেখানে একজন চীনা একটি গর্ত খুঁড়ছিল। গর্তটি পূর্বে একজন আমেরিকান কর্তৃক পরিত্যক্ত স্বর্ণখনি। এখানে কাজ করে চীনাটি দৈনিক কয়েক ডলার রোজগার করছিল।

পথে নানা রকম চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। সেগুলি বর্ণনা দেবার লোভ বহুকষ্টে সম্বরণ করতে হল কেন না আমি নতুন ক্যালিফোর্ণিয়ার ইতিবৃত্ত লিখতে বসিনি। পুরাতনের সঙ্গে নবীনের তুলনাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সানফ্রানসিস্কো নগরীর ইতিহাস কি বিচিত্র। ১৮৩৫ সালে এখানে কেবল একটি কাঠের কুটির ছিল। ১৮৩৬ সালে ঐখানেই একটি পাকা বাড়ী নির্মিত হল। ১৮৪৭ সালে চার শ পঞ্চাশ জন মিলে একটি শহর গড়ে উঠল, শাসনব্যবস্থা হল। তারপর সহসা এক অস্থায়ী জনপদের বিকাশ, আঠারো মাসের মধ্যে পাঁচ বার আগুন লেগে সেই নগর বিনষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ এক শ ষাট লক্ষ ডলার। তারপর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠল ইঁট পাথরে তৈরী এক বিরাট নগর, যার লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আজ, ১৮৫৯ সালে এই শহর সভ্যতা সংস্কৃতিতে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সুশাসিত শহর। এই শহরেও এমন সময় গেছে যখন হেন পাপকাজ নেই যা এখানে অনুষ্ঠিত হয় নি। জঘন্যতম অপরাধ, হত্যা প্রভৃতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর জন্য নাগরিকদের বিভিন্ন সভা সমিতিরও অবদান অনেক। বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সানফ্রানসিস্কো নগরী আজ সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে উপনীত—এর ইতিহাস যিনি লিখবেন তাঁকে কেবল ঘটনার বিবৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, তাঁর লেখনীকে হতে হবে কল্পনায় উদ্দীপ্ত।

রাজ্যের সকল অংশের নরনারীদের সাদর অভ্যর্থনা ও সদয় ব্যবহারের কথা এই সুযোগে জানিয়ে আমি তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এই সময় চার মাসের জন্য আমি বিদায় নিয়ে বস্টনের দ্রুতগামী পোত ম্যাস্টিফে করে যাত্রা করি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের দিকে। জাহাজটি সমুদ্রে অগ্নিদগ্ধ হয়, আমরা অতিকষ্টে পরিত্রাণ পেয়ে নৌকা করে ভেসে পড়ি। একটি ইংরাজ জাহাজ আমাদের পৌঁছে দেয় হনলুলু। তিন মাস সেই বিচিত্র সুন্দর দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক ও নৈতিক নানা বিস্ময় দেখার শেষে আবার ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৫৯ সালে রবিবার দিন সানফ্রানসিস্কো ফিরে এলাম।

সানফ্রানসিস্কো থেকে এক শ মাইল অভ্যন্তরে সাক্রামেন্টো, এই প্রদেশের রাজধানী। এখানে চল্লিশ হাজার লোকের বাস। এখানে নদীপথে খুব বাণিজ্য চলে। আমি এখানে এসে দেখলাম নূতন শাসনকর্তা মিঃ ল্যাথাম কার্য ভার গ্রহণ করছেন। ভদ্রলোক ম্যাসাচুসেটসবাসী, বয়সে আমার চেয়ে ছোটই। এখানে সেনেটের একজন সদস্যকে দেখলাম তিনি দশ বছর আগে আমাদের বাড়ী ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করতেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার আরো দুজন সেনেটর, সান ডিয়াগো থেকে ডন আন্দ্রে পিকো ও ডন পাবলো ডি লা গুয়েরা যাঁর সঙ্গে আমার সান্টা বারবারায় দেখা হয়েছিল—আমেরিকানদের মধ্যে কেবল এই দুইজন বিজিত জাতির প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত। এঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। ১৮৪৬ সালে ডন আন্দ্রে সান পাজকাল ও সেপুলভেদাতে বিপুল বিক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। মেক্সিকানদের মধ্যে এরকম শৌর্য দুর্লভ। এজন্য এঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। ইনি কিয়ার্নিকে পরাস্ত করেছিলেন। সেনেটে ডন আন্দ্রের বক্তৃতা ছিল। স্পেনীয়েরা বক্তৃতা দিতে খুবই ভালবাসে। সান পাজকালের যুদ্ধে আহত একজন সেনাবিভাগের কর্মচারীর স্বপক্ষে এঁর বলার কথা ছিল। ডন আন্দ্রের বাগ্মিতা ও জ্বালাময়ী বাক্যে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে গেলেন।

এরপর আমি যেসব স্থান পরিভ্রমণ করি সেগুলি হল উর্বর নাপা উপত্যকা, মেয়ার দ্বীপে আমেরিকার নৌসেনা বিভাগের কেন্দ্র, উষ্ণ প্রস্রবণ এবং জন ইয়াউন্টের খামার। জাহাজে উত্তর ক্যারোলিনার মিঃ এডওয়ার্ড স্টানলের সঙ্গে পরিচয়, ইনি পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কুড়ি বৎসর আগেকার আর এক পরিচিত মুখ, ডন গুয়াডেলোপ ভ্যালেজো আমাকে প্রভূত আপ্যায়ন করে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। ইনি আমার পূর্ব-পরিচিত বললে আংশিক সত্য ভাষণ হবে কেন না তখন আমি মাল্লা ছিলাম, এঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা বলা ছিল নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু ইনি আমার পূর্ব ইতিহাস জানতেন এবং ইংরাজীতে কথাবার্তা মোটামুটি ভালই বলতেন। নৌকা করে যাওয়ার সময় এঁর সঙ্গে আমার কথা হত। তখন ইনি ছিলেন দুর্গের অধ্যক্ষ। এঁদের বংশের দুজন নাকি এক সময় সমস্ত নাপা ও সোনোমার মালিক ছিলেন, কিন্তু এখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এদের বন্দোবস্ত হয় যে ভ্যালেজো নগরে রাজধানী

স্থাপিত হলে তারা সেখানকার সব পৌর ভবনগুলি নির্মাণ করার ভার নেবে। এদের মোট খরচ হয় এক লক্ষ ডলার। কিন্তু দু বছরের মধ্যেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় সান জোসেতে। শহরের কাঠের বাড়ীগুলি খুলে নেওয়া হয় ও ফলে এই দুই ভদ্রলোক দারুণ অর্থ কষ্টের সম্মুখীন হন। আমি বৃদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভ্যালেজোতে প্রাতরাশের জন্য আসতে সম্মত হলাম।

মেয়ার দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগীয় ইয়ার্ডের অবস্থান সুন্দর। এখানকার জল সুমিষ্ট ও গভীর। এখানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, ডিকেটার ও আরো দুটি জাহাজ ছিল। স্থানীর কাঠ দিয়ে একটি ডাকবাহী নৌকা তৈরী করার চেষ্টা চলছিল।

নাপা উপত্যকা মনোরম। কিন্তু তার বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। জন ইয়াউন্টের খামারে গিয়ে তার মুখে নানা লোমহর্ষক ইতিবৃত্ত শুনলাম—শিকারের কাহিনী, রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ, স্বপ্নাদেশ পেয়ে তার লোকজন নিয়ে পাহাড় অতিক্রম করার বৃত্তান্ত, যেখানে ডানার অভিযাত্রী দলের অবশিষ্ট কয়েকজন অনাহারে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়েছিল।

উষ্ণ প্রস্রবণের বর্ণনা দিয়েও অযথা সময় নষ্ট করব না। গেহানা অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার জলের ধারা বয়ে গেছে, কিন্তু তার বর্ণনা দেবারও সময় এখানে নেই। নাপা উপত্যকার ক্ষেতগুলি এত বড় যে প্রবাদ আছে একজন চাষী লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে সেই স্থানে ফিরে আসতে একদিন লেগে যায়। এখানে দেখেছি ক্ষেতে স্ট্রবেরী, দ্রাক্ষাকুঞ্জে থোলো থোলো আঙ্গুর ফলে আছে; খোলা জানালা পথে দেখেছি ঘরে ঘরে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন জ্বলছে। আরো দেখেছি পাহাড়ী নদীর পথ পরিবর্তিত করে নদীগর্ভ থেকে সোনা তোলার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু সে সব বর্ণনা দেওয়ার স্থান এটা নয়।

১০ই জানুয়ারী, ১৮৬০! আবার সানফ্রানসিস্কোয় ফিরে এলাম। আমার ক্যালিফোর্ণিয়া ভ্রমণ সমাপ্ত। এই ভ্রমণের বিবরণ হয়ত পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়নি কিন্তু আগেই বলেছি এটি আমার সমুদ্রযাত্রা ও উপকূল বাসের কাহিনীর উপসংহার মাত্র। তবু এই দেশের নূতন জনপদগুলির উল্লেখ করতে হল কারণ ১৮৩৫-৩৬ সালের জনহীন ক্যালিফোর্ণিয়ার সঙ্গে

এই দ্রুত উন্নতিশীল অঞ্চলের খনিজ ও কৃষিজাত দ্রব্য, লোকসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভেদ লক্ষণীয়।

১১ই জানুয়ারী, ১৮৬০। এই অষ্টম বার গোল্ডেন গেট পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে পাড়ি দিলাম দূর প্রাচ্যের দিকে, যেখানে সভ্যতা তিন হাজার বছরের চেয়েও প্রাচীন। ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হল। কোস্ট রেঞ্জের চূড়া দিক চক্রবালের নীলে অস্তমিত। শেষ বারের মত, চিরকালের মত বিদায় ক্যালিফোর্ণিয়া—আবার কখনও দেখা না হলেও এই অঞ্চলের স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় চিরকাল অম্লান থাকবে।

পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় হয়ে এল। কিন্তু অনুরোধে পড়ে আমার পরিচিত মাল্লা ও পুরানো জাহাজগুলির পরবর্তী ইতিহাস যতটুকু জানি লিখতে প্রবৃত্ত হলাম।

অ্যালার্ট থেকে ফেরার পর বছর খানেক কেটেছে। তখন আমার চোখ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। আমি আবার কলেজে যোগদান করেছি। এমন সময় একদিন কাগজে পড়লাম যে "পিলগ্রীম, ক্যাপ্টেন ফকনের নেতৃত্বে সান ডিয়াগো, ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এসে পৌঁছেছে।" কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি অ্যান স্ট্রীটে হ্যাকস্টাডের হোটেলে উপস্থিত হলাম। নিশ্চিত জানতাম টম হ্যারিস ও অন্যান্যদের দেখা এখানেই পাব। আমি পৌঁছতেই একদল নীল পোশাক পরা রোদে পোড়া কালিবর্ণ চেহারার লোকেরা আমার নাম ধরে ডাকছে শুনলাম। এরা প্রথমটা আমার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ইতস্তত করছিল। একজন তো আমাকে মিঃ ডানা বলে সম্বোধন করে বসল। আমি কিন্তু ওদের আশঙ্কা দূর করে আবার আগেকার মত সৌহার্দ্যসূচক আলাপ আলোচনায় মেতে উঠলাম। টম হ্যারিসকে আমি সান ডিয়াগোতে বিদায় নেবার সময় বস্টনে আমার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করতে বলেছিলাম। টম বস্টনের একটি নকশা জোগাড় করে রাস্তার নাম মুখস্থ করছিল। তার নাকি নকশা থেকে পথঘাট এত ভালভাবে জানা হয়ে গিয়েছিল যে কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই সে এখন আমাদের গৃহে পৌঁছে যেতে পারে। কথাটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। আমি নকশাটি ওর হাত থেকে নিয়ে নেবার পরও ও নির্ভুল ভাবে পথের নিশানা বলে দিতে পারল।

টম পিলগ্রীমের দ্বিতীয় মেট হয়েছিল। পয়সাও জমিয়েছিল কিছু। বহুদিনের ইচ্ছা অনুযায়ী সে ইংলণ্ডে তার মাকে খুঁজতে যাবে ঠিক করেছিল। তাকে মাইনে নোটে অথবা স্বর্ণমুদ্রায় দেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৭ সালে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব সুবিধার ছিল না। আমি তাকে একজন ব্যাঙ্ক মালিকের কাছে পরামর্শের জন্য নিয়ে গেলাম। টম কিন্তু সেদিন বিকেলেই নিউইয়র্ক যাত্রা করল, সেখান থেকে পরদিন লিভারপুল রওনা হবে বলে। টম হ্যারিসকে শেষ দেখি ট্রেমণ্ট স্ট্রীটে একটি ঠেলাগাড়ী ঠেলে চলেছে। তাতে তার অতি জীর্ণ তোরঙ্গ, বিছানা ও সামুদ্রিক যন্ত্রপাতি।

অল্পবয়সী মাল্লা স্যাম শুনলাম কুপথে চলে যায়। তার প্রভাবশালী বন্ধু বান্ধবদের বহু চেষ্টাতেও কিছু হয় নি। ফিনল্যাণ্ডবাসী সেই ছুতোর যাকে আমাদের রাঁধুনী ঘোর সন্দেহের চোখে দেখত, অসুস্থ হয়ে মারা যায়। সাণ্টা বারবারাতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। জিম হল, যাকে ফস্টারের পরিবর্তে দ্বিতীয় মেট করা হয়েছিল—ফিরে এল পিলগ্রীমের প্রধান মেট হয়ে। এর সঙ্গে পরেও কয়েক বার দেখা হয়েছে। এ জীবনে উন্নতি করেছিল, সে যোগ্যতাও ছিল তার। বহু বড় জাহাজের কর্তৃত্বভার নিয়ে জিম দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। শেষবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয় সে দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে যাত্রা করছিল। হতভাগ্য ফস্টারের সঙ্গে দু বার দেখা হয়েছিল। আমি আইন ব্যবসা আরম্ভ করার পর ও একদিন বস্টনে আমার কামরায় প্রবেশ করে বলে ও নাকি এখন একটি বড় জাহাজের প্রধান মেট। আমার বইয়ে ওর সম্বন্ধে আমি নাকি অশ্রদ্ধাসূচক কথা লিখেছি? বইটি কিনে ও আজ রাত্রেই পড়ে দেখবে। যদি এই অভিযোগ সত্য হয় তবে ও আমাকে একবার স্টেট স্ট্রীটে পেলেই বিষম প্রহার দেবে। আমি তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললাম "ফস্টার, তোমাকে আগেও ভয় করার কোন কারণ ছিল না, এখনও নেই দেখছি।" পরে আর একবার ফস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন কিন্তু সে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছিল। বোধহয় ওর চরিত্র সম্বন্ধে ও আমার সঙ্গে একমত, অথবা আমার বইয়ে হয়ত আপত্তিকর কিছু পায় নি।

আমি এর আগে লিখতে ভুলে গেছি যে পিলগ্রীমের প্রধান মেট মিঃ অ্যানড্রু অ্যামার্জিনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ফকনের মনোমালিন্য হয় এবং উনি

ওঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন। মিঃ অ্যামার্জিন আমাদের সঙ্গে অ্যালার্টে করে ফেরেন। কিন্তু ছুটিতে মেটের যে রকম স্থানে থাকা উচিত তার পরিবর্তে ক্যাপ্টেন টমসন ওঁকে সাধারণ মাল্লাদের মত থাকতে দিয়েছিলেন। উচ্চ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁকে কথা পর্যন্ত বলতে দিতেন না। আমি ওঁর সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা বলতাম কিন্তু মেট এই ব্যাপারে খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন। বস্টনে ফিরে আসার পর অবশ্য এজন্য ক্যাপ্টেন টমসনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। পরে আর এঁর কি হয়েছিল আমার জানা নেই।

হেনরী মেলাসের সঙ্গে আমার ১৮৫৯ সালে লস এঞ্জেলসে দেখা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ও ব্যবসাতে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তার কয়েক বছর পরেই ও মারা যায়। বেন স্টিমসন জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রেরী অঞ্চলে ব্যবসা করতে থাকে। ১৮৬৩ সালে আমি যখন ডেট্রয়েট যাই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেখলাম আগেকার বন্ধুবাৎসল্য ওর তেমনই আছে।

পিলগ্রীমের মাল্লাদের বৃত্তান্তের এইখানেই সমাপ্তি। কেবল ক্যাপ্টেন টমসনের কথা বাকী আছে। ক্যাপ্টেন টমসনকে পুরানো সংস্থা আর নিযুক্ত করেনি। উনি এর পরে অন্য জাহাজে করে গোল মরিচ সংগ্রহ করতে সুমাত্রা যাত্রা করেন। এই জাহাজে মালের তদারকিতে আমার এক আত্মীয়ও গিয়েছিল, কিন্তু যাবার পূর্বে ইনি ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে আমার কাছে খোঁজ খবর করেন নি। প্রথমে সুমাত্রার উপকূলে আর একটি মার্কিন জাহাজের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের বিবাদ বাধে, তারপর স্থানীয় লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনে। উনি একদিন কূলে নামার পর তারা সকলে মিলে বলপূর্বক ওঁকে বন্দী করে এবং অন্যায় ভাবে প্রাপ্ত বাড়তি মালের জন্য টাকা দিতে স্বীকার না করা পর্যন্ত ধরে রাখে। ক্যাপ্টেন টমসনের সাহসের অভাব ছিল না। তিনি নৌকা নিয়ে তাঁর কর্মচারীকে ফিরে যেতে বললেন, এবং বললেন তাঁর আদেশের প্রতীক্ষা করতে। কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড রৌদ্র, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জাহাজ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু ক্যাপ্টেন টমসনের কাছ থেকে সাড়াশব্দ নেই—যদিও ওঁকে কূলেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল। পঞ্চম দিনে উনি হাত নাড়ছেন দেখা গেল। ওঁর কাছ থেকে আর টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই দেখে স্থানীয় লোকেরা ওঁকে ছেড়ে

দিয়েছিল। ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখ ক্যাপ্টেন টমসন জাহাজে এসে উঠলেন, দুচোখ হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে। জাহাজে লাফিয়ে উঠেই বললেন নোঙর ওঠাও, কামান ভর্তি কর। জাহাজে চারটি কামান ছিল, সেগুলি বারুদপূর্ণ করে স্থানীয় লোকেদের বাঁশের তৈরী গ্রামটির যত কাছে সম্ভব জাহাজ এনে গুলী ছুঁড়েই সমুদ্রে যাত্রা করলেন। এর পরেই আরম্ভ হল ভীষণ মাথার যন্ত্রণা ও জ্বর। কূলে জল ও শিশিরে ভিজে ওখানকার স্থানীয় মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হলেন ক্যাপ্টেন টমসন। জাহাজকে পেনাঙ যেতে নির্দেশ দিয়ে সেই যে কেবিনে ঢুকলেন আর ডেকের মুখ দেখতে হয় নি। ক্যাপ্টেনের জাহাজেই মৃত্যু হল, তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হল। আমার আত্মীয় মিঃ চ্যানিং তাঁকে সেবা শুশ্রষা করেছিলেন। এই মারাত্মক ব্যাধি তাঁর দেহেও সংক্রামিত হয়েছিল। ইনি অবশ্য পেনাঙে পৌঁছে মারা যান। প্রথম মেটও এই অসুখে পড়েন, তবে সেরে উঠে জাহাজ নিয়ে ফিরে আসেন। তবে দ্বিতীয় মেট ও অন্য মাল্লারা পলায়ন করেছিল। ১৮৫৯-১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমি পৃথিবী পর্যটনে বার হই, এই সময়ই আবার ক্যালিফোর্ণিয়ায় পদার্পণ করেছিলাম—পেনাঙে আমার আত্মীয় ও বন্ধুর সমাধির পাশে দাঁড়ালাম। রূপকথার মত সুন্দর এই দেশ, এখানে চির বসন্ত বিরাজমান, কিন্তু সুন্দর ফুলের আড়ালেই লুকিয়ে আছে বিষাক্ত ব্যাধির বীজ। ভাবলাম আমার বন্ধুর মৃত্যুর জন্য আশা করি অন্য কেউ দায়ী নয়। ক্যাপ্টেন টমসন সম্বন্ধেও মনে একটু কোমলতা আনার চেষ্টা করলাম। মৃত্যুকালে তাঁর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছিল।

পিলগ্রীমের কি হয়েছিল? এই যাত্রার শেষে তাকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে এক কারবারীর কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। কয়েক বছর পরে সমুদ্রে আগুন লেগে পিলগ্রীম ধ্বংস পায়। আমি সংবাদটি কাগজে পড়লাম।

ক্যাপ্টেন ফকন যিনি অ্যালার্টে যাত্রা করেন ও পিলগ্রীমে ফিরে আসেন পরেও অনেক বছর ধরে ভারতীয় ও চীন সাগরে জাহাজ নিয়ে গেছেন। গত যুদ্ধের সময় ইনি আমাদের নৌ বিভাগের স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দেন। এখন ইনি সামুদ্রিক জীবন ছেড়ে দিলেও বস্টনের উপকণ্ঠে এমন স্থানে বাস করেন যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। আমার সঙ্গে এঁর প্রায়ই সাক্ষাৎ হত। অ্যালার্টের মাল্লাদের উচ্চ প্রশংসা করতে শুনেছি এঁকে।

এরকম কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান এবং বিশ্বাসভাজন মাল্লা গোষ্ঠী তিনি আর কখনো দেখেন নি। বিশেষতঃ ফরাসী মাল্লা জনের কথা তিনি খুবই বলতেন। জন পরে নৌকার মাঝি হয়েছিল। গ্রানাইট ঘাটের কাছে ওর নৌকা বাঁধা থাকত। অ্যালার্টের পুরাতন মাল্লাদের কাছে ও কখনও ভাড়া নিত না। একদিন ক্যাপ্টেন ফকন ঘাটে গিয়েছেন। দূরে নোঙর বাঁধা জাহাজে উঠতে হবে। তিনি জনকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোথায় জন! মৃত্যু তাকে অতর্কিতে কখন গ্রাস করেছে। ওর কোথায় সমাধি হয়েছিল তা পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি।

অ্যালার্টের প্রধান মেট মিঃ ব্রাউন ইউরোপে বহুবার বড় বড় জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। কয়েক বছর আগে জাহাজ-ঘাট থেকে জাহাজে ওঠবার সময় পা ফসকে খোলের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সমুদ্রে মৃত্যু না হলেও তিনি নাবিকরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন বলা চলে।

দ্বিতীয় মেট ইভান্সকে কেউই বিশেষ পছন্দ করত না। তাকে একবার আদালতে দেখি, নিম্ন কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করার অপরাধে অভিযুক্ত।

তৃতীয় মেট মিঃ হ্যাচ অল্পবয়সেই খুব উন্নতি করেছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যরত অনেকগুলি বড় জাহাজের নেতৃত্বভার নিয়েছিল সে। তার শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্রবলের সুনাম ছিল।

অ্যালার্টের অন্য মাল্লাদের সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ আমার জানা নেই। একবার কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি যুদ্ধ জাহাজ দেখতে গিয়েছি। আমাদের সকলকে জাহাজের যাবতীয় বিষয় একজন কর্মচারী বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় আমার এক বন্ধু বললেন এক বৃদ্ধ মাল্লা নাকি আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করছিল "ওকে আবার জাহাজের কি বোঝাবে!" আমি লোকটিকে খুঁজে বার করলাম। তামাটে চামড়া, চোখ মুখ কোঁচকানো, ঐ দুটি চোখ বহু উত্তরে ঝড় দেখেছে—আমাদের অ্যালার্টের পুরানো পালের মিস্ত্রী—সারেঙের পোশাক পরনে। আমরা অন্যের অগোচরে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনের স্মৃতির আলোচনা করলাম। জাহাজের কর্মচারিটি যখন একজন ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তরে ফ্যাদম কি বলতে পারল না মিস্ত্রী বিদ্রূপভরে পিছন ফিরে দাঁড়াল। মনে

পড়ে গেল এর সেই স্ত্রীর বাড়ী থেকে পলায়নের গল্প। এ কিন্তু সেকথা ভুলে গিয়ে আবার বিবাহ করেছে।

হ্যারি বেনেট নামে যে মাল্লাটির বাত হওয়াতে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে পরিত্যাগ করে আসা হয় পরে পিলগ্রীমে দেশে ফেরে। আমি ওকে ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালে ভর্তি করে দিই। হাসপাতালে ওকে পরে দেখতে গেলাম। কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম "ওঃ, ভারী আরাম। একটু কাজ নেই। খাবার এসে দিয়ে যাচ্ছে।" নাবিকের কাছে এটাই স্বর্গ। কিন্তু বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে বেনেট একটি দোকান খোলে। কালক্রমে সে দোকানও উঠে যায়। বেনেটের কি হল জানি না।

হ্যারি মে নামে যে ছেলেটি আমার সঙ্গে এক নৌকায় দাঁড় বাইত, যাকে সকলে হ্যারি ব্লাফ বলে ডাকত—অতি অল্প বয়সেই বিপথগামী হয়। ন্যাট বলে ছেলেটি জাহাজের কাজ ছেড়ে তার শহরে পূর্বেকার জীবিকায় ফিরে যায়।

একদিন শীতের রাত। এক দুঃখিনী রমণী আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার ছেলে জর্জ সোমারবি নাকি মৃত্যুশয্যায়। আমি তার সঙ্গে তাদের কুটিরে উপস্থিত হলাম। অতি দীন উপকরণের মধ্যে মাটিতে বিছানা—তাতে জর্জ শুয়ে, ফ্যাকাসে চেহারা, চোখ ভিতরে ঢুকে গেছে। এই জর্জ চোদ্দ বছর বয়সে মাল্লা হয়েছিল। জাহাজে একবার বিষম হাতহাতি করে গৌরব অর্জন করেছিল। পরে এ চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। কিন্তু মাত্র উনিশ বছর বয়সে নাবিক জীবনের যাবতীয় পাপে লিপ্ত হয়ে এর আজ কি অবস্থা। দুর্বল হাতে আমার হাতটি তুলে নিয়ে ও মৃত্যুপথযাত্রীর বিবর্ণ স্বরে কথা বলল। পরদিন আমার শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার কথা। এদের দেখা শোনা করার কে আছে? জর্জের মা তাদের বাড়ীওয়ালার নাম করলে, তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসকও বটে। অর্থের ব্যাপারে এঁর সম্বন্ধে অনেকে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করলেও আমি এঁকে পরম দয়াবান বলেই জানতাম। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে উষ্ণ ঘরের মধ্য থেকে বাইরে শীতের রাস্তায় টেনে আনলাম। দু'মাইল পথ হেঁটে আমরা সেই দুঃখের দৃশ্যের মধ্যে পড়লাম। পরে জর্জের মার কাছ থেকে শুনেছি ইনি জর্জের শেষ সময়ে সর্বপ্রকার সাহায্য অতি অকুণ্ঠভাবে করেছিলেন।

অ্যালার্ট এর পর আরো দু বার ক্যালিফোর্ণিয়ায় গিয়ে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করেছিল। ১৮৪৩ সালে নিউ ইংলণ্ড, কনেকটিকাটের এক ব্যবসায়ী মিঃ টমাস ডাবলিউ উইলিয়ামস জাহাজটি কিনে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি শিকারের কাজে লাগান। এখানেও অ্যালার্ট কখনও দুর্ঘটনায় পড়েনি। ১৮৬০ সালে আমি যখন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে যাই তখন অ্যালার্টের এক পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন বাণিজ্য জাহাজ চালিয়ে যেমন আনন্দ ও গর্ব অনুভব করা হয় অ্যালার্ট চালিয়েও তিনি সেরকম আনন্দ পেয়েছেন।

অ্যালার্ট অবশেষে বিদ্রোহীদের জাহাজ আলাবামা কর্তৃক ধৃত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। তার এই সমাপ্তির বর্ণনা একটি চিঠিতে আছে। জাহাজের তদানীন্তন মালিকের অনুমতিক্রমে চিঠিটি মুদ্রিত হল।

"নিউ লণ্ডন, ১৭ই মার্চ, ১৮৬৮।

"শ্রীযুক্ত রিচর্ডা. এইচ, ডানা সমীপেষু,

মহাশয়—আপনার ১৪ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। আপনি অ্যালার্ট জাহাজটি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি মেসার্স ব্রায়ান্ট অ্যাণ্ড স্টার্গিস-এর নিকট হতে কিনে তিমি শিকারের ব্যবসায় নিযুক্ত করি। দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে অ্যালার্ট পঁচিশ হাজার পিপে তেল সংগ্রহ করে নিউ লণ্ডনে পৌঁছে দেয়। ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যালাবামা নামক বিদ্রোহী জাহাজের হাতে বন্দী হওয়া অবধি অ্যাল্যার্ট সাফল্যের সঙ্গে তার কর্তব্য করে গেছে। শেষবার এই বন্দর থেকে অ্যালার্ট ১৮৬২ সালের ৩০শে আগস্ট যাত্রা করে। এডউইন চার্চ ছিলেন ক্যাপ্টেন। মাত্র দশদিন বাদে আজোরসের কাছাকাছি জাহাজটি বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে, তখন নৌকাগুলি তিমির খোঁজে বার হয়ে গেছে, জাহাজে তিরিশ পিপে তেল। এখানেই অ্যালার্টে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

"সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক লোকের কাছেই অ্যালার্ট ছিল অতি প্রিয় জাহাজ। এই প্রসঙ্গে আপনার কথাও না এসে পারে না। অ্যালার্ট জাহাজের নাম শোনামাত্র সকলেই জিজ্ঞাসা করত "যখন নাবিক ছিলাম" বইটিতে কি এই জাহাজের কথা আছে? আপনার সঙ্গে আমরাও এই শোচনীয় পরিণতিতে

গভীর ভাবে মর্মাহত হয়েছি। এই কাজ আমাদের স্বদেশবাসীর বলেই আরো বেদনাদায়ক।

"আজ বিকেলে আমার সহকর্মী মিঃ হাভেন জানালেন জাহাজের বিবরণী পত্রিকার শেষ দিনের দিনলিপি তাঁদের হাতে এসেছে। সন্ধ্যাবেলা তিনি সেটি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। যদি এতে মূল্যবান তথ্য পাই আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনার আরো কিছু জ্ঞাতব্য থাকলে জানাতে দ্বিধা করবেন না, আমি সানন্দে আপনাকে সাহায্য করব।

ভবদীয়

টমাস ডাবলিউ, উইলিয়ামস।"

"পুনশ্চ—চিঠিটা লেখার পর পত্রিকাটি আমার হাতে পৌঁছেছে। এই সঙ্গে পাঠালাম।"

অ্যালার্টের গতি পত্রিকার শেষ পাতা।

"৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬২।

জাহাজটি প্রধান পালদণ্ড পিছনে করে এগিয়ে এল, আমরাও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরক্ষণেই দেখি আমরা সংযুক্ত রাজ্যের জাহাজ অ্যালাবামার হাতে যুদ্ধবন্দী। আমাদের প্রতি আদেশ হল যাবতীয় সামুদ্রিক যন্ত্রপাতি ও আমাদের চিঠিপত্র ওদের হাতে তুলে দিতে। তারপর আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল আমরা কি ওদের জাহাজে যোগদান করতে চাই? পরিবর্তে ওদের কাছে লিখিত ভাবে প্রতিজ্ঞা করতে হল আমরা যুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্য অথবা নৌসেনা দলে কখনও যোগ দেব না। আমরা কেউই প্রথম প্রস্তাবে রাজী হলাম না। তখন আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি জাহাজ পরিত্যাগ করতে বলা হল। চারটি নৌকায় করে আমরা চোদ্দ মাইল দাঁড় বেয়ে কূলে পৌঁছলাম। জাহাজ ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছিল। আমরা নির্বিঘ্নে পেঁৗছলাম—কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি আমাদের জাহাজ দাউ দাউ করে জ্বলছে।

একদল দুর্বৃত্তের হাতে এইভাবে আমাদের সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেল। এদের মানুষের জীবনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই—কেবল এক অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এরা সমস্ত দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে।"

আমার মনে হল আমাদের প্রিয় সুদর্শন অ্যালার্ট যার দীর্ঘ কর্মজীবনে একবারও অসাফল্যের মুখ দেখতে হয়নি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অনন্ত সুবিচারের রাজ্যে উপনীত হয়েছে। সত্যিকারের জাহাজের মত সে কর্মক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সে নিজেকে স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করল বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।

বস্টন, ৬ই মে ১৮৬৯।

আর এইচ, ডি জুনিয়র।